প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

১৭তম পুনর্মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক ইতিহাস **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায়
EHI - 02 : 5-8

	রচনা	সম্পাদনা
একক 17-18	অধ্যাপিকা ঈশিতা চক্রবর্তী	অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়
একক 19-20	অধ্যাপক দিব্যেন্দু বিকাশ হোতা	অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়
একক 21-23	অধ্যাপক রাধামাধব সাহা	অধ্যাপক হিমাদ্রী ব্যানার্জী
একক 24	অধ্যাপিকা স্বপ্না সেন	অধ্যাপক হিমাদ্রী ব্যানার্জী
একক 25-28	অধ্যাপক রঞ্জিত সেন	অধ্যাপক হিমাদ্রী ব্যানার্জী
একক 29-31	অধ্যাপিকা সুহিতা সিন্‌হা	অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়
একক 32	অধ্যাপিকা রত্নাবলী চ্যাটার্জী	অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EHI – 2

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
5

একক 17 ❑	ভারতের ইসলামের অভিঘাত ও রাজনৈতিক পরিবর্তন— দিল্লি-সুলতানির প্রতিষ্ঠা	**7-16**
একক 18 ❑	দিল্লি-সুলতানির বিকাশ আইবক থেকে বলবন	**17-24**
একক 19 ❑	খলজি বিপ্লব ও তুঘলক শাসন	**25-50**
একক 20 ❑	বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব ও বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান	**51-74**

পর্যায়
6

একক 21 ❑	সুলতানি শাসনে কৃষি ও বাণিজ্য	**75-87**
একক 22 ❑	ভারতীয় সমাজের উপর ইসলামের প্রভাব—সুফিবাদ— ভক্তি আন্দোলন—ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য শৈলীর ভূমিকা	**88-102**
একক 23 ❑	সুলতানি শাসনের পতন এবং মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা— বাবর—মোগল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা—শেরশাহ	**103-115**
একক 24 ❑	আকবরের নেতৃত্বে সুসংহত মোগল সাম্রাজ্য	**116-128**

পর্যায় 7

একক 25 ❑ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ—মোগল শাসকশ্রেণির সুদৃঢ়করণ 129-147

একক 26 ❑ ঔরংজেবের ইতিহাস—দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক সম্প্রসারণ—মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্ব—রাষ্ট্র ও ধর্ম 148-179

একক 27 ❑ মোগল সাম্রাজ্যের পতন 180-192

একক 28 ❑ মোগল শাসনে বাংলাদেশ 193-209

পর্যায় 8

একক 29 ❑ মনসবদারি ব্যবস্থা—মোগল রাজস্বনীতি ও কৃষি 210-222

একক 30 ❑ নগরায়ণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য 223-234

একক 31 ❑ মোগল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিসমূহ 235-241

একক 32 ❑ ধর্মীয় সমন্বয়বাদী—ভক্তি, সংস্কৃতি—মোগল ভারতে শিল্প-স্থাপত্য 242-255

একক ১৭ □ ভারতে ইসলামের অভিঘাত ও রাজনৈতিক পরিবর্তন—দিল্লি-সুলতানির প্রতিষ্ঠা

গঠন

১৭.০ উদ্দেশ্য
১৭.১ প্রস্তাবনা
১৭.২ ইসলামের আবির্ভাব ও ভারতে ইসলামের প্রসার
১৭.২.১ ইসলামের অভিঘাতে ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তন
১৭.৩ ভারতীয় ইতিহাসের যুগবিভাগ
১৭.৩.১ ভারতে আরব অভিযান
১৭.৩.২ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব
১৭.৩.৩ অর্থনৈতিক প্রভাব
১৭.৪ তুর্কী অভিযানের সময় ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি
১৭.৪.১ ভারতে তুর্ক-আফগান অভিযানের শুরু : সুলতান মামুদ
১৭.৪.২ মামুদের অভিযানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব
১৭.৫ ভারতের বিকেন্দ্রিকৃত সামন্ত কাঠামো
১৭.৫.১ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্ব
১৭.৫.২ তুর্ক-আফগান অভিযানের পর ভারতীয় শাসকদের অবস্থা
১৭.৬ মহম্মদ ঘুরির অভিযান
১৭.৬.১ মহম্মদ ঘুরির অভিযানের ফল : কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তি স্থাপন
১৭.৭ তুর্ক-আফগানদের সাফল্যের কারণ : ভারতীয় সামন্ত শাসকদের দুর্বলতা
১৭.৮ অনুশীলনী
১৭.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- ইসলামের অভিঘাতের অব্যবহিত পূর্বে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা
- কিভাবে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করেছিল, বিশেষ করে সুলতান মামুদের আক্রমণের আগের ভারতের সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগ
- সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণ ও ভারতীয় প্রতিরোধের ব্যর্থতা
- মহম্মদ ঘুরির বিজয় ও তার প্রতিক্রিয়া

১৭.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন এই এককটি সামগ্রিকভাবে ভারতে ইসলামের অভিঘাতের প্রথম পর্ব সম্পর্কে একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। উত্তর ভারতের যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবির্ভাব, সেটিকেও যথাসম্ভব স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। সুলতান মামুদের আক্রমণের উদ্দেশ্য এবং ফলাফলের কথাও এই এককে উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে মহম্মদ ঘুরির বিজয়ের কারণ এবং তরাইনের যুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরোধের ব্যর্থতার কথাও আপনারা এই এককে জানতে পারবেন।

১৭.২ ইসলামের আবির্ভাব ও ভারতে ইসলামের প্রসার

সপ্তম শতকে ইসলামের অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পশ্চিম এশিয়ার আরবদেশে হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) এই ধর্মমত প্রবর্তন ও প্রচার করার একশো বছরের মধ্যেই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার নানাদিকে ইসলামের প্রসার ঘটে। ইসলামের এই দ্রুত প্রসারের ফলে পশ্চিম এশিয়া এবং ইরান তার করায়ত্ত হয়। তারপর খোরাসান, মধ্য এশিয়া এবং বিশেষ করে ট্রান্স-অক্সিয়ানায় ইসলামের বিস্তৃতি ঐসব অঞ্চলে ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। সতীশচন্দ্র মনে করেন, স্থলপথে ভারতের সঙ্গে চীনের এবং পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কও ইসলামের অভিঘাতে ব্যাহত হয়েছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। অবশ্য বহির্বাণিজ্যের এই প্রাথমিক অসুবিধাগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা কেটে গিয়েছিল, ভারতীয় নাবিক ও বণিকরাও কালক্রমে তাঁদের পুরনো ভূমিকায় ফিরে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগ হয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়। এই আমল থেকে দ্বাদশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত নানাভাবে ইসলামের ভারতে প্রবেশ এবং এই যোগাযোগের প্রতিক্রিয়া জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে।

সপ্তম শতকের শেষদিক থেকে ত্রয়োদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত আলোচ্য পর্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি ও ইসলামের আবির্ভাব সংক্রান্ত সমকালীন তথ্যসূত্র প্রধানত তিন ধরনের, যথা—বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির শানসকালে উৎকীর্ণ লেখমালা, দেশীয় সাহিত্যগত বিবরণ (প্রধানত জীবন-চরিত) এবং আরবি ও পারসিক পর্যটন-পণ্ডিতদের বিবরণ। এই শেষোক্ত তথ্যসূত্রের মধ্যে আলোচ্য পর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণটি হল পণ্ডিত আলবেরুনির লেখা 'তহকিক-ই-হিন্দ' বা ভারততত্ত্ব।

১৭.২.১ ইসলামের অভিঘাতে ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তন

ইসলামের অভিঘাতে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় একটি কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক (Centralized monarchy) শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই শাসনব্যবস্থা দিল্লি-সুলতানি (Delhi Sultanate) নামে পরিচিত। সামরিক শক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রীভূত তুর্কি রাষ্ট্রব্যবস্থা কালক্রমে সর্বভারতীয় চেহারা লাভ করে এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। তবে কেবলমাত্র রাজ্যজয় ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই ইসলামি নেতারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন এই ধারণা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারতে তুর্কি রাষ্ট্রনৈতিক শাসন শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ইসলামি জগতের নানাধরনের মানুষ নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে আসছিলেন। এদের মধ্যে বণিক, পর্যটক, ধর্মপ্রচারক, মরমি সাধক যেমন ছিলেন তেমনই ছিলেন

সৈন্য, রাষ্ট্রনেতা ও লুঠেরার দল। কাজেই 'একহাতে তরবারি ও অন্যহাতে কোরাণ' নিয়ে ইসলামের ভারতজয়ের কাহিনী ইতিহাসের সরলীকরণ এবং একপেশে ব্যাখ্যা। সপ্তম শতক থেকে ইসলামের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ আসলে এক দীর্ঘ, জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটেছিল দিল্লি-সুলতানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা যেমন একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে আসেননি তেমনই তাঁদের প্রবেশ পথও ছিল ভিন্ন। কেবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে স্থলপথে আরব ও তুর্কি-আফগান সেনাবিহিনী নয়, জলপথে এদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে এসে নেমেছিলেন বণিক ও পর্যটকেরা।

১৭.৩ ভারতীয় ইতিহাসের যুগবিভাগ

নানা পথে নানা উদ্দেশ্য নিয়েই ইসলামের ভারতে প্রবেশ এদেশের ইতহাসকে নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করেছিল একথা ঠিক। কিন্তু সেই পরিবর্তনের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগবিভাগ করা যায় কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। দিল্লি-সুলতানি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতবর্ষে মধ্যযুগ শুরু হল এই ধারণা মেনে নিতে সবাই রাজি নন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের একাংশ ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আদি মধ্যযুগের সূচনা করেছিল বলে মনে করেন। ষষ্ঠ শতকে কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অবক্ষয় ও উৎপাদন সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্যে তাঁরা যুগ-পরিবর্তনের মূল সূত্রগুলি সনাক্ত করেছেন। আবার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ জেমস মিল (The History of British India) সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠা থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'হিন্দু যুগ' শেষ হয়ে 'মুসলিম যুগ' শুরু হয় বলে মনে করতেন। শাসকশ্রেণীর ধর্ম অনুসারে এই সাম্প্রদায়িক যুগবিভাগ ইতিহাসের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা থেকে তৈরি। ইসলাম ধর্মাবলম্বী সুলতানেরা ক্ষমতায় বসা মাত্র (১২০৬) রাতারাতি ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ পাল্টে যায়নি। ইসলামের অভিঘাতে ভারতীয় জনজীবনে পরিবর্তন এসেছিল ধীরে, জটিল ও দীর্ঘ আদান-প্রদানের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। কাজেই সুলতানি ও মুঘল আমলকে 'মুসলিম যুগ' আখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক।

১৭.৩.১ ভারতে আরব অভিযান

ভারতবর্ষে ইসলামের অভিঘাতের চরিত্র সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনাটি সেরে ফেলার পর এবার মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গে এই উপমহাদেশের যোগাযোগের একটি সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। সপ্তম শতকে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের ওপর আরব বণিকদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার তাদের ভারতবর্ষে বাণিজ্যক্ষেত্র প্রসারেও বিশেষ আগ্রহী করে তোলে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদের তিরোধানের পর মাত্র বারো বছরের মধ্যেই তিনবার ভারতের পশ্চিম উপকূলের তিনটি বন্দরে আরব নৌ-বাহিনী অভিযান চালায়। তানাহ্, ভৃগুকচ্ছ এবং দেবল বন্দরে এই তিনটি আক্রমণই চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী প্রতিহত করেন। এরপর অষ্টম শতকের গোড়ায় সিন্ধু অঞ্চলে তিনবার আরব সামরিক অভিযান চালানো হয়। ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজ বিন-ইউসুফের নেতৃত্বে প্রথম দুটি আক্রমণ ব্যর্থ হলেও, মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযানটি সফল হয়। ৭০৮ খ্রিস্টাব্দে কাশিমের হাতে সিন্ধুরাজ দাহির পরাজিত ও নিহত হন। সুলতানকে কেন্দ্র করে সিন্ধু অঞ্চলে আরব শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান জয়ের পর আরব-বাহিনী আরও ভূখণ্ড জয়ে সচেষ্ট হল। মহম্মদ-বিন-কাশিম স্বয়ং কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হলেন। অন্য একটি বাহিনী কনৌজ দখলের চেষ্টা করল। কিন্তু কাশ্মীরের ও কনৌজের রাজা আরব অগ্রগতি প্রতিহত করে তাদের রাজ্যসীমা থেকে বিরাড়িত করেন। এই পরাজয়ের পর মহম্মদ-বিন-কাশিম স্বদেশে ফিরে যান ও সেখানে নিহত হন। তাঁর অবর্তমানে সিন্ধুর শাসনভার গ্রহণ করেন সেনাপতি জুনাইদ। তাঁর বাহিনী ৭২৪ থেকে ৭৩৮ সালের মধ্যে রাজপুতানা পর্যন্ত উত্তর ভারতে

বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করে নেয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিহাররাজ প্রথম নাগভট্ট, চালুক্যরাজ পুলকেশী ও কাশ্মীরের কার্কটবংশীয় রাজারা বারবার সিন্ধুদেশ আক্রমণ করায় আরবশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। আরব থেকে নতুন কোনও সামরিক সাহায্য এই সময়ে আসেনি। সিন্ধু ও মূলতান ছাড়া অন্যান্য বিজিত অঞ্চল দ্রুত আরবশক্তির হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশেষে দ্বাদশ শতকের শেষদিকে তুর্কি নেতা মহম্মদ ঘুরির আক্রমণে ভারতে শেষ আরব শাসনটুকু নিশ্চিহ্ন হয়।

১৭.৩.২ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

প্রধানত বাণিজ্যিক কারণে ও লুঠপাটের উদ্দেশ্যে সিন্ধু অঞ্চলে আরব আক্রমণ ও তাদের সাময়িক শাসনের প্রতিক্রিয়া অবশ্য তেমন ব্যাপক হয়নি। উপমহাদেশের বাকি অংশে মহম্মদ-বিন-কাশিমের অভিযানের কোনও প্রভাবই পড়েনি। সুলতানের সামান্য এলাকা ছাড়া ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আরব জাতি দ্বিতীয়বার আর ভারত আক্রমণ করেনি। তবে সিন্ধু অভিযানের পর আরব ও ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। সিন্ধুজয়ের পরবর্তী বছরগুলিতে এই অঞ্চলের বণিকেরা আরবের প্রায় প্রতিটি শহরে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল। এই বণিকদের মাধ্যমেই আরব সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৭.৩.৩ অর্থনৈতিক প্রভাব

ইসলামের অভ্যুদয় ও অষ্টম শতকে ভারতে আবির্ভাব উপমহাদেশের রাজনৈতিক জীবনকে সেভাবে প্রভাবিত না করলেও অর্থনীতিকে করেছিল। ভারত মহাসাগরে আরব বণিকদের উত্থানের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্য ও অর্থনীতি ঘনিষ্ঠ সূত্রে জড়িয়ে যায়। পশ্চিম উপকূলের জনজীবনেও এই ঘটনা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। আরব লেখক আল-মাসুদি, যিনি ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন, চৌল (সৈমুর) বন্দরে কমপক্ষে দশ হাজার মুসলমান বণিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। দশম শতকে আরব বণিকেরা অনেকে কোঙ্কন উপকূলে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিলেন। ইসলামের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের প্রথম পর্বের ইতিহাস আলোচনা করার সময় কেবল মহম্মদ-বিন-কাশিম বা সুলতান মামুদের কথা নয়, এইসব অনামা বণিকদের কথাও মনে রাখা উচিত। যদিও যথেষ্ট তথ্য ও গবেষণার অভাবে এই ক্ষেত্রটি এখনও কিছুটা অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে।

১৭.৪ তুর্কি অভিযানের সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অন্যদিকে উত্তর ভারতে ৭০৮ সালে সিন্ধুর পতনের পর অন্তত তিনশো বছর আর কোনও বড় মাপের বহিরাক্রমণ হয়নি। এই দীর্ঘ, নিশ্চিন্ত অবসরে আকস্মিক যবনিকাপতন একাদশ শতকের গোড়ায়, ততদিনে মধ্য-এশিয়ার রাজনীতিতে আরবরা পিছু হটে গিয়েছে। ইসলামের পতাকা উড়িয়ে এবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানা দিয়েছিল তুর্ক-আফগান বাহিনী। কিন্তু তুর্কি হানা ও তার পরিণতিতে দিল্লি-সুলতানি প্রতিষ্ঠার আলোচনা শুরু করার আগে ওই অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি কেমন ছিল সেদিকে একবার নজর ফেরানো দরকার। উত্তর ভারতে ঐক্যবন্ধ, কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতকে দিল্লি-সুলতানি প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত উত্তর ভারত আর রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল না। কেবল তাই নয়, আলোচ্য পর্বে সমগ্র উপমহাদেশেই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমশ আঞ্চলিক গণ্ডিতে সীমিত হয়ে পড়েছিল। মৌর্যদের মতো সর্বভারতীয় শক্তি দূরে থাক, গুপ্ত

সাম্রাজ্যের মতো প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত বা বাকাটকদের মতো সমগ্র দাক্ষিণাত্যের ওপর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের নজিরও এই পর্বে পাওয়া যায় না। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার বংশ, বাংলার পাল ও সেন বংশ, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ ও সুদূর দক্ষিণের চোল সাম্রাজ্য সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হলেও এলাকাভিত্তিক শক্তি হিসেবেই এদের সনাক্ত করা যায়। এই প্রধান শক্তিগুলির অধীনে আবার বহু ছোট ছোট শাসকগোষ্ঠী ছিল, যারা সাম্রাজ্যগুলির আধিপত্য মেনে নিলেও কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে সর্বদাই তৎপর থাকত। প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে এবং অধীনস্ত শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতাদখলের লড়াই এই আমলের একটি অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা।

১৭.৪.১ ভারতে তুর্ক-আফগান অভিযানের শুরু : সুলতান মামুদ

উত্তর ভারতের এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় একাদশ শতকে হানা দিয়েছিল তুর্কো-আফগানরা। আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনী রাজ্যের শাসক মামুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে সতেরবার উত্তর ও পশ্চিম ভারতে আক্রমণ চালান। মধ্যযুগের কিছু মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিবরণে সুলতান মামুদ ইসলামের ধ্বজাধারী বীর যোদ্ধার মর্যাদালাভ করলেও, ওই আফগান সমরনেতা কিন্তু এদেশে রাজ্যজয় বা ধর্মপ্রচারের কোনও চেষ্টা করেননি। সুলতান মামুদের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য ছিল আফগানিস্থানের হিন্দুশাহী শাসক জয়পালকে পরাস্ত করা। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি শাহীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান করেন তাতে জয়পাল শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করেও পরাস্ত হন। কথিত আছে যে মামুদ জয়পালের সঙ্গে এরপর সমঝোতা করলেও, জয়পাল পরাজয়ের গ্লানি সহ্য না করতে পেরে জ্বলন্ত আগুনে আগুনে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। এই বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে শাহীরা এরপরেও মামুদের অগ্রগতিকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস সফল হয়নি। ১০০৬ সালে মামুদ উত্তর সিন্ধু অঞ্চল দখল করেন, ১০০৯ সালে এক নির্ণায়ক যুদ্ধে জয়লাভ করে পাঞ্জাব অঞ্চলে নিজের আধিপত্য কায়েম করেন। এইভাবে ধাপে ধাপে তিনি তাঁর সামরিক শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে ইতিহাস মামুদকে ভারতে নতুন এক রাজ্যবিজেতা বা শাসক হিসেবে মনে রাখেনি। তাঁর সতেরবার ভারত অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের প্রবাদপ্রতিম ধনসম্পদ লুণ্ঠন। এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলি তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এদেশের বিভিন্ন মন্দিরে বহুযুগ ধরে সঞ্চিত ধনরত্ন লুঠ করে নিয়ে গিয়ে মামুদ প্রধানত দুইভাবে কাজে লাগান। মধ্য এশিয়ার তুর্কি উপজাতীয় হানাদারদের বিরুদ্ধে যে নিয়মিত লড়াই এই সময় গজনী রাজ্যকে চালাতে হচ্ছিল তার ব্যয়ভার অনেকটাই মেটানো সম্ভব হয়েছিল ভারত থেকে লুঠের বখরা দিয়ে। এখানে মনে রাখা দরকার, ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়ম করে গ্রীষ্মকালগুলিতে সুলতান মামুদ যে তাঁর বাহিনী নিয়ে ভারতে হানা দিতেন, সেই অভিযানগুলির ফাঁকে ফাঁকেই তাঁকে মধ্য এশিয়ায়ও লড়াই চালাতে হয়েছিল। লুঠের বখরার একাংশ দিয়ে রাজধানী গজনী মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন মামুদ। ভারত কখনও তাঁর কাছে স্থায়ী আকর্ষণের কারণ হয়ে ওঠেনি। তাঁর এতগুলি সামরিক অভিযানের দীর্ঘমেয়াদি কোনও প্রভাবও পড়েনি ভারতের রাজনীতি কিংবা জনজীবনে। ১০৩০ সালে গজনীতে মামুদের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মানুষ হাঁপ ছেড়ে ভেবেছিলেন সীমান্ত থেকে বিপদ বোধহয় কেটে গেল।

১৭.৪.২ মামুদের অভিযানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

মামুদের আক্রমণ থেকে উত্তর ভারতের রাজনীতি কোনও শিক্ষা না নিলেও ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের সুফল স্পষ্ট হয় অন্য এক স্তরে। অষ্টম শতকে সিন্ধু বিজয়ের পরবর্তীতে যেমন, তেমনই একাদশ শতকের শুরুতে মামুদের হানার পরেও মুসলিম বণিকদের সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের লেনদেন বৃদ্ধি পায়। মুসলিম

বণিকদের মাধ্যমে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্র প্রসারিত হয়। নিছক অর্থনৈতিক কারণে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজারা এই নতুন বাণিজ্য সম্ভাবনায় উৎসাহী হন। এবার উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে মুসলিম বণিকদের বসতি গড়ে ওঠে। এরই সঙ্গে সুফি নামে পরিচিত ধর্ম-প্রচারকেরা ভারতে আসতে থাকেন। প্রেম ও ভক্তিতে বিশ্বাসী এক ঈশ্বরের পূজারী এই সাধকেরা হিন্দু সমাজের একেবারে নিচের স্তরে আলোড়ন তোলেন। এইভাবে বণিক এবং সুফি মরমিয়া সাধকদের মাধ্যমে ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও সমাজের আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

১৭.৫ ভারতের বিকেন্দ্রীভূত সামন্ত-কাঠামো

কেবল রাজনীতিতে নয়, সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আলোচ্য আমলে আঞ্চলিকতার উদ্ভব ও প্রসার সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা সচেতন। ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ—এই কালসীমায় ভারতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার ব্যাপক বিকাশের মূল সূত্রটি অর্থনীতি তথা উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন রামশরণ শর্মা। ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বিষয়ক তাঁর পথিকৃৎ প্রতিম গবেষণায় (Indian Feudalism) শর্মা দেখিয়েছেন জমিতে কৌমের যৌথ মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তি-মালিকানার প্রতিষ্ঠা কীভাবে রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিয়ে রাষ্ট্র-বিকেন্দ্রীকরণের পথ খুলে দিয়েছিল। এই ভূস্বামী বা সামন্ত প্রভুদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়েছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য স্থানীয় শক্তির উত্থানের মধ্যে। পাশাপাশি কারিগরি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্যে এই আমলে দেখা গিয়েছিল নজিরবিহীন সঙ্কোচন। সামগ্রিকভাবে এক স্বনির্ভর, আবদ্ধ, জড়বৎ গ্রামীণ অর্থনীতির জন্ম হয়েছিল যে পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক মৃতকল্প অবস্থা বিরাজ করতে থাকে, যা পরিবর্তন ও অভিনবত্বের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

১৭.৫.১ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্ব

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে গোটা উপমহাদেশে অর্থনৈতিক সঙ্কোচন ও সামগ্রিক অবক্ষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। আলোচ্য পর্বে উপমহাদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে বাণিজ্যের সঙ্কোচন তো নয়ই বরং বৃদ্ধি এবং কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু বিশেষভাবে উত্তর ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের বিশ্লেষণ করলে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতককে সমৃদ্ধির সময় কখনই বলা যায় না। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, উত্তর ভারতে একসঙ্গে এতগুলি রাজনৈতিক শক্তির সহাবস্থান এই আমলে আগে দেখা যায়নি। দশম শতকের শেষে ও একাদশ শতকের গোড়ায় সুলতান মামুদের অভিযানগুলির সময় উত্তর ভারতের অসংখ্য রাজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশ্মীরের লোহর বংশ, পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশ, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের রাজপুত রাজ্যগুলি এবং বাংলার পাল ও সেন বংশ। রাজপুত রাজত্বগুলির মধ্যে আবার আজমীরের চৌহান, মালবের পরমার, কনৌজের গাহড়য়াল, দিল্লির তোমর, মধ্য ভারতের কলচুরি ইত্যাদি বংশের রাজত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। এতগুলি স্থানীয় শক্তির সহাবস্থান ও তাদের মধ্যে নিয়মিত সংঘর্ষ উত্তর ভারতে একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে করে তুলেছিল সুদূর পরাহত। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় দিল্লিকে কেন্দ্র করে সুলতানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে আলোচ্য পর্বে উত্তর ভারতে বাণিজ্য অথবা নগরায়ণের প্রসার দেখা যায়নি। সমাজ-জীবনের যে ছবি সমকালীন তথ্যসূত্রে পাওয়া যায় তাকে অভিনবত্বের পরিপন্থী বা জড়বৎ আখ্যা দিলে খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাতিভেদ প্রথা। ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থার কঠোরতা ও অস্পৃশ্যতা সমাজের প্রাণশক্তি বহুলাংশে হরণ করেছিল। মানুষে মানুষে কঠোর সামাজিক ব্যবধান, ধর্মীয় বিশ্বাস

ও আচরণের পার্থক্য, কতিপয় সম্পদশালী সামন্ত রাজন্যবর্গ ও অগণিত দরিদ্র কৃষিজীবীর মধ্যে দুস্তর আর্থিক তফাত গোটা সমাজকে এমনভাবে স্তরে স্তরে ভাগ করে দিয়েছিল যে কোনও ধরনের সর্বজনীন নাগরিকত্বের বোধ এই পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা সম্ভবই ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এই বর্ণবিশিষ্ট, বহুস্তরবিশিষ্ট সমাজ সব ধরনের পরিবর্তন থেকে মুখ ফিরিয়ে সনাতন ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিল। সমকালীন উত্তর ভারতের সমাজের আত্মসন্তুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সেরা মূল্যায়ন সম্ভবত আলবেরুণির গ্রন্থের (তহকিক-ই-হিন্দ) প্রথম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায় যেখানে তিনি লিখছেন :

"ভারতীয়রা মনে করে তাদের সঙ্গে তুলনীয় কোনও দেশ নেই, জাতি নেই, রাজা নেই, ধর্ম নেই ও বিজ্ঞান নেই...... তারা যা জানে তা অন্যকে জানাতে স্বভাবতই অনিচ্ছুক। এমনকি স্বদেশের লোক ভিন্ন বর্ণের হলে তার কাছ থেকে নিজের জ্ঞানটুকু সযত্নে লুকিয়ে রাখে, বিদেশি হলে তো কথাই নেই।"

১৭.৫.২ তুর্ক-আফগান অভিযানের পর ভারতীয় শাসকদের অবস্থা

একাদশ-দ্বাদশ শতকের উত্তর ভারতে কলহপরায়ণ আত্মসন্তুষ্ট রাজন্যবর্গ সুলতান মামুদের বার বার হানা জোটবদ্ধভাবে রুখতে তো পারেইনি, এই আক্রমণগুলির সঠিক মূল্যায়ন করতেও ব্যর্থ হয়েছিল। সুলতান মামুদের বাহিনীকে তারা পূর্বতন শক বা হুণদের মতোই আরও একদল 'ম্লেচ্ছ' বলে মনে করেছিল। তাই এই আক্রমণ থেকে কোনও শিক্ষাই তারা নেয়নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষে যে একটি আগ্রাসী তুর্কি সাম্রাজ্য জন্ম নিচ্ছে এবং মধ্য এশিয়ার এই পট-পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক নিয়মিত, সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ব্যস্ত স্থানীয় শক্তিগুলি। অন্যদিকে, মামুদের সতেরবার অভিযানের সুবাদে তুর্ক-আফগান হানাদার বাহিনী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথগুলি হাতের তালুর মতো চিনে নিয়েছিল। মহম্মদ ঘুরির অভিযানের বহু আগেই তুর্কি-বাহিনী গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে নেমে আসতে পারত। উত্তর ভারতের রাজনীতি ও সমরনীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলিও অভিযানকারীদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা চাইলে দ্বাদশ শতকেই দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা হতে পারত ইসলামি শাসন। এর জন্য যে ত্রয়োদশ শতকের শুরু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল তার কারণ মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতি তুর্কি নেতৃত্বকে এতদিন ব্যস্ত রেখেছিল। মামুদের মৃত্যুর পর থেকে প্রায় দেড়শো বছরের এই অবসরে উত্তর ভারতের রাজারা জোটবদ্ধভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে পারতেন। কিন্তু স্থানীয় প্রয়োজনে তাঁরা সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হলেও মধ্য-এশিয়া থেকে আক্রমণ প্রতিরোধ সর্বভারতীয় স্তরে কোনও সচেতনতা বা প্রয়াস এই আমলেও দেখা যায়নি। মামুদের শেষ আক্রমণ এবং ঘুরির আক্রমণের মধ্যবর্তী দেড়শো বছর উত্তর-ভারতে ভাঙ্গাগড়ার যুগ। অবশ্য গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার দিকেই পাল্লা ভারি ছিল। রাজপুত রাজন্যবর্গ লাগাতার পরস্পরের সঙ্গে আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে। কিন্তু কোনও একজন রাজনীতির নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নিতে পারেনি। রাজপুত রাজন্যবর্গ, আসলে যুদ্ধকে তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক শৌর্যের অঙ্গ করে তুলেছিলেন। কিন্তু সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের দিকে মন দেননি। পরিবর্তন বিমুখ দেশীয় নেতৃত্ব ধীর অথচ অনিয়ন্ত্রিত গতির হস্তিবাহিনীর ওপরেই ভরসা করেছিলেন। ঢাল-তরোয়াল, তীর-ধনুক, পদাতিক সৈন্য ও হাতির সাহায্যে সামরিক বাহিনী গঠনের গতানুগতিকতার বাইরে যেতে পারেননি। তাই দ্রুতগামী অশ্ব ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত মহম্মদ ঘুরির বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলার সময় উত্তর ভারতের রাজারা ততটাই অপ্রস্তুত ছিলেন যতটা দেখা গিয়েছিল মামুদের আক্রমণের প্রাক্কালে।

১৭.৬ মহম্মদ ঘুরির অভিযান

উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানের ঘুর রাজ্যের অধিপতি মুইজুদ্দিন মহম্মদ-বিন-সাম বা মহম্মদ ঘুরি গজনীর অধিপতি হন ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এখানকার অধিপতি নিযুক্ত হওয়ার পর গজনী সম্প্রসারণই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর মূল লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে গোমাল গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিন্ধু অঞ্চল জয় করে

নেন। ১১৮৫ সালে তাঁর তুর্কিবাহিনী লাহোর দখল করে নেয়। মামুদের মতো কেবল লুঠপাটের অভিপ্রায়ে নয়, মহম্মদ ঘুরি ভারতে এসেছিলেন রাজ্য বিস্তারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে। সিন্ধু ও লাহোর জয়ের পর এই তুর্কি সমরনেতা গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের দিকে নজর দেন। ফলে এই অঞ্চলের রাজপুত শক্তিগুলির সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আজমীরের চৌহান-বংশীয় নৃপতি পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে রাজপুত শক্তিগুলি তুর্কি হানা রুখতে সাময়িকভাবে জোটবদ্ধ হয়। এঁদেরই মধ্যে কনৌজের গাহড়ওয়াল বংশীয় জয়চাঁদ অবশ্য সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জোটে যোগ দেননি। ১১৯০-৯১ সালে মহম্মদ ঘুরি ভাতিন্দা দখল করে নিলে পৃথ্বীরাজ তাঁর রাজপুত-বাহিনী নিয়ে থানেশ্বরের অদূরে তরাইনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তুর্কি সেনাদের রুখে দেন। ঘুরি এই যুদ্ধে আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি বাহিনী নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। পৃথ্বীরাজ ভাতিন্দা পুনর্দখল করেন। কিন্তু রাজপুত যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী পলায়মান শত্রুর পিছনে ধাওয়া করে তাদের বিনাশ না করে পৃথ্বীরাজ আজমীরে ফিরে আসেন।

১১৯২ সালে আরও বিশাল বাহিনী নিয়ে মহম্মদ ঘুরি ফের তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। তাঁর জোটসঙ্গী দিল্লির গোবিন্দরাজ যুদ্ধে নিহত হন। পৃথ্বীরাজ নিজে হাতির পিঠ ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে ধরা পড়েন ও নিহত হন। তাঁর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত জোট ভেঙ্গে যায়। অমিত শৌর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার দৈন্য, সনাতন সমরসজ্জা ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত তুর্কি বাহিনীর সুপরিকল্পিত অভিযানের কাছে পরাস্ত হয়।

১৭.৬.১ মহম্মদ ঘুরির অভিযানের ফল : কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তি স্থাপন

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর মহম্মদ ঘুরি তাঁর বিশ্বস্ত তুর্কি ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন আইবককে ভারতের বিজিত অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করে গজনীতে ফিরে যান। গজনী সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশের শাসক কুতুবউদ্দিন, মহম্মদ ঘুরির প্রতিনিধি হিসেবে আজমীর ও মেরঠের বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর দিল্লি অধিকার করে সেখানেই প্রথম তুর্কি শাসনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১১৯৪ সালে মহম্মদ ঘুরি ফের দিল্লিতে আসেন ও কুতুবউদ্দিনের সাহায্যে কনৌজের অধিপতি জয়চাঁদকে পরাজিত ও নিহত করেন। ঘুরি নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেও কুতুবউদ্দিন এরপর আলিগড় (১১৯৫), আনহিলওয়াড়া (১১৯৬) ও বদাউন (১১৯৭) দখল করেন। ১২০০ খ্রিস্টাব্দে আর এক তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খলজি জয় করেন বাংলার কিছু অংশ। ১২০২ সালে বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লরাজা পরমলদেবকে হারিয়ে তুর্কি সেনারা কালিঞ্জর, খাজুরাহো ও অন্যান্য অঞ্চল ছিনিয়ে নেয়। এইভাবে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের দশ বছরের মধ্যে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তুর্কি অধিকার কায়েম হয়। কিন্তু ভারতের এইসব ভূখণ্ড বিজয় ছিল মূলত গজনী সুলতানের জয়।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত থেকে গজনী ফেরার পথে আততায়ীর হাতে মহম্মদ ঘুরি নিহত হন। এবার কুতুবউদ্দিনের সামনে স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ আসে। কুতুবউদ্দিন সেই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দিল্লিতে এক স্বাধীন সুলতানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লি-সুলতানি নামে পরিচিত এই সাম্রাজ্য কালক্রমে সর্বভারতীয় চেহারা নেয় এবং যে কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জন্ম দেয় তা তিনশো বছরেরও বেশি স্থায়ী হয়েছিল।

১৭.৭ তুর্ক-আফগানদের সাফল্যের কারণ : ভারতীয় সামন্ত শাসকদের দুর্বলতা

এই আলোচনা শেষ করার আগে মহম্মদ ঘুরির সাফল্যের কারণগুলো আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তরাইনের যুদ্ধে ঘুরির সাফল্য অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে যে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে তিনি রাজপুত

প্রতিরোধকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সমসাময়িক মুসলিম লেখকরা ঘুরির সাফল্যকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে উল্লেখ করেছিলেন। তবে এই ধরনের দৈবনির্ভর ব্যাখ্যা ইতিহাসসম্মত নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মহম্মদ হবিব ঘুরির সাফল্যের একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন সেই সময়ের সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে। আলবেরুনীর বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে হবিব মনে করেন জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজকে সংঘবদ্ধ হতে দেয়নি এবং বহুধা বিভক্ত করে রেখেছিল। সেই সঙ্গে সামরিক দক্ষতাকেও বাড়তে দেননি। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য মনে হলেও অনেক ঐতিহাসিকই এর সঙ্গে সহমত নন। জাতিভেদ প্রথা কতটা সামরিক দুর্বলতার কারণ, সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, মুসলিম সমকাজের তথাকথিত সামাজিক সমতা ঘুরির আক্রমণের সময় নিচু জাতের হিন্দুদের ধর্মান্তরে প্রলুব্ধ করেছিল, এর স্বপক্ষে বিশেষ তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় ব্যাপক হারে ধর্মান্তর ঘটেনি। ইরফান হবিবও মনে করেন সরকার অথবা ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে এই সময় হিন্দু জাতিভেদ প্রথার ওপর সরাসরি কোনও আক্রমণ ঘটেনি। এককথায় আলবেরুনীর পর্যবেক্ষণের যাথার্থ মেনে নিলেও, হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ বিভাজনের সঙ্গে তরাইনের যুদ্ধে রাজপুতদের ব্যর্থতার সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা বরং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিরোধের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। প্রথমত, বিগত একশো বছরেরও বেশি সময় জুড়ে বহিরাগত আক্রমণকারীরা উত্তর-পশ্চিমে পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতের প্রতিরোধ বেষ্টনীকে ক্রমেই দুর্বল করে তুলছিল। এ সম্পর্কে রাজপুতরা আদপেই কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে পঞ্জাবকে গজনী দখলমুক্ত করার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু এর জন্য রণনীতির যে বিশেষ ধ্যানধারণা প্রয়োজন তা সমকালীন রাজপুত নেতৃত্বের ছিল না।

সতীশচন্দ্রের মতে, রণনীতি সম্পর্কে চেতনার আলোচ্য এই ঘাটতি বস্তুর রাজপুতদের রাজনৈতিক অনৈক্যের অনিবার্য ফল। রাজপুত রাজন্যবর্গের সৈন্যসামন্ত বা অর্থবল কম ছিল না। বরং অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মনে করেন তুর্কিদের তুলনায় রাজপুত রাজাদের সৈন্যবল বা যুদ্ধের উপকরণ বেশিই ছিল। জাতিভেদ প্রথা এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়নি। শৌর্য বা বীরত্বও তাঁদের পর্যাপ্ত ছিল। অস্ত্রশস্ত্রেও তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন না। তাহলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে পারলেন না কেন? এই প্রশ্নের কোনও সহজ উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে ঐতিহাসিকদের মতে সৈন্যসংখ্যা, অর্থবল বা সমরসম্ভারে দুর্বল না হলেও সংগঠন বা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রাজপুতরা পিছিয়ে ছিল। আয়তনে সুবিশাল রাজপুত-বাহিনী রণক্ষেত্রে যখন তুর্কিদের সম্মুখীন হত তখনই তাদের যথাযথভাবে পরিচালনা করার উপযুক্ত সংঘবদ্ধ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব অনুভূত হত। গতিতেও তুর্কিবাহিনী রাজপুত সেনানীদের পরাস্ত করত। বস্তুত, তুর্কি অশ্বারোহী বাহিনীর খ্যাতি তখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। এক অঞ্চল থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদের অন্য অঞ্চলে পাঠানো অনেক সহজসাধ্য ছিল। পক্ষান্তরে রাজপুত প্রতিরোধ ছিল বীরত্বব্যঞ্জক কিন্তু তুলনায় দুর্বল। অনেক ঐতিহাসিক রাজপুত সামন্ততন্ত্রের মধ্যে এই দুর্বলতার উৎস খুঁজে পেয়েছেন। অসংখ্য ছোট-মাঝারি-বড় মাপের সামন্তপ্রভুদের মধ্যে প্রজাদের, বিশেষ করে সেনানীদের আনুগত্য বিভক্ত হয়ে থাকার ফলে এককেন্দ্রিক আনুগত্য গড়ে উঠতে পারেনি। এক্ষেত্রে তুর্কিরা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। তাছাড়া অনেকে সমকালীন হিন্দুদের আত্মকেন্দ্রিকতার কথাও উল্লেখ করে থাকেন। হিন্দুদের কূপমণ্ডূকতার জন্য তারা বহির্বিশ্বে বিশেষত যুদ্ধবিদ্যার ক্ষেত্রে বা রণনীতির প্রয়োগগত দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। এ বিষয়ে অন্যত্র যে সব পরিবর্তন ঘটছিল সে সম্পর্কেও তারা সবিশেষ অবগত ছিল না। তুর্কিদের কাছে রাজপুতদের পরাজয়ে এই আত্মকেন্দ্রিক কূপমণ্ডূক দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা ভূমিকা আবশ্যই ছিল।

সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে রাজপুত ব্যর্থতার কারণ অনুধাবন করা সহজ হয়। সামরিক অথবা সাংগঠনিক দুর্বলতার পেছনে লুকিয়ে ছিল সামাজিক বিন্যাসের বিচ্যুতি, যার ফলে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা

সম্ভব হয়নি। সর্বোপরি বহির্বিশ্বের পরিবর্তনের সঙ্গে তারা তাল রেখে চলতে পারেনি। ফলে প্রতিরোধের বৃহত্তর পরিধি সম্পর্কে, বিশেষ করে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে তাকে কিভাবে বুঝতে হবে সে সম্পর্কে রাজপুতদের পরাজয়কে প্রায় অনির্বার্য করে তুলেছিল।

১৭.৮ অনুশীলনী

১। মহম্মদ ঘুরির আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি পরিচয় দিন।

ছোট প্রশ্ন (Short answer type) :

২। সুলতান মামুদ কেন বার বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন?

৩। দিল্লি-সুলতানি বলতে কী বোঝায়?

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective type) :

৪। ইসলামের সঙ্গে ভারতের প্রথম পরিচয় কোন শতকে হয়?

৫। আল বেরুনির লেখা ভারত-বিষয়ক বইটির নাম কী?

৬। কোন্ যুদ্ধের পরিণতিতে এদেশে তুর্কি-শাসন প্রতিষ্ঠা হয়?

১৭.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। M. Habib and K. A. Nizami (edi.) : *The Comprehensive History of India.* Vol. V. 2 parts, 1970.

২। Tarachand : *Influence of Islam on Indian Culture,* 1954.

৩। H. C. Roy : *Dynastic History of Northern India,* 1931.

৪। R. S. Sharma : *Indian Feudalism,* 1965.

৫। Romila Thapar : *A History of India,* 1966.

৬। Satish Chandra : *Medieval India, Part-I*—অনুবাদ বৈদ্যনাথ বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪ (মধ্যযুগে ভারত)—সতীশচন্দ্র।

একক ১৮ □ দিল্লি-সুলতানির বিকাশ : আইবক থেকে বলবন

গঠন

১৮.০ উদ্দেশ্য

১৮.১ প্রস্তাবনা

১৮.২ দিল্লি-সুলতানির প্রতিষ্ঠা : দাসবংশ অভিধা নিয়ে বিতর্ক

১৮.২.১ কুতুবউদ্দিন আইবক

১৮.২.২ তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

১৮.২.৩ ইলতুৎমিস

১৮.২.৪ সুলতানা রাজিয়া

১৮.২.৫ নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ ও গিয়াসুদ্দিন বলবন

১৮.৩ সুলতানি শাসনের চরিত্র : রাষ্ট্র ধর্মপ্রিয় ছিল কিনা?

১৮.৪ রাজতন্ত্রের আদর্শ বিষয়ে বলবনের তত্ত্ব

১৮.৪.১ শাসক হিসাবে বলবনের কৃতিত্ব

১৮.৫ দিল্লি-সুলতানির অর্থনৈতিক ভিত্তি

১৮.৬ অনুশীলনী

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- কুতুবউদ্দিন আইবকের রাজত্বকাল
- ইলতুৎমিসের শাসন
- সুলতানা রাজিয়ার স্বল্পকালীন শাসন
- নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ ও গিয়াসুদ্দিন বলবনের সুলতানি শাসনের চরিত্র
- দিল্লি-সুলতানির অর্থনৈতিক ভিত্তি

১৮.১ প্রস্তাবনা

আগের এককটিতে আপনারা ভারতে তুর্কি আক্রমণ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে জেনেছেন। আপনারা আরও দেখছেন ইতিহাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে ইসলামের প্রসার সমকালীন রাজনীতিকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে প্রসারমান ইসলামের এই অভিঘাত বিভিন্ন পর্বে অনুভূত হলেও প্রধানত সুলতান

মামুদ এবং মহম্মদ ঘুরির আক্রমণের কথা ঐতিহাসিকরা বিশেষভাবে উল্লেখ করে থাকেন। এই দুই আক্রমণের উদ্দেশ্য এক ছিল না, এই দুই আক্রমণের অভিঘাতও অভিন্ন ছিল না। তবে এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই যে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি ভারতবর্ষের ইতিহাসের এমন একটি নির্ণায়ক ঘটনা, যার প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে রাজপুত রাজ্যনবর্গ এই নির্ণায়ক ঘটনার প্রগাঢ় তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতার জন্য তাঁদের অত্যন্ত চড়া দামও দিতে হয়েছিল।

বর্তমান এককে আমরা মহম্মদ ঘুরির আক্রমণের পর দিল্লি-সুলতানির প্রথম পর্যায়ের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করব। এই পর্বের মুখ্য ঘটনা হল ঘুরির মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবকের নেতৃত্বে সুলতানির প্রতিষ্ঠা। আমরা ইতিপূর্বে আইবকের প্রথম জীবনের কথা উল্লেখ করেছি। আপনারা জানেন, আইবক ছিলেন ঘুরির আস্থাভাজন এবং প্রিয় ক্রীতদাস। তরাইনের যুদ্ধে এবং তারপর উত্তর ভারতে তুর্কি সামরিক অভিযানেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে তিনি ভারতবর্ষে ঘুরির জয় করা অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে কথাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই এককে ঘুরির মৃত্যুর পর আইবকের রাজত্বকাল থেকে বলবনের মৃত্যু পর্যন্ত সুলতানির ইতিহাসের কথা আপনারা জানতে পারবেন।

১৮.২ দিল্লি-সুলতানির প্রতিষ্ঠা : দাসবংশ অভিধা নিয়ে বিতর্ক

১২০৬ সালে মহম্মদ ঘুরির মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবক গজনী রাজ্যের সঙ্গো সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতে যে স্বাধীন তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তা দিল্লি-সুলতানি নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্য ১২০৬ থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত ৩২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবকের আমল থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকাল (১২৬৬-১২৮৪) পর্যন্ত সময়কে ভারতে তুর্কিবিজয় সংহত করে একটি কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে। প্রস্তুতিপর্বে সুলতানি শাসকদের যে সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে হয়েছিল সেগুলি হল : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আক্রমণ, দিল্লির মসনদের বিরুদ্ধে তুর্কি অভিজাতবর্গের ষড়যন্ত্র, পূর্বভারতে বিদ্রোহ এবং রাজপুতদের বিরোধিতা। প্রথম পর্বের শাসকেরা একদিকে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির মোকাবিলা ও অন্যদিকে শিশু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট শাসনকাঠামো নির্মাণ—এই দুটি কাজই কৃতিত্বের সঙ্গো করেছিলেন।

কুতুবউদ্দিন আইবক থেকে গিয়াসুদ্দিন বলবন পর্যন্ত দিল্লি-সুলতানির শাসকদের একসঙ্গো দাসবংশ নামে অভিহিত করেছেন এলফিনস্টোন, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ সাবেক ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ্। এই নামকরণের কারণ সুলতান কুতুবউদ্দিন, সুলতান ইলতুতমিস এবং সুলতান বলবন—প্রথম জীবনে তিনজনেই ছিলেন ক্রীতদাস। কেউ কেউ এঁদের ইলবারি বা আলবারি তুর্কি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কুতুবউদ্দিন থেকে বলবন পর্যন্ত সব সুলতান আলবারি বংশোদ্ভুত ছিলেন না। আর দাসবংশ অভিধাটি তো অনৈতিহাসিক, কারণ ইসলামি রীতি অনুসারে দাসত্ব থেকে মুক্তি (manumission) পেলে তবেই কেউ সিংহাসনে বসতে পরতেন। অনেকে আবার এঁদের মামেলুক সুলতান নামেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'মামেলুক' শব্দটির অর্থ এমন ক্রীতদাস যে মুক্ত পিতামাতার সন্তান। তাই এই অভিধার সঙ্গোও দাসত্বের ব্যঞ্জনা থেকে যাচ্ছে। সুতরাং বংশগত জটিলতার মধ্যে না গিয়ে এঁদের সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রথম পর্বের শাসক হিসেবে উল্লেখ করাই ভাল।

১৮.২.১ কুতুবউদ্দিন আইবক

১২০৬ থেকে ১২১০ পর্যন্ত স্বাধীন রাজত্বকালের চার বছর কুতুবউদ্দিন আইবক প্রধানত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। গজনী মসনদে মহম্মদ ঘুরির উত্তরসূরীদের ভারত আক্রমণের চেষ্টা ঠেকাতে

কুতুবউদ্দিন সীমান্তের নিকটবর্তী লাহোরে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গাড়েন। ১২১০ সালে লাহোরেই তাঁর মৃত্যু হয়। নতুন রাজ্যজয় কিংবা শাসন সংগঠন, সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে কোনও দিকেই তিনি সেভাবে মন দিতে পারেননি। তাঁর সেরা কৃতিত্ব দিল্লিকে কেন্দ্র করে মধ্য এশিয়ার প্রভাবমুক্ত একটি সার্বভৌম সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা।

১৮.২.২ তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

সদ্যোজাত একটি রাষ্ট্রের নায়ক কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লাহোরের উচ্চপদস্থ তুর্কি অভিজাতবর্গ বা আমির-ওমরাহ্‌রা প্রয়াত সুলতানের পুত্র হিসাবে কথিত আরম শাহকে সিংহাসনে বসান (১২১০)। অবশ্য আরম শাহ আইবকের পুত্র ছিলেন কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। সতীশচন্দ্রের মতে আইবকের তিন কন্যা থাকলেও কোনও পুত্র ছিল না। এই মনোনয়ন দিল্লির ওমরাহদের না পসন্দ হওয়ায়, তাঁরা কুতুবউদ্দিনের জামাই বদায়ুনের শাসনকর্তা ইলতুতমিসকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ইলতুতমিস তাঁর অনুগত ওমরাহদের সাহায্যে আরম শাহকে পরাজিত ও বন্দি করে ১২১১ সালে দিল্লির মসনদে বসেন। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সমস্যা মেটাতে তুর্কি অভিজাতবর্গের তৎপরতা থেকে বোঝা যায় রাজা গড়ার কারিগর হিসেবে তাঁদের আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া এই আমলেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। মহম্মদ ঘুরির সঙ্গে ভারতে আসা এই আমির-ওমরাহদের অধিকাংশই আদিতে ছিলেন কুতুবউদ্দিনের মতো ক্রীতদাস। জাতিতে তুর্কি এই নেতারা রাষ্ট্রের প্রায় সব উঁচু পদগুলি দখল করে রেখেছিলেন। ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করা রাজস্বের একটা বড় অংশের ভোগ-দখলের অধিকারী এই তুর্কি শাসকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান ছিল একমাত্র সুলতানের সঙ্গেই তুলনীয়। সুলতান বলবনের আমলে এঁদের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়নি।

১৮.২.৩ ইলতুতমিস

দিল্লির অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করে ইলতুতমিস স্বাভাবিকভাবেই এঁদের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আমিরদের দল 'বন্দেগান-ই-চহেলাগান' অর্থাৎ চল্লিশ-চক্র তাঁর সময়েই গড়ে ওঠে। তবে অভিজাতবর্গের ক্ষমতাবৃদ্ধির থেকেও গুরুতর বিপদ নিয়ে ইলতুতমিসকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। বাংলায় আলিমর্দান খানের বিদ্রোহ, মুলতানে নাসিরুদ্দিন কুবাচার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা, পূর্ব রাজস্থানে রাজপুত শক্তিগুলির প্রতিরোধ সামাল দিয়ে শিশু সুলতানি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান ইলতুতমিস। এর ওপর আবার তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ-র আক্রমণের আশঙ্কা। চেঙ্গিস খাঁ সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্য এশিয়ার খওয়ারিজমি সাম্রাজ্য ধ্বংস করে ১২২০ সালে ভারত সীমান্তে এসে উপস্থিত হন। মোঙ্গল সমরনেতার তাড়া খেয়ে ভারতে পালিয়ে আসা খওয়ারিজমির শাসক জালালউদ্দিন মঙ্গাবরনি এই সময় দিল্লির কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী কূটনীতিক ইলতুতমিস মঙ্গাবরনিকে আশ্রয় দিয়ে মোঙ্গল নেতার বিরাগভাজন হতে চাননি। শেষ পর্যন্ত মঙ্গাবরনি পারস্যে চলে গেলে এবং ১২২৭ সালে চেঙ্গিস খাঁ-র মৃত্যু হলে মোঙ্গলভীতি তখনকার মতো দূর হয়। এরপর ইলতুতমিস পূর্বভারতে দৃষ্টি ফেরান। বাংলায় এক অভিযান পাঠিয়ে সেখানে দিল্লির শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া রণথম্ভোর, ঝালোর, যোধপুর, গোয়ালিয়র, গুজরাত ইত্যাদি রাজপুত রাজ্যগুলি কৌশলে জয় করে সুলতানি সাম্রাজ্যের হারানো অংশগুলি পুনরুদ্ধার করেন। ১২৩৪ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় সুলতানি সাম্রাজ্য পশ্চিমে সিন্ধু অঞ্চল থেকে পূর্বে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহম্মদ ঘুরির পৃষ্ঠপোষকতায় কুতুবউদ্দিন আইবক যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার ভিত্তি সুদৃঢ় করে স্থায়িত্বদানের কৃতিত্ব ইলতুতমিসের প্রাপ্য। ভারতে তুর্কিবিজয়ের প্রকৃত সংগঠক তিনিই। ঐতিহাসিকরা তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তাঁর রাজত্বকালেই সুলতানি গজনী

অথবা ঘুরির প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে স্বাধীন সত্তায় আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর রাজত্বকালে ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের খলিফার প্রতিনিধি ভারতে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে স্বীকৃতি জানালে মুসলিমদের দৃষ্টিতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এটি ছাড়াই তিনি তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও খলিফার স্বীকৃতির প্রতীকী তাৎপর্যকে অবহেলা করা যায় না। তিনি দিল্লিকে সুলতানি শাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে এই শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮.২.৪ সুলতানা রাজিয়া

ইলতুতমিস তাঁর কন্যা রাজিয়াকে মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন। কন্যাসন্তানের এহেন উত্তরাধিকার ইসলামি নির্দেশের পরিপন্থী এই যুক্তিতে তুর্কি অভিজাত তথা ওমরাহ্‌রা এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। ইলতুতমিসের উজির নিজাম-উল-মুল্‌ক্ জুনিয়াদির নেতৃত্বে তাঁরা সুলতানের পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসনে বসান। রুকউদ্দিনের সঙ্গে অভিজাতবর্গের মধুচন্দ্রিমার পর্ব অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত। ১২৩৬ সালে ওমরাহদের একাংশের সমর্থনে সিংহাসনে বসেন রাজিয়া। শাসকশ্রেণী আশা করেছিল নতুন সুলতান হবেন তাদেরই হাতের পুতুল। স্বাধীনচেতা রাজিয়া উল্টে তুর্কিগোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য ধ্বংস করে রাজপদে অন্যদেরও নিয়োগ করা শুরু করেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার রাজিয়া তুর্কি অভিজাতদের কোনও শক্তিশালী গোষ্ঠীরই সমর্থনপুষ্ট ছিলেন না। ফলে তাঁর পক্ষে অভিজাতদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নেবার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। দরবারে বসে বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করে ও পুরুষের বেশে প্রকাশ্যে বেরিয়ে সুলতানা রাজিয়া সনাতনপন্থী ধর্মীয় নেতাদেরও বিরাগভাজন হন। অচিরেই মোল্লা ও তুর্কিগোষ্ঠীর যৌথ চক্রান্তে রাজিয়ার পতন হয়। ১২৪০ সালে এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

১৮.২.৫ নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ ও গিয়াসুদ্দিন বলবন

সুলতানা রাজিয়ার চার বছরের রাজত্বকালে রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রাজতন্ত্রের সঙ্গে আমিরচক্রের প্রকাশ্য সংঘর্ষের সূচনা। ১২৪০ সালে রাজিয়ার হত্যা থেকে ১২৬৬ সালে বলবনের মসনদে আরোহণ পর্যন্ত দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল এই অভিজাতবর্গেরই কোনও না কোনও গোষ্ঠীর হাতে। এদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ছাব্বিশ বছরের মধ্যে তিনজন শাসক যথা মুইজুদ্দিন বহরম শাহ (১২৪০-৪২), আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ (১২৪২-৪৬) এবং নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ (১২৪৬-৬৫) মসনদে বসেন। এঁদের মধ্যে শেষজন, ইলতুতমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ, সিংহাসন লাভ করেছিলেন আমিরচক্রের মধ্যমণি উলুঘ খানের মদতে। এঁরই অনুমোদনে নাসিরুদ্দিনের শাসনকাল তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালে সুলতান বলবন নামে পরিচিত উলুঘ খাঁ প্রথমে ছিলেন সুলতান নাসিরুদ্দিনের প্রধান প্রাসাদরক্ষী। ওই পদে থেকে নিজের কন্যার সঙ্গে তরুণ সুলতানের বিবাহ দিয়ে উলুঘ তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। শান্তিপ্রিয়, অনভিজ্ঞ সুলতানের শাসনকালের শেষের দিকে অন্য তুর্কি আমিরদের কোণঠাসা করে উলুঘই হয়ে ওঠেন দরবারে সর্বেসর্বা। কিন্তু সম্ভবত জনমতের ভয়েই সুলতান নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত উলুঘ মসনদ দখল করেননি। ১২৬৬ সালে গিয়াসুদ্দিন বলবন নাম নিয়ে তিনি দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

১২৮৬ সাল পর্যন্ত কুড়ি বছর বলবনের শাসনকাল সুলতানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাফল্যের সঙ্গে বহিরাক্রমণ মোকাবিলা করে ও আমিরচক্রের ক্ষমতা খর্ব করে বলবন রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। বেতনভুক সামরিক বাহিনীর শক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক শাসনকাঠামো তাঁর আমলেই গড়ে ওঠে।

১৮.৩ সুলতানি শাসনের চরিত্র : রাষ্ট্র ধর্মপ্রিয় ছিল কিনা?

সুলতানি শাসনব্যবস্থার চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তৎকালীন ইসলামি দুনিয়ার রীতিরেওয়াজ অনুযায়ী বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দিল্লির সুলতানদেরও মুসলিম বিশ্বের প্রধান বাগদাদের খলিফার প্রতি আনুগত্য জানাতে হত। কিন্তু এই আনুগত্য জানানোর বিষয়টি ছিল একেবারেই আনুষ্ঠানিক ও প্রতীকী। কোনও কোনও ঐতিহাসিক অবশ্য মনে করেন, দিল্লি-সুলতানি ছিল একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র (theocratic state)। সুলতানি আমলের সমকালীন সেরা ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি এই যুগের শাসনব্যবস্থার চরিত্র বোঝাতে 'জাহানদারি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাঁর 'ফতোয়া-ই-জাহানদারি' নামে বিখ্যাত গ্রন্থে। 'জাহানদারি' শব্দটির অর্থ পার্থিব শাসন এবং যে শাসন ধর্মীয় আধিপত্য থেকে আলাদা। কিন্তু হাল আমলে ঐতিহাসিকদের একাংশ যথা ঈশ্বরীপ্রসাদ, শ্রী রাম শর্মা, আশীর্বাদীলাল শ্রীবাস্তব প্রমুখ সুলতানি শাসনের ধর্মীয় ভিত্তির ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান। অন্যদিকে কুনওয়ার মহম্মদ আসরফ, ইসতিয়াফ হুসেন কুরেশি, মহম্মদ হাবির, খলিফ নিজামি প্রমুখ সুলতানি শাসনকে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র আখ্যা দিতে রাজি নন। যাঁরা বলেন সুলতানি আমলে রাষ্ট্র ছিল ধর্মাশ্রয়ী তাঁদের মতে, তুর্কি শাসকেরা পবিত্র কোরান মেনে দেশ শাসন করতেন। রাষ্ট্রে ধর্ম ছিল ইসলাম। কোনও সুলতানই ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আলাদা করেননি। এই রাষ্ট্রে ধর্মীয় নেতৃত্ব বা উলেমাদের আধিপত্য ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, দিল্লি-সুলতানির শাসকেরা যে কোরানের নির্দেশ মেনে অথবা ধর্মীয় নেতৃত্বের আজ্ঞায় রাষ্ট্র চালাতেন এমন কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই। ভারতে ইসলামের বিজয়ের প্রথম পর্বেও খলিফা নয়, সুলতানই ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রে। কুতুবউদ্দিন বা ইলতুতমিস ইসলামি ধর্মগুরুর প্রতি যে আনুগত্য জানিয়েছিলেন তা প্রধানত রাজনৈতিক তাগিদপ্রসূত। সুলতানি সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই তাঁদের সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল।

খলিফার অনুগত শাসক হিসেবে নিজেকে জাহির করার অভিপ্রায়ে ইলতুতমিস প্রধান ধর্মগুরুর কাছে দূত পাঠান। খলিফা খুশি হয়ে তাঁকে 'সুলতান-ই-আজম' অর্থাৎ প্রধান সুলতান অভিধায় ভূষিত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী আমির-ওমরাহদের চোখে রাজপদটিকে বৈধতা ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ইলতুতমিসের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, খলিফার নৈতিক সমর্থন তাঁর দরকার হয়েছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য। উলেমাদের নির্দেশে ইলতুতমিস রাজ্য চালাননি। ভারতে ইসলামের রাজ্য (দার-উল-ইসলাম) স্থাপনের পরামর্শেও তিনি কর্ণপাত করেননি। আবার ১২৬৬ সালে মসনদে বসে গিয়াসউদ্দিন বলবন যখন বাগদাদের অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করলেন তখন তার পিছনেও কাজ করেছিল বৈধতা আদায়ের রাজনৈতিক তাগিদ। চল্লিশ আমিরচক্রের অন্যতম নায়ক থেকে ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে ওঠা বলবনের পক্ষে কেবল খলিফার অনুমোদনই যথেষ্ট হয়নি। ঈর্ষান্বিত অন্য আমিরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাল দিয়ে রাজপদটি সুরক্ষিত রাখতে বলবন নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপেও ঘোষণা করেন। বস্তুত ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রস্থাপনের জন্য নয়, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে রাজতন্ত্রকে যাবতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার নাগালের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে বলবন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

১৮.৪ রাজতন্ত্রের আদর্শ বিষয়ে বলবনের তত্ত্ব

সুলতানি শাসকদের মধ্যে একমাত্র বলবনই রাজতন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সুলতানের ঐশ্বরিক ক্ষমতার ধারণাটি পেয়েছিলেন পারস্যের ঐতিহ্য থেকে। নিজেকে তিনি পারস্যের পৌরাণিক নৃপতি আফ্রাসিয়াবের (Afrasiyab) বংশধর বলেও দাবি করেন। পারস্যের দরবারের বহু আদবকায়দা ও রীতিনীতিও বলবনের আমলে দিল্লিতে চালু হয়েছিল। সুলতান পদের মর্যাদা যে আমির-ওমরাহদের অনেক ওপরে তার প্রতি জোর দিতে বলবন দরবারে সুলতানের পদচুম্বনের পারসিক রীতি প্রচলন করেন। এই রেওয়াজ ইসলাম

অনুমোদিত না হলেও সুলতানের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য জরুরি ছিল। রাজপদকে ঘিরে একটি সম্ভ্রমের আবহ গড়ে তুলতে তিনি দরবারে নাচ-গান ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করে দেন। খাপখোলা তলোয়ার হাতে দীর্ঘদেহী রক্ষীদের দ্বারা বেষ্টিত সুলতান নিজেকে ঘিরেও একটি ভীতির প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন।

তবে নবগঠিত রাষ্ট্রে বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মোকাবিলা করে রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে সুলতানের প্রধান হাতিয়ার ছিল অবশ্যই সেনাবাহিনী। বেতনভুক সৈন্যদের নিয়ে গড়া সামরিক বিভাগকে বলবন সম্পূর্ণভাবে সুলতানের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। সেনা নিয়োগ ও বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব দেন 'দেওয়ান-ই-আরজ্' উপাধিধারী বিশ্বস্ত কর্মচারীর ওপর। সামরিক শক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী শাসনের প্রধান স্তম্ভ গুপ্তচর বিভাগকেও বলবন সুসংগঠিত করেন।

বলবনের রাজতান্ত্রিক আদর্শের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বংশকৌলীন্য ও তুর্কি আভিজাত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ। অভিজাত কুলোদ্ভব নয় এমন কাউকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে নিয়োগ করতে রাজি ছিলেন না। এর পরিণতিতে ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলিমরা সুলতানি সাম্রাজ্যের যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু মজার কথা, নিজেকে তুর্কি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জাহির করলেও, বলবন করাও সঙ্গেই রাষ্ট্রক্ষমতা ভাগ করে নিতে রাজি ছিলেন না, এমনকী তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও নয়। একদা যে চল্লিশ চক্রের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন সেই তুর্কি অভিজাতবর্গের ক্ষমতা তাঁর আমলেই চূড়ান্তভাবে খর্ব করা হয়। রাজতান্ত্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে প্রধান বাধা এই তুর্কি নেতাদের অনেকের জায়গির বাজেয়াপ্ত করেন সুলতান। কয়েকজনকে হত্যাও করা হয়। এইভাবে ইলতুতমিসের আমলে গড়ে ওঠা আমিরচক্র ভেঙে যায় এবং সুলতানের স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠার পথে সামরিক বাহিনী ও গুপ্তচর বিভাগের পাশাপাশি বলবনের আরও একটি হাতিয়ার ছিল বিচারব্যবস্থা। শাস্তি দেওয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতা করায়ত্ত করে বলবন যে কোনও বিরোধিতা কড়া হাতে দমন করতেন। মসনদের কর্তৃত্ব অমান্য করার অপরাধে অভিজাত, উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরও চরম দণ্ড থেকে রেহাই মিলত না।

১৮.৪.১ শাসক হিসেবে বলবনের কৃতিত্ব

শাসক হিসেবে বলবন যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এ কথা ঠিক যে তিনি নতুন কোনও রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তার সম্ভাবনাও ছিল না, কারণ তাঁর পুত্র বুঘরা খাঁ-র সেই যোগ্যতাও ছিল না। বুঘরা তরুণ কাইকোবাদের হাতে দিল্লির শাসনক্ষমতা সমর্পণ করে নিজে লখনৌতির শাসন নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কাইকোবাদের মধ্যেও যোগ্যতার ছিটেফোঁটা ছিল না। শাসনক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এই শূন্যতার পূর্ণ সুযোগ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন জালালউদ্দিন খলজি। তিনি এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর নাম খলজি বংশ।

তবে তাঁর জীবদ্দশায় বলবন অসামান্য যোগ্যতার সঙ্গে শাসন পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের আগে ওমরাহরা যেভাবে শাসনব্যবস্থাকে কুক্ষীগত করেছিল তা বলবন মেনে নেননি। সুলতানের সঙ্গে অভিজাতরা যে সমতুল্য নন,—সুলতানের অবস্থান যে তাঁদের অনেক উর্ধ্বে—সেকথা তিনি শুধু ঘোষণাই করেননি, বাস্তবে রূপায়িত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। আইন-শৃঙ্খলাকে শক্ত হাতে প্রয়োগ করে উত্তর দোয়াব অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। ঐতিহাসিকরা মনে করেন এই শান্তি স্থাপনের ফলে বণিকের যাতায়াত নির্বিঘ্ন হয়, বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং ভবিষ্যতে সুলতানির সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মৌলিক কোনও পরিবর্তন না করলেও যেভাবে তিনি ইকতাদারদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর যোগ্যতার পরিচালয়ক। চিহালগানি বা তার সমতুল্য কোনও গোষ্ঠীর পক্ষে সুলতানকে চাপে রাখার সম্ভাবনার তিনি মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কাকে দূর করে তিনি সুলতানির ভিত আরও

মজবুত করে তুলেছিলেন। তাঁর শাসন সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল না, নানাক্ষেত্রে অনেক অসম্পূর্ণতাও ছিল। তার অনেকগুলিই পরবর্তী খলজি শাসকরা দূর করে দিল্লি-সুলতানিকে স্থায়িত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮.৫ দিল্লি-সুলতানির অর্থনৈতিক ভিত্তি

১২৮৬ সালে বলবনের মৃত্যুর সময় দিল্লি-সুলতানির শানসকাঠামোর রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদ থেকে পূর্বে বাংলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত এই কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রাক্-সুলতানি আমলের মতোই ছিল প্রধানত কৃষি। রাষ্ট্রের আর্থিক সচ্ছছলতা ও স্থিতিশীলতার জন্য নিয়মিত ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু রাখা সুলতানি শাসকদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নতুন রাষ্ট্র এবং তার নতুন শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনে নতুনভাবে উদ্বৃত্ত আহরণের দরকার হয়েছিল। প্রথমে লুঠের মাল, ধনরত্ন, পরে উপঢৌকন ও অন্য নানাধরনের কর এই কাজে সহায়ক হয়েছিল। তবু যতদিন না ভূমিরাজস্ব স্থায়ী এবং নির্দিষ্ট হয়েছে, সুলতানি শাসনের ভিত্তিও ততদিন সুদৃঢ় হয়নি, তা শাসকদের যতই সামরিক শক্তি থাক। ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ও শাসকশ্রেণীর মধ্যে তা বণ্টনের নিয়মিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনেই সুলতানি আমলের সূচনাপর্বে উত্তর ভারতে ইকতা-ব্যবস্থা চালু হয়। 'ইকতা' বলতে নির্দিষ্ট অঞ্চলে রাজস্ব আদায় করার অধিকার বোঝায়। শাসনব্যবস্থার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এক-একজন ব্যক্তিকে এইভাবে বেতনের বদলে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দেওয়ার প্রথার উদ্ভব হয় দিল্লি-সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ইলতুতমিসের আমল থেকে। ত্রয়োদশ শতকেই ইকতা-ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। গোড়ার দিকে ইকতার শাসক বা মুকতিদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া বা নিজের অধীনে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য রাখা বাধ্যতামূলক ছিল না। কিন্তু ক্রমশ মুকতিদের এই দুটি কর্তব্য আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সুলতানি শাসকেরা নিজেদের অধীনস্ত খালসা জমি বাড়ানোর দিকেও মনোযোগ দেন। ইলতুতমিস রাষ্ট্রে খাস জমির তদারক করার জন্য একজন ক্রীতদাসকে নিয়োগ করেন। দিল্লি ও তার আশপাশের জেলাগুলি, দোয়াবের অংশবিশেষ ইলতুতমিসের আমলে খাস জমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। জিয়াউদ্দিন বরানির সাক্ষ্য অনুসারে বলবনের আমলেই ইকতা থেকে সংগৃহীত উদ্বৃত্ত রাজস্ব রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পাঠানোর প্রথা চালু করা হয়। এই উদ্বৃত্ত হিসাব করার রেওয়াজ দেখে বোঝা যায়, প্রতিটি ইকতা থেকে কত আদায় হত বা রাজস্ব বাবদ সংগৃহীত হত এবং সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য কত ব্যয় হত তার ওপর নজরদারিও বলবনের আমলে শুরু হয়েছিল। এই নজরদারির কাজের জন্য বলবন 'খাজা' পদটি সৃষ্টি করেছিলেন।

নতুন রাষ্ট্রের নতুন উদ্বৃত্তের প্রয়োজনে সুলতানি আমলে যেমন ভূমি সম্পর্কের বিন্যাস পাল্টে গিয়েছিল, তেমনই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের অন্যান্য ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছিল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। ত্রয়োদশ শতক থেকে উত্তর ভারতে নগরায়ণের নতুন জোয়ার, শিল্প ও কারিগরিতে বৈচিত্র্য এবং বাণিজ্যের প্রসার এই পরিবর্তন সূচিত করেছিল। দিল্লিতে সুলতানি শাসন শুরু হওয়ার পর ভারতের নানা অঞ্চলে অনেক নতুন নগর গড়ে ওঠে। এই নগরগুলি একদিকে যেমন ছিল প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি, তেমনি শিল্প ও বাণিজ্যেরও কেন্দ্র। উত্তর ভারতে এই নবপর্যায়ের নগরায়ণের প্রধান দৃষ্টান্ত দিল্লি। কুতুবউদ্দিন আইবকের অধিকারের আগে দিল্লি স্থানীয় একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল মাত্র। ইলতুতমিস দিল্লি নগরীকে সুলতানি সাম্রাজ্যের রাজধানী করার পর বিশাল শহর হিসেবে এর সমৃদ্ধির সূচনা হয়। ইবন বতুতার সাক্ষ্য অনুসারে দিল্লি সেকালে কেবল ভারতবর্ষেরই সবচেয়ে বড় নগর নয়, মুসলিম শাসিত পূর্বাঞ্চলে বৃহত্তম ছিল। নগর হিসেবে দিল্লিকে গড়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব সুলতান

ইলতুতমিসের। দূরদূরান্ত থেকে যেসব মানুষ এখানে এসে জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যশস্বী ও সুপণ্ডিত। ফলে দিল্লি অচিরেই ইসলামি সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে লাহোর ছিল আর একটি বড় নগরকেন্দ্র।

সুলতানি আমলেই পরের দিকে ক্যাম্বে প্রভৃতি বন্দর-শহর ও দৌলতাবাদ নগরীর সমৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহিরাগত নতুন শাসকশ্রেণীর জীবনযাত্রার পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল এই নব পর্যায়ের নগরায়ণে। তবে নগরকেন্দ্রগুলির শ্রীবৃদ্ধির পিছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল অবশ্যই শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারে। নানা দেশের বণিকেরা এই নতুন নগরগুলিতে যাওয়া-আসা করতেন। অনেকেই স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিলেন। নতুন মানুষ, নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে দৈনন্দিন লেনদেন ভারতীয় সমাজজীবনে প্রাণশক্তি ও গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। অন্যদিকে নগরকেন্দ্রগুলির কারিগর ও বণিককুল সাধারণত সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে বঞ্চিত হতেন না। এর প্রধান কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নগরের শ্রীবৃদ্ধি রাজকোষে বাড়তি রাজস্বের পথ সুগম করেছিল ঠিক সেই সময় যখন রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের জন্য সম্পদের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি।

১৮.৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন (Long answer type) :

১। দিল্লি-সুলতানির শাসনকে আপনি কি একটি কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র (centralised monarchy) বলবেন?

ছোট প্রশ্ন (Short answer type) :

২। সুলতানি শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তি কী ছিল?

৩। সুলতান ইলতুতমিস ও সুলতান বলবনের শাসন কি ধর্মাশ্রয়ী ছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective type) :

৪। দিল্লি-সুলতানির প্রতিষ্ঠাতা কে?

৫। ইকতা কী?

৬। চল্লিশ চক্র কী?

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। M. Habib and K. A. Nizami (edited) : *The Comprehensive History of India,* Vol., V, 2 parts, 1970.

২। I. H. Qureshi : *The Administration of the Sultanate of Delhi,* 1945.

৩। A. B. M. Habibullah : *Foundation of Muslim Rule in India,* 1945.

৪। Irfan Habib and Tapan Roychowdhury (edited) : *The Cambridge Economic History of India,* Vol., I, 1982.

একক ১৯ □ খলজি বিপ্লব ও তুঘলক শাসন

গঠন

১৯.০ উদ্দেশ্য

১৯.১ প্রস্তাবনা

১৯.২ খলজি বিপ্লব

১৯.৩ জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ খলজি (১২৯০-১২৯৬ খ্রিঃ)

১৯.৪ আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৪ খ্রিঃ)

১৯.৪.১ আলাউদ্দিনের রাষ্ট্রশাসনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

১৯.৪.২ অর্থনৈতিক সংস্কার : রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ

১৯.৪.৩ বাজার ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ

১৯.৫ খলজি সাম্রাজ্যবাদ

১৯.৫.১ গুজরাট অভিযান

১৯.৫.২ রাজস্থান অভিযান

১৯.৫.৩ মালব অভিযান

১৯.৫.৪ মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারত অভিযান (প্রথম পর্যায়)

১৯.৫.৫ মহারাষ্ট্র (দেবগিরি) অভিযান (দ্বিতীয় পর্যায়)

১৯.৫.৬ খলজিদের পতন

১৯.৬ তুঘলক রাজত্ব : গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রিঃ)

১৯.৭ মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিঃ)

১৯.৭.১ শাসন সংস্কার

১৯.৭.২ রাজধানী পরিবর্তন

১৯.৭.৩ মুদ্রানীতি

১৯.৭.৪ সামরিক পরিকল্পনা

১৯.৭.৫ মূল্যায়ন

১৯.৮ ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রিঃ)

১৯.৮.১ কর ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

১৯.৮.২ সৈন্যবাহিনীর সংগঠন

১৯.৮.৩ বিচারব্যবস্থা

১৯.৮.৪ জনহিতকর কার্যাবলী

১৯.৮.৫ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা

১৯.৮.৬ ধর্মনীতি

১৯.৮.৭ সামরিক কৃতিত্ব

১৯.৮.৮ শেষ জীবন

১৯.৮.৯ মূল্যায়ন

১৯.৯ অনুশীলনী

১৯.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- কীভাবে খলজি সুলতানরা বলবনের পর রাষ্ট্রশাসনের নতুন মাত্র যোগ করেছিলেন।
- কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা অর্জন করেছিল।
- কীভাবে সামরিক রাষ্ট্রে প্রয়োজনে অর্থনৈতিক সংস্কার করা হয়েছিল।
- কেন পরবর্তী কালে মুহম্মদ বিন তুঘলকের সংস্কার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল।
- কেন ফিরোজ শাহ তুঘলকের চেষ্টা সত্ত্বেও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

১৯.১ প্রস্তাবনা

আইবক থেকে বলবন যে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের পত্তন করেছিলেন, সেই রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদে দীক্ষা দিয়েছিলেন আলাউদ্দিন খলজি। সামরিক প্রয়োজনে তিনি অর্থনৈতিক সংস্কার করেছিলেন। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। কিন্তু তার পরেই খলজিদের পতন ও তুঘলক রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। মহম্মদ বিন তুঘলকের অনেক চমকপ্রদ পরিকল্পনা বাস্তব প্রতিকূলতার দরুন ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর ফিরোজ তুঘলক জনমুখী নানা পরিকল্পনা নিয়ে রাষ্ট্রকাঠামো টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তবুও তার পর কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে চলে যায়। বর্তমান এককে সুলতানি রাষ্ট্রের এই গতি-প্রকৃতিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯.২ খলজি বিপ্লব

জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ খলজি ১২৯০ সালের জুন মাসে ইলবারী তুর্কি বা মামেলুক শাসনের অবসান ঘটিয়ে খলজি শাসনের সূচনা করেন। ১২৯০-১৩২০ এই সময়কালে খলজি শাসন দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং রাজনীতি বিষয়ে এই সময়ে কতগুলি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। পরিবর্তনগুলির সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব বিবেচনা করে ঐতিহাসিকেরা খলজিদের অভ্যুত্থানকে খলজি বিপ্লবের সূচনা বলে মনে করেছেন। এই পরিবর্তন নিছক তথাকথিত দাস বংশের পরিবর্তে খলজি বংশের শাসন অর্থাৎ নিছক রাজবংশের পরিবর্তন ছিল না। বলা যেতে পারে, সুলতানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে খলজিদের শাসনকাল এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। পূর্ববর্তী শাসকবর্গের শাসন এবং সাম্রাজ্য বিষয়ক যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গিয়েছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটায় খলজিরা। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ এই সময়ে লক্ষণীয়। দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রকৃতি পালটে যায়। তুর্কি শাসকগোষ্ঠীর একচেটিয়া একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগ শেষ হয়। ঐতিহাসিক হবিবুল্লাহ, হাবিব ও নিজামী প্রত্যেকেই খলজি যুগকে ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা বলে মনে করেছেন। সেই কারণে খলজিদের উত্থান এক বংশের পরিবর্তে আরেক বংশের সিংহাসন দখলের সাধারণ ঘটনা না বলে খলজি বিপ্লব বলা হয়েছে। জালালউদ্দিন এই বিপ্লবের সূচনা করেন এবং আলাউদ্দিনের সময়ে এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিণত রূপ পায়।

খলজিরা তুর্কি-বংশোদ্ভূত ছিলেন কিনা এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। আধুনিক গবেষকরা বলেছেন, ঘুরির পার্শ্ববর্তী গরমসার অঞ্চলে বসবাসকারী খলজিরা তুর্কি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আধুনিক গবেষকেরা

সম্ভবত ঈস্তাখরি এবং বসওয়ার্থ লিখিত খলজিদের তুর্কি-বংশোদ্ভূত সম্পর্কিত বক্তব্যের ভিত্তিতে নিজেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খলজিদের তুর্কি-বংশোদ্ভূত বলে কেউ মনে করতেন না। ইরফান হাবিব বলেছেন, খলজিরা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা কোনো গোষ্ঠী নয়। খলজি অভিজাতদের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন দেখা গেছে, তেমনি সাধারণভাবে ব্যাপক সংখ্যায় সুলতানের সৈন্যবাহিনীতেও দেখা গেছে। অবশ্য ইরফান হাবিব, তুর্কি-বংশোদ্ভূত শাসকগোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্যের কথাও স্বীকার করেছেন। খলজি অভ্যুত্থানের গুরুত্ব বোঝা যাবে, যদি আমরা পরিবর্তনগুলির গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করি।

ঐতিহাসিক হাবিবুল্লাহের মতে, জালালউদ্দিনের সুলতান পদে অধিষ্ঠান একটি পুরানো যুগের অবসান ঘটিয়েছিল। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের নীতির ওপর ভিত্তি করে মামেলুক তুর্কিরা যে শাসনকাঠামোটি গড়ে তুলেছিলেন, সেই কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লো। এই তুর্কি-শাসকগোষ্ঠীর বাইরে থেকে খলজিরা শাসনক্ষমতা দখল করে এই আধিপত্যের অবসান ঘটান। খলজিদের জয়লাভ প্রমাণ করে যে একটি জাতিগত গোষ্ঠীর স্বৈরতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, তার জায়গায় প্রয়োজন যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়ে গঠিত একটি সুপরিকল্পিত প্রশাসন। বলবনের রাজত্বকালের শেষের দিকে বোঝা যাচ্ছিল, তুর্কিদের একচেটিয়া স্বৈরতন্ত্র তৎকালীন সময় এবং পরিস্থিতির দাবির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে চলতে পারছে না। দাবি ছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন সামাজিক কাঠামো। এই দাবির রূপায়ণ খলজিদের শাসনকালে লক্ষ্য করা গেছে। ড. কে. এস. লাল তাঁর 'History of the Khaljis' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, খলজিদের ক্ষমতাদখলের ফলে কেবল একটি নতুন সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠা হয়নি। এর ফলে অবিরত রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার, শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সূচনা হয়েছে। এ যুগে সাহিত্যের জগতেও নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে।

জালালউদ্দিন অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সঙ্গে খলজি শাসনের সূচনা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, দীর্ঘস্থায়ী তুর্কি আধিপত্যের অবসান দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষেরা সহজে মেনে নেবে না। তিনি তাই যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে চলছিলেন এবং অভিজাত সকলকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। জালালউদ্দিন প্রথম বারো মাস রাজধানীতে প্রবেশ করেননি, পরিবর্তে কাইলুঘরী (Kailugarhi) তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। বলবনের বন্ধু ফখ্‌র-উদ্দিনকে দিল্লির কোতোয়াল পদে বহাল রেখেছিলেন। বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র চাজ্জুকে কারা প্রদেশের দায়িত্বে রেখে দিয়েছিলেন। আসলে জালালউদ্দিন তাঁর উদারতা ও দান-ধ্যানের দ্বারা জনগণের মধ্যে খলজি শাসনের ভীত দৃঢ় করার চেষ্টা করেছিলেন। কালক্রমে সুলতানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তিনি বিনা বাধায় রাজধানী দিল্লিতে পদার্পণ করেন। ধীরে-ধীরে তাঁর শাসনকাঠামো পায়ের নিচে শক্ত মাটি খুঁজে পায়। তবে খলজি শাসনের কাঠামো আলাউদ্দিনের সময়ে আরো পরিণত হয়ে উঠেছিল। নিজামী এবং হাবিব জালালউদ্দিন শাসন বিষয়ে বলেছেন যে, তাঁর রাজত্বকাল মামেলুকদের পরীক্ষামূলক যুগের সঙ্গে আলাউদ্দিনের পরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সেতু রচনা করেছিল। তিনি তুর্কিদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে রচিত প্রতিক্রিয়াশীল অবাস্তব রাজনৈতিক কাঠামোর অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের সূচনা করেছিলেন। জালালউদ্দিন যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, সেই বিপ্লব আলাউদ্দিনের সময়ে পরিণতি লাভ করে। এই অর্থে খলজি বিপ্লবকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়।

ত্রিপাঠীর মতে, আলাউদ্দিন খলজি বিপ্লবে এক নতুন মাত্রা এনেছিলেন। তিনি খলজিদের সমরবাদী উন্মাদনার যোগ্য প্রতিভূ ছিলেন। আলাউদ্দিন বলবনী রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বলবনের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তিনি বলবনের চেয়ে চিন্তাভাবনায় অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। তিনি বলবনের সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিতে পারেননি। কে. এস. লালের মতে, আলাউদ্দিন বলবন অপেক্ষা বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। যেখানে বলবন সীমান্ত নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ সংহতির জন্যে রাজ্যবিস্তার

থেকে বিরত ছিলেন, সেখানে আলাউদ্দিন ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিল্লির ইতিহাসে তিনি প্রথম মুসলমান সুলতান, যিনি সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি একই সঙ্গে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এবং আভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে মজবুত করেন। আলাউদ্দিন সামগ্রিকভাবে সুলতানি ব্যবস্থায় নতুন গতি সঞ্চার করেছিলেন। সুতরাং, কেবলমাত্র খলজি পরিপ্রেক্ষিতে নয়, গোটা সুলতানি ইতিহাসে আলাউদ্দিন অনন্যসাধারণ।

আলালউদ্দিন সাম্রাজ্যকে ধর্মের আধিপত্য থেকে মুক্ত করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, রাষ্ট্র নিজের বিষয় নিজেই পরিচালিত করবে এবং উলেমাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বৈরতন্ত্র থেকে এসেছিল, কারণ তাঁর মতো ক্ষমতাপ্রিয় শাসক, সকল ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার পরিচায়ক। ধর্ম রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, এই ধরনের মানসিকতা আধুনিক রাষ্ট্রেরই একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য আলাউদ্দিন ধর্মবিরোধী ছিলেন না। বরং তিনি অনেকের কাছ থেকে ইসলামের রক্ষক হিসাবে প্রশংসা পান।

খলজিরা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচন অথবা খলিফার অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না। তাঁরা রাজতন্ত্রকে সামরিক শক্তি ও দক্ষতার ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ববর্তী শাসকদের তুলনায় পৃথক ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতবর্ষে মুসলমান রাজতন্ত্রের ইতিহাসে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ত্রিপাঠীর মতে, খলজিদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। খলজিরা দেখিয়েছিলেন রাজতন্ত্র কোনো একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর হাতে নেই। যাদের হাতে ক্ষমতা ও দক্ষতা আছে, কেবলমাত্র তারাই রাজতন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। খলজিদের দ্বিতীয় অবদান এই যে, সুলতানের পক্ষে ধর্মের ওপর নির্ভরতার প্রয়োজন নেই।

আলাউদ্দিনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল—অর্থনীতিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা। আমরা এখানেও আলাউদ্দিনের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। যদিও এখানে আলাউদ্দিন স্বৈরতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর অধীনে রাষ্ট্র বাজার ও মুল্য নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখানে আলাউদ্দিনের মধ্যে মধ্যযুগের স্বৈরতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছিল বলে অনেকে মনে করেন। আবার অন্যদিকে আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক নীতিতে কল্যাণকর রাষ্ট্রের দায়িত্ব ফুটে ওঠে বলে অধ্যাপক সাক্সেনা মনে করেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে তিনি সর্বপ্রথম মূল্য-নিয়ন্ত্রণজনিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যদিও স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মূল্যনিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়নি। তথাপি আলাউদ্দিন অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা তুলে ধরেছিলেন।

খলজি বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য হল আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদ। আলাউদ্দিন ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর জন্যে তিনি সামরিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই সামরিক শক্তি আলাউদ্দিনকে একটি ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করে তুলেছিল। নিঃসন্দেহে এটি ছিল আলাউদ্দিনের সবথেকে বড় কীর্তি। এই সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি ছিল সামরিক। এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসে স্থায়ী হয়নি। আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না।

দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত খলজি বিপ্লব সম্পূর্ণভাবে অতীতের অবসান না ঘটালেও বেশকিছু নতুন বৈশিষ্ট্যের সূচনা করেছিল, যা মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল।

১৯.৩ জালাউদ্দিন ফিরোজ শাহ খলজি (১২৯০-১২৯৬ খ্রিঃ)

বলবন সুলতান নাসিরুদ্দিনের পুত্রদের সরিয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসেছিলেন এবং এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যে অভিজাত শ্রেণী ও সেনাবিভাগের সমর্থন থাকলে প্রতিষ্ঠিত বংশের

উত্তরাধিকারীদের হঠিয়ে সিংহাসন দখল করা যায়। ঠিক একইভাবে জালালউদ্দিন খলজির নেতৃত্বে খলজি অভিজাতদের একটি দল ১২৯০ খ্রিঃ বলবনের অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের সরিয়ে দিল্লির আধিপত্য লাভ করেন। জালালউদ্দিন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন। অভিজাতদের মধ্যে অ-তুর্কি গোষ্ঠী খলজিদের এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে। খলজিরা শাসনক্ষমতায় এলে তুর্কি প্রাধান্যের অবসান হয়। তবে জালালউদ্দিন সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্রের শাসন প্রচলন করেননি। বলবনের সময়কার অনেক তুর্কি অভিজাত এবং অমাত্য যাঁরা জালালউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁদের তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বসিয়েছিলেন। এমনকি বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক চাজ্জুকে কারার শাসক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। চাজ্জু যখন বিদ্রোহী হয়ে পরাজিত হয় তখনও তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়নি।

জালালউদ্দিন বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়ে উদার ধারণার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। বলবনের শাসনের কঠোরতা বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে বলেন যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের সদিচ্ছার ও সমর্থনের উপরই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করা এবং প্রজাদের মঙ্গল কামনাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। তিনি নিজে ধার্মিক মুসলমান ছিলেন কিন্তু সমস্ত হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা যে অবাস্তব তা বুঝেছিলেন। ভারতের জন-সংখ্যার বৃহদংশ হিন্দু, সুতরাং ভারত কখনও ইসলামিক রাষ্ট্র হতে পারে না—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। আহমদ চাপের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি হিন্দুদের নিজস্ব ধর্মাচরণের পক্ষে মত দেন। তাঁর প্রাসাদের সামনে দিয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় শোকযাত্রায় কোন বাধা তিনি দেননি। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের সমর্থনকে তিনি ইসলাম-বিরোধী বলে মনে করতেন। কঠোর শাস্তি না দিয়ে সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করে তিনি অভিজাতদের সদিচ্ছা লাভের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উদার নীতিকে তাঁর সমর্থক সহ অনেকেই দুর্বলের নীতি বলে ভেবেছিলেন। ঐ দুযোর্গপূর্ণ সময়ে এই ধরনের নীতি কার্যকরী হওয়া মুস্কিল ছিল। দেশে নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল—ঘরে ও বাইরে শত্রু থাকার জন্যে। আলাউদ্দিন দিল্লির সিংহাসনে বসে জালালউদ্দিনের নীতি সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

১৯.৪ আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৪ খ্রিঃ)

আলাউদ্দিন চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজ পিতৃব্য ও শ্বশুর জালালউদ্দিন খলজিকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা থাকাকালীন তিনি দেবগিরি ও দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। দেবগিরি থেকে লুণ্ঠিত সোনা বিতরণ করে অভিজাত ও সৈন্যদের বশীভূত করে তাদের সমর্থন লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে তাঁকে পরপর কয়েকটি বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়।

আলাউদ্দিন তাঁর পিতৃব্যের রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে উদার ও মানবিক নীতি বর্জন করেন। তাঁর ধারণায় এই নীতি বিদ্রোহ ও মোঙ্গল আক্রমণের প্রেক্ষাপটে একেবারেই সময়োপযোগী ছিল না। তাছাড়া এই নীতি দুর্বলতার সামিল বলে সকলেই ধরে নিতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল।

১৯.৪.১ আলাউদ্দিনের রাষ্ট্রশাসনের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

শাসিতের মনে ভীতির সঞ্চার করে রাষ্ট্র চালনার যে নীতি বলবন গ্রহণ করেছিলেন, আলাউদ্দিন সেই নীতি অনুসরণ করেন। কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর ও বলিষ্ঠ নীতির প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। রাজত্বের প্রথমদিকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আকত খান, ভাগিনেয় ওমর খান ও মাংগু খান, নয়া মুসলমানদের

ও হাজি মোল্লার বিদ্রোহ আলাউদ্দিনকে কঠোর হাতে দমন করতে হয়। কিন্তু যাতে বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেইজন্যে বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে চারটি কারণে বিদ্রোহ হয় ঃ (১) সাম্রাজ্যের সকল সংবাদ সুলতানের কর্ণগোচর হয় না এবং সুলতান নিজ কার্যে অবহেলা করেন, (২) মদ্যপানের ফলে অভিজাতদের উচ্চাভিলাষ বৃদ্ধি পায়, (৩) পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ও মেলামেশা করে দরবারের আমির-অমাত্যরা সুলতানকে অগ্রাহ্য করতে সাহসী হয়, (৪) প্রজাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার প্রবণতা বাড়ে।

বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধান করে সুলতান ভবিষ্যতে বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য কয়েকটি কঠোর নির্দেশনামা জারি করেন। (১) সাম্রাজ্যের সমস্ত রকম সংবাদ যাতে সুলতানের নিকট যথাসময়ে পৌঁছায় তার জন্যে তিনি অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন। অভিজাতদের গতিবিধি এমনকি ব্যক্তিগত বিষয়গুলি সম্পর্কেও গুপ্তচরেরা সুলতানকে অবহিত করত। (২) আমীর-ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্যে তিনি অভিজাতদের কাছ থেকে ওয়াক্ফ বা ইনাম হিসাবে প্রাপ্ত বাড়তি জমি কেড়ে নেন। (৩) তিনি মদ্যপান বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। তিনি স্বয়ং মদ্যপান ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। (৪) তাঁর অনুমতি ছাড়া আমীর-ওমরাহরা পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক বা মেলামেশা করতে পারবে না—এই আদেশ দেওয়া হয়। একসঙ্গে মিলিত হতে হলে, আগে থেকে সুলতানের অনুমতি নিতে হ'ত। ঐতিহাসিক কে. এস. লাল বলেছেন যে বারাণী ও সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা অভিজাতদের প্রতি আলাউদ্দিনের আচরণের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা অতিরঞ্জিত। তবে একথা ঠিক যে, আলাউদ্দিন অভিজাতদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে পেরেছিলেন।

বারাণী জানিয়েছেন যে, আলাউদ্দিন হিন্দু, বিশেষ করে হিন্দু জমিদারদের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্যে ভূমি ও ভূমিরাজস্ব সংস্কার সাধন করেছিলেন। হিন্দুদের কাছ থেকে নানাধরনের কর আদায় করে তাদের আর্থিক ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। এই নীতিগুলির মধ্যে আলাউদ্দিনের হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন বলে বারাণী যে কথা বলেছেন তা আদৌ ঠিক নয়। রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে (চৌধুরী, খুত্, মুকদ্দম্) হিন্দুরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন বলেই আলাউদ্দিন তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছিলেন—এখানে ধর্মের কোন ভূমিকা ছিল না। আলাউদ্দিন আর এক অভিনব নিষ্ঠুর পন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন, নব মুসলমানদের বিদ্রোহ দমন করার সময়। তিনি বিদ্রোহী নব মুসলমানদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সকলকে বন্দী করেছিলেন। বিদ্রোহীদের পরিবার-পরিজন কঠোর শাস্তি পেয়েছিল।

আলাউদ্দিন কিন্তু জালালউদ্দিনের একটি ধারণার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন যে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এখানে প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন সম্ভব নয়। সুলতানের একচ্ছত্র ক্ষমতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। এই ক্ষমতার অংশীদার অভিজাত ও উলেমা—কেউ-ই হতে পারবে না। রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে গেলে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা সম্ভব হয়। শরিয়ৎ বা ইসলামীয় আইনে যে শাস্তির বিধান নেই, পরিস্থিতির দাবিতে সেই শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। ধর্ম কোনভাবেই রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণায় আলাউদ্দিনের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্যশাসন সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি কাজী মুঘিসুউদ্দিনের কাছে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "....যে সব আদেশ রাষ্ট্রের মঙ্গল ও জনগণের উপকার সাধন করবে তা আমি জারি করে থাকি। লোকে আমার নির্দেশের প্রতি অবহেলা ও অশ্রদ্ধা দেখালে আমি বাধ্য হয়ে তাদের বশে আনার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আমি জানি না শরিয়ৎ অনুযায়ী এটা আইনি কি বেআইনি, তবে রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর অথবা জরুরি প্রয়োজনের উপযোগী বলে যা মনে করি সেই নির্দেশ জারি করি। আমি একথাও জানি না, শেষ বিচারের দিনে ঈশ্বর আমার বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেবেন।" রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যাপারে তিনি

নিজে যা সঠিক বলে মনে করতেন সেই অনুসারে চলতেন। তিনি কেন্দ্রে সুলতান-নির্ভর একটি শক্তিশালী সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং কোন ধর্মীয় প্রভাবে স্বীয় সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হতেন না।

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে অ-তুর্কি বংশোদ্ভূত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতেন। তাঁর দুই বিখ্যাত সেনাপতি জাফর খান এবং নসরত খান অ-তুর্কি ক্রীতদাস মালিক কাফুর আলাউদ্দিনের দক্ষিণভারত বিজয়ের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সামানা ও সুনামের শাসনকর্তা মালিক নায়েক নামে এক হিন্দু ছিলেন। তিনি মোঙ্গালদের বিরুদ্ধে যে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাতে বহু মুসলমান সেনাপতি ছিলেন। আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনীতে বহুসংখ্যক ভারতীয় মুসলমান ছিল। খলজিদের উত্থানের পূর্বে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যে তুর্কি প্রাধান্য ছিল আলাউদ্দিনের সময় তা একেবারে বিলুপ্ত হয়।

১৯.৪.২ অর্থনৈতিক সংস্কার : রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ

আলাউদ্দিন খলজির সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরে দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে অর্থাৎ উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা ও পূর্ব রাজস্থানে মোটামুটি সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সুশাসনের জন্য সুলতান নানা আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সমর্থ হন। একদিকে সরকার ও গ্রামের চাষীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে শাসনব্যবস্থার উন্নতি এবং অন্যদিকে শহরের অধিবাসীদের সুখ-সুবিধা এই ছিল আভ্যন্তরীণ সংস্কারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে মোঙ্গালদের বিরুদ্ধে এবং সুলতানি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার কারণে বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। সুশাসন ও নিরাপত্তা—এই দুই-এর কারণে আলাউদ্দিন বিভিন্ন সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন।

আলাউদ্দিন সর্বপ্রথম জমির খাজনা হিসেবে কৃষকেরা ঠিক কি দেয় তা জানবার জন্যে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় প্রধানেরা কৃষকদের কাছ থেকে যাতে বেশি করে অর্থ বা শস্য জোর করে আদায় করতে না পারে আলাউদ্দিন তা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। আলাউদ্দিন দীপালপুর ও লাহোর থেকে কারা অর্থাৎ আধুনিক এলাহাবাদের নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত সমস্ত গ্রামগুলি 'খালসা' অর্থাৎ সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই অঞ্চলের কোন গ্রামকেই ইক্‌তা হিসাবে কোন আমির বা ওমরাহকে দেওয়া হল না। যে জমিগুলি দান হিসাবে ব্যক্তি বা সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল, সব আবার ফিরিয়ে নেওয়া হল। এই অঞ্চলের ভূমিরাজস্বের (খরজ্) পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক। জরিপ করে জমির পরিমাণ দেখে রাজস্ব নির্ধারণ করা হত। এছাড়া 'চরাই' ও 'ঘরাই' নামে দুটি কর ছাড়া আর অন্য কোন কর কৃষকদের ওপর চাপানো চলত না। উৎপন্ন শস্যের ওপর ভূমিরাজস্ব ঠিক করা হলেও মুদ্রায় ওই রাজস্ব দাবি করা হত। ফলে কৃষকরা উৎপন্ন শস্য বানজারাদের কাছে অথবা স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করত।

আলাউদ্দিন রাজস্ব সংগ্রহকারী, খুত্, মুকদ্দম্ (মুকাদ্দম) ও চৌধুরীদের অর্থ, বিত্ত ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধে কমিয়ে দেবার জন্যে সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। খুত্ ও মুকদ্দম্ গ্রামের রাজস্ব এবং চৌধুরীরা পরগণার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন। এইসব রাজস্ব সংগ্রহকারীরা বিত্তবান ও সুবিধাভোগী ছিল। আলাউদ্দিনের নির্দেশে খুত্, মুকদ্দম্ ও চৌধুরীদের সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল এবং কৃষকদের সমান হারে রাজস্ব দিতে বলা হল। এরা যাতে কৃষকের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতে না পারে বা তাদের করের বোঝা কৃষকের ওপর চাপাতে না পারে সরকার থেকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হত।

নায়েব উজির শরফ্ কোয়ি গ্রামের হিসাবরক্ষক বা পাটোয়ারীর খাতা থেকে সরকারের পাওয়া রাজস্বের প্রতিটি 'জিতল' রাজস্ব সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে ও রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের কাছ থেকে আদায় করতেন।

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জোরজুলুম করা হত। রাজস্ব কর্মচারীদের নির্যাতন করা হত। রাজস্ব আদায় বিন্দুমাত্র গাফিলতিতে তাদের শাস্তি দেওয়া হত। বারাণী বলেছেন যে, লোকে এদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতো না।

কৃষকদের দেয় পরিমাণের মোটা অংশ রাজকোষে জমা পড়ুক—এই ছিল আলাউদ্দিনের লক্ষ্য। কৃষকদের শোষণ করে খুত্, মুকদ্দম্, চৌধুরীরা যাতে ধনী হয়ে উঠতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। যেহেতু এই পদাধিকারীরা হিন্দু ছিল, তাই সুলতান হিন্দুবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। সুলতানের নীতিই ছিল কি হিন্দু, কি মুসলমান কেউ-ই যেন বিত্তবান হয়ে সুলতানের বিরোধিতা করতে না পারে। এদের অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা বর্ণনা বারাণী এইভাবে দিয়েছিন : খুত্ ও মুকদ্দমরা সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারত না বা পানও চিবোতে পারত না। তারা এত দরিদ্র হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের গৃহিণীরা মুসলিম পরিবারে কাজ নিতে বাধ্য হয়। বারাণীর এই বিবরণ নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত। এদের প্রভাব একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

জমি জরিপ করার ব্যবস্থা, মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা ও গ্রামস্তরে পাটোয়ারীদের লেজার বই ধরে রাজস্ব আদায়ের হিসাব পরীক্ষা করা—আলাউদ্দিনের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব সংস্কার শেরশাহ ও আকবর অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর কৃষি-বিষয়ক সংস্কারের ফলে গ্রামীণ স্তরে বাজার অর্থনীতির (Market economy) বিকাশ ঘটিয়েছিল।

১৯.৪.৩ বাজার ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ

ড. সতীশচন্দ্র মনে করেন যে, আলাউদ্দিন প্রশাসন ও সামরিক প্রয়োজনে বাজারদর নিয়ন্ত্রণ এবং এই সংক্রান্ত সংস্কার সাধন করেছিলেন। আলাউদ্দিনের বাজারদর নিয়ন্ত্রণ এবং তার প্রয়োগে সাফল্য সেই সময়ে সকলকে বিস্মিত করেছিল। বারাণী বলেছেন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা। মোঙ্গলরা দিল্লি অবরোধ করলে এই সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন জরুরি হয়ে পড়ে। প্রচলিত হারে বেতন দিয়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখা ঐ সময়ে আর্থিক সংকটের দরুন সম্ভব ছিল না। মুদ্রাস্ফীতি তো ছিলই তাছাড়া মজুত অর্থভাণ্ডার এমন ছিল না যে যথাযথ বেতন দিয়ে বেশিদিন সৈন্য রাখা যাবে। কাজেই বারাণীর মতে, সুলতান প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দর বেঁধে দিলেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত বাজারে এক দাম চালু করা হল কেননা তার ফলে কম খরচে বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখা আলাউদ্দিনের পক্ষে সহজ হয়। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য কম থাকার ফলে সুলতান একজন ঘোড়সাওয়ারকে (ঘোড়াসহ) ২৩৮ টংকা বছরে বেতন দিয়ে এবং দুটি ঘোড়া থাকলে একজন ঘোড়সওয়ারকে অতিরিক্ত ৭৫ টংকা বেতন দিয়ে রাখতে পারলেন। আলাউদ্দিন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সামরিক সংস্কারক একজন daring political economist-এ পরিণত হয়েছেন।

বারাণী অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের দ্বিতীয় কারণ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হিন্দুদের জব্দ করার উদ্দেশ্যেই আলাউদ্দিন বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। কেননা তখন বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা ছিল হিন্দু এবং খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যে মুনাফা অর্জনের দিকেই তাদের ঝোঁক দেখা দিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্থলপথে বহির্বাণিজ্য খোরাসানী ও মূলতানীদের হাতে ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম ছিল। বাজার-নিয়ন্ত্রণ হিন্দুদের জব্দ করার জন্যে বারাণীর এই তত্ত্ব খাটে না।

প্রজাদের মঙ্গলচিন্তায় আলাউদ্দিন এই সংস্কার প্রবর্তন করেছেন বলে খয়েরউল মজলিসে যে উল্লেখ আছে এবং আমীর খসরু যে বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন তা মেনে নেওয়া শক্ত। ড. কে. এস. লাল যথার্থই বলেছেন যে, আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক সংস্কার ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি তৎকালীন রাজনৈতিক প্রয়োজনেরই ফলশ্রুতি

এবং এর পিছনে প্রজাহিতৈষণার কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে ছিল না। তবে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট ছিল এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বারাণী জানিয়েছেন যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সাধারণ বাজারদরের নিচে নির্ধারণ করে তাকে ধরে রাখার জন্য এবং বাজার-নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতগুলি বিধি জারি করেছিলেন। (১) শস্য কেউ ব্যক্তিগতভাবে গুদামজাত করতে পারবে না; (২) দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে খাদ্য ঘাটতি যাতে না হয় তার জন্যে দিল্লিতে শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা। ঘাটতির সময়ে রেশন-ব্যবস্থা চালু করা; (৩) প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য-তালিকা দোকানে টাঙ্গিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক; (৪) লাইসেন্স বা সরকারি অনুমতিপত্র ছাড়া চাষিদের কাছ থেকে শস্য ক্রয় নিষিদ্ধ; (৫) সকল ব্যবসায়ীর (বহিরাগত সহ) নাম রেজিস্ট্রী করার নির্দেশ; (৬) নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দাম নিলে কঠোর শাস্তি; ওজনে কম দিলে বিক্রেতার শরীর থেকে সমপরিমাণ মাংস কেটে নেওয়া; (৭) চোরা কারবারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি।

বারাণীর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, আলাউদ্দিন দিল্লিতে কয়েক ধরনের বাজার বসিয়েছিলেন এবং বাজারগুলির দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সুদৃঢ় ব্যবস্থা করেছিলেন। (১) 'মাণ্ডি' বা প্রধান শস্যের বাজার বসিয়েছিলেন। প্রধান বাজারের সঙ্গে আবার দিল্লির বিভিন্ন মহল্লায় সরকার নিয়ন্ত্রিত দোকান বসানো হয়, প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্যে। (২) 'সেরা-ই-আদল' নামে দিল্লির বদাউন তোরণের কাছে যে বাজার খোলা হয় সেখানে বস্ত্র, চিনি, ঔষধপত্র, শুকনো ফল, মাখন, তেল প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। (৩) ঘোড়া, গবাদি পশু ও ক্রীতদাস-এর বাজার এবং (৪) অন্যান্য ধরনের জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য সাধারণ বাজারও বসানো হয়েছিল। বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ, সাহানা-ই-মাণ্ডি, বারিদ-ই-মাণ্ডি প্রমুখ অফিসার নিযুক্ত হয়েছিল।

কয়েকটি দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত মূল্যের তালিকা দেওয়া হল।

খাদ্যশস্য	**বস্ত্র**
গম (প্রতিমণ)—৭ ১/২ জিতল	৪০ গজ মোটা কাপড় } এক টংকা
বার্লি (প্রতিমণ)—৪ জিতল	২০ গজ সূক্ষ্ম কাপড় } এক টংকা
উচ্চমানের চাল (প্রতিমণ)—৫ জিতল	১ সের মোটা চিনি—১ ১/২ জিতল
ছোলা (প্রতিমণ)—৫ জিতল	১/২ সের ঘি—১ জিতল
	৩ সের তিল তৈল—১ জিতল

ঘোড়া

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ঘোড়া—১০০-১২০ টংকা

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়া—৮০-৯০ টংকা

তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়া—৬৫-৭০ টংকা

টাট্টু ঘোড়া—১০-২৫ টংকা

ক্রীতদাস ও ক্রীতদাশী

গৃহকর্মে নিযুক্তা বালিকা ক্রীতদাসী—৫-১২ টংকা

সুদর্শনা ক্রীতদাসী—২০-৪০ টংকা

ক্রীতদাস বালক—২০-৩০ টংকা

সাধারণ মানের ক্রীতদাস—৭-৮ টংকা

আলাউদ্দিন অত্যন্ত কঠোরভাবে বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে চোরাচালান ও চোরাকারবারীদের একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

আলাউদ্দিনের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিধি কেবল দিল্লিতেই প্রযোজ্য ছিল কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক রয়েছে। বারাণী বলেছেন যে, দিল্লির জনসাধারণই মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিধির ফলে উপকৃত হয়েছে। ড. কে. এস. লাল বারাণীর মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। ফিরিস্তা আলাউদ্দিনের প্রশংসা করে জানিয়ছেন যে সারাদেশে জিনিসপত্রের দাম একই ছিল, এমনকি খরা ও অজন্মার সময়েও দাম একই ছিল। কে. এস. লালের মতে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলে ব্যবসায় ও কৃষি উৎপাদনে মন্দা দেখা দেয়। ঐতিহাসিক শরণ বলেছেন যে, বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে কেবল সৈন্যবাহিনীর উপকার হয়েছে। সমগ্র দেশে এই ব্যবস্থা সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়নি। মোরল্যাণ্ডও এই একই ধরনের মতামত দিয়েছেন। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র বারাণীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, যদি শুধু দিল্লিতেই মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা হত তাহলে দোয়াব অঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কোনও দরকার হত না। তাছাড়া সৈন্য বা তার পরিবারবর্গ কেবল দিল্লি শহরে বসবাস করত না, লাহোর থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে শহর ও শহরতলীতে বাস করত। বারাণী নিজেই তো বলেছেন যে, দিল্লিতে অনুসৃত আইন-কানুন অন্যান্য শহরগুলিতেও চালু হত। তথ্যের অভাবে অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না যে, দিল্লির বাইরের অঞ্চলে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতখানি কার্যকরভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল।

আলাউদ্দিন যতদিন বেঁচেছিলেন এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। তবে জটিল আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ফলে এই ব্যবস্থা দুর্নীতিরও জন্ম দিয়েছিল। গোপনে কালোবাজারিও চলেছিল। কেবল সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণে সন্তুষ্ট না থেকে সুলতান সব রকমের দ্রব্যের মূল্য বেঁধে দিয়েছিলেন। এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কার্যকরীভাবে বজায় রাখা আলাউদ্দিনের মত সুলতানের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাজার-নিয়ন্ত্রণ নীতি বিলুপ্তি ঘটে।

১৯.৫ খলজি সাম্রাজ্যবাদ

কেম্‌ব্রিজ ঐতিহাসিক উলসী হেগ বলেছেন যে, আলাউদ্দিনের রাজত্বের সঙ্গে শুরু হয় সুলতানি সাম্রাজ্যবাদী যুগ। তিনি জালালউদ্দিনের পর সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন, যা উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্যের এই পরিধি নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তিনি কেবল উত্তর ভারতের অবিজিত অঞ্চলগুলিই নয়, দক্ষিণ ভারতের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে পেরেছিলেন। বলবন পর্যন্ত সুলতানেরা সাম্রাজ্য রক্ষা ও তার নিরাপত্তা বিধান করার দিকেই বেশি নজর দিয়েছিলেন, এবং সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারের জন্য আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করাতে তাঁরা অপারগ হয়েছিলেন। আলাউদ্দিন খলজির নেতৃত্বে খলজি আমলেই দেখা গেল আগ্রাসী নীতি গ্রহণের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশ জুড়ে চতুর্দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। দিল্লি-সুলতানির স্বার্থে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র দেশ বিজয় সাম্রাজ্যবাদেরই নামান্তর। দিল্লি-সুলতানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এই সর্বব্যাপী সামরিক আগ্রাসন ও বিস্তারকে 'খলজি-সাম্রাজ্যবাদ' বলা হয়েছে।

আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণের প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বসূরীদের অবদানের কথাও মনে রাখতে হবে। তাঁর আগে বলবন সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেননি ঠিকই কিন্তু সুলতানি শাসনকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেন, যার ফলে আলাউদ্দিনের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। মানসিক গঠনের দিক

থেকে দেখলে আলাউদ্দিনের মধ্যে ধর্মীয় ও সামরিক সর্বব্যাপী সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার বীজ সুপ্ত ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় গুজরাট বিজয়ের পর। গুজরাটে সহজ সাফল্য তাঁর এই সুপ্ত মানসিক আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্ট করে তোলে, যখন, তিনি বিশ্ব-বিজয়ের কথা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে "দ্বিতীয় সেকেন্দার শাহ" বলে অভিহিত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রফেটের মতো এক নতুন ধর্মের প্রবক্তাও হতে পারেন এইরকম বিশ্বাসও তাঁর জন্মায়। এই দুটি বিষয়েই তাঁর আকাঙ্ক্ষা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে যখন দিল্লির কোতোয়াল তাঁকে জানালেন তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্ব-বিজয়ের পরিবর্তে ভারত-বিজয় পরিকল্পনা রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন। আসলে এই ধর্মীয় সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা যুগে যুগে লক্ষ্য করা গেছে। আলাউদ্দিনও ব্যতিক্রম ছিলেন না।

বাস্তব পরিস্থিতি তার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষাকে উস্কে দিয়েছিল। কারার শাসনকর্তা হিসেবে তাঁর দুঃসাহসিক দেবগিরি আক্রমণ, সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীসহ প্রভূত সম্পদ লাভ—সুলতান হবার পদকে যেমন মসৃণ করে দিয়েছিল, তেমন সুলতান হবার পর এই সহজ সাফল্য তাঁকে আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

দেবগিরির অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তৎকালীন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। গুজরাট, রণথম্ভোর, মেবার, মাড়োয়ার, মালোয়া, রাজপুত বংশীয় শাসকদের অধীনে ছিল। স্বাধীন এই অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব সুলতানি সাম্রাজ্যের পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। আশ্চর্যের বিষয়, এই রাজপুত শাসকরা সুলতানি সাম্রাজ্যের অবস্থিতির গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করেননি, এবং প্রায় প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে গেছেন ঐ অঞ্চল জুড়ে নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইলতুৎমিস যখন গুজরাট আক্রমণ করেন, তখন মালোয়া এবং দেবগিরির শাসকেরা দক্ষিণ দিকে থেকে গুজরাট আক্রমণ করেছিলেন। কেবল উত্তর ভারত নয়, দক্ষিণ ভারতে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কাকতীয় রাজ্য, কর্ণাটক অঞ্চলে হোয়সল রাজ্য এবং সুদূর দক্ষিণে অর্থাৎ তামিলনাড়ু অঞ্চলে পাণ্ড্য রাজ্য পরস্পরের মধ্যে বিরোধে লিপ্ত ছিল। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহজেই সাম্রাজ্যবাদী আলাউদ্দিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করার পেছনে ঐতিহাসিকরা অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সুবিধালাভের কথা উল্লেখ করেছেন। গুজরাট, রাজপুতানা এবং দক্ষিণ ভারতে যে অঞ্চলগুলি আক্রান্ত হয়েছিল, তার কারণ হিসেবে আলাউদ্দিনের পক্ষে একই যুক্তি দেখানো যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের পেছনে অনেক সময় নানা ধরনের যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের মূল কথাই হল অন্য স্বাধীন রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ এবং তাকে নিজের কুক্ষিগত করা। আলাউদ্দিনের আগ্রাসনের মূল কথাই ছিল উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিল্লি-সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা।

তাঁর সাম্রাজ্যবাদ দুটি দিকে বিস্তারলাভ করে, একটি উত্তর ভারত ও অন্যটি হল দক্ষিণ ভারত। উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান চালান ১২৯৭ থেকে ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান চালান ১৩০৬ থেকে ১৩১২ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে।

১৯.৫.১ গুজরাট অভিযান

মহম্মদ ঘুরির সময় থেকেই তুর্কি সুলতানদের নজর গুজরাটের ওপর ছিল। গুজরাট যে কেবল উর্বর এবং জনাকীর্ণ ছিল তাই নয়, হস্তশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের জন্যও এর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। গুজরাটের প্রধান বন্দর খাম্বাট (কম্বে)-এর মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু, জৈন, বোহ্‌রা ব্যবসায়ী ছাড়া আরব ব্যবসায়ীরাও খাম্বাট বন্দরে আস্তানা গেড়েছিল। গুজরাটের এই সমৃদ্ধির ফলে শাসকেরা প্রচুর সোনা-রূপা সঞ্চয় করেছিলেন। এমনকি মন্দিরগুলির সম্পদের পরিমাণও কম ছিল না। গুজরাট ও মালবের অন্য ধরনের গুরুত্বও ছিল। এই দুটি অঞ্চলের শাসকেরা পশ্চিমের

সমুদ্র-বন্দরগুলি ও ভাঙ্গা উপত্যকার সঙ্গো সংযুক্ত বাণিজ্যপথগুলির ওপর তারা কর্তৃত্ব করত। দিল্লির সুলতানদের গুজরাটের ওপর শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অন্য কারণও ছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন গুজরাটের ওপর কর্তৃত্ব থাকলে তাঁদের সেনাবাহিনীর জন্য অশ্ব সরবরাহ করা অধিকতর সুবিধাজনক হবে। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মোঙ্গালদের অভ্যুত্থানে এবং দিল্লির সুলতানদের সঙ্গো তাঁদের সংঘর্ষে ঐসব অঞ্চল থেকে দিল্লিতে ভাল জাতের ঘোড়া আমদানি করা কষ্টসাধ্য ছিল। খ্রিস্টিয় ৮ ও ১২ শতকের মধ্যে পশ্চিমের সমুদ্র-বন্দর থেকে ভারতে আরবি, ইরাকি ও তুর্কি ঘোড়া আমদানি বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গা ছিল।

আলাউদ্দিন কর্তৃক গুজরাট আক্রমণ প্রায় নিশ্চিত ছিল। অজুহাতও পাওয়া গেল। গুজরাটের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের নতুন শাসক বাঘেলা বংশীয় রায়করণ-এর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে আলাউদ্দিনকে গুজরাট আক্রমণে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁকে সাহায্যও করেন। আলাউদ্দিন খলজির দুজন সুদক্ষ সেনাপতির (উলুঘ খান এবং নসরৎ খান) অধীনে এক সেনাবাহিনী রাজস্থানের পথ ধরে গুজরাটের দিকে অভিযান করে। গুজরাট শাসক রায়করণ আকস্মিক আক্রমণে যুদ্ধ না করেই পলায়ন করেন। এই আক্রমণের ফলে প্রধান প্রধান নগর লুণ্ঠিত ও ধ্বংস হয়। খ্রিস্টিয় ১২ শতকে নির্মিত প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দিরও লুণ্ঠিত হল। খাম্বাট বন্দরে হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী কেউই লুণ্ঠন থেকে রেহাই পেল না। এখানেই মালিক কাফুরকে বন্দী করা হয়েছিল এবং এই মালিক কাফুরই পরে দক্ষিণ ভারত অভিযানে নেতৃত্ব দেন। আলাউদ্দিন উপহার হিসেবে কাফুরকে পেয়েছিলেন। রাণী কমলাদেবী তুর্কি সৈন্যদের হাতে বন্দী হলেন। আলাউদ্দিন কমলাদেবীকে সসম্মানে নিজের হারেমে স্থান দিয়েছিলেন। গুজরাট আলাউদ্দিনের সহজ জয়লাভের কারণ হিসেবে বলা যায়; রায়করণ জনপ্রিয় ছিলেন না এবং গুজরাটের সেনাবাহিনী ও শাসনব্যবস্থা সম্ভবত সেকেলে ছিল। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের সাহায্যে রায়করণ দক্ষিণ গুজরাটের কিছু অংশ ধরে রাখতে সমর্থ হন। এর ফলে দেবগিরির যাদবদের সঙ্গো দিল্লির যুদ্ধ আসন্ন হয়ে ওঠে। গুজরাটের বাকি অংশে তুর্কি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯.৫.২ রাজস্থান অভিযান

গুজরাট বিজয়ের পর আলাউদ্দিন রাজস্থানে ওপর কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করবার চেষ্টা চালান। রাজস্থানের নগৌর এবং মান্দোর ছাড়া তাঁর পূর্বসূরীরা রাজস্থানের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারেননি। জালালউদ্দিন রণথম্ভোর দখল করার চেষ্টা করেও বিফল হন। গুজরাটকে নিজের দখলে আনার পর আলাউদ্দিনের কাছে রাজস্থান এবং মলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। তাঁর দৃষ্টি প্রথমে পড়ল রণথম্ভোরের ওপর। আলাউদ্দিনের গুজরাট অভিযানের পর দিল্লি ফেরার পথে আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মোঙ্গাল সৈন্যরা লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ নিয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আলাউদ্দিন সেই বিদ্রোহ দমন করেন। দুজন মোঙ্গাল অভিজাত পালিয়ে গিয়ে রণথম্ভোরের শাসক হামীরদেব-এর কাছে আশ্রয় নিলেন। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হামীরদেব আশ্রিতদের রক্ষা করা কর্তব্য ও নিজ দুর্গ ও সৈন্যবাহিনীর ওপর আস্থা স্থাপন করে আলাউদ্দিনের নির্দেশমত ঐ দুজন বিদ্রোহীকে হত্যা অথবা বহিষ্কার কিছুই করলেন না। আলাউদ্দিন হামীরদেবের রাজ্য আক্রমণের জন্য উলুঘ খান এবং নসরৎ খানকে পাঠালেন। যুদ্ধে নসরৎ খান নিহত হন এবং উলুঘ খান পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিন স্বয়ং সসৈন্যে রণথম্ভোর আক্রমণ করেন। আলাউদ্দিনের সঙ্গো ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ আমির খসরু। তিনি দুর্গ এবং দুর্গ অবরোধের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন। তিন মাস ধরে অবরোধ চলার পর দুর্গে খাদ্য এবং জলের অভাব দেখা দেয়। দুর্গের মধ্যে জহরব্রত অনুষ্ঠিত হল। রাজপুত রমণীরা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিলেন এবং পুরুষেরা দুর্গের বাইরে এসে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। রাজপুতদের পক্ষে যুদ্ধ করে মোঙ্গালরাও নিহত হল। এইভাবে রণথম্ভোরের পতন হল।

রণথম্ভোর বিজয়ের পর মেবারের দিকে আলাউদ্দিন দৃষ্টি দিলেন। মেবারের রাজধানী ছিল চিতোর। মেবারের রাণা রতন সিং সুলতানি সেনাবাহিনীকে মেবারের ভিতর দিয়ে গুজরাট আক্রমণের অনুমতি না দেওয়ায়

সুলতান তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাছাড়া আজমীর এবং মালব পথের ওপর চিতোরের নিয়ন্ত্রণ ছিল। রণথম্ভোর বিজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী আলাউদ্দিনের দৃষ্টি চিতোরের ওপর পড়বে এটা ছিল স্বাভাবিক। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী আলাউদ্দিন রতন সিংহের অনন্য সুন্দরী রাণী পদ্মিনীকে লাভ করবার জন্যই চিতোর আক্রমণ করেছিলেন। তবে বহু আধুনিক ঐতিহাসিক পদ্মিনী কাহিনীর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকেই এই কাহিনীকে সত্য বলে মানেননি। কোনো সমসাময়িক লেখায় এই কাহিনীর উল্লেখ নেই। একশ বছর পরে মালিক মহম্মদ জাইসির পদ্মাবৎ কাব্যে এই কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। আলাউদ্দিন চিতোর অবরোধ করলেন। কয়েকমাস ধরে অবরুদ্ধ রাজপুতগণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করলেও শেষ রক্ষা করা গেল না। পরাজয় নিশ্চিত জেনে রাজপুত রমণীগণ জহরব্রত উদ্যাপন করলেন। রাজপুত যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। চিতোরের পতন হল। চিতোরের শাসনভার দেওয়া হল আলাউদ্দিন পুত্র খিজির খাঁ-কে।

চিতোর বিজয়ের পর রাজস্থানের প্রায় অপর সব রাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মারওয়ার, বুন্দি সুলতানের আধিপত্য মেনে নেয়। মান্দোর এবং জয়শলমীর ইতিপূর্বেই সুলতানের দখলে এসেছিল। গুজরাটের পার্শ্ববর্তী সিওয়ানা এবং জালোর প্রতিরোধের চেষ্টা করেও বিফল হয়। ১৩০৮ এবং ১৩১১ সালের মধ্যে দুটি অঞ্চল সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

এইভাবে দশ বছরের মধ্যেই সমগ্র রাজস্থান সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হল। আজমীর, রণথম্ভোর এবং চিতোর ছাড়া আলাউদ্দিন অন্যান্য রাজপুত অঞ্চলগুলির ওপর প্রত্যক্ষ শাসনভার চাপিয়ে দেননি। বস্তুত আলাউদ্দিন রাজপুত রাজাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজাস রাখার চেষ্টা করেছিলেন। বলা হয়েছে, জালোরের শাসকের ভাই মালদেও পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের বাহিনী নিয়ে আলাউদ্দিনকে সাহায্য করেছিলেন এবং ১৩১৩ সাল নাগাদ আলাউদ্দিন খিজির খাঁর পরিবর্তে মালদেওকে চিতোরের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। স্থানীয় প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করে রাজপুতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নীতি আলাউদ্দিন পরবর্তীকালে দেবগিরি এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য শাসকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন।

১৯.৫.৩ মালব অভিযান

চিতোর দখলের পরই আলাউদ্দিন মালবের দিকে নজর দেন। আমির খসরু জানিয়েছেন যে, মালব অঞ্চল এত বিস্তীর্ণ ছিল যে জ্ঞানী ভৌগোলিকেরাও এর সীমানা নির্দেশ করতে পারেননি। আলাউদ্দিনের পক্ষে মালব দখল প্রয়োজন ছিল কেননা মালব দখল করলে গুজরাট যাওয়ার পথ এবং দক্ষিণ ভারতে ঢোকার পথ এই দুটির ওপরই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হত। সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনী খুব সহজেই মালব অধিকার করল। মালবকে সুলতানের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনা হল এবং সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হল। এইভাবে বাংলা ছাড়া প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এল। ওড়িশা গিয়াসুদ্দিনের আমলেই অধীনতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু ওড়িশাকে সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীনে আনা হয়নি।

১৯.৫.৪ মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারত অভিযান (প্রথম পর্যায়)

আলাউদ্দিন সাফল্যের সঙ্গে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং সামরিক বাহিনীতে সংস্কার সাধন করে একে আরো শক্তিশালী করে তোলেন। আভ্যন্তরীণ সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রশাসনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন এবং সুলতান হিসেবে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির পর আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের দেশগুলিকে নিজের অধীনে আনার জন্য দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারত সোনা এবং অন্যান্য সঞ্চিত সম্পদের জন্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এই অঞ্চলের বিখ্যাত বন্দরগুলির মধ্য দিয়ে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত তার ফলে প্রচুর সোনা এই অঞ্চলের শাসকেরা বছরের পর বছর ধরে সঞ্চয় করেছিলেন। এই অঞ্চলের মন্দিরগুলি সঞ্চিত সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই অঞ্চলগুলি

দখল করলে সম্পদ এবং গৌরব দুটিই অর্জন করা সম্ভব ছিল। আলাউদ্দিনের এই অভিযানের দ্রুত সাফল্য সবাইকেই বিস্মিত করে। সুলতানের বিজয় সম্ভব হয়েছিল কেননা দক্ষিণের রাজ্যগুলি একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অবস্থানকে তাঁরা গুরুত্ব দেননি। গুরুত্ব দিলে তুর্কি আক্রমণের আশঙ্কায় অন্তত তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করে রাখতেন।

মহারাষ্ট্র : আলাউদ্দিন কারার শাসনকর্তা থাকাকালীন হঠাৎ দেবগিরি আক্রমণ করে যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্র ও তার পুত্র সিংহানাকে পরাজিত করে প্রচুর সম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন। রামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দেন বাৎসরিক কর প্রদানের।

মালব এবং চিতোর বিজয়ের পর আলাউদ্দিন পুনরায় দেবগিরির দিকে দৃষ্টি দিলেন। অজুহাত ছিলই। রামচন্দ্র গুজরাটের শাসক রায়করণের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন। পরাজিত গুজরাট শাসক মালব সীমান্তে বগলানা অঞ্চলটুকু ধরে রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, রামচন্দ্র বাৎসরিক কর দিচ্ছিলেন না।

১৩০৮ খ্রিঃ আলাউদ্দিন মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দেবগিরিতে অভিযান পাঠান। ইতিমধ্যে আর এক অভিযানে রায়করণকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করা হয়। রামচন্দ্র খুব সহজেই পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। আমীর খসরু জানিয়েছেন যে, আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন ভাবেই যাতে রামচন্দ্র বা তার পরিবারবর্গের প্রতি কোন অসম্মান দেখানো না হয়। রামচন্দ্রকে সসম্মানে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল। কিছুদিন পর তাঁকে রায় রায়ান উপাধি দিয়ে নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল। গুজরাটের একটি জেলাও তাঁকে দেওয়া হয়। রামচন্দ্র তাঁর কন্যা ঝাত্যাপালির সঙ্গে আলাউদ্দিনের বিবাহ দেন। দেবগিরির সঙ্গে এই মৈত্রী আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য অভিযানে খুবই সহায়ক হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারত : দক্ষিণ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ দুটি রাজ্য ছিল—কাকতীয়দের অধীনে বরঙ্গাল (আধুনিক তেলেঙ্গানা) এবং হোয়সলদের নিয়ন্ত্রণে দ্বারসমুদ্র (মহীশূর অঞ্চল, আধুনিক কর্ণাটক)। সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্যবংশীয় শাসকদের অধীনে মাবার এবং মাদুরাই (তামিলনাড়ু)। এই রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থেকে নিজেদের শক্তিক্ষয় করছিল।

১৩০৯ ও ১৩১১ খ্রিঃ মধ্যে মালিক কাফুর দুটি অভিযানে নেতৃত্ব দেন—একটি তেলেঙ্গানা অঞ্চলে বরঙ্গালের বিরুদ্ধে এবং অন্যটি দ্বারসমুদ্র ও মাবারের বিরুদ্ধে। এই রাজ্যগুলি সরাসরি দখলের কোন ইচ্ছা আলাউদ্দিনের ছিল না। বাৎসরিক কর প্রদান ও সুলতানের আনুগত্য মেনে নিলেই দক্ষিণের শাসকরা নিজ নিজ রাজ্যে শাসক হিসাবে বহাল থাকতে পারবেন—এই নির্দেশ আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে দিয়েছিলেন। তিনি ভালই জানতেন যে, দিল্লি থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলির ওপর সরাসরি কর্তৃত্ব করা সুলতানের পক্ষে সম্ভব নয়। ইসামী এবং বারাণী কাফুরকে আলাউদ্দিন যে এই ধরনের নির্দেশ দিয়েছিলেন—তা উল্লেখ করেছেন।

বরঙ্গালের বিরুদ্ধে মালিক কাফুরের অভিযান প্রায় ছয় মাস ধরে চলেছিল। অবরুদ্ধ বরঙ্গালের দুর্গের পতন অনিবার্য দেখে বরঙ্গালের শাসক সন্ধি করেন। তিনি সুলতানের প্রতি আনুগত্য মেনে নিলেন এবং বাৎসরিক কর প্রদানে সম্মত হলেন। মালিক কাফুরের কাছে প্রভূত ধনসম্পত্তি সমর্পণ করতে হ'ল। এক হাজার উঠের পিঠে চাপিয়ে সেই সম্পদ দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আলাউদ্দিন পরের বছর আবার মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দ্বারসমুদ্র ও মাবারের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। রামচন্দ্রের মারাঠা সর্দারদের সাহায্য নিয়ে কাফুর দ্রুত দ্বারসমুদ্র পৌঁছে গেলেন। অপ্রস্তুত বল্লালদেবের পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় রইল না। বরঙ্গালের মতোই সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করতে হল। সমস্ত সম্পদ সমর্পণ করলেন মালিক কাফুরকে। বাৎসরিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দিতে হল। বীর বল্লাল দিল্লি গিয়ে সুলতান আলাউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর দশলাখ টাকা, খিলাত, ছত্র দিয়ে সম্মান জানিয়ে তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর কাফুর মাবার আক্রমণ করেন। পাণ্ড্য শাসক সরাসরি যুদ্ধে মালিক কাফুরের মুখোমুখি হননি। তিনি মাবারের বিভিন্ন অঞ্চল লুণ্ঠন করেন। চিদাম্বরম ও মাদুরাইয়ের বেশ কয়েকটি ধনরত্ন সমৃদ্ধ মন্দির লুণ্ঠন করেন। শেষ পর্যন্ত তামিল সৈন্যদের পরাস্ত করতে তিনি পারেন নি।

দক্ষিণ ভারতের এই অভিযানগুলি থেকে প্রভূত পরিমাণে ধনরত্ন লাভ হয়েছিল এবং সুলতানের সম্মান ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে হেরে গিয়েছিল। দুঃসাহসিক অভিযানের কৃতিত্বে কাফুর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ফলে আলাউদ্দিন তাঁকে সাম্রাজ্যের মালিক নায়েব বা সহকারী শাসক পদে নিযুক্ত করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এই অভিযানগুলি খুব একটা সুফল প্রসব করেনি। পরাজিত রাজন্যবর্গ কর প্রদানে সম্মত হলেও এই কর আদায় করতে বার্ষিক অভিযানের প্রয়োজন হত। রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন অভিযানের ফলে বাণিজ্যেরও সম্প্রসারণ হয়নি। তবে সফল এই অভিযানগুলি ভবিষ্যৎ দক্ষিণ ভারতে সরাসরি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল।

১৯.৫.৫ মহারাষ্ট্র (দেবগিরি) অভিযান (দ্বিতীয় পর্যায়)

সঙ্গত কারণেই আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের দেশগুলিকে প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না আনার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যাতে তাঁকে এই নীতি পুনর্বিবেচনা করে দেবগিরিকে প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনতে হয়েছিল। দেবগিরির রামচন্দ্র মারা যাবার পর তাঁর পুত্র মাসিংঘানা (শঙ্করদেব) আলাউদ্দিনের আনুগত্য মানতে অস্বীকার করেন। সুলতানের নির্দেশে মালিক কাফুর দেবগিরি দখল করেন এবং মারাঠা-প্রধানদের ক্ষমতাচ্যুত না করে দেবগিরি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আলাউদ্দিনের পক্ষে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির ওপর বাধা সৃষ্টির জন্য দেবগিরিকে প্রত্যক্ষ শাসনে আনার প্রয়োজন ছিল।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ ভারতের দেশগুলিকে সরাসরি সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীনে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

১৯.৫.৬ খলজিদের পতন

একনায়কতন্ত্রের যা স্বাভাবিক পরিণতি আলাউদ্দিনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর রাজতন্ত্র, সামরিক শক্তি ও অত্যধিক কঠোরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর শাসনকালে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছিলেন। কিন্তু সাফল্যের পিছনে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন ছিল না। যে সন্ত্রাস তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার ফলে সকলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। কঠোরতা, নিপীড়ন ও গুপ্তচরের আধিক্যের ফলে সর্বস্তরের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সুলতানের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল এই শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে আলাউদ্দিন মারা যাবার পরেই। এইজন্যেই বলা হয়েছে, 'তিনি যে সামরিক রাজতন্ত্রের ভিত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, তা বালির ওপর স্থাপিত হয়েছিল।' যা সহজেই ভেঙ্গে পড়েছিল তিনি মারা যাবার অব্যবহিত পরে। আলাউদ্দিনের কঠোর শাসননীতিতে পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নতুন যে শাসকগোষ্ঠী গড়ে উঠল তাঁরা দিল্লির সিংহাসনে যিনিই বসতে পারবেন তাঁকে গ্রহণ করার নীতি মেনে নিলেন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়পাত্র মালিক কাফুর সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আলাউদ্দিনের এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে অন্য পুত্রদের হয় বন্দী, না হয় অন্ধ অথবা হত্যা করলেন। এই নির্মম কাজে অভিজাতরা বাধা দেয়নি। অবশ্য অল্পকাল পরেই প্রাসাদরক্ষীরা মালিক কাফুরকে হত্যা করে এবং খসরু নামে এক ধর্মান্তরিত হিন্দু সিংহাসনে বসেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা খসরুকে ইসলাম-বিরোধী এবং নানা অপরাধমূলক কাজের নায়ক বলে সমালোচনা করলেও দিল্লির জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমানগণ জাতিগত বিচার-বিবেচনার দ্বারা আর প্রভাবিত না হয়ে যে কোন বংশের সুলতানের আজ্ঞাবহ হতে রাজি ছিলেন। শীঘ্রই খসরুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৩২০ খ্রিঃ গিয়াসুদ্দিন

তুঘলকের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান হয় তারই ফলে খসরু নিহত হন এবং গিয়াসুদ্দিন তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন ও তুঘলক বংশের শাসনের সূত্রপাত করেন।

১৯.৬ তুঘলক রাজত্ব (১৩২০-১৪১২) : গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০-২৫ খ্রিঃ)

গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রিঃ) স্বল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করলেও তিনি প্রশাসনে শৃঙ্খলা ও সারা দেশে সুলতানি সাম্রাজ্যের সম্মান ও গৌরব আনার চেষ্টা করেছিলেন। কঠোর ও নরম নীতি গ্রহণ করে তিনি সকলের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। আলাউদ্দিনের রাজস্ব নীতির কঠোরতা তিনি হ্রাস করেছিলেন তবে রাষ্ট্রের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কিছু করেননি। আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে সরাসরি সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে চেষ্টা করেন। বরঙ্গালে দিল্লির আধিপত্য পুনরায় স্থাপনের জন্য তাঁর পুত্র জুনা খানকে পাঠান। গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠান। নিজে বাংলাদেশকে পদানত করতে অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সফল অভিযান থেকে ফেরার পথে তাঁর পুত্র জুনা খান তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কাঠের যে মণ্ডপ বানিয়েছিলেন, তা ভেঙ্গে পড়ায় সুলতান গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যু হয় (১৩২৫)। আধুনিক গবেষকরা স্বীকার করেন না যে তাঁর পুত্রের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে অথবা বাজ পড়ে সুলতান মারা যান। সম্ভবত দ্রুত কাঠের মণ্ডপ বানাতে হয়েছিল এবং এই মণ্ডপের সামনে হাতির দলের প্যারেডের ফলে মণ্ডপ ভেঙ্গে পড়ে।

১৯.৭ মহম্মদ-বিন-তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিঃ)

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যুবরাজ জুনা খাঁ, মহম্মদ-বিন-তুঘলক উপাধি নিয়ে দিল্লির মসনদে বসেন (১৩২৫ খ্রিঃ)। মধ্যযুগের সুলতানদের মধ্যে তাঁর ক্ষমতা ও দক্ষতা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। তুর্কো-আফগান যুগের সুলতানদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও সচেতন। তাঁর সহজাত ও বহুমুখী প্রতিভা সমকালীন পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। কাব্য, শিল্প-সংস্কৃতি, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ।

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক ছিল স্ববিরোধিতা। এই অভিযোগই তাঁকে মধ্যযুগীয় সুলতানদের মধ্যে বিতর্কিত করে তুলেছে। ইবন বতুতার মতো সমকালীন ঐতিহাসিক তাঁকে “রক্তপিপাসু” বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ঐ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। বস্তুত রাজদ্রোহী ও অন্যান্য অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। আসলে সুলতান তাঁর কঠোর ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে প্রগতিশীল শাসনতন্ত্রের এক সমন্বয় তৈরি করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন শাসন-সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর চরিত্রের বিশেষত্বকে অনুধাবন করতে পারি। অবশ্য এর আগে সুলতানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ তাঁর সমস্ত সংস্কার এবং পরিকল্পনাগুলিই নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক এক অসাধারণ মৌলিকত্ব ও সৃজনীশক্তির অধিকারী ছিলেন, ফলে সমাজ বা শাসন ব্যবস্থা—যে কোন ক্ষেত্রেই তিনি গতানুগতিকতার বিরোধী ছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে তিনি মনে-প্রাণে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে একই শাসনব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। অধ্যাপক নিজামীর মতে সম্রাট অশোকের পর মহম্মদ-বিন-তুঘলক ছাড়া কোন শাসকই রাজনৈতিক দিক থেকে সমগ্র ভারতবর্ষকে একই দেশ হিসাবে দেখেননি। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে, সুলতান মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক

অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ঐ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেন। অধ্যাপক নিজামী একে "উচ্চ সাম্রাজ্যবাদ" (High Imperialism)-এর সূচনা বলে মনে করেছেন। তাছাড়া কূটনৈতিক দিক থেকে সুলতান বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে তাঁর রাজনৈতিক উদ্যোগ ও দূরদৃষ্টি পশ্চিমে মিশর থেকে শুরু করে পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রগাঢ় জ্ঞান প্রসিদ্ধ ছিল। ইসলামের অনুশাসনগুলিকে তিনি একদিকে যথাযথভাবে মেনে চলতেন। তবে অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তাঁর সহনশীলতা ছিল এবং হিন্দুদের 'হোলি' উৎসবে তাঁর অংশগ্রহণের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর রাজ্যে অনেক হিন্দুযোগীর মুসলমান শিষ্যও ছিল। এসব কারণে সমকালীন ঐতিহাসিক ইসামী সুলতানকে 'বিধর্মী' বলতেও দ্বিধা করেননি। সুফী সম্প্রদায়ের প্রতি সুলতান ছিলেন উদার। জৈন পণ্ডিতদের সাথেও তাঁর যোগাযোগ ছিল।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক মধ্যযুগের অন্যান্য সুলতানদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্রভাবেই রাজ্য পরিচালনার বিষয়ে ধর্ম অপেক্ষা প্রতিভাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল যে রাজ্য পরিচালনার জন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্য মানুষদেরই প্রয়োজন। সে কারণে রাজ্যের উচ্চপদগুলিতে তিনি হিন্দুদের নিয়োগ করতে দ্বিধা করেননি।

সিংহাসনে আরোহণের পর ১৩২৭ খ্রিঃ মহম্মদ-বিন-তুঘলক মোঙ্গল নেতা তারমাসিরিনকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে ভারতবর্ষকে মোঙ্গাল আক্রমণের হাত থেকে বাঁচান। অতঃপর সুলতান কালাসুর ও পেশোয়ারে এক অভিযান পরিচালনা করেন। অবশ্য শস্যজাত খাদ্যের অভাবহেতু ঐ অঞ্চল দুটি বেশিদিন সুলতানের দখলে রাখা সম্ভব হয়নি।

সিংহাসনে বসার পর সুলতান কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রথম বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল সুলতানের নিকটাত্মীয় বাহাউদ্দিন গুরসাস্প-এর নেতৃত্বে (১৩২৬-২৭ খ্রিঃ)। গুরসাস্পকে কাম্পিলিরাজ ও পরে হোয়সলরাজ তৃতীয় বীর বল্লাল আশ্রয় দিলে সুলতান ঐ দুটি রাজ্যই দখল করেন। বন্দি গুরসাস্প-এর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর দেবগিরিতে অবস্থানকালে সুলতান বহরম আইবা কিসলু খাঁনের বিদ্রোহের সংবাদ পান। ঐতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহকে সুলতানের গুরসাস্পের প্রতি বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিদ্রোহকেও কঠোর হাতে দমন করা হয়। এই বিদ্রোহের প্রায় একই সময়ে লক্ষ্মৌতীর শাসক গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর (বীরা) সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। অবশ্য সুলতানের বাহিনীর হাতে তিনি ধরা পড়েন ও তাঁরও কঠোর শাস্তি হয় (১৩৩০-৩১ খ্রিঃ)।

১৯.৭.১ শাসন সংস্কার

মহম্মদ-বিন-তুঘলক প্রথম থেকেই শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন।

দোয়াবের কর ব্যবস্থা : শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েই সুলতান গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। বারাণীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে সুলতানের এই নীতির ফলে জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি দেখা যায়। সুলতান প্রচলিত রাজস্বহার দশ থেকে কুড়ি গুণ বৃদ্ধি করেছিলেন। সরকারি কর্মচারীরা এসব পাওনা কঠোরভাবে আদায় করতে শুরু করেন। ফলে চারিদিকে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং আবাদযোগ্য জমিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় চাষবাসের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এর প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দিল্লি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এবং যারা পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে সুলতান সেনাদল নিয়োগ করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। কৃষিক্ষেত্রে চাষীর অভাব দেখা দেয়। চাষযোগ্য জমি পড়ে থাকে।

বাদাউনী ও স্যার উলসী হেগের মত ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, দোয়াবের কর বৃদ্ধির পেছনে সুলতানের মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসন বিভাগের দক্ষতা ও সামরিক বিভাগের উপকরণ বৃদ্ধি। তবে এ নীতির ফলে

ঐ অঞ্চলে চাষীদের ওপর যে দারুণ চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা অনস্বীকার্য। অবশ্য চাষীদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পেরে সুলতান তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য ঋণদান, কূপ-খনন, শস্যদান ও খাজনা মকুব প্রভৃতির নির্দেশ দেন।

দোয়াব অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে সুলতান বিশেষ শিক্ষা নিয়ে দেশের সামগ্রিক কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ও অধিক পরিমাণ শস্য উৎপাদনের প্রয়োজনবোধ করেন। বারাণীর বক্তব্য অনুযায়ী সুলতান কৃষির উন্নতিকল্পে যে সমস্ত অনুশাসন জারি করেন, সেগুলি অধিকাংশই কল্পনাপ্রবণ। অবশ্য জনসাধারণ যদি এই নির্দেশগুলিকে অবাস্তব বলে মনে না করতেন তাহলে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির সীমা থাকত না। তাই বারাণীর মতে, সুলতানের পরিকল্পনার আতিশয্য দেখা গেলেও এতে সুলতানের ঐকান্তিকতা প্রশংসার দাবি রাখে।

১৯.৭.২ রাজধানী পরিবর্তন

সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় সুলতানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলির মধ্যে দেবগিরিতে দ্বিতীয় শাসনকেন্দ্র স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুলতানের এই পদক্ষেপ নিয়ে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বারাণীর মতে, দেবগিরি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল বলেই সুলতান এখানে রাজধানী স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ইবন বতুতা অবশ্য বলেছেন যে, দিল্লির অধিবাসীরা সুলতানের নামে কুৎসা রটনা করতেন ও সেইজন্যই সুলতান তাদের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজধানী দিল্লি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ইসামীও ইবন বতুতার বক্তব্যকে সমর্থন করেন। অধ্যাপক নিজামীর মতে, গুরসাস্পের বিদ্রোহের পরই সুলতান দাক্ষিণাত্যের শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় করার আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ কারণে তিনি দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করতে চান, যেখান থেকে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহগুলি দ্রুত দমন করা যেত। অধ্যাপক হাবিবও নিজামীর মতই এই পরিকল্পনার পেছনে সুলতানের বিশেষ যুক্তি ছিল বলেই মনে করেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী, সুলতানের আদেশে একই সাথে দিল্লির সমস্ত অধিবাসীদেরই দেবগিরি যেতে বাধ্য করা হয়। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, সে সময় সমাজের উঁচুতলার অধিবাসীরাই (যেমন—উলেমা, শেখ প্রভৃতিরা) প্রথমদিকে দেবগিরি রওনা হন। দিল্লির আপামর জনসাধারণ বিশেষত হিন্দুদের এ সময়ে দেবগিরি যাওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মনে করেন, আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে দেবগিরিতে পাঠানোর একটা প্রচ্ছন্ন চাপ অবশ্যই ছিল। দেবগিরিতে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদেই সুলতান প্রথমদিকে প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ঐ স্থানে যাওয়ার আদেশ দেন। দেবগিরির নতুন নাম হয় দৌলতাবাদ।

দিল্লির অধিবাসীদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্বপুরুষের বাসভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করায় এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। দিল্লির সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া দিল্লিবাসীর পক্ষে সুলতানের এই আদেশ মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়েছিল। বারাণীর বর্ণনায় দেখা যায় যে সুলতানের এই পরিকল্পনার ফলে দিল্লি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। তবে বারাণীর এই অভিমত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ বিষয়ে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। অল্-কল্কাসান্দির বর্ণনা অনুযায়ী এ কথা বোঝা যায় যে, সুলতান দৌলতাবাদকে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। যদিও প্রচলিত ধারণা এই যে মহম্মদ দিল্লি থেকে তাঁর রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করেন।

সুলতানের এই রাজধানী স্থানান্তরের সদর্থক ও নঞর্থক দু'ধরনের ফলই দেখা যায়। নঞর্থক দিকটি এই যে, জোর করে দিল্লি ত্যাগে বাধ্য করায় সুলতান বিশেষ একশ্রেণীর মানুষের আস্থা হারান। সুলতানের জনপ্রিয়তাও নষ্ট হয়। সদর্থক দিক থেকে বলা যায় যে, সুলতানের এই পদক্ষেপের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ব্যবধান ঘুচে এই দুই অঞ্চল ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায়। নিজামীর মতে, উত্তর ভারত থেকে দৌলতাবাদে জনসমাগমের পরোক্ষ ফলই হল বাহমনী রাজ্যের সৃষ্টি।

১৯.৭.৩ মুদ্রানীতি

সুলতানের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মুদ্রানীতির সংস্কার। তিনি দেশে প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন এক ধরনের 'প্রতীক মুদ্রা' (তাম্র মুদ্রা) প্রচলন করেন। এই যুগের প্রচলিত মুদ্রার নাম ছিল 'তঙ্কা'। সুলতান নতুন তাম্রমুদ্রা বা 'জিতল'-কে রৌপ্যমুদ্রার সমমূল্যের বলে ঘোষণা করে বাজারে ছেড়েছিলেন।

এশিয়া মহাদেশে এর আগে চীনের কুবলাই খান (১২৬০-৯৪ খ্রিঃ) ও পারস্যের কাই কাতু খান (১২৯৪ খ্রিঃ) প্রচলিত ধাতুমুদ্রার বদলে কাগজের মুদ্রা বা 'নোট' চালু করেছিলেন। চীনে এ ধরনের নোটের নাম ছিল 'চাউ'। মহম্মদ-বিন-তুঘলক এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। তবে কাগজের টাকার পরিবর্তে তিনি কমদামি ধাতু অর্থাৎ তামা ব্যবহার করেছিলেন।

বারাণীর মতে, ভারতের বাইরে রাজ্যজয় ও অনেক দান-খয়রাতি প্রভৃতির ফলে রাজ্যে এক অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। তাই সুলতান এই নতুন মুদ্রানীতির আশ্রয় নেন। নিজামীর মতে, যুদ্ধে প্রভূত ব্যয় ছাড়াও সে সময় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও রূপার অভাব দেখা দেয়। সেইজন্য সুলতান তাঁর মুদ্রানীতিতে এই মৌলিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন।

সুলতানের এই সংস্কার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। আসলে এই পরীক্ষা যুগোপযোগী ছিল না। জনসাধারণ তামা বা পিতলকে মূল্যবান ধাতু হিসেবে গণ্য করত না। ফলে তারা মুদ্রার যথার্থ মূল্য হিসেবে তামাকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাছাড়া সুলতান তাম্রমুদ্রা তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট গোপনীয়তা বা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেননি। এই ব্যবস্থাটিকে সরকার একচেটিয়া অধিকারে রাখারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এডওয়ার্ড টমাসের মতে, সরকারি টাকশালে নির্মিত তামার নোট এবং দক্ষ বেসরকারি শিল্পীর তৈরি তাম্রমুদ্রার মধ্যে সঠিক প্রভেদ করার ব্যবস্থা না থাকায় অল্পদিনের মধ্যে দেশে জাল তামার নোট ভীষণভাবে চালু হয়ে যায়। সুলতান আশা করেছিলেন যে, সোনা বা রূপা গ্রহণ করার মতোই তামার নোট গ্রহণের ক্ষেত্রেও জনসাধারণ ধাতু পরীক্ষা করে নেবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা সফল হয়নি। ফলে সারাদেশ জালনোটে ভরে যায়। বারাণী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অতিশয়োক্তি করে লিখেছিলেন যে, প্রতিটি হিন্দুর বাড়ি এক-একটা টাকশালে পরিণত হয়। খুত্, মুকদ্দম প্রভৃতি কর্মচারীরা এই জাল নোটের সুযোগে বেশ বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। বিদেশি বণিকরা জাল তাম্রমুদ্রা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ফলে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে সুলতান তাঁর মুদ্রানীতির এই পরিণাম দেখে তামার নোট প্রত্যাহারের ও ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন। রাজকোষ থেকে সোনা ও রূপার বিনিময়ে আসল ও নকল—সব ধরনের তামার মুদ্রাকেই বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়। বারাণীর মতে, তুঘলকাবাদের কাছে তামার মুদ্রা জমে পর্বতের আকার নেয়।

স্যার উলসী হেগের মতে, মহম্মদ-বিন-তুঘলক এ ধরনের নোট প্রচলনের কথা জানলেও এর উদ্দেশ্য অথবা প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না। সঠিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারলে সুলতানের এই নীতি হয়তো সাফল্যমণ্ডিত হতে পারত।

১৯.৭.৪ সামরিক পরিকল্পনা

জিয়াউদ্দিন বারাণীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহম্মদ-বিন-তুঘলক খোরাসান ও ইরাক জয়ের উদ্দেশ্যে প্রায় ৩,৭০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। তবে সামরিক অভিযানে ভৌগোলিক পরিস্থিতিকে তিনি চিন্তার মধ্যে আনেননি। হিমালয় ও হিন্দুকুশের গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে ঐ অঞ্চলে সমরসজ্জা পাঠানো যে যথেষ্ট দুরূহ কাজ তা সুলতান প্রথমে বুঝতেই পারেননি। যাই হোক, এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত রূপায়িত হয়নি।

সুলতান হিমালয়ের কুমায়ুন-গাড়োয়াল অঞ্চলের কারাচল নামক স্থানটিকে দখলেরও পরিকল্পনা করেন। ইবন বতুতার মতে, চীনের আগ্রাসনের হাত থেকে এই রাজপুত রাজ্যটিকে বাঁচাবার তাগিদেই তিনি এই পরিকল্পনা নেন। অন্যদিকে বারাণীর মতে, সুলতানের এই অভিযান তাঁর খোরাসান পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। শেষ পর্যন্ত দুর্গম পথে সুলতানি বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং সুলতান ঐ পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে খাজনা পাওয়ার শর্তে তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। এই অভিযান পুরোপুরি সফল না হলেও বিফল বলা যায় না।

এছাড়াও ১৩৩৭ খ্রিঃ সুলতান হিমালয়ের কাংড়া অঞ্চলের নগরকোট দুর্গটি দখল করেন। ১৩৩৭-৩৮ খ্রিঃ নাগাদ সুলতানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সেখানকার শাসক ফক্‌রউদ্দিন পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা—সোনারগাঁও ও লখ্‌নৌতি মহম্মদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। বহু প্রচেষ্টাতেও সুলতান ঐ অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। ১৩৪০-৪১ খ্রিঃ নাগাদ সুলতান অযোধ্যার শাসক আইন-উল-মুলুকের বিদ্রোহ দমন করেন। ১৩৪২ খ্রিঃ মহম্মদ সিন্ধুদেশে অরাজকতা ও রাহাজানি দমন করে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন।

সিংহাসন লাভের পর মাবার দ্বারসমুদ্র, বরঙ্গল প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে জয় করার প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যই মহম্মদ-বিন-তুঘলকের অধীনে চলে আসে। তবে মাবার রাজ্যের বিদ্রোহ, বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও কৃষ্ণনায়েকের নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাষ্ট্রগুলির জোটের ফলে অনেক অঞ্চলই আবার সুলতানকে হারাতে হয়। অবশেষে দৌলতাবাদে বিদ্রোহ শুরু হলে সে বিদ্রোহ তিনি দমন করেন। তবে ইতিমধ্যে গুজরাটে বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় তিনি সেদিকে নজর দিলে বিদ্রোহীরা দৌলতাবাদের দুর্গ দখল করে নেয়। অন্যদিকে গুজরাটের তাখীরের বিদ্রোহ দমনে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সুলতান অসুস্থ হয়ে পড়েন ও হঠাৎ মারা যান (২০ মার্চ, ১৩৫১ খ্রিঃ)।

১৯.৭.৫ মূল্যায়ন

রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। অবশ্য বাস্তব জ্ঞানের অভাবহেতু ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল দিল্লির অধীনে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। তিনি অবশ্য বিশাল এক সাম্রাজ্যের অধিকারীও হয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লি থেকে এই বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় বলেই তিনি দেবগিরিতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির বলে সুলতানের পক্ষে সে যুগের ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না।

এ কথা ঠিক যে, সুলতানের পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতার দরুন তিনি জনসাধারণের আস্থা হারান এবং অর্থনৈতিক সংকট, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সারাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে। তাঁর কঠোর নীতি সারাদেশে বিদ্রোহের ইন্ধন জোগায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা এবং সুলতান-বিরোধী কাজীরা সুলতানের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেও সফল হননি। দীর্ঘ ২৭ বছরের রাজত্বকালে সুলতান কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই জনসাধারণের বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হননি।

সুলতানের চরিত্র সম্পর্কে সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের লেখক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। শিয়াবউদ্দিন-অল-উমরী, সালাউদ্দিন সাফাদী প্রমুখ বিদেশি ইতিহাসবিদ্‌রা সুলতানের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। ইবন বতুতা তাঁর দানশীলতা, বিদ্যাবুদ্ধি ও উদারতার প্রশংসা করলেও তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। ইসামী সুলতানকে বিধর্মী ও অত্যাচারী বলতেও দ্বিধা করেননি। এমনকী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। জিয়াউদ্দিন বারাণী সুলতানের বিভিন্ন শাসন-সংস্কারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। ব্রিটিশ লেখক এলফিনস্টোন সুলতানকে "বিকৃত মস্তিষ্ক" বলে বর্ণনা করেছেন এবং হ্যাভেল, এডওয়ার্ড, টমাস ও স্মিথ তাঁকে সমর্থনও করেছেন। অন্যদিকে গার্ডনার ব্রাউন সুলতানের কাজকর্মের মধ্যে কোন অসঙ্গতি লক্ষ্য করেননি।

এইসব ঐতিহাসিক বিতর্ক সত্ত্বেও মহম্মদ-বিন-তুঘলক মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অত্যন্ত বর্ণময় চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তিনি অস্থিরচিত্ত, হঠকারী এবং সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁদের তিনি মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি দিয়েছিলেন। তাঁর সংস্কারগুলি অধিকাংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও এই ব্যর্থতার গ্লানিকে অতিক্রম করেও ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর কৃতিত্ব ঐতিহাসিকদের সপ্রশংস স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

১৯.৮ ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রিঃ)

সিন্ধুতে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যুর পর সুলতানি সিংহাসনের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। দিল্লির সিংহাসনে দুদিন কোন শাসনকর্তা ছিল না। আমির, ওমরাহ, ওলেমা, সুফিরা থাট্টায় রাজকীয় শিবিরে উপস্থিত হয়ে সমবেতভাবে ফিরোজ শাহ তুঘলককে সুলতান হিসেবে মনোনীত করেন। অধ্যাপক নিজামীর মতে, মুসলিম রাজতন্ত্রে এই ধরনের মনোনয়নের বিধি ছিল। কাজেই ফিরোজ শাহের নির্বাচন বিধিসম্মত ছিল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জালালউদ্দিন খলজি প্রজাহিতৈষণা ও উদারনীতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রব্যবস্থার যে ঐতিহ্য স্থাপন করেছিলেন ফিরোজ তুঘলক তাকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালে নানা কারণে অভিজাতগণ, প্রশাসক, সৈন্য, উলেমা, কৃষকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, ফিরোজ তুঘলক সমস্ত অংশের মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য উদার ও শান্তিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা না পেয়ে, যুদ্ধনীতি বা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রজার উন্নতি ও মঙ্গলের স্বার্থে প্রয়োগ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ফিরোজ ধর্মীয় মনোভাবের দিক থেকে ক্রমশ সংকীর্ণমনা হয়ে উঠেছিলেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের ধর্ম সম্পর্কে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ফিরোজের ছিল না। ফলে গোঁড়ামির বশে তিনি হিন্দু ও মুসলামানদের অনেকের বিরুদ্ধে নানারকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই নীতি তাঁর প্রজাহিতৈষণার ধারণাকে সংকুচিত করেছিল। শাসন-বিষয়ে যে সংস্কারগুলি ফিরোজ করেছিলেন তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে এই সংস্কারের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

সিংহাসনে বসে ফিরোজ প্রথমে প্রজাসাধারণের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট হন। তিনি সরকারি ঋণ মকুব করার আদেশ দেন। প্রজাদের বৈষয়িক উন্নতির দিকে নজর দেন এ বিষয়ে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন। বারাণীর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সুলতান 'শিয়াস্তের' নিষিদ্ধকরণের মধ্যে দিয়ে জনসমর্থন লাভ করেন। তাঁর আমলে এই শব্দটির অর্থ ছিল মৃত্যুদণ্ড। তাছাড়াও মুসলমানদের ওপর প্রচলিত অন্যান্য নৃশংস শাস্তিও তিনি নিষিদ্ধ করেন। সুলতান দোষী মুসলমানদের সঠিক বিচারের দায়িত্ব কাজীকে দেন। কিন্তু নির্যাতনমূলক শাস্তির পরিবর্তে কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তাঁর আমলে বহু রাজস্ব বিভাগের কর্মী তহবিল তছরূপ করেও সাজা পায়নি।

১৯.৮.১ কর ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

জিয়াউদ্দিন বারাণীর মতে, ফিরোজের দীর্ঘ রাজত্বকালে আপেক্ষিক সমৃদ্ধির কারণ হল দেশের উৎপাদনের সাথে 'খরজ' বা ভূমিরাজস্ব এবং 'জিজিয়া' বা অমুসলমানদের ওপর করের সামঞ্জস্য বিধান। আফিফের বর্ণনায় জানা যায় যে, সুলতানের আদেশে খাজা হাসিমুদ্দিন জুনিয়াদ প্রায় ছ-বছর সারাদেশে ভ্রমণ করে রাজ্যের বার্ষিক

আয় ছ'কোটি পঁচাত্তর লক্ষ তঙ্কা স্থির করেন। তবে মোরল্যান্ডের মতে, যেহেতু দীর্ঘসময়ে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণেই বেড়েছিল, সেহেতু সরকারের আয় দীর্ঘকাল এক থাকার কথা নয়। বস্তুত, জুনিয়াদ তাঁর অধীনস্থ বিরাটসংখ্যক কর্মচারীদের মোটামুটি একটা হিসেবের ওপর এই অঙ্ক স্থির করেছিলেন। সে আমলে কৃষিব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে উৎপাদন অবশ্যই যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা শস্যের স্থানীয় দামের ওপর নির্ভর করেই সরকারি পাওনার অর্ধেক, তঙ্কায় আদায় করতেন। অন্যদিকে পাওনার পুরোটাই শস্যে আদায় করার প্রথাও চালু ছিল।

আফিফের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ফিরোজ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত বেতনের পরিবর্তে সমপরিমাণ রাজস্বের জমি সরকারি কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিলি করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য অধ্যাপক নিজামীর মতে, সুলতান যাদের মধ্যে জমি বিলি করতেন তারা সরকারি খাজনা আদায়কারীদের কাছ থেকে মোট আদায়ের অর্ধেক টাকাই পাওনা হিসেবে পেতেন। খাজনা আদায়ের ব্যাপারে জমির ভোগকারীদের প্রত্যক্ষ কোন অধিকার ছিল না। যাই হোক, যে সমস্ত অঞ্চল সেনাবাহিননীর মধ্যে বিলি করা হত সেগুলি শাসনের কোন অধিকার তাদের ছিল না। তবে অসামরিক কর্মচারীরা যে সমস্ত অঞ্চলগুলির রাজস্ব অধিকার পেতেন সেই অঞ্চলগুলির শাসনভার তাদের হাতে থাকত।

অধ্যাপক নিজামীর মতে, এই রাজস্ব বিলি-ব্যবস্থা কর্মচারীদের অবাধ দুর্নীতি ও কৃষকদের ওপর শোষণের পথকে প্রশস্ত করে। এই ব্যবস্থা সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল।

ফিরোজ শাহ তুঘলক ইসলামের আইন অনুসারেই বেশকিছু প্রচলিত কর-ব্যবস্থার সংস্কার করেন। বিভিন্ন নির্যাতনমূলক কর বা খাজনা তুলে দেওয়া হয়। 'ফুতুহাত্-ই-ফিরোজশাহী'-তে ফিরোজ নিজে শহুরাঞ্চলের তেইশটি কর বন্ধ করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইসলামের বিধি অনুসারে তিনি কেবলমাত্র ছয়টি করের প্রচলন করেন—'খরজ্', জাকাত', 'জিজিয়া', খামস্', 'উসর' এবং 'তারকাত্'। যুদ্ধজয়ের পর প্রাপ্ত সমস্ত বনসম্পদ পবিত্র আইনানুসারেই রাষ্ট্র এবং সেনাদলের মধ্যে বণ্টন করা হত। ফিরোজের এই নতুন কর-ব্যবস্থা বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সহায়ক হয়েছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যও ছিল কম।

১৯.৮.২ সৈন্যবাহিনীর সংগঠন

সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির ওপর ফিরোজের সামরিক সংগঠন গড়ে ওঠে। আগেই বলা হয়েছে যে, সৈন্যদের মধ্যে জমি বিলি করা হয়েছিল, যার রাজস্ব দিয়ে তারা জীবিকা-নির্বাহ করতেন। অবশ্য অনিয়মিত সৈন্যদের সরকারি কোষাগার থেকেই পারিশ্রমিক দেওয়া হত। রাজকীয় বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮০ থেকে ৯০ হাজার। এছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক সামন্তপ্রভুদের অধীনস্থ সৈন্যদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় দুইলক্ষ। সুলতান সৈন্যদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্বদা নজর রাখতেন। অবশ্য সুলতানের অতিরিক্ত দাক্ষিণ্যের ফলে বৃদ্ধ এবং দুর্বল মানুষও সৈন্যবাহিনীতে থেকে যেতেন, যারা মোটেই সামরিক দিক থেকে রাষ্ট্রের সেবা করার যোগ্য ছিলেন না। অবশ্য ফিরোজ বয়স্ক সৈন্যদের অবসর দিয়ে তাদের পুত্রদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯.৮.৩ বিচারব্যবস্থা

বিচার বিভাগের সংস্কারের ক্ষেত্রে সুলতান এক গোঁড়া মুসলমানের মতো কোরানের বিভিন্ন নিয়মাবলীকে অনুসরণ করতেন। আইন প্রণয়নের জন্য 'মুফতি'-কে নিয়োগ করা হয়। বিচারের দায়িত্বভার অর্পিত হয় 'কাজী'র ওপর।

ফিরোজের আমলে তাঁর রাজ্যে দাসব্যবস্থার প্রসার ঘটেছিল। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সরকারি কর্মচারীরা বিভিন্ন কাজে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করতেন এবং রাষ্ট্র এই ক্রীতদাসদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যে মোট ক্রীতদাসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৮০,০০০। এই বিশাল সংখ্যক ক্রীতদাসদের নিয়ন্ত্রণের জন্য 'দিওয়ান-ই-বন্দাগানী' নামে একটি পৃথক সরকারি বিভাগও চালু হয়।

১৯.৮.৪ জনহিতকর কার্যাবলী

ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁর শাসনতন্ত্রকে প্রজাকল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছিলেন। যেহেতু সে-যুগে কৃষিই ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি, সেহেতু তিনি কৃষির উন্নতি সাধনে জলসেচের গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' থেকে জানা যায় যে, ফিরোজ দীপালপুরের শতদ্রু নদী থেকে ঘর্ঘরা নদী পর্যন্ত এবং যমুনা নদী থেকে মাণ্ডভী ও সিরমুরের প্রান্তদেশ পর্যন্ত দুটি বড় খাল খনন করেছিলেন। দ্বিতীয় খালটির সঙ্গে আরো সাতটি ছোটো খাল যুক্ত করে প্রধান খালটিকে হানসী পর্যন্ত বাড়ানো হয়। পরে হানসী থেকে আরাসীন এবং পুনরায় খালটিকে হিসার ফিরুজা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এইসব সেচখাল খননের ফলে দোয়াব অঞ্চলের প্রায় ১৬০ মাইল চাষের জমি দুটি বৃহৎ খালের জলে সিঞ্চিত হয়েছিল এবং গম, আখ ও অন্যান্য ধরনের শস্যের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া সুলতান প্রচুর কূপও খনন করেছিলেন। আফিফের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সুলতানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কৃষি উৎপাদন থেকে সুলতানের ব্যক্তিগত আয় দাঁড়ায় বার্ষিক প্রায় দু লক্ষ তঙ্কা।

কৃষির উন্নতি ছাড়া ফিরোজের অপর এক কীর্তি হল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নগর নির্মাণ। প্রায় সাঁইত্রিশ বছরের রাজত্বকালে সুলতান তাঁর রাজ্যে যে-সমস্ত নগরগুলি গড়ে তোলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফিরোজাবাদ, হিসার, জৌনপুর ও ফিরোজপুর। আফিফের বর্ণনায় দিল্লির কাছে যমুনার তীরে গড়ে ওঠা ফিরোজাবাদ নামক শহরটির সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তৈমুরের আক্রমণে এই শহরটি ধ্বংস হয়েছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশ অভিযানের সময় ফিরোজ পাণ্ডুয়ার নতুন নাম দেন ফিরোজপুর। শহরগুলি নির্মাণের সঙ্গে সুলতান নগরবাসীদের সুবিধার্থে বেশকিছু সরাইখানা, স্মৃতিস্তম্ভ, জলাশয়, হাসপাতাল ও কূপ খনন করান। রাজধানীতে জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য বেশকিছু দাতব্য হাসপাতাল (দার-উস্-সাফা) নির্মাণ করা হয়েছিল। দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় এক হাজারের বেশি বাগান তৈরি করা হয়েছিল।

সুলতানের অপর এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি দরিদ্র বালিকাদের সরকারি খরচে বিবাহের আয়োজন করা। 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' নামে নতুন একটি সরকারি বিভাগ সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে সুলতান দরিদ্র পিতামাতাদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদের বিবাহযোগ্য কন্যাদের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। 'দেওয়ান-ই-ইস্তিহক' নামে অপর এক সরকারি বিভাগের কাজ ছিল যোগ্য ব্যক্তিদের অর্থসাহায্য দেওয়া। সরকারি তহবিল থেকে এই খাতে প্রতি বছর ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।

বেকার যুবকদের কর্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে ফিরোজ শাহ তুঘলক আজকের দিনের মতো কর্ম বিনিয়োগ সংস্থা (Employment Exchange) স্থাপন করেন। দিল্লির কোতোয়াল কর্মপ্রার্থীদের সলুতানের কাছে হাজির করতেন। সুলতান স্বয়ং তাদের যোগ্যতা ও আর্থিক অবস্থা বুঝে চাকরিতে বহাল করতেন।

১৯.৮.৫ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা

ফিরোজ দেশে জ্ঞানচর্চার প্রচারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। শিক্ষিত সমাজকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজ প্রাসাদে আপ্যায়ন করতেন। এঁদের আর্থিক সমৃদ্ধি, ভাতা প্রভৃতির দিকেও তিনি দৃষ্টি রাখতেন। ইতিহাস চর্চার প্রতি তাঁর

বিশেষ আগ্রহ ছিল। উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। শামস-ই-সিরাজ আফিফ ও জিয়াউদ্দিন বারাণীর মতো ঐতিহাসিকরা তাঁর আমলেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি রচনা করেন। আজাজউদ্দিন খালিদখানি নামে জনৈক ব্যক্তি নগরকোট থেকে প্রাপ্ত প্রায় তিনশো সংস্কৃত গ্রন্থ পারসিতে অনুবাদ করেন। এই অনূদিত গ্রন্থটির নাম 'দালাইল-ই-ফিরোজশাহী'। ফিরোজের আমলেই 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' রচিত হয়। ফিরোজ বহু বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সঙ্গে মসজিদ নির্মাণের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১৯.৮.৬ ধর্মনীতি

ফিরোজ শাহ তুঘলক সম্ভ্রান্ত অভিজাত ও উলেমাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে সিংহাসনে বসেন। ফলে তাদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। তাছাড়া হিন্দু নারীর গর্ভজাত সন্তান হওয়ার ফলে নিজেকে তুর্কি মুসলমানদের সমকক্ষ প্রমাণ করার একটা তাগিদও তাঁর ছিল। ফলে তিনি উলেমাদের ক্ষমতা ও মর্যাদাকে পুনরায় শক্তিশালী ভিত্তি দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বিষয়ে তিনি ইসলাম জগতের বিভিন্ন প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিদের উপদেশ নিয়েই সিদ্ধান্ত নিতেন। এর ফলে তাঁর ধর্মনীতি গোঁড়া ইসলাম আদর্শের প্রভাবে কিছুটা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তিনি হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহ দিতেন। ধর্মান্তরকরণকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি 'জিজিয়া' কর তুলে দেওয়া, জায়গীর ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সম্মান দান প্রভৃতি পুরস্কারের ঘোষণা করেন। তাঁর ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা তাঁকে 'শিয়া' ও অন্যান্য 'অ-সুন্নী' মুসলমানদের বিরুদ্ধেও কঠোর করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মতো একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম শাসক খলিফার সুনজরে পড়েছিলেন। তিনি দু-বার খলিফার স্বীকৃতিপত্র লাভ করেছেন। ফিরোজের মুদ্রাতেও খলিফার নাম মুদ্রিত রয়েছে।

১৯.৮.৭ সামরিক কৃতিত্ব

সামরিক দিক থেকে ফিরোজ শাহ তুঘলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করেননি। তিনি বাংলাদেশ, কাঙড়া ও সিন্ধুদেশে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। ১৩৫৩ থেকে ১৩৫৮ খ্রিঃ মধ্যে সুলতান বাংলাদেশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তৎকালীন বাংলার শাসক সিকান্দারের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেই তিনি ক্ষান্ত হন। অবশ্য সিকান্দারের মিত্র ওড়িশার জাজনগরের রাজা গজপতি ফিরোজের কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছিলেন। সুলতান কটক দখল করেন ও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বংসসাধন করেন। এরপর সুলতান কাঙড়া অঞ্চলের নগরকোট আক্রমণ করেন ও সেখানকার শাসককে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ফিরোজের পরবর্তী অভিযান ছিল সিন্ধুদেশের থাট্টা অঞ্চলে। প্রথমদিকে ব্যর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত ফিরোজ এই অঞ্চলে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হন।

১৯.৮.৮ শেষ জীবন

ফিরোজের রাজত্বকালের শেষদিকে কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৩৮৭ খ্রিঃ নাগাদ সুলতান অবসর নিয়ে যুবরাজ মহম্মদ জুনা খাঁ-কে অভিষিক্ত করেন। মাত্র দু-মাস পরে ফিরোজের অধীনস্থ প্রায় দু-লক্ষ ক্রীতদাস বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মহম্মদ জুনা খাঁ পলায়নে বাধ্য হন। এরপর ফিরোজ তাঁর দৌহিত্র দ্বিতীয় তুঘলক শাহ-কে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেন। এক বছর বাদে ১৩৮৮ খ্রিঃ ৮২ বছর বয়সে ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যু হয়।

ফিরোজের মৃত্যুর পর দিল্লি-সুলতানির ভাঙ্গান শুরু হয় এবং উত্তর ভারত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। যদিও তুঘলকরা ১৪১২ খ্রিঃ পর্যন্ত শাসন করেন, ১৩৯৮ খ্রিঃ তৈমুরের অভিযান তুঘলক সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

১৯.৮.৯ মূল্যায়ন

ফিরোজ শাহ তুঘলককে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। সমকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে আফিফ বারাণী তাঁকে প্রজাহিতৈষী ও দয়ালু বলে বর্ণনা করেছেন। হেনরি এলিয়ট ও এলফিনস্টোনের মতো বিদেশি ঐতিহাসিকরা ফিরোজকে "সুলতানি যুগের আকবর" বলে আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য ড. ভিনসেন্ট স্মিথ এবং ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ আকবরের তুলনায় ফিরোজকে একশ ভাগের একভাগও মনে করেননি। স্যার উলসী হেগের মতে, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ক্ষেত্রে আকবরের পূর্বে একমাত্র ফিরোজের রাজত্বকালই ছিল সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল।

বস্তুত ফিরোজ ছিলেন সৎ এবং নিজের দায়িত্বের প্রতি সচেতন। তাঁর আগে দিল্লীর আর কোনও সুলতান প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এতটা নজর দেননি। তাঁর কর-ব্যবস্থা, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, কর্ম-বিনিয়োগের সংস্থা স্থাপন, 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' প্রভৃতি সংস্কার তাঁকে প্রচুর জনসমর্থন এনে দিয়েছিল। কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে সুলতান বিশেষ গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর আমলে ক্রীতদাসরা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ শুরু করে। তাছাড়া ফিরোজের ধর্মনৈতিক আদর্শ ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ। সুলতানি যুগে প্রথমবারের জন্য তাঁর আমলেই রাষ্ট্র হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের মানুষদের মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার তত্ত্বাবধায়কে পরিণত হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় উচ্চ আসনে উলেমাদের স্থাপন অনেক ক্ষেত্রে সুলতানের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক স্বার্থকে বিঘ্নিত করেছিল। ড. ত্রিপাঠীর মতে ইতিহাসের পরিহাস এই যে, যে-সমস্ত গুণগুলি ফিরোজ শাহ তুঘলককে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, সেগুলিই দুর্ভাগ্যবশত দিল্লি-সুলতানির দুর্বলতার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯.৯ অনুশীলনী

ক

১। খলজি বিপ্লবের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। খলজি সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝেন? আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্যবাদী নীতির রূপায়ণ পর্যালোচনা করুন।

৩। আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সংস্কার আলোচনা করুন। তিনি কি সফল হয়েছিলেন?

৪। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব মন্তব্য সহ আলোচনা করুন।

৫। ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলীর বিবরণ দিন। তাঁকে কী 'সুলতানি যুগের আকবর' বলা যায়?

খ

১। জালালউদ্দিন খলজির রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ধারণা কি ছিল?

২। জালালউদ্দিন কেন শান্তি নীতি অনুসরণ করেছিলেন?

৩। আলাউদ্দিনের রাজতন্ত্র-বিষয়ক ধারণা কেমন ছিল?

৪। আলাউদ্দিন কেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেছিলেন?

৫। ধর্ম বিষয়ে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?

৬। মহম্মদ-বিন-তুঘলক কী সত্যিই 'পাগলা রাজা' ছিলেন?

৭। ফিরোজ তুঘলকের ধর্মনীতি ও ক্রীতদাস-প্রীতি রাষ্ট্রে পক্ষে কেন ক্ষতিকর হয়েছিল?

৮। মহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলককে সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতখানি দায়ী করা যায়?

গ

১। কোন্ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে খলজি বংশের উত্থান হয়?

২। আলাউদ্দিন কিভাবে সুলতান হয়েছিলেন?

৩। আলাউদ্দিনের গুজরাট আক্রমণের একটি কারণ দেখান।

৪। মালিক কাফুর কে ছিলেন?

৫। 'দার-উস্-সাফা' কি?

৬। 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' কাকে বলে?

১৯.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। K. S. Lal. (Allahabad, 1950)—*History of the Khaljis.*

২। Mahdi Hussain. (Calcutta, 1963)—*Tughlug Dynasty.*

৩। R. C. Mazumdar, Ed. (Bharatiya Vidya Bhavan, 1980)—*The Delhi Sultanate.*

৪। Mohammad Habib, Vol-V—*The Delhi Sultanate.* K. A. Nizami, Ed. 1970—*A Comprehensive Hisotry of India.*

৫। Ishwari Prasad—*A Short History of Medieval India.*

৬। অনুবাদ বৈদ্যনাথ বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪ : *মধ্যযুগে ভারত* (*Medieval India, Part-I : সতীশচন্দ্র*)।

৭। অসিত কুমার সেন, ১৯৯৮ : *তুর্কি ও আফগান যুগে ভারত।*

একক ২০ □ বাংলার স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব ও বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান

গঠন

২০.০ উদ্দেশ্য
২০.১ প্রস্তাবনা
২০.২ বক্তিয়ার খলজির বাংলা জয়
২০.২.১ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
২০.২.২ সিকন্দর শাহ
২০.২.৩ গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ
২০.২.৪ হামজা শাহ
২০.২.৫ ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান
২০.৩ রাজা গণেশ ও তাঁর (ধর্মান্তরিত) বংশধর (১৪১৫-১৪৪২ খ্রিঃ)
২০.৩.১ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ
২০.৩.২ বাংলায় হাবসী শাসন
২০.৩.৩ হাবসী শাসনের অবসান
২০.৪ ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান
২০.৪.১ সমাজ-সংস্কৃতি
২০.৪.২ সাহিত্য
২০.৪.৩ শিল্প-সাহিত্য
২০.৫ হুসেন শাহী বংশ
২০.৫.১ হুসেন শাহের প্রথম জীবন
২০.৫.২ হুসেন শাহের রাজ্যবিস্তার
২০.৫.৩ হুসেন শাহী বংশ : নসরৎ শাহ
২০.৫.৪ হুসেন শাহী বংশের অবক্ষয়
২০.৫.৫ বঙ্গ জীবনে হুসেন শাহী বংশের অবদান
২০.৬ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
২০.৭ সঙ্গম বংশ
২০.৭.১ প্রথম দেবরায়
২০.৭.২ দ্বিতীয় দেবরায়
২০.৭.৩ শালুভ বংশ (১৪৮৬-১৫০৩ খ্রিঃ)
২০.৮ তুলুব বংশ (১৫০৫-১৫৭০ খ্রিঃ) : কৃষ্ণদেব রায়
২০.৮.১ তুলুব বংশের পতন : তালিকোটার যুদ্ধ
২০.৯ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা
২০.১০ বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগর
২০.১১ অনুশীলনী
২০.১২ গ্রন্থপঞ্জি

২০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে যে বিষয়গুলোর ওপর মূল জোর দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হল—

- কী পরিস্থিতিতে বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল
- বাংলায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও শিল্প-সংস্কৃতিতে ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশের অবদান কি ছিল
- দিল্লির সুলতানি শাসনের অবক্ষয়ের সুযোগে দক্ষিণ ভারতে কীভাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠিত হয়েছিল।
- দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরে শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল।

২০.১ প্রস্তাবনা

ফিরোজ শাহ তুঘলকের পর দিল্লির কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-কাঠামোয় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। ঐ সময়ে যে দুটো অঞ্চলে বড় আঞ্চলিক রাষ্ট্র স্থাপনের ঝোঁক দেখা যায়, সে দুটো হল পূর্ব ভারতের বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর। কুতুবউদ্দিন আইবকের বিশ্বাসভাজন সমরনায়ক বখ্‌তিয়ারই প্রথম বাংলাদেশে দিল্লির নিয়ন্ত্রণের বাইরে শাসন-কাঠামো গঠনের পথ দেখিয়েছিলেন, তবে এ ব্যাপারে মূল কৃতিত্ব ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরে একই কাজ করেছিলেন বেশ কয়েকজন শাসকের একটি ক্রমিক গোষ্ঠী। কেন্দ্রীভূত কাঠামোকে অস্বীকার করে বিকেন্দ্রীকরণের এই প্রবণতার পর্যায় বর্তমান এককের প্রস্তাবিত বিষয়।

২০.২ বখ্‌তিয়ার খল্‌জির বাংলা জয়

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজি বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা করেন (১২০২-১২০৩)। লক্ষ্মণ সেন নদিয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে পূর্ববঙ্গে সেন বংশের রাজত্ব আরো কিছুকাল টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে কুতুবউদ্দিন আইবকের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বখ্‌তিয়ার খলজি কুতুবউদ্দিনের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে নেননি। মুসলমান শাসনের প্রথমদিকে দিল্লির সুলতানের পক্ষে প্রভুত্ব চাপিয়ে দেওয়া সম্ভবও ছিল না। সম্পূর্ণ নিজের শক্তি ও দক্ষতার জোরেই বখ্‌তিয়ার বাংলায় মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লির সুলতানি শাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাংলায় স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের যে ঐতিহ্য রেখে যান, তা পরবর্তীকালে গৌরবময় স্বাধীন গৌড় সুলতানিতে পরিণত হয়। বাংলার মুসলমান শাসকেরা প্রায়ই দিল্লির প্রাধান্য অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। দিল্লির বিরুদ্ধে বাংলার শাসকদের বিদ্রোহের কতকগুলি কারণ ছিল। (১) দিল্লি থেকে বাংলাদেশের দূরত্ব বাংলার শাসকদের বিদ্রোহ করতে প্রলুব্ধ করেছে। দিল্লির শাসকদের পক্ষে এই দূরত্ব অতিক্রম করে দ্রুত বিদ্রোহ দমন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। বিদ্রোহ দমন করে মনোমত শাসক বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে সুলতানেরা ফিরে গেলেই বাংলা বিদ্রোহ ঘোষণা করত। (২) বাংলার ধনসম্পদ এবং ভৌগোলিক পরিবেশ বাংলার শাসকদের বার বার বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছে। সুলতানি যুগের প্রথম থেকেই বাংলায় দিল্লির কর্তৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জিয়াউদ্দিন বারাণী বলেছেন যে, লখ্‌নৌতির (লক্ষণাবতী) লোকেরা বিদ্রোহী হিসেবে পরিচিত ছিল এবং এই শহরকে বুলঘাকপুর বা বিদ্রোহের শহর বলা হত।

এই সময় বাংলা চারটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল—লখ্নৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম। দিল্লির সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বের শেষদিকে বাংলার ওপর কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ সুলতানের ছিল না। লখ্নৌতি ও সোনারগাঁও-এর দুই শাসনকর্তার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হলে দারুণ গোলযোগের সূত্রপাত হয়। বাংলার বেশকিছু জমিদার নিজ নিজ এলাকা বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকেন। বাংলার এই রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইলিয়াস খান লখ্নৌতি এবং সোনারগাঁও দখল করে নেন। অনতিবিলম্বে তিনি শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাদি গ্রহণ করে সুলতানি শাসনের সূচনা করেন।

২০.২.১ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

ইলিয়াস শাহের পূর্ব-ইতিহাস বিশেষ কিছুই আমরা জানতে পারি না। সমসাময়িক আরবি ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরানের সিজিস্তানে। দিল্লি থেকে বাংলায় এসে ইলিয়াস প্রথমে দক্ষিণ বাংলার কোথাও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং এক সৈন্যদল গঠন করেন। ১৩৪২ মতান্তরে ১৩৪৫ সালে লখ্নৌতি বা লক্ষণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বাংলার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বের সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জিয়াউদ্দিন বারাণীর তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী, নিজামুদ্দিন বখসী'র তবাকাৎ-ই-আকবরী, মহম্মদ কাশিম ফিরিস্তা লিখিত তারিখ্-ই-ফিরিস্তা, শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফের তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক ব্যক্তির লেখা সিরাজ-ই-ফিরোজশাহী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বকালের বিবরণ জানা যায়। তবে বেশিরভাগ লেখাতেই ইলিয়াস শাহের কৃতিত্বকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

লখ্নৌতির সিংহাসনের দখল করেই ইলিয়াস শাহ বাংলায় নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রথমে সম্ভবত সাতগাঁও অধিকার করেন এবং পরে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির দিকে হাত বাড়ান। ত্রিহুত অধিকার করে হাজিপুর পর্যন্ত জয় করেন। চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশি প্রভৃতি অঞ্চলও তিনি জয় করেন। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, তিনি সোনারগাঁও অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। কামরূপেরও কতকাংশ ইলিয়াসের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। ইলিয়াস উড়িষ্যা আক্রমণ করে চিল্কাহ্রদের সীমা পর্যন্ত সামরিক অভিযান চালান এবং সেখানে ৪৪টি হাতি সমেত অনেক সম্পত্তি লুঠ করেন। নেপালের বিরুদ্ধেও তিনি সফল অভিযান প্রেরণ করেন। নেপালের বহু মন্দির ধ্বংস করে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। তাঁর সফল সামরিক অভিযানগুলির ফলে প্রথমত, বাংলায় রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয়ত, ভারতের পূর্বপ্রান্তে শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় দিল্লির সুলতানের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

ইলিয়াসকে দমন করার জন্য দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ বিশাল বাহিনী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়া দখল করলে ইলিয়াস দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। দুর্গ অবরোধ করেও ইলিয়াসের পতন ঘটানো সম্ব হল না। অবরোধ তুলে নিয়ে স্বসৈন্যে ফিরোজ ফিরে যাচ্ছেন এই ভান করায় ইলিয়াস দুর্গ থেকে বেরিয়ে সুলতানি বাহিনীকে আক্রমণ করেন। পাইক সর্দার সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। ইলিয়াস পরাজিত হলেন। কিন্তু তিনি আবার একজালা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ফিরোজ তুঘলক ৪৫টি হাতি ও কিছু অর্থসম্পদ দখল করে দিল্লি ফিরে যান। বারাণী, ইসামি এই যুদ্ধে সুলতানের জয় হয়েছে বললেও যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। দিল্লির বাহিনী বাংলা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইলিয়াস পুনরায় তাঁর হারানো অংশগুলি দখল করে নেন। দিল্লির সুলতানের সঙ্গে ইলিয়াসের যে সন্ধি হয় তাতে কার্যত ফিরোজ তুঘলক বাংলার স্বাধীন মর্যাদা স্বীকার করে নেন। ইলিয়াসও মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে দিল্লির সঙ্গে শান্তি বজায় রাখেন।

প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল থেকেই বাংলা দু'শ বছর ধরে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল—বাংলার জনজীবনে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল। শাম্স-ই-সিরাজ আফিফ্ তার তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে ইলিয়াস

শাহকে শাহ-ই-বাঙালা, সুলতান-ই-বাঙালা, শাহ-ই-বাঙালিয়ান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বাঙালি পাইকদেরই কেবল সাহায্য পেয়েছিলেন তাই নয়, বরেন্দ্র অঞ্চলের ভাদুড়ি ও সান্যাল জমিদারেরাও তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। ইলিয়াস শাহ বাঙালি হিন্দু অভিজাত ও সাধারণ বাঙালিজনের শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যও রূপ পাচ্ছিল। রিয়াজ-উস্-সালাতিনের লেখক ইলিয়াস শাহকে ভাঙ্গরা বা ভাঙ্গের নেশাখোর বলে উল্লেখ করেছেন। বারাণী তাঁকে অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বক্তব্যগুলিকে 'ইলিয়াসের শত্রুপক্ষের লোকের বিদ্বেষ প্রণোদিত মিথ্যা উক্তি' বলে উপহাস করেছেন।

২০.২.২ সিকন্দার শাহ

ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম তিনজন শাসকই যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রিঃ) সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে ফিরোজ শাহ আবার বাংলা আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের কারণ—(১) তিনি বাংলা অভিযানের ব্যর্থতা ভুলতে পারেননি এবং (২) ইলিয়াস শাহের কাছে পরাজিত সোনারগাঁও-এর শাসকের জামাতার আবেদনে বাংলার শাসককে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা আক্রমণ করেন। সিকন্দর পিতার মতোই একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু একডালা দুর্গের পতন ঘটানো দিল্লির সুলতানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উভয়পক্ষই ক্লান্ত হয়ে সন্ধি স্থাপন করেন। বাংলা ছেড়ে ফিরোজ চলে যান এবং বাংলার ওপর সিকন্দরের সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে নেন। সিকন্দরের কেবল যোদ্ধা ও প্রশাসক হিসাবেই খ্যাতি ছিল তা নয়, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক রূপেও সুনাম ছিল। তাঁরই সময়ে 'স্থাপত্য কৌশলের' দিক দিয়ে অতুলনীয় পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়। তাঁর শেষ জীবন সুখের ছিল না। তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ বাঁধে। তাঁর প্রিয় পুত্র গিয়াসউদ্দিন বিমাতার চক্রান্তে অতিষ্ঠ হয়ে সন্দেহের বশে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যুদ্ধে সিকন্দরের মৃত্যু হয়।

২০.২.৩ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

পরবর্তী শাসক গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯১-১৪১০ খ্রিঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। তবে দিল্লির সুলতানের পক্ষ থেকে বাংলা আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকায় তিনি নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করেন। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে তিনি কামতা রাজ্যের একাংশ দখল করে নিয়েছিলেন, কিন্তু অহোম ও কামতা রাজ্যের ঐক্যবন্ধ আক্রমণে তাঁকে কামতা রাজ্য থেকে সরে আসতে হয়েছিল। সমসাময়িক রচনাগুলিতে তাঁকে 'ন্যায়পরায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী' বলে প্রশংসা করা হয়েছে। বিহারের দরবেশ মুজফ্ফর বল্‌খি এবং প্রখ্যাত সন্ত নূর কুতব আলমের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিনের পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং তাঁকে স্বীয় দরবারে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। কিন্তু হাফিজের পক্ষে এই আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বিদেশের সঙ্গে বাংলার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আজম শাহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সময়ে চীনের সঙ্গে বহুবার দূত বিনিময় হয়েছিল। চীন সম্রাট ইয়ং লুর কাছে গিয়াসউদ্দিন ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ সালে দূত পাঠিয়েছিলেন। চীনা সম্রাট এদেশ থেকে বৌদ্ধ শ্রমণদের স্বদেশে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ১৪১০-১১ খ্রিঃ মহারত্ন উমরাজ নামে একজন ভিক্ষু এদেশ থেকে চীনে প্রেরিত হয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। এই সময়ে মা-হুয়ান চীন থেকে বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে তৎকালীন বাংলা ও বাঙালিদের সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

২০.২.৪ হামজা শাহ

গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সাঈফ্উদ্দিন হামজা শাহ (১৪১০-১২) সিংহাসনে বসেন। সাঈফ্উদ্দিন চীনের সঙ্গে মৈত্রী ও যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী সিহাবুদ্দিন বা বায়োজি শাহ (১৪১৩-১৪) ও পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৪১৪-১৫) রাজত্বকালে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের একজন ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা গণেশ দরবারে শক্তিশালী অভিজাত হিন্দুগোষ্ঠীর নেতা হিসাবে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। সমকালীন ঐতিহাসিকদের মতে রাজা গণেশ ফিরোজ শাহকে হত্যা করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেছিলেন।

২০.২.৫ ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান

প্রায় দুশো বছর নিরবচ্ছিন্ন মুসলিম শাসনের পর হিন্দু বংশের অভ্যুত্থান আশ্চর্য মনে হলেও তা অবাস্তব ছিল না। ইলিয়াস শাহীদের রাজত্বের শেষের দিকে বাংলার আমির-ওমরাহদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। উমেলা ও মুসলিম প্রশাসকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজা গণেশ তথা হিন্দু অমাত্যদের অভ্যুত্থানের পথ সহজ করে দেয়। রাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম সাধু-সন্তদের হস্তক্ষেপের অনেক নজীর আছে। মুজফ্ফর শাহ বল্খী, আজম শাহকে প্রশাসনের কোনো বিভাগে বিধর্মীদের নিয়োগ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহের আমলে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সহযোগিতার ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল, আজম শাহের আমলে তা অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। সম্ভবত এই কারণে হিন্দু সামন্ত, জমিদার ও অমাত্যদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে এবং গণেশের অভ্যুত্থান সহজ হয়।

২০.৩ রাজা গণেশ ও তাঁর মুসলমান (ধর্মান্তরিত) বংশধর (১৪১৫-১৪৩৭)

দীর্ঘকাল ধরে বাংলায় মুসলমান শাসনের মধ্যে স্বল্পকালের জন্য রাজা গণেশের হিন্দুশাসন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে তাঁর রাজত্বকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কয়েকটি বিষয় এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। রাজা গণেশের নামে কোন মুদ্রা আজও পাওয়া যায়নি। যতগুলি তথ্য আজ অবধি পাওয়া গেছে, কোন তথ্যই রাজা গণেশের সিংহাসন আরোহণের যথাযথ ও সঙ্গতিপূর্ণ তথ্য দিতে পারেনি। অবশ্য (১৪১৭-১৯) সালের মধ্যে দনুজমর্দনদেব নামে এক রাজার মুদ্রা পাওয়া গেছে। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী রাজা গণেশেরই আর এক নাম দনুজমর্দনদেব বলে জানিয়েছেন। অনেকে অবশ্য এই মত সমর্থন না করলেও গণেশ ও দনুজমর্দনদেব অভিন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়। রাজা গণেশের সিংহাসন আরোহণে বাংলার মুসলমান সাধু-সন্তরা অসন্তুষ্ট হন। তাঁদের নেতা নূর কুতুব-আলম জৌনপুরের বিখ্যাত সুফী আসরাফ্-উল-সিমনানির সাহায্য চান। সিমনানির অনুরোধে জৌনপুরের মুসলিম শাসক ইব্রাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করেন। গণেশ প্রায় বিনাযুদ্ধে শর্কির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। গণেশের পুত্র যদু পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে মুসলিম শিবিরে যোগ দেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে মুসলমান উলেমা ও আমীর-ওমরাহরা তাঁকে সিংহাসনে বসান। তাঁর নাম হয় জালালউদ্দিন। বাংলায় ইসলামি শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। জালালউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসউদ্দিন আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে রাজধানী গৌড়ে রাজনৈতিক দলাদলি চরমে ওঠে। তাঁর দুই ক্রীতদাস শাহী খান ও নাসির খান ষড়যন্ত্র করে আহমদ শাহকে হত্যা করেন। এই দুই ক্রীতদাস ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে অভিজাতবর্গ ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহকে সর্বসম্মতিক্রমে সিংহাসনে বসান। ইলিয়াস শাহী বংশের পরবর্তী বংশধরদের রাজত্ব শুরু হল।

২০.৩.১ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকাল শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে কেটেছিল বলে সমসাময়িক ঐতিহাসেরা জানিয়েছেন। অন্তত জৌনপুরের শর্কিরা বাংলার দিকে তখন নজর দেয়নি। দিল্লির লোদিদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা লিপ্ত ছিল। তবে উড়িষ্যা ও মিথিলার রাজার সঙ্গে বাংলার যুদ্ধ বেঁধেছিল। তাঁর রাজত্বকালেই সম্ভবত পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল। রিয়াজ বলেছেন. নাসিরুদ্দিন উদার ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ফিরিস্তা তাঁর প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, প্রজারা তাঁর রাজত্বে সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। এই সময়ে বাংলার শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রুকনদ্দীন বরবক শাহ শান্তিপূর্ণভাবে সিংহাসনে আরোহণ (১৪৫৮) করেন। বরবক শাহ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তাঁর সময় বাংলাদেশের সীমান্ত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁর সেনাপতি ইসমাইল গাজী বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। মান্দারণ দুর্গকে কেন্দ্র করে তিনি উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের সঙ্গে এক দীর্ঘকালীন সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। বরবক শাহ ত্রিহুত জয় করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সিলেট পুনরায় নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তিনি আরাকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রাম উদ্ধার করেছিলেন। যশোর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ তাঁর শাসনাধীনে ছিল।

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তিনি নিজেও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসুকে সুলতান গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুদের দরবারে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অনন্ত সেন, কেদার রায়, নারায়ণ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

২০.৩.২ বাংলায় হাবসী শাসন

পরবর্তী ইলিয়াস শাহীদের দুর্বলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, দরবারী ষড়যন্ত্রের ফলে প্রশাসন যন্ত্র প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা নিজেদের ক্রীতদাস ও অমাত্যদের ওপর ভরসা করতে পারছিলেন না। তাঁরা প্রায় দশ হাজার হাবসী (আবিসিনিয়) ক্রীতদাস আমদানি করেন এবং দেহরক্ষী ও রাজপ্রাসাদের রক্ষী হিসাবে নিয়োগ করেন। সুলতান বরবক শাহ সর্বপ্রথম হাবসী ক্রীতদাসের আমদানি করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, হাবসী ক্রীতদাসরা প্রাধান্য পেলে স্থানীয় প্রভাবশালী অমাত্যরা সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় রাজঅন্তঃপুরে এবং বাইরে হাবসী ক্রীতদাস ও সেনারা প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজার ছত্রছায়ায় তারা অত্যাচারী হয়ে ওঠে। হাবসীদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য এই বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দিন ফতে শাহ প্রয়াসী হলে হাবসীরা তাঁকে হত্যা করে এবং সিংহাসন দখল করে (১৪৮৭)। ইলিয়াস শহদের হাবসী প্রীতি এতদূর পৌঁছেছিল যে পূর্বতন অভিজাত ও অমাত্যরা প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিল এবং সুলতানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো ক্ষমতাও তাদের ছিল না। এইসঙ্গে প্রশক্তিও হীনবল হয়ে পড়েছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটল।

২০.৩.৩ হাবসী শাসনের অবসান

হাবসীরা ১৪৯৩ পর্যন্ত শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। হাবসীদের শেষ সুলতান মুজফ্ফর শাহ-এর অত্যাচার ও কুশাসন শুধুমাত্র আমীর-ওমরাহদের অসন্তুষ্ট করেননি, জলসাধারণকেও শত্রু বানিয়েছিল। তিনি হিন্দু-মাসলিম জমিদার ও অভিজাতদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকেন। চড়া হারে রাজস্ব আদায় করেন, এবং সেনাবাহিনীর বেতন কমিয়ে দেন। ফলে আমীর-ওমরাহ, সেনাবাহিনী ও সাধারণ প্রজা সবাই সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হয়।

'বাংলার শাসকের বিরুদ্ধে সব শ্রেণীর মানুষের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের এটাই হল প্রথম দৃষ্টান্ত।' এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মুজফ্‌ফর শাহের উজির হুসেন শাহ. মুজফ্‌ফর শাহ নিহত হলে হুসেন শাহ অভিজাত ও হিন্দু পাইকদের সমর্থনে সিংহাসনে বসে হুসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

২০.৪ ইলিয়াস শাহী বংশের অবদান

ইলিয়াস শাহী সুলতানদের প্রচেষ্টায় বাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সত্তার জন্ম হয়। সাতগাঁও, সোনারগাঁও চট্টগ্রাম-এর শাসকদের পরাভূত করে লক্ষণাবতী বা লখনৌতির অধীনে ঐক্যবন্ধ বাংলা গড়ে তুললেন ইলিয়াস শাহীরা। দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের চরম বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে তারা বাংলার স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। পর পর দু'বার দিল্লির সম্রাট বাংলা আক্রমণ করেও বাঙ্গালীদের পরাজিত করতে পারেননি। বাংলার স্বাধীনতাকে কার্যত তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করে বাংলার প্রভাব ও কর্তৃত্ব জাহির করতে পেরেছিলেন বাংলার সুলতানেরা। ইলিয়াস এমন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন যারা প্রায় দেড়শত বছর ধরে গৌরবের সঙ্গে বাংলার রাজত্ব করেন। ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা বাংলা ও বাঙ্গালির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলেছিলেন। সমসাময়িক লেখক আফিফ সঙ্গত কারণেই ইলিয়াস শাহকে শাহ-ই-বাঙালিয়ান বা শাহ-ই-বাঙলা বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক আবদুল করিম বলেছেন যে, মুধ্যযুগে বা আধুনিক যুগে বাংলা বলতে যে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দেশকে বুঝি তার সৃষ্টি এই সুলতানি বংশের শাসনকালেই। শশাঙ্ক বা পালরাজাদের আমলের বাংলার সঙ্গে আমাদের পরিচিত বাংলার অনেক প্রভেদ।

২০.৪.১ সমাজ-সংস্কৃতি

রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সাম্প্রদায়িক ঐক্যও সুদৃঢ় হয়। ইলিয়াস শাহী সুলতানরা এমন এক উদার শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন যাতে খুব সহজেই হিন্দুরা অভিজাত ও সাধারণ মানুষ ইলিয়াস শাহী সুলতানদের আপনজন ভাবতে পারে। পাইক নেতা সহদেব দিল্লির সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। যোগ্যতা ও গুণানুযায়ী বাঙালি হিন্দুরা সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'পঞ্চদশ শতকে বাংলার প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু কর্মচারীরা বাংলায় ভূমিভিত্তিক অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে।' এই হিন্দু অভিজাত গোষ্ঠী দরবারি রাজনীতি ও প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকে। পরিণতিতে দেখা যায় হিন্দুরাজা গণেশের বাংলার শাসক হিসাবে উত্থান। ইলিয়াস শাহী আমলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য; উদার রাষ্ট্রনীতি, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা ইত্যাদির ফলে হিন্দু-মাসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দীনেশচন্দ্র সেন, তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে এই পরিবেশের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। 'মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালি হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। ...এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস-নিবন্ধন, বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল।' এই সময় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাঙালি বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হতে থাকে।

ইলিয়াস শাহী বংশের আমলে বাংলার খ্যাতি সারা ভারতে তো বটেই এমনকি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সুলতানেরা যেমন স্বদেশে জৌনপুরের রাজদরবারে এবং দিল্লির দরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন তেমনি আরবদেশের মক্কা ও চীনদেশের সঙ্গে দূত বিনিময় করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলেন। আজম শাহের আমলে চীনা দূত মা-হুয়ান এসেছিলেন, তাঁর লেখা থেকে বাংলার অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় জানা যায়। ইবন বতুতাও এই সময়ে বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে বাংলাদেশের

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তার বিবরণ থেকে জানা যায় বহির্বিশ্বে বাংলার বয়নশিল্পের খ্যাতির কথা ও জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক কম দামের কথা

২০.৪.২ সাহিত্য

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালের গৌরবজনক ভূমিকা রয়েছে। সুলতানদের প্রচেষ্টায় লক্ষ্ণাবতী, গৌড় ও পাণ্ডুয়া বাংলার সাংস্কৃতিক পীঠস্থানে পরিণত হয়। ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম তিনজন সুলতান এবং পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের বরবক শাহ—প্রত্যেকে বিদ্যোৎসাহী এবং পণ্ডিত ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তাঁর স্বরচিত কবিতার একটি পংক্তি পূরণের জন্যে ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজের কাছে পাঠান এবং হাফিজ তা পূরণ করে পাঠিয়ে দেন। বরবক শাহের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে ‘অল্-ফাজিল’ ও ‘অল-কামিল’ এই দুটি উপাধি তাঁর নামের সঙ্গে ব্যবহার করা হ’ত। এই সময় চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ও মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির আবির্ভাব হয়েছিল। কৃত্তিবাস জানিয়েছেন যে, তিনি গৌড়াধিপতির নির্দেশে রামায়ণ রচনা করেছেন। সম্প্রতি সুলতান বরবক শাহের নির্দেশেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর লেখক মালাধর বসুকে বরবক শাহ গুণরাজ খান উপাধি দিয়েছিলেন। জালালউদ্দিনের আমলে বৃহস্পতি মিত্রের মতো মহাপণ্ডিত সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ইলিয়াস শাহী বংশের আমলে চর্যাপদ থেকে ‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন’-এ বাংলা ভাষার উত্তরণ ঘটেছিল।

২০.৪.৩ শিল্প-স্থাপত্য

কেবলমাত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয় এই সময় শিল্প ও স্থাপত্যে স্বতন্ত্র এক ধরনের বাঙালি ঘরানার সৃষ্টি হয়। ইট ও পাথর মিশিয়ে ছোট ছোট স্তম্ভের ওপর গম্বুজ নির্মাণ ও দোচালা ও চারচালা বিশিষ্ট কুটিরের আদলে মসজিদ ও অট্টালিকা নির্মাণ স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে এক নতুন রীতির প্রচলন করেছিল। সুলতান সিকন্দর শাহ নির্মিত আদিনা মসজিদ এই শিল্পরীতির উদাহরণ। ভারতবর্ষে এতবড় মসজিদ আর কখনও নির্মিত হয়নি। এই মসজিদ দামাস্কাসের মসজিদের সঙ্গে তুলনীয়। এই মসজিদের ভেতরে সমবেত প্রার্থনাগৃহ স্থাপত্য-সৌন্দর্যে অসাধারণ। পার্সী ব্রাউন এই মসজিদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই আমলে তৈরি গৌড়ের বিখ্যাত লোটন মসজিদ, রামকোটি মসজিদ ও তাঁতিপাড়া মসজিদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফ্রাঙ্কলিন লোটন মসজিদের শিল্প-সুষমার প্রশংসা করেছেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

২০.৫ হুসেন শাহী বংশ

হাবসী রাজত্বের বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের অবসান ঘটিয়ে হুসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯) বাংলায় হুসেন শাহ বংশের রাজত্বের সূচনা করেন। এই বংশ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করে এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য গৌরবময় অবদান রাখেন। ইলিয়াস শাহীরা রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে যে উদারতা দেখিয়েছিলেন, তা হুসেন শাহী আমলে অব্যাহত ছিল।

২০.৫.১ হুসেন শাহর প্রথম জীবন

হুসেন শাহের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর সম্পর্কে নানা ধরনের বিবরণ চালু রয়েছে। কেউ কেউ বলেন তিনি আরবদেশ থেকে এসেছিলেন। আবার স্থানীয় কাহিনী অনুসারে তিনি রংপুরের

বাসিন্দা ছিলেন। তাঁকে মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়ার লোক বলেও দাবি করা হয়েছে। তিনি নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে কিভাবে হাবসী শাসক মুজফ্‌ফর শাহের উজিরের স্থান লাভ করেছিলেন—এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। হুসেন শাহ প্রথমেই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর সিংহাসনারোহণের সুযোগ নিয়ে রাজধানীতে ব্যাপক লুঠপাঠ চলেছিল এবং সুলতানের নিষেধ অমান্য করার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। সুলতানের আদেশে তাদের অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। পাইক সৈন্যদের মধ্যে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছিল তাদের তিনি বরখাস্ত করেন। পাইক বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে তিনি নতুন সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। হাবসীদের তিনি রাজ্য থেক সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করেন। হিন্দু ও মুসলিম অমাত্যদের আবার গুরুত্বপূর্ণ পদে ফিরিয়ে আনেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সুলতান দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে নিজের শক্তি সংহত করেছিলেন। বংশের নিরাপত্তা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য হুসেন শাহুকে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির দিকে নজর দিতে হয়েছিল।

দিল্লির সুলতান সিকন্দর লোদীর সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য জৌনপুরের শর্কি সুলতানদের বিরোধের সুত্রে হুসেন শাহ ও দিল্লির সুলতানের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়। জৌনপুরের শর্কি সুলতানকে বাংলায় আশ্রয় দেওয়ায় সিকন্দর লোদী বাংলার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। হুসেন শাহ তাঁর পুত্র দানিয়েলকে দিল্লির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাঠালেন। উভয় বাহিনী বিহারের রাঢ় নামক স্থানে মুখোমুখি হল। কিছুদিন ঐ অবস্থায় থেকে উভয়পক্ষই যুদ্ধ না করে আপোষে বিরোধ মিটিয়ে নেবার জন্য সন্ধি করল। এই সন্ধির ফলে উভয়পক্ষই অপরপক্ষের শত্রুকে ভবিষ্যতে আশ্রয় না দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। দিল্লির পরাক্রান্ত সুলতানের সঙ্গে এই সম্মানজনক সন্ধি হুসেন শাহের গৌরব বাড়িয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক আব্দুল করিম বাংলার সুলতান ও দিল্লির সুলতানের মধ্যে আদৌ কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল কিনা—এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে মুঙ্গের ও সারণ জেলায় প্রাপ্ত লিপি অনুসারে হুসেন শাহ সমগ্র উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২০.৫.২ হুসেন শাহর রাজ্যবিস্তার

হুসেন শাহ তাঁর রাজত্বের প্রথম বছর থেকেই মুদ্রায় নিজেকে ‘কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উড়িষ্যা-বিজয়ী’ বলে ঘোষণা করে—এই অঞ্চলগুলিকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করতে থাকেন। কামতা-কামরূপ রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে বাংলার সুলতানদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাজ্যবিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করে আসছিল। হাবসী শাসনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কামতার রাজা করতোয়া নদীর তীর বরাবর ঘোরাঘাট পর্যন্ত রাস্তা বানিয়েছিলেন। সামরিক প্রয়োজনে এই রাস্তা কাজে লাগানো হচ্ছিল। ফলে গৌড়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কামতাপুরের খেন বংশীয় শাসক নীলাম্বরের বিরুদ্ধে বাংলার সুলতান সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী নীলাম্বরের সঙ্গে বিরোধ করে তাঁর মন্ত্রী হুসেন শাহকে কামতাপুর আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন। আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী কৌশল অবলম্বন করে কামতাপুর রাজ্য দখল করে। হাজো পর্যন্ত তাদের দখলে চলে আসে। কামতা-কামরূপ অভিযান সফল হতে হুসেন শাহ আসাম ও উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিযান শুরু করেন। রিয়াজ-উস্‌ সালাতিনের মতে হুসেনের আসাম অভিযান প্রাথমিকভাবে সাফল্য লাভ করেছিল। অসমীয়া বুরঞ্জীর বক্তব্য অনুসারে হুসেনের আসাম অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আসামের সৈন্যবাহিনী গৌড়ের বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। নিরুপায় হয়ে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়। সমসাময়িক লেখকদের বিবরণ ও অসমীয়া বুরঞ্জীর বিবরণে কিছু পার্থক্য থাকলেও হুসেন শাহের আসাম জয়ের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

উড়িষ্যার সঙ্গেও হুসেন শাহের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়েছিল। হুসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি, রিয়াদ-উস্-সালাতিন এবং ত্রিপুরার রাজমালার সাক্ষ্য অনুসারে হুসেন শাহ উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। উড়িষ্যার বিভিন্ন সূত্রমতে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র হুসেন শাহকে পরাজিত করেছিলেন। উড়িষ্যার সীমানা তখন সরস্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সমগ্র মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার একাংশ উড়িষ্যার অধিকারে ছিল। জগন্নাথ মন্দিরের মাদলাপঞ্জী অনুযায়ী ১৫০৮-১৫০৯ সালে হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী আরামবাগ জেলার মান্দারণ ঘাঁটি থেকে উড়িষ্যা অভিযান শুরু করেন। তিনি কটক জাজপুর ও অন্যান্য স্থান ও মন্দির লুণ্ঠন করে পুরী পৌঁছে যান। এই সাফল্যকে স্মরণ করে এই সময় গৌড়ীয় মুদ্রায় জাজনগর উড়িষ্যার নাম লেখা হয়। প্রতাপরুদ্রদেব ইসমাইল গাজীর এই অভিযানের খবর পেয়ে দক্ষিণ ভারত অভিযান স্থগিত রেখে দ্রুত সসৈন্যে ফিরে এসে বাংলার সৈন্যবাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে যান এবং তাদের মান্দারণ ঘাঁটি অবরোধ করেন। অবশ্য এই অবরোধ সফল হয়নি। দুপক্ষের কেউ সফল হতে পারেননি। চৈতন্যদেবের জীবনী লেখকেরা জানিয়েছেন যে, বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত-বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

হুসেন শাহ এবং ত্রিপুরার রাজার মধ্যেও অনেকদিন ধরে যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল। বাংলার সুলতানদের সঙ্গে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ত্রিপুরার সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ ত্রিপুরার কিছু অংশ দখল করেছিলেন। সুলতান হুসেন শাহ ত্রিপুরা দখল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লিখিত ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত রাজমালাতে বলা হয়েছে যে, হুসেন শাহ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে পর পর চারটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে হুসেন শাহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পেরেছিলেন বলে জানানো হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় অভিযান চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় অভিযানে হুসেন শাহের বাহিনী প্রাথমিক সাফল্য পেয়ে ত্রিপুরার রাজধানী রঙ্গমতীর দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছিল। কিন্তু ত্রিপুরার সেনাপতি সুকৌশলে বাংলার সৈন্যবাহিনীর গতিরোধ করে তাদের বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন। গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখার ফলে যে চড়া পড়ে, সেই চড়া অতিক্রম করে হুসেন শাহী সৈন্যবাহিনী যখন এসেছিল তখন ত্রিপুরীরা বাঁধ কেটে নদীর জল ছেড়ে দেয়, ফলে সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ জলের তোড়ে ভেসে যায়। চতুর্থ অভিযানে কালিয়াগড় দুর্গের কাছে উভয়পক্ষে তীব্র যুদ্ধ হয় কিন্তু এই যুদ্ধে জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকে। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বলা যায় হুসেন শাহ ত্রিপুরাকে পদানত করতে পারেননি। সোনারগাঁও-এর লিপির ওপর ভরসা করে কেউ কেউ বলেছেন যে, সুলতান ত্রিপুরার একাংশ দখল করতে পেরেছিলেন। এই বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

হুসেন শাহ আরাকানের বিরুদ্ধে সাময়িক অভিযান প্রেরণ করেন। গৌড়-ত্রিপুরার সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে আরাকান অধিপতি চট্টগ্রাম দখল করে নিয়েছিলেন। আরাকান অধিপতি নিজের স্বার্থে গৌড়ের বিরুদ্ধে ত্রিপুরারাজ ধনমানিক্যকে সাহায্য করেছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরগল খাঁ এবং পরে তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ মগেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন। ফলে চট্টগ্রাম হুসেন শাহের করতলগত হয়। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী ডি. বরোজ জানিয়েছেন যে, চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানের অধিকারে ছিল ও আরাকানের রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

হুসেন শাহের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে তিনি বাংলাকে রক্ষা করেন। দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তাতে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয়। দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশের সীমানাও চতুর্দিকে বাড়াতে পেরেছিলেন। সারাজীবন তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন তাঁর রাজত্বকালের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত যশোরাজ খানের মতো সাহিত্যিক এই সময়ের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরগল খান

পরমেশ্বরকে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করতে বলেছিলেন। তাঁর পুত্র ছুটি খানের উৎসাহে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেছিলেন। সুলতান ও তাঁর আমলাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের মতো হুসেন শাহ যোগ্য হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন। রূপ সাকর মালিকের পদে আসীন ছিলেন। তাঁর ভ্রাতা সনাতন ছিলেন সুলতানের দবিরখাস। গোপীনাথ বসু ও মুকুন্দদাস ছিলেন যথাক্রমে সুলতানের মন্ত্রী ও চিকিৎসক। দেহরক্ষী ছিলেন কেশবচন্দ্র ছত্রী এবং টাঁকশালের প্রধান ছিলেন অনুপ। সুলতান চৈতন্যদেবকে যেমন শ্রদ্ধা দেখাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনি মুসলমান শেখ ও সুফীরাও সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। লোকপ্রিয় এই সুলতানকে সঙ্গত কারণেই লোকেরা 'নৃপতিকুল তিলক' ও 'জগৎভূষণ' নামে অভিহিত করেছিল। রমেশচন্দ্র মুজমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) গ্রন্থে সুখময় মুখোপাধ্যায় হুসেন শাহের কৃতিত্ব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হুসেন শাহের ধর্মীয় উদারতা এবং সাহিত্যপ্রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তাঁর নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বকে খাটো করে দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের গ্রন্থ, 'দুশ বছরের স্বাধীন বাংলার ইতিহাস'-এ একইভাবে হুসেন শাহের সমালোচনা করেছেন। তবে তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে যে তথ্য ও যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলি মোটেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সবদিক বিবেচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহের রাজত্বকাল নানাদিক দিয়ে স্মরণীয় এবং গৌরবোজ্জ্বল।

২০.৫.৩ হুসেন শাহী বংশ : নসরৎ শাহ

হুসেন শাহ মারা যাবার পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২) বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার মতই দক্ষ প্রশাসক ও সমরবিদ্ ছিলেন। বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বিস্তার নীতি তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। নসরৎ শাহের সময় উত্তর ভারতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হচ্ছিল। মুঘল বাবরের ভারত আক্রমণ এবং ইব্রাহিম লোদীর প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে যে রাজনৈতিক ঘূর্ণচক্রের সৃষ্টি হয়েছিল—তার মধ্যে নসরৎ শাহকেও পড়তে হয়েছিল। তিনি অবশ্য দক্ষতার সঙ্গে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন। মুঘল আক্রমণের পূর্বেই পূর্ব ভারতের আফগানদের সঙ্গে দিল্লির সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর সংঘর্ষ চলছিল। এই বিবাদের সুযোগ নিয়ে তিনি ত্রিহুত দখল করেন। প্রথম পাণিপথের যুদ্ধের পর বাবর দিল্লি ও আগ্রা দখল করে আফগানদের দোয়াব অঞ্চল থেকেও বিতাড়িত করেন। নসরৎ শাহের পক্ষে বাবর ও আফগান এই দুই শক্তির হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। কূটনীতির সাহায্যে তিনি বাবর ও আফগান শক্তিকে কিছু সময় দূরে রাখতে পারলেও বাবরের সঙ্গে ঘর্ঘরার যুদ্ধে সম্মিলিত আফগান ও বাংলার বাহিনী পরাজিত হয়। নসরৎ শাহ অত্যন্ত দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে বাবরের সঙ্গে সন্ধি করলেন। বাংলা রক্ষা পায়। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন বাংলা আক্রমণের তোড়জোড় করলে নসরৎ শাহ মুঘলদের পরম শত্রু গুজরাটের বাহাদুর শাহের কাছে দূত পাঠিয়ে মৈত্রী-বন্ধনের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক। তবে মৈত্রী-বন্ধনের পূর্বেই নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ত্রিপুরা এবং আসামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

নসরৎ শাহ তাঁর পিতার অনুসৃত উদার নীতি প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। সরকারি কাজে ও সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু-মাসলমান নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ দিয়েছিলেন। সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। উচ্চপদস্থ কর্মী কবিরঞ্জনের লেখায় সুলতান নসরৎ শাহের সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালে ১৫২৬ সালে গৌড়ে বিখ্যাত বড় সোনা মসজিদ তৈরি হয়। গৌড়ের সমস্ত মসজিদের চেয়ে এই মসজিদ আয়তনে বড় ছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলার যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও শহর এবং গঞ্জে নির্মিত মসজিদ ও সৌধের স্থাপত্যে। এই প্রসঙ্গে ১৫২৯ সালে সাতগাঁওতে, ১৫২৩ সালে সোনারগাঁওতে এবং ১৫২৪ সালে অজয় নদীর তীরবর্তী মঙ্গলকোটে নির্মিত মসজিদের নাম করা যায়।

২০.৫.৪ হুসেন শাহী বংশের অবক্ষয়

নসরৎ শাহের মৃত্যুকালে হুসেন শাহী বংশের দ্রুত অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। গিয়াসউদ্দিন মাসুদ শাহের আমলে এই বংশের পতন ঘটে। নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফিরোজ শাহ বাংলার এক জমিদার গোষ্ঠীর সমর্থনে সিংহাসনে আরোহণ করলে পিতৃব্য মাসুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮) তা মেনে নিতে পারেননি। তিনি ফিরোজকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। হুসেন শাহ গুণসরৎ শাহ অভিজাতদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু রাজপরিবারে ক্ষমতার লড়াইয়ে তারা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সীমান্তের শাসনকর্তারা স্বাধীন আচরণ শুরু করেন। উত্তর-পশ্চিমে হাজীপুরের শাসনকর্তা মকদুম আলম বিরোধী হয়ে শের খাঁ শূরের দলে যোগ দেন। বিহারে শের খাঁর নেতৃত্বে বাংলার পক্ষে বিপজ্জনক এক শক্তিজোটের উদ্ভব হয়। শের খাঁ প্রথমবার বাংলা আক্রমণ করলে ভীতসন্ত্রস্ত মাসুদ শাহ প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে শের খাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। কিন্তু শের খান দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করলে মাসুদ শাহ পালিয়ে গিয়ে সম্রাট হুমায়ুনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শের খাঁ মাসুদ শাহের দুই পুত্রকে হত্যা করে বাংলা দখল করেন। এই ঘটনার পর মাসুদ শাহ দেহত্যাগ করেন। বাংলায় হুসেন শাহী বংশের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

২০.৫.৫ বঙ্গ জীবনে হুসেন শাহী বংশের অবদান

বঙ্গজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হুসেন শাহী বংশের শাসনকাল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে। রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ ইত্যাদি বিভাগের কথা লোকে একেবারে ভুলে না গেলেও বাংলাদেশ বলতে এই সময় চট্টগ্রাম থেকে মান্দারণ, বঙ্গোপসাগর থেকে আসামের পার্বত্য এলাকার সীমা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকেই বোঝানো হ'ত। আফগান ও মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সুলতানদের সংগ্রামের সঙ্গে বাঙালির সংহতির বোধও জড়িয়েছিল। আপামর বাঙালি হুসেন শাহ তার উত্তরাধিকারীর সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের আমলে বাংলায় যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, যথাযথ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে তাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রশাসনিক কাঠামোতে হিন্দুরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ায়, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারলাভ করে, দেশ প্রভূত সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ বাংলা ও বাঙালির জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাকে অনেকেই ইউরোপীয় রেনেশাঁসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঐতিহাসিক তরফদার সাহিত্যের ক্ষেত্রে রেনেশাঁসের কথা বলেছেন।

হুসেন শাহীরা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই নীতি গ্রহণ অপরিহার্য ছিল। বাংলা ছিল শত্রু পরিবেষ্টিত। দিল্লিতে লোদী বংশের পতনের পর মুঘলদের আবির্ভাব বাংলার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর হুসেন শাহীদের নির্ভর করতে হয়। হুসেন শাহীদের মনে কোন বহির্ভারতীয় প্রেম বা আনুগত্য ছিল না। তাঁরা বাংলাকে ভালবেসেছিলেন, বাংলার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছিলেন এবং বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উদার রাষ্ট্রীয় নীতির ফলে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার সম্ভব হয়েছিল। এ যুগেই হিন্দু ও মুসলিম মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে এবং দুই সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টায় বাঙালি সংস্কৃতি বিশিষ্টতা লাভ করে।

উত্তর ভারতের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে বাংলা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করার সুযোগ পেয়েছিল। ঐতিহাসিক আবদুল করিম বলেছেন যে, হুসেন শাহী যুগের শাসকরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জনসংযোগের এই মাধ্যমকে জনপ্রিয়তার অন্যতম বাহন বলে মনে করতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ,

লৌকিক দেবদেবীর কাহিনী ও স্থানীয় সাহিত্যের বিকাশে সুলতানি ও তাদের হিন্দু-মাসলমান প্রশাসকদের সক্রিয়া সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। এই যুগে ফার্সী ও আরবি ভাষাও অবহেলিত হয়নি। সকল ধর্মের প্রতি উদারতা ও সমন্বয় নীতি ও যুগের সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ সহজ করেছিল। মনসামঙ্গালের লেখক বিজয়গুপ্ত হুসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক' বলে অভিহিত করেছেন। কবি যশোরাজ, দ্বিজ বিপ্রদাস প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকেরা হুসেন শাহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সাহিত্যচর্চার বাতাবরণে সংস্কৃত সাহিত্যও গুরুত্ব পেয়েছিল। সংস্কৃতি সাহিত্যের এই সময়ে মূলত চৈতন্যজীবনী ও রাধাকৃষ্ম লীলা কাহিনী কেন্দ্রিক ছিল। এই প্রসঙ্গো মুরারী গুপ্তের চৈতন্যচরিতামৃত এবং রূপ গোস্বামীর রাধাকৃষ্ম লীলা নিয়ে দানকেলী কৌমুদী, ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকগুলির নাম করা যায়। এই যুগে নব্যন্যায় চর্চা, রঘুনন্দনের ধর্মবিষয়ক আলোচনা, রঘুনাথ শিরোমণির তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে ব্যাপক আলোড়ন হয়। কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতেরা প্রাচীন ধর্মীয় প্রথা ও নিয়মগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন যাতে ভক্তি আন্দোলন ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাঠামোটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও হুসেন শাহী বংশের অবদান কম নয়। ইলিয়াস শাহী আমলে বাংলাদেশে শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যে বাঙালি বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিল, সেই ধারা হুসেন শাহী আমলে অব্যাহত থাকে। তবে এই সময় প্রচলিত শিল্পধারার মধ্যে অলঙ্করণের প্রবর্তন করা হয়েছিল। হুসেন শাহী বংশের শিল্প-স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ. কদমরসুল, দাখিল দরওয়াজা, একলাখি সমাধি মন্দির প্রভৃতির নাম করা যায়। হুসেন শাহী আমলে যে সব স্থাপত্যশিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে তাদের গঠন-বৈচিত্র্যে নতুনত্বের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না, তবে অলঙ্করণের মধ্যে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। হুসেন শাহী আমলে ইঁট ও পাথর দিয়ে তৈরি—ছোট সোনা মসজিদ ও বড় সোনা মসজিদ স্থাপত্যশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এই আমলে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার

প্রান্তলিপি

বাংলার স্বাধীন সুলতানি বংশ

(ক) ইলিয়াস শাহী বংশ-লতিকা (প্রথম পর্যায়)	***(খ) রাজা গণেশের বংশ-লতিকা***
(১) শামসুদ্দিন ইলিয়াস (১৩৩৯-৫৯)	*(১) রাজা গণেশ (আঃ ১৪১৫)*
(২) সিকান্দার (১৩৫৯-৮৯)	*(২) জালালউদ্দিন মহম্মদ (১৪১৫-৩১)*
(৩) গিয়াসুদ্দিন আজম (আঃ ১৩৮৯-১৪১০)	*(৩) শামসুদ্দিন আহমদ (১৪৩১-৩৫)*
(৪) সৈয়ফুদ্দিন হামজা (১৪১০-১২)	
(৫) শিহাবুদ্দিন বৈয়াজিদ্ (১৪১৩-১৪)	
(৬) আলাউদ্দিন ফিরোজ (১৪১৪-১৫)	
(গ) ইলিয়াস শাহী বংশ (দ্বিতীয় পর্যায়)	***(ঘ) আবিসিনীয় শাসন***
(১) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১৪৩৭-৫৯)	*(১) সৈফ্উদ্দিন ফিরোজ (১৪৮৭-৯০)*
(২) রুকনুদ্দিন বরবক (১৪৫৯-৭৪)	*(২) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১৪৯০-১৪৯১)*
(৩) শামস্উদ্দিন ইউসুফ (১৪৭৪-৮১)	*(৩) শামসুদ্দিন মুজফ্ফর (১৪৯১-৯৩)*
(৪) জালালউদ্দিন ফতেহ্ (১৪৮১-৮৭)	
(ঙ) হুসেন শাহী বংশ-লতিকা	
(১) আলাউদ্দিন হুসেন (১৪৯৩-১৫১৯)	*(৪) গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ (১৫৩৩-৩৮)*
(২) নসরৎ (১৫১৯-৩২)	
(৩) আলাউদ্দিন ফিরোজ (১৫৩২-৩১)	

বাইরেও মসজিদ ও অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। পার্সী ব্রাউন হুসেন শাহী বংশের শিল্প-স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি বিচার করে বলেছেন যে, এদের শিল্পকলাকে খুব উচ্চশ্রেণীর না বলা গেলেও এর গঠনাকৃতিতে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের এক নতুন ধারা দেখা যায়। বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা স্থাপত্যালঙ্কারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। চালারীতির সহজবোধ্য সরল রূপের রমনীয়তা বাংলার মসজিদের অন্যতম চরিত্র-লক্ষণ।

সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে হুসেন শাহী বংশের গৌরবজনক ভূমিকা সম্ভব হয়েছিল সেই সময় বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য। বাংলার সমৃদ্ধির কারণ বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি ও আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার। বহুলোক কারিগর ও শিল্পী হিসাবে শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। বাঙালি শিল্পীর দক্ষতা দেশে-বিদেশে পরিচিত ছিল। বাংলার মসলিন পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। দেশের প্রচুর রেশমবস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। বাংলায় আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল লবণ ও দামী হীরা-জহরৎ এবং রপ্তানির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল চাল, গম, তুলা, বস্ত্র, চিনি এবং রেশমবস্ত্র। বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের ফলে প্রচুর সোনার আমদানি হয়েছিল বাংলায়। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণে এবং এই সময়ের প্রবাদ ও প্রচলিত কাহিনীতে বাংলার সওদাগরদের বিদেশযাত্রার কথা বলা হয়েছে। এই সময় পর্তুগীজ বণিকেরা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহের আমলে পর্তুগীজরা খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। তাদের আচার-আচরণ, দুর্ব্যবহার এবং জলদস্যুতার জন্য সুলতানেরা এদের কড়া শাসনে রেখেছিলেন। পর্তুগীজরা এই বংশের রাজত্বের শেষদিকে চট্টগ্রাম, সাতগাঁও অঞ্চলে কুঠি নির্মাণ ও শুল্ক আদায়ের অধিকার পেয়েছিল। পর্তুগীজ বারোসের মতে, গৌড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিপণ্যের প্রাচুর্যও বিদেশি ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চীনা পর্যটকেরা পোষাকে ও অলঙ্কারে বাঙালিদের জাঁকজমক দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে কবিকঙ্কন চণ্ডী ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় সাহিত্য-পাঠে জানা যায় যে প্রাচুর্যের পাশাপাশি ছিল দারিদ্র্য ও অনটন। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনায় সাধারণ মানুষের দিনযাপনের কষ্টের প্রতিফলন দেখা যায়। সবদিক থেকে বিচার করলে হুসেন শাহী বংশের রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

২০.৬ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের অবনতি ও ভাঙ্গনের সুযোগ নিয়ে দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। প্রায় একই সময়ে দক্ষিণ ভারতে বাহমনী রাজ্যেরও জন্ম হয়। এই দু'টি রাজ্যই দু'শ বছরের অধিক কাল ধরে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে। উত্তর ভারতে যখন রাজনৈতিক অনৈক্যের ছবি স্পষ্ট তখন দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘকাল ব্যাপী শক্তিশালী বিজয়নগরের অস্তিত্ব ছিল। স্থায়ী শান্তিরক্ষা, অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য ও সর্বোপরি দেশজুড়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা ইত্যাদি কারণে বিজয়নগর সাম্রাজ্য মধ্যযুগের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে প্রতিবেশি বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামে বিজয়নগরে ও বাহমনী উভয় রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে। বাহমনী রাজ্য ভেঙ্গে যে পাঁচটি স্বাধীন সুলতানির সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলির সঙ্গে তালিকোটা পানিহাট্টির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত হতে পারেননি। ঐতিহাসিক সিওয়েল (Sewell) বিভিন্ন প্রচলিত মতের উল্লেখ করে সঙ্গমের পাঁচ পুত্রের বিশেষ করে হরিহর ও বুক্কার প্রয়াসের ফলে বিজয়নগর

স্থাপিত হয়েছিল বলে অভিমত দিয়েছেন। দেবগিরির যাদববংশীয় সঙ্গামের পুত্র হরিহর ও বুক্কাকেই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয়। বিজয়নগর শহরটি তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে স্থাপিত হয়। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে হরিহর ও বুক্কা ছিলেন বরঙ্গালের কাকতীয়-বংশীয় শাসকদের অধীনে সামন্ত. পরে তাঁরা বর্তমান কর্ণাটকের অন্তর্গত কাম্পিলি রাজ্যের মন্ত্রীপদে বৃত হয়েছিলেন। এক মুসলমান বিদ্রোহীকে আশ্রয় দেবার অপরাধে মহম্মদ-বিন-তুঘলক যখন কাম্পিলি রাজ্য দখল করেন তখন এই দুই ভাই বন্দী হ'ন। হরিহর ও বুক্কাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়। এই সময় মাদুরাই-এর মুসলিম শাসক নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং মহীশূরের হোয়সাল এবং বরঙ্গালের কাকতীয় শাসকেরাও নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এদিকে হরিহর ও বুক্কা গুরু বিদ্যারণ্যের অনুরোধে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন করেন। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে হরিহরের রাজ্যাভিষেক হয়।

দিল্লিতে তুঘলক শাসনের অবসানে দক্ষিণ ভারতে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুরনো রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূরের হোয়সাল-বংশের শাসন বজায় থাকে কিন্তু বেশ কিছু নতুন স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে মাদুরাই-এর সুলতানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বরঙ্গালের ভালেমা এবং তেলেঙ্গানায় রেড্ডীদের শাসন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। বিজয়নগরের উত্তরদিকে শক্তিশালী বাহমনী রাজ্যের উত্থান হয়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকে। যে যার সুবিধেমত একে অন্যের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। মাদুরাইয়ের সুলতানের সঙ্গে হোয়সাল শাসক তৃতীয় বল্লালের যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে হোয়সালরাজের পরাজয় ও মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হরিহর এবং তার ভাইয়েরা আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে এবং সমগ্র হোয়সাল রাজ্য বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইবার মাদুরাইয়ের সুলতানেরা প্রায় চারদশক ধরে বিজয়নগরের সঙ্গে লড়াই চালায়। ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মাদুরাই বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণে তামিল ও চের (কেরালা) সহ রামেশ্বরম্ পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। রাজ্যের উত্তরে অবশ্য বিজয়নগরকে এক শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়। এই শত্রু হল মুসলিম শাসিত বাহমনী রাজ্য। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হাসান নামে এক আফগান বীর বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে লড়াই চলে তার পেছনে যেমন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল তেমন দক্ষিণ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঞ্চল দখলে রাখার অর্থনৈতিক কারণও ছিল। তুঙ্গাভদ্রা-দোয়াব, কৃষ্মা-গোদাবরীর বদ্বীপ অঞ্চল এবং মারাঠাওয়াড়া দেশ—এই তিনটি পৃথক ও সুস্পষ্ট অঞ্চলে স্বার্থ নিয়ে বিজয়নগর শাসক ও বাহমনী সুলতানের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তুঙ্গাভদ্রা দোয়াব ছিল কৃষ্মা ও তুঙ্গাভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। অর্থনৈতিক সম্পদ নিয়ে এই অঞ্চলে পূর্বে পশ্চিম চালুক্য এবং চোলদের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে যাদব ও হোয়সালদের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়েছে। কৃষ্মা-গোদাবরী অববাহিকা অত্যন্ত উর্বর এবং অনেকগুলি বন্দর থাকায় এই অঞ্চলের বহির্বাণিজ্যের ওপরও এর কর্তৃত্ব ছিল। বেশিরভাগ সময় তুঙ্গাভদ্রা-দোয়াবের সংগ্রামের সঙ্গে কৃষ্মা-গোদাবরী অববাহিকায় প্রভুত্বের জন্য সংগ্রাম যুক্ত হয়ে পড়ত। মারাঠাওয়াড়া বা মারাঠা দেশে বিরোধের প্রধান কারণ ছিল কোঙ্কন (পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অংশ) ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে। গোয়া বন্দরটি ছিল এই অঞ্চলে। এই অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করার এবং ইরান ও ইরাক থেকে ঘোড়া আমদানি করার প্রধান কেন্দ্র ছিল গোয়া।

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত দু'টি রাজ্যে সামরিক সংঘর্ষ চলেছিল। এই সংঘর্ষের ফলে যুদ্ধক্ষেত্র সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত, বহুলোক প্রাণ হারাত এবং প্রভূত সম্পদ নষ্ট হত। উভয়পক্ষই চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা দেখাত। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে বন্দী করে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করত। এই নিষ্ঠুরতার প্রমাণ মেলে প্রথম

বুক্কার তুঙ্গভদ্রা-দোয়াবে মুদকল দুর্গ আক্রমণের সময়। একজন ছাড়া সমস্ত দুর্গবাসীকে হত্যা করা হয়। এই সংবাদ পেয়ে বাহমনী সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ বিজয়নগর আক্রমণ করে প্রায় একলক্ষ হিন্দুকে হত্যা করেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার বিবরণী অনুসারে প্রথম বুক্কাকে পরাজিত করে বাহমনী সুলতান বিজয়নগরে প্রবেশ করেছিলেন। উন্নততর গোলন্দাজ বাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনীর জন্যেই বাহমনী সুলতান জয়লাভ করেছিলেন। কয়েকমাস ধরে যুদ্ধ চললেও বিজয়নগরের রাজা বা তার রাজধানী সুলতান দখল করতে পারেননি। শেষে উভয়পক্ষ ক্লান্ত হয়ে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে প্রত্যেক রাজ্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং দোয়াব অঞ্চল দুপক্ষের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। সন্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল কোন পক্ষ যুদ্ধে অসহায় নিরস্ত্র অধিবাসীকে হত্যা করবে না। মাঝে মধ্যে এই শর্ত লঙ্ঘিত হলেও এর মানবিক দিক যে সন্ধিতে গুরুত্ব পেয়েছিল সে কথা ভুললে চলবে না।

২০.৭ সঙ্গম বংশ

প্রথম বুক্কার পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৭-১৪০৬) বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য মাদুরাইয়ের সুলতানি ধ্বংস করে পূর্ব উপকূলের দিকে রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হিন্দু রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে অবশ্যই খ্যাতমান ছিলেন রেড্ডিরা এবং বরঙ্গামের শাসকেরা। উত্তরে উড়িষ্যার শাসকদের এবং পূর্বে বাহমনী সুলতানদের এই অঞ্চলের উপর নজর ছিল। বরঙ্গালের রাজা দিল্লির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসানকে সাহায্য করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর বংশধরেরা বরঙ্গালের কাছ থেকে কৌলুস ও গোলকোণ্ডার দুর্গ ছিনিয়ে নিয়েছিল। তবে বরঙ্গালের সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মিত্রতা পঞ্চাশ বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল। এর ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্য তুঙ্গাভদ্রা-দোয়াব অঞ্চলে সুদৃঢ় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি বা এই অঞ্চলে বাহমনীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। বাহমনী-বরঙ্গাল জোট সত্ত্বেও দ্বিতীয় হরিহর সাম্রাজ্যে নিজ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। তিনি বাহমনীদের কাছ থেকে পশ্চিমে বেলগাঁও ও গোয়া অধিকার করেন এবং উত্তর শ্রীলঙ্কায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন।

২০.৭.১ প্রথম দেবরায়

১৪০৬ সালে দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যু হলে কিছুকাল বিশৃঙ্খলার পর তাঁর পুত্র প্রথম দেবরায় (১৪০৬-১৪২২) সিংহাসনে বসেন। রাজত্ব শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুঙ্গাভদ্রা-দোয়াবের অধিকার নিয়ে বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। বাহমনী সুলতান ফিরোজ শাহ যুদ্ধে দেবরায়কে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন। দেবরায়কে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হয় দশলক্ষ মুদ্রা, মুক্তা ও হস্তী। তিনি সুলতানের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হন এবং ভবিষ্যতে বিরোধ যাতে আর না হয় সেইজন্য দোয়াব অঞ্চলের বাঁকাপুর বিবাহের যৌতুক হিসাবে সুলতানকে প্রদান করেন। তিনদিন ধরে বিপুল জাঁকজমকের সঙ্গে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এত করেও এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকার প্রশ্নে বিজয়নগর বাহমনী ও উড়িষ্যার মধ্যে নতুন করে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই সময় রেড্ডি রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রেড্ডি রাজ্যটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া যাবে—এই প্রস্তাব দিয়ে দেবরায় বরঙ্গালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। বাহমনী জোট থেকে বরঙ্গাল বেরিয়ে আসায় দাক্ষিণাত্যে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন হল। বিজয়নগরের দিকে পাল্লা ভারি হল। দেবরায় ফিরোজ শাহকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত অঞ্চল নিজ রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

২০.৭.২ দ্বিতীয় দেবরায়

কিছুদিন বিশৃঙ্খলার পর দ্বিতীয় দেবরায় (১৪২২-১৪৪৬) সিংহাসনে বসেন। সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্যে তিনি সেনাবাহিনীতে অধিক সংখ্যক মুসলমান নিয়োগ করেন। ফিরিস্তা জানিয়েছেন যে, দ্বিতীয় দেবরায় বুঝেছিলেন যে বলিষ্ঠ ঘোড়া ও দক্ষ তীরন্দাজ থাকার জন্যেই বাহমনী সৈন্যবাহিনী এত শক্তিশালী হয়েছে। তাই তিনি সৈন্যবাহিনীতে মুসলমান নিয়োগ করে তাদের কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যা শেখার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনীর সংস্কার সাধন করলেও বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। নতুন সেনাবাহিনী নিয়ে দ্বিতীয় দেবরায় তুঙ্গভদ্রা নদী পার হয়ে মুদকল, বাঁকাপুর প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এই অঞ্চলগুলি ছিল কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে এবং বাহমনীদের অধীনে। দুই রাজ্যের মধ্যে তিনটি তুমুল যুদ্ধ হয়। কারো পক্ষেই চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সম্মত হয়। দ্বিতীয় দেবরায় শ্রীলঙ্কা অভিযান করেছিলেন। ১৪২০ ও ১৪৪৩ সালে যথাক্রমে ইতালীয় পরিব্রাজক নিকোলো কন্তি এবং পারস্যের রাজদূত আব্দুর রজ্জাক বিজয়নগর পরিদর্শন করেছিলেন এবং তাঁরা উভয়েই এই রাজ্যের সমৃদ্ধির বর্ণনা করেছেন। ১৪৪৬ সালে দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর বিজয়নগর রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সিংহাসনের দাবি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগীদের মধ্যে পরপর কয়েকটি গৃহযুদ্ধ ঘটে। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বিজয়নগরের সামন্ত রাজারা স্বাধীন হয়ে যায়। রাজ্যের মন্ত্রীরা প্রকৃত অর্থে দেশের কর্ণধার হয়ে ওঠেন। রাজারা বিলাসব্যসনে ডুবে থাকতেন। বিজয়নগর রাজ্যের কর্তৃত্ব কর্ণাটক ও পশ্চিম-অন্ধ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে বিজয়নগর রাজ্যের সিংহাসন রাজমন্ত্রী নরসিংহ শালুভ অধিকার করেন। এইভাবে বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গম রাজবংশের অবসান ঘটে।

২০.৭.৩ শালুভ বংশ (১৪৮৬-১৫০৩)

শালুভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহ শালুভ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বাহমনী সুলতান ও উড়িষ্যার অধিপতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়নগরে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বিজয়নগরে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১৫০৫ সালে শালুভ বংশের শেষ নরপতিকে হত্যা করে বীর নরসিংহ বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শুরু হয় নতুন তুলুব বংশের রাজত্ব।

২০.৮ তুলুব বংশ (১৫০৫-১৫৭০) : কৃষ্ণদেব রায়

কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫৩০) তুলুব বংশের রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে বিজয়নগরের সকল বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি খুব দ্রুত দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বিজয়নগরের নিরাপত্তা বিধান করেন।

তাঁর সময়কালে বাহমনী রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। বাহমনী সুলতানের ক্ষমতা কেবলমাত্র রাজধানী বিদর ও তার উপকণ্ঠে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৫২৬ সালে বাহমনী সাম্রাজ্য একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে এবং পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, যথা—বেরার (ইমাদশাহী বংশ), আহমদনগর (নিজামশাহী বংশ), বিজাপুর (আদিলশাহী বংশ), গোলকুণ্ডা (কুতুবশাহী বংশ) এবং বিদর (বারিদশাহী বংশ)। কৃষ্ণদেব রায়কে বিজয়নগরের চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী বাহমনী রাজ্য থেকে উদ্ভূত রাজ্যগুলির এবং উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। তাঁকে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল। এসময় পর্তুগীজরা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। সমুদ্রের ওপর আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে তারা

সমুদ্র উপকূলের বিজয়নগরের ছোট ছোট সামন্তরাজ্যকে বাগে আনতে চেষ্টা করত। তারা বিজাপুরের কাছ থেকে গোয়া পুনরুদ্ধার ও ঘোড়া সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজয়নগরের রাজাকে এই বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার প্রস্তাব দেয়। অসামান্য দক্ষতায় কৃষ্মদেব রায় প্রতিবেশী রাজ্য ও পর্তুগীজদের মোকাবিলা করেছিলেন।

প্রায় সাত বছর ধরে উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে কৃষ্মদেব রায়কে বেশ কয়েকার যুদ্ধ করতে হয়েছিল। উড়িষ্যার রাজাকে কৃষ্মানদী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল বিজয়নগরকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন। কৃষ্মদেব রায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে তুঙ্গাভদ্রা-দোয়াবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। বাহমনী-উড়িষ্যা-বিজয়নগরের মধ্যে এই অঞ্চল নিয়ে যে সংগ্রাম ইতিপূর্বে চলেছিল—সেই সংগ্রাম আবার নতুন করে দেখা দিল। বিজাপুর ও উড়িষ্যা দুটি প্রধান বিরোধী রাজ্য মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। কৃষ্মদেব রায় এই পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। রাইচুর ও মুদকল দখল করে কৃষ্মদেব রায় প্রথম সংগ্রাম শুরু করেন। যুদ্ধে বিজাপুরের সুলতান পরাজিত হন। কোনরকমে কৃষ্মানদী পার হয়ে বিজাপুরের সুলতান আত্মরক্ষা করেন। বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী বিজাপুর অধিকার করে লুণ্ঠন করে এবং সন্ধি স্থাপিত হবার পূর্বে গুলবর্গা ধ্বংস করে।

কৃষ্মদেবের অধীনে বিজয়নগর দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কৃষ্মদেব রায় পর্তুগীজদের সঙ্গো মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পর্তুগীজরা আরব ও পারসিক বণিকদের সঙ্গো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল। ফলে মধ্যযুগের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় আরব ও পারস্যের যুদ্ধের ঘোড়া বিদেশ থেকে সরবরাহের একচেটিয়া বাণিজ্য পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কৃষ্মদেব রায় এই ঘোড়া পর্তুগীজদের কাছ থেকে কিনে নিতেন। বলা যায় তিনিই একমাত্র ক্রেতা ছিলেন। পর্তুগীজরাও তাঁর কাছ থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অজস্র নগর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে নানারকম সুযোগ-সুবিধে লাভের চেষ্টায় থাকতেন। তিনি পর্তুগীজ শাসকর্তা আলবুকার্ককে ভাটকলে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে পর্তুগীজরা গোয়া দখল করে নিলে তাদের অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু পর্তুগীজরা যখন গোয়ার নিকটবর্তী মূল ভূখণ্ড অধিকার করতে অগ্রসর হয়, তখন তিনি প্রতিবাদ করে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ছোট সৈন্যদল পাঠান। তবে তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গো মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

কৃষ্মদেব রায় যোদ্ধা ও সেনানায়ক হিসাবে প্রতিভার স্বাক্ষর যেমন রেখেছিলেন, তেমনি শাসক হিসাবেও অসামান্য গুণের অধিকারী ছিলেন। পর্যটন পায়েস্ তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন যে, তাঁর মত জ্ঞানী-গুণী নৃপতি তৎকালে বিরল ছিল। তাঁর রাজসভায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাদর ছিল। তাঁর চরিত্রে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ দেখা যায়। সর্বধর্মে সমভাব ও উদারতা, আহত সৈনিকদের পরিচর্যা, পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শন, প্রজাসাধারণের প্রতি দাক্ষিণ্য, বিদেশি পর্যটকদের সমাদর, সুশাসন, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বিনয় ইত্যাদি গুণের জন্য কৃষ্মদেব রায় অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে সারা দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী দেশ বলে পরিগণিত হয়েছে। এই সময় বিজয়নগর গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। তিনি বিজয়নগরের কাছে একটি নতুন শহর নির্মাণ করেন এবং এক বিরাট পুষ্করিণী খনন করেন। জলসেচের কাজে এই পুষ্করিণীকে কাজে লাগানো হত। তাঁর রাজ্যে ধর্মীয় উদারতার যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল সে সম্পর্কে পর্যটক বারকারোসা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন : 'রাজা সকলকে এতখানি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে তাঁর সাম্রাজ্যে যে কেউ আসতে পারত, এখান থেকে যেতে পারত এবং নিজ নিজ ধর্মপালন করে শান্তিতে বাস করতে পারত। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করত না যে সে খ্রিস্টান, ইহুদি বা ধর্মহীন ব্যক্তি কিনা'। বিজয়নগর রাজ্যে ন্যায়বিচার ও সমদর্শিতা প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্মদেবের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

কৃষ্ণদেব রায় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেও একজন সুলেখক ও কবি ছিলেন। সংস্কৃত সহ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার উন্নতির জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। বিশেষ করে তেলুগু সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ সুবিদিত এবং এর ফলে এই সাহিত্যের নবযুগের সূত্রপাত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ না করে তেলুগু ভাষায় স্বাধীন রচনার সূত্রপাত হয়। তিনি 'আমুক্ত মাল্যাড়া' (Amukta-malyada) নামক কাব্যের রচয়িতা ছিলেন। 'অস্টদিগ্‌গজ' নামে খ্যাত আটজন বিখ্যাত তেলুগু কবি তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। কৃষ্ণদেব রায়ের সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা ও অন্যান্য মানবিক গুণাবলীর জন্য তাঁর আমলে বিজয়নগর সাম্রাজ্য গৌরব ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিল।

২০.৮.১ তুলুব বংশের পতন : তালিকোটার যুদ্ধ

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই বাধে। শেষ পর্যন্ত সদাশিব রায় সিংহাসনে বসেন (১৫৪৩ খ্রিঃ) এবং ১৫৬৭ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু রাজ্য শাসনের আসল ক্ষমতা থাকে আরবিড়ু বংশীয় মন্ত্রী রামরায়ের হাতে। রামরায় দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে বিজয়নগরের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। পর্তুগীজদের সঙ্গে তিনি বাণিজ্যিক চুক্তি করেন। ফলে বিজাপুরের সুলতানকে পর্তুগীজরা ঘোড়া সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি বিজাপুর সুলতানকে পরাস্ত করেন। এইবার তিনি গোলকুণ্ডা ও আহমদনগরের বিরুদ্ধে বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। বিজয়নগরের প্রাধান্য বিস্তারে মুসলিম রাজ্যগুলির নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে দেখে নিজেদের বিরোধ মুলতুবী রেখে আহমদনগর, গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর জোটবদ্ধ হয়ে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৫৬৫ খ্রিঃ তালিকোটার কাছে পাণিহাট্টিতে সম্মিলিত বাহিনীর কাছে বিজয়নগর চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়। এই সংঘর্ষ ইতিহাসে তালিকোটার যুদ্ধে নামে পরিচিত। যুদ্ধে রামরায় নিহত হন। বিজয়নগর সম্পূর্ণভাবে লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তালিকোটার যুদ্ধের ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগের অবসান হয়। অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ-ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিনষ্ট হয়। বিজয়নগরের প্রাধান্য ধ্বংসের পর দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের শক্তিক্ষয় করতে থাকে। ফলে মুঘলদের পক্ষে এই অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন সহজ হয়েছিল।

তালিকোটার যুদ্ধের পর বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। আরবিড়ু বংশের শাসকেরা আরো একশ বছর এই রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। কিন্তু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডসমূহ ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে বিজয়নগরের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে না।

২০.৯ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা রীতি অনুযায়ী রাজা স্বৈরাচারী ক্ষমতা ভোগ করতেন। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রশক্তির উৎস। জনকল্যাণের ওপর দৃষ্টি রেখে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালিত হ'ত। রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী ছিল না। বিজয়নগর রাজাদের রাজতন্ত্র সম্পর্কে এক উচ্চ ধারণা ছিল। রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাঁর রাষ্ট্রবিষয়ক গ্রন্থে রাজকর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাজা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং নিজ শক্তি অনুসারে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করবেন। তিনি যা দেখবেন বা শুনবেন তার কোনটিই উপেক্ষা করবেন না। প্রজাদের নিকট থেকে রাজা পরিমিত কর আদায় করবেন—এই উপদেশও তিনি দিয়েছেন।

বিজয়নগর রাজ্যে সম্রাটকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি মন্ত্রীসভা ছিল। রাজ্যের উচ্চ অভিজাতরাই মন্ত্রীসভার সদস্য হতেন। বিজয়নগর রাজ্য কয়েকটি মণ্ডলম্ বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। মণ্ডলম্ আবার কয়েকটি নাড়ু বা জিলা এবং নাড়ু আবার স্থল বা মহকুমা এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল।

বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল, চোলদের মত গ্রাম্য-স্বায়ত্বশাসন ঐতিহ্য বিজয়নগর রাজ্যে প্রচলিত ছিল। গ্রামই ছিল শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে ছোট সংগঠন। এগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল গ্রামসভার ওপর। গ্রাম্য-প্রধানগণ স্থানীয় বিচার ও শান্তিরক্ষার কাজ পরিচালনা করতেন। মহানায়কাচার্য নামে সরকারি কর্মচারী গ্রাম্যসভার কাজের ওপর নজর রাখতেন। কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিনিধি হিসাবে মহানায়কাচার্যরা গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। গ্রামীণ স্বাধীনতা ও কর্মোদ্যোগ হ্রাস পেতে থাকে যখন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা নায়ক পদ বংশগত হয়ে যায়।

প্রতিটি প্রদেশ 'নায়ক' উপাধিকারী শাসনকর্তার হাতে ন্যস্ত থাকত। প্রথনদিকে রাজকুমাররা প্রদেশের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হতেন। পরে সামন্ত ও অভিজাত পরিবারের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করা হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া ছিল। তাঁদের নিজেদের দরবার ছিল, তাঁরা উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতেন এবং তাঁদের সেনাবাহিনীও ছিল। এঁদের কার্যকালের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। সামর্থ ও শক্তির ওপর তাঁদের কার্যকাল নির্ভর করত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা নতুন কর ধার্য করতে পারতেন এবং পুরাতন কর মকুব করতে পারতেন। তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক ও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হত। বিজয়নগর রাজ্যের যে আয় ছিল তার অর্ধেক পেত কেন্দ্রীয় সরকার।

বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা। রাজাকে বিচারকার্যে সাহায্যের জন্যে অন্যান্য বিচারকও নিযুক্ত হতেন। সারা দেশজুড়েই বিচারালয় ছিল। রাজা বিচারকদের নিযুক্ত করতেন। গ্রাম্য-প্রধানরা গ্রাম্য বিচারের দায়িত্বে ছিলেন। গ্রাম্য বিচারের ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিতে স্থানীয় সংস্থার সাহায্যে বিচারকগণ এই নিষ্পত্তি করে দিতেন। দেশের রীতিনীতি, চিরাচরিত প্রথাই ছিল বিজয়নগরের আইন-ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। অপরাধীর কঠোর শাস্তি হত। মৃত্যুদণ্ড চালু ছিল।

বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এই অপ্রতিহত ক্ষমতাই কালক্রমে বিজয়নগরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

২০.১০ বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগর

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বহু বিদেশি পর্যটক এসেছিলেন। তাঁদের বর্ণনায় বিজয়নগরের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্তি ১৪২০ খ্রিঃ বিজয়নগর পরিভ্রমণে আসেন। তিনি বিজয়নগরের সুন্দর বর্ণা দিয়েছেন। 'এই শহরটির পরিধি ছিল ষাট মাইল, এর প্রাচীর ছিল পর্বতগাত্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পর্বতের পাদদেশে উপত্যকাগুলিও প্রাচীরবেষ্টিত।.....এই শহরে নব্বই হাজার লোক ছিল যুদ্ধ করবার উপযুক্ত।....এখানকার রাজা ছিলেন ভারতের অন্য যে কোন রাজা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।' আব্দুর রজ্জাক দ্বিতীয় দেবরায়ের আমলে বিজয়নগর এসেছিলেন। এই শহর সম্বন্ধে আব্দুর রজ্জাক লিখেছেন : 'সারা পৃথিবীতে বিজয়নগরের মত শহর চোখে দেখিনি, কানেও শুনিনি। একটি প্রাচীরের মধ্যে আর একটি প্রাচীর তৈরি করে এরকম সাতটি প্রাচীর দিয়ে নগরটি তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রাচীর দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত। নগরের মধ্যস্থলে রয়েছে সপ্তম দুর্গটি—সপ্তম প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত।....রাজপ্রাসাদের নিকটেই চারটি বাজার—

একটির বিপরীত দিকে আর একটি।....শহরে সবসময় টাটকা ফুল পাওয়া যা, আর এই ফুল ছাড়া নগরের লোকেরা থাকতে পারে না বলে ফুলকে জীবনধারণের উপায় বলে গণ্য করা হয়। প্রত্যেক পৃথক দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের দোকানগুলি পাশাপাশি থাকে। জহুরী খোলা বাজারেই তাদের মণিমুক্তা বিক্রয় করে। রাজপ্রাসাদের মনোরম অঞ্চলে শানবাঁধানো মসৃণ খাল দিয়ে নদীর মত জলস্রোত প্রবাহিত হয়।....রাজার রাজকোষের কক্ষের গর্তগুলিতে সোনা জমাট বেঁধে সোনার পিণ্ডের আকারে থাকে।'

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বিজয়নগরের সঙ্গে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি হতে থাকে। এই সূত্রে বিজয়নগরে পর্তুগীজ বণিকদের আগমন হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে দুইজন পর্তুগীজ পর্যটক ডোমিনগোস্ পায়েস ও ফেরনাও নুনিজ বিজয়নগরে আসেন। পায়েস-এর ভ্রমণ কাহিনীতে আছে চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের বর্ণনা আর নুনিজের বর্ণনায় আছে ঐতিহাসিক ঘটনা।

বিজয়নগর সম্পর্কে পায়েস লিখেছেন, 'রাজপ্রাসাদটি একটি শক্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই ঘেরা জায়গাটির আয়তন লিসবনের সমস্ত দুর্গের আয়তনের চেয়ে বেশি।....এই নগরের লোকসংখ্যা অসংখ।.....শহরটির আয়তন বিশাল।....শহরটি রোমনগরীর মতই বড়, দেখতেও সুন্দর। এই শহরটির মত খাওয়া-পরার ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন শহরে নেই। এখানে চাল, গম ও অন্যান্য শস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।'

বিজয়নগর শহরটির বর্ণনাতে ঐ সমরকার শান্তি ও সমৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। সমগ্র বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেরও সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় পর্যটকদের বর্ণনাগুলি থেকে। অবশ্য পর্যটকদের লেখায় অতিরঞ্জনের প্রবণতা রয়েছে। অন্যান্য তথ্য ও লিপি ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা সম্ভব।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। পর্যটকেরা গ্রামীণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন না, ফলে তাঁদের বিবরণী থেকে স্পষ্ট ছবি পাওয়া শক্ত। তাঁরা গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে একটি সাধারণ চিত্র এঁকেছেন। এই রাজ্যের অধিকাংশ লোকই কৃষিনির্ভর ছিল এবং গ্রামে বাস করত। জমির মালিকানা পাওয়া অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ছিল। অন্তত ছোটখাটো জমির মালিকানা পেতে কৃষকেরা চেষ্টা করত। রাজ্যের বহু জায়গায় কিছুকাল অন্তর-অন্তর চাষযোগ্য জমির পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল। এই সময় ভূমিহীন চাষীদের একাংশ ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। সমাজে প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন চাষীদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের কত অংশ রাজস্ব দিতে হতো জানা যায় না। এক শিলালিপিতে নিম্নরূপ রাজস্বের হার দেওয়া হয়েছে :

শীতকালে কুরুভয়ি (একপ্রকার ধান) উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ তিল, রাগী, ছোলা প্রভৃতির এক-চতুর্থাংশ। জোয়ার ও শুকনো জমিতে উৎপন্ন অন্যান্য শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ, কাজেই শস্যভেদে, মৃত্তিকাভেদে, জলসেচভেদে রাজস্বের হার বিভিন্ন রকমের ছিল।

ভূমিরাজস্ব ব্যতীত প্রজাদের অন্যান্য কর দিতে হ'ত, যেমন—সম্পদ কর, বিক্রয় কর, পেশা কর, সামরিক কর, বিবাহ কর ইত্যাদি। ষোলো শতকের পর্যটক নিকিতিন জানিয়েছেন যে, 'রাজ্যে বহু লোকের বাস ছিল। পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা ছিল শোচনীয় কিন্তু অভিজাতরা ছিলেন অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও বিলাসিতায় তৃপ্ত'। অবশ্য এই ধরনের সাধারণ বিবৃতি মধ্যযুগের যে কোন দেশ সম্বন্ধেই খাটে।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজয়নগর প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের প্রসারের ফলে শিল্পোৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ভ্রাম্যমান বণিক ও বণিকসংঘগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সূতাকাটা ও

বস্ত্রবয়ন প্রধান শিল্পগুলির অন্যতম ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন বন্দর থেকে নানা ধরনের সূক্ষ্ম বস্ত্রের রপ্তানির কথা বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। ধাতুশিল্প ও অলঙ্কার নির্মাণশৈলী চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। লবণ উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ছিল সরকারের এবং এর ফলে সরকারের প্রচুর লাভ হ'ত। বস্ত্রবয়ন, ধাতুশিল্প, খনিজ শিল্পের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদন। বণিক সংঘগুলির ভূমিকার কথা আব্দুর রজ্জাক ও পায়েস্ উভয়েই বলেছেন।

বাণিজ্যের জন্যে বিজয়নগর রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বহু বন্দর ছিল। মালাবার উপকূলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল, কালিকট। আফ্রিকা ও আরব দেশগুলির পক্ষে কালিকট ছিল নিরাপদ পোতাশ্রয়। ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, চীন, আরবদেশ, পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, আবিসিনিয়া ও পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বিজয়নগরের বাণিজ্যেক সম্পর্ক ছিল। কাপড়, চাল, লোহা, সোরা, চিনি, মশলাপাতি রপ্তানি হত। বিজয়নগর বিদেশ থেকে আমদানি করত ঘোড়া, হাতি, মুক্তা, তামা, গালা, পারদ, চীনাসিল্ক প্রভৃতি। বাণিজ্যিক পণ্যের পরিবহণ করা হ'ত জাহাজে। বার্বোসা বলেছেন, মালদ্বীপে জাহাজ নির্মাণ করা হত।

বিজয়নগরে সোনা ও তামার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। অল্পসংখ্যক রৌপ্যমুদ্রার প্রচনলও ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকারী হওয়ায় নানাধরনের মুদ্রা চালু ছিল। বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা চালু থাকায় অসুবিধের সৃষ্টি হ'ত।

বিজয়নগরের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেও বিদেশিদের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণভিত্তিক সামাজিক কাঠামো বিজয়নগরে প্রচলিত ছিল। সঙ্গত কারণেই ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। সমাজে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

মহিলারা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতেন। নুনিজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহিলারা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দপ্তরে চাকরিতে নিযুক্ত হতেন। বাল্যবিবাহ ও পুরুষদের বহুবিবাহ এ যুগে বিজয়নগরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সতীদাহ প্রথাও চালু ছিল। বিজয়নগরে ইউরোপীয় পর্যটকেরা অবাক হয়েছিল রাজাদের অসংখ্য পত্নী দেখে। নিকোলো কান্তি রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের রানীদের সম্পর্কে লিখেছেন—'তাঁর বারো হাজার পত্নী, তাদের মধ্যে চার হাজার তিনি যেখানেই যান তার সঙ্গে হেঁটে যান।' আব্দুর রজ্জাক লিখেছেন—দ্বিতীয় দেবরায়ের অন্তঃপুরে ছিল সাতশ' রানী ও উপপত্নী। আব্দুর রজ্জাক ও পায়েস জানিয়েছেন বিজয়নগরে গণিকাবৃত্তি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। গণিকারা যে কোন সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত এবং সম্মান আদায় করে নিত। মন্দিরগুলিতে দেবদাসী প্রথা চালু থাকার কথাও পর্যটকেরা বলেছেন।

পর্যটকেরা বিজয়নগরের বেশ কয়েকটি উৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে রথযাত্রা উৎসব, নববর্ষ ও মহানবমী উৎসব প্রধান। উৎসবে রাজপরিবার অমাত্য ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করত।

বিজয়নগরের প্রজাসাধারণের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে পর্যটকেরা জানিয়েছেন যে, তারা খালি পায়ে সাধারণত চলাফেরা করত এবং কোমরের উপরিভাগে পরনে তাদের কিছুই থাকত না। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা কখনো দামি জুতো পরত, তাদের মাথায় থাকত সিল্কের পাগড়ী, কিন্তু কোমরের উপরিভাগে তারাও কিছু পরত না। সকল শ্রেণীর লোকেরা অলঙ্কার পরতে ভালবাসত।

বিজয়নগর সাম্রাজ্য শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। রাজারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তেলুগু, তামিল ও কন্নড় ভাষা তাঁদের বদান্যতায় যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে। বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়ন ও তাঁর ভাই মাধব বিদ্যারণ্য বুক্কার রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। কৃষ্ণদেবের আমলে

দক্ষিণ ভারতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়েছিল। তাঁর সভায় অষ্টদিগ্‌গজ নামে আটজন পণ্ডিত উপস্থিত থাকতেন। স্থাপত্যশিল্পেও বিজয়নগর দাক্ষিণাত্যে এক বিশেষ স্থাপত্য-রীতির প্রচলন করেছিল। ড. এস. কে. সরস্বতী বিজয়নগরের প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির সৌন্দর্য বিচার করতে গিয়ে বলেছেন যে, চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যশিল্প উভয়েরই অলংকরণ অত্যন্ত শিল্পরীতি সম্পন্ন ছিল। এ প্রসঙ্গে হাজারা মন্দির ও বিঠলস্বামী মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প উল্লেখযোগ্য। স্থপত্যশিল্পের মত সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পও শিল্পসুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সময়কালে দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃতির এক সমন্বিত রূপ দেখা গিয়েছিল।

২০.১১ অনুশীলনী

(ক)

১। বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের অবদান আলোচনা করুন।

২। বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহী বংশের গুরুত্ব বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৩। বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলে কিভাবে হিন্দুরাজা গণেশ এবং আবিসিনিয় শাসকের আবির্ভাব হয়েছিল? কেন এই দুই বংশের পতন হয়েছিল?

৪। বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের মধ্যে সংগ্রামের পটভূমিকা ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৫। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা পর্যালোচনা করুন।

(খ)

১। ইলিয়াস শাহ বাংলায় রাজনৈতিক ঐক্য কিভাবে এনেছিলেন?

২। ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের বিবরণ দিন।

৩। হুসেন শাহের আমলে সাহিত্যচর্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৪। বাংলায় স্বাধীন সুলতানির অবসান হয়েছিল কিভাবে?

৫। কোন পরিস্থিতিতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

৬। কৃষ্মদেব রায়ের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৭। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বিজয়নগরের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা বর্ণনা কি বিশ্বাসযোগ্য?

(গ)

১। মা হুয়ান কে ছিলেন? কার রাজত্বকালে তিনি বাংলায় এসেছিলেন?

২। যদু কে ছিলেন?

৩। 'একডালা' দুর্গ কি জন্যে বিখ্যাত?

৪। কোন দিল্লির সুলতান বাংলা আক্রমণ করে বিফল হয়েছিল?

৫। চৈতনদেব কার রাজত্বকালে বৈষ্মবধর্ম প্রচার করেন।

৬। রূপ ও সনাতন কে ছিলেন?

৭। বিজয়নগর এসেছিলেন এমন দু'জন পর্তুগীজ পর্যটকের নাম লিখুন।

৮। তালিকোটার যুদ্ধ কেন বিখ্যাত?

২০.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১। J. N. Sarkar (ed.) : *History of Bengal*, Vol. VI.

২। R. C. Majumdar (ed.) : *Delhi Sultanate*.

৩। আব্দুল করিম : *বাংলার ইতিহাস, সুলতানি যুগ।*

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত) : *বাংলার ইতিহাস (মধ্যযুগ)*।

৫। অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : *মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি।*

৬। K. A. Nilkanta Sastri : *A History of South India.*

৭। Habib & Nizami (ed.) : *Comprehensive History of India*, Vol. V, *Delhi Sultanate*, 1970.

৮। Burson Stein : *Vijayanagar, The New Cambridge History of India*, 1997.

৯। ননীগোপাল চৌধুরী : *বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

১০। বৈদ্যনাথ বসু : *মধ্যযুগের ভারত* (অনুবাদ)।

একক ২১ □ সুলতানি শাসনে কৃষি ও বাণিজ্য

গঠন

২১.০ উদ্দেশ্য

২১.১ প্রস্তাবনা

২১.২ সুলতানি শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২১.৩ সুলতানি যুগের কৃষি-ব্যবস্থা

২১.৩.১ কৃষি উপাদান ও উৎপাদন

২১.৩.২ ভূমি রাজস্ব

২১.৩.৩ কৃষি সম্পর্ক

২১.৪ ইকতা প্রথা

২১.৫ শহরের উদ্ভব ও শহর জীবনের বিকাশ

২১.৬ বাণিজ্যের বিস্তার

২১.৬.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

২১.৬.২ বহির্বাণিজ্য

২১.৭ সারাংশ

২১.৮ অনুশীলনী

২১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- তুর্কিদের পূর্বপরিচয় ও দিল্লি থেকে তুর্কি সুলতানদের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
- সুলতানি আমলের আগে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা এবং সুলতানি আমলে ওই ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন হয়।
- ইক্তা প্রথা কাকে বলে এবং এই প্রথার বৈশিষ্ট্য।
- সুলতানি আমলে ভারতে ছোট-বড় শহরের উদ্ভব ও শহর জীবনের নানা দিক।
- সুলতানি যুগে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিস্তার এবং ঐ সময় জলপথে ও স্থলপথে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ।

২১.১ প্রস্তাবনা

আফগানিস্তানের ঘুর প্রদেশের তুর্কি শাসনকর্তা মহম্মদ ঘোরী ১১৯২ খ্রিস্টাব্দের তরাইনের যুদ্ধে দিল্লির চৌহান রাজ পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বে মিলিত রাজপুত রাজাদের পরাজিত করে ভারতে স্থায়ী মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হলে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবক ভারতে মহম্মদ ঘোরীর বিজিত রাজ্যের দায়িত্ব পান। এইভাবে দিল্লির সুলতানি শাসন শুরু হয়। তুর্কি রাজত্বের ইতিহাস পাঠ করার আগে আপনারা তুর্কিদের আদি পরিচয় জেনে নিন।

পাহাড়, পর্বত, নদী, মরুভূমি, মরূদ্যান, পশু-বিচরণ ক্ষেত্র (Steppes) প্রভৃতি নিয়ে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশের দেশ মধ্য এশিয়া বা তুর্কিস্তান। তুর্কিরা প্রথমে ছিল যাযাবর। মধ্য এশিয়ার ওপর দিয়ে প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপ, মেসোপটেমিয়া হয়ে চীন পর্যন্ত পণ্য চলাচলের পথ, রেশম পথ (Silk Road) বিস্তৃত ছিল। এই পথে ভারত থেকেও বাণিজ্য হত। তুর্কিরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য (দুগ্ধজাত খাবার, চামড়া, মধু, ফার ইত্যাদি) বিদেশীদের পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করত। এইভাবে বাণিজ্যের মাধ্যমে এই যাযাবর জাতি সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। তুর্কিরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে খুব ভাল যুদ্ধ করতে পারত। আরব সাম্রাজ্যের সীমানা তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হলে তুর্কিদের সামরিক খ্যাতি পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন আরব এবং পারস্যর সুলতানরা তুর্কিদের দাস হিসাবে কিনে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করে। তুর্কি সৈনিকরা তাদের বিশ্বস্ততার ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বড় বড় রাজপদ লাভ করে। পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন আফগানিস্তানের গজনীর শাসনকর্তা মহম্মদ ছিলেন এমনি এক তুর্কি ক্রীতদাস সবুক্তিগীনের পুত্র। গজনীর মহম্মদ পরে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। গজনীর সুলতান মহম্মদের মৃত্যুর পর ঘুর প্রদেশের শাসন কর্তা মহম্মদ ঘোরী গজনীর কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে ভারতে রাজ্য বিস্তারের পথে বেছে নেন।

তুর্কিরা যখন এদেশে আসে তখন শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেনি, ইসলামিক জগতের আইন-কানুন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যথেষ্টভাবে পরিচিত হয়ে এসেছিল। তারা ভারতের অবস্থা অনুসারে সেইসব প্রথা পরিবর্তন করে প্রচলন করার চেষ্টা করে। সুলতানি আমলের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক, ঐ সময়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বহুগুণ বেড়ে যায়।

২১.২ সুলতানি শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধের পর মরম্মদ ঘোরী তাঁর একান্ত অনুগত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবককে ভারতে বিজিত রাজ্যগুলির শাসনের দায়িত্ব দেন। কুতুবউদ্দিন লাহোর থেকে তাঁর রাজ্য শাসন শুরু করেন। পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে। এইভাবে দিল্লি সুলতানি কথাটার প্রচলন হয়।

কুতুবউদ্দিন নিজে প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে এবং পরবর্তী আরও কয়েকজন বিখ্যাত সুলতান প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে তিনি যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তাকে দাস বংশ বলে। দাস বংশের (১২০৬-১২৯০) পর খলজী (১২৯০-১৩২০), তুঘলক (১৩২০-১৪২২), সৈয়দ (১৪১২-১৪৫১) এবং লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬) মুঘলদের দিল্লি জয় করার আগে পর্যন্ত দিল্লি থেকে রাজত্ব করে। দাস, খলজি, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী এই পাঁচ বংশের শাসনকালকে (১২০৬-১৫২৬) সুলতানি শাসন বলে।

সুলতানি শাসনের গোড়ার দিকে বেশিরভাগ সময় মহম্মদ ঘোরীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই এবং পরাজিত রাজপুত রাজাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও ভারতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে কেটে যায়। ইলতুতমিস (১২১৩-১২৩৬) ও গিয়াসুদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭) সুলতানি রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ় করার চেষ্টা

করেন। আলাউদ্দিন খলজীর (১২৯৬-১৩১৬) রাজত্বকালের আগে পর্যন্ত সুলতানি শাসন উত্তর ভারতে কিছু অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। আলাউদ্দিন নতুন রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে গুজরাট, মালব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হয়। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে উত্তর ভারতের নতুন কিছু এলাকা পূর্বে জাজনগর (উড়িষ্যা) উত্তর-পশ্চিমে পেশোয়ার এবং উত্তরে কুরাচল (কাংড়া উপত্যকা) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মহম্মদ তুঘলকের সময় তুর্কি সাম্রাজ্যের সীমানা চরম সীমায় পৌঁছয়, কিন্তু ঐ রাজত্বকালের শেষ দিক থেকে ভাঙন শুরু হয়। পরবর্তী সুলতান ফিরোজ তুঘলকের পর (১৩৫১-১৩৮৮) সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার মত অবস্থা হয়। সৈয়দ ও লোদীদের সময়ে দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই তুর্কি সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ থাকে। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করলে তুর্কি সুলতানির অবসান হয়, মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

২১.৩ সুলতানি যুগের কৃষি ব্যবস্থা

সুলতানি যুগের কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনারা ধারণা করতে পারবেন যদি ঐ সময়ের কৃষি উৎপাদনের উপকরণ, উৎপন্ন ফসলের বিবরণ, ভূমি-রাজস্ব এবং গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারেন। নীচের এই সমস্ত বিষয়ই পরপর আলোচনা করা হয়েছে।

২১.৩.১ কৃষি উপাদান ও উৎপাদন

ভারতে কৃষি উৎপাদনের উৎস হল জমি ও তার উর্বরা শক্তি, এবং জমি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন বলদ, লাঙ্গল, কাস্তে, কোদাল, বীজ ইত্যাদি। চাষবাস বৃষ্টি নির্ভর ছিল। সেচের ব্যবহার কমই হত। লোকসংখ্যার তুলনায় জমি ছিল অপর্যাপ্ত। জমির মালিকানা প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যেহেতু চাষী নিজেই উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক-এর মালিক সেইহেতু উৎপাদনের কমবেশি নির্ভর করত বৃষ্টিপাতের ওপর। সুলতানি যুগে যে সব ফসল উৎপন্ন হত তার প্রায় সবগুলিই প্রাক্-সুলতানি যুগে হত। বছরে সাধারণত দুবার ফসল হত—শরৎকালে খারিফ এবং বসন্তকালে রবি। সেচের বহুল প্রচলন না হওয়ায় এবং শীতকালে জলের যথেষ্ট যোগান না থাকায় রবি ফসল কমই হত।

আগেই জেনেছেন, লোকসংখ্যার তুলনায় জমি ছিল অপর্যাপ্ত। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় গঙ্গা-যমুনার উর্বর দোয়াব অঞ্চলেরও বহু জায়গা জঙ্গালে ভরে ছিল। কর আদায়কারীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বহুলোক জঙ্গলে পালাত। চাহিদা বৃদ্ধি পেলে চাষ নিবিড় প্রথায় (intensive) না হয়ে আয়তনে বাড়ানো হত (extensive)।

প্রাক্-সুলতানি যুগে সেচের ব্যবহার একেবারে হত না তা নয়। বৃষ্টির জল ধরে রেখে কোথাও কোথাও সেচ হত, কোথাও কোথাও পরপর কলসির কানায় দড়ি বেঁধে কপিকলের সাহায্যে কূপ থেকে জল তুলে সেচ হত। এই প্রথাকে 'অড়ঘট' বলে। কিন্তু এইভাবে জলের সরবরাহ অবিচ্ছিন্ন না হওয়ায় বেশি জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব ছিল না।

আপনারা প্রাক্-সুলতানি যুগের কথা জানলেন, এবার দেখা যাক সুলতানি যুগে কি কি পরিবর্তন হয়।

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে সেচের প্রসার। তুর্কিরা কূপ থেকে জল তোলার এক নতুন প্রযুক্তি পারস্য থেকে এদেশে নিয়ে আসে। নতুন প্রথায় কয়েকটা খাঁজ কাটা চাকা একসঙ্গে চালিয়ে মাটির কলসীর

বদলে ধাতুনির্মিত কলসীর কানা পরপর দড়িতে বেঁধে অবিচ্ছিন্নভাবে জল তোলা যেত। একে বলে সাকিয়া (saquiya) প্রথা। এই প্রথায় আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হল। তাছাড়াও সুলতানি যুগে খাল থেকে জল নিয়ে সেচের প্রসার হয়। চতুর্দশ শতকে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক প্রথম এ কাজে হাত দেন। পরে ফিরোজ তুঘলকের সময় বিশাল বিশাল খাল কাটা হয়। তাঁর সময়ের দুটি বিখ্যাত খালের নাম রজবওয়াহ ও উলুঘখানি। যমুনা নদী থেকে হিসার পর্যন্ত এগুলি বিস্তৃত ছিল। খালের দু পাশে প্রায় দুশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় সেচের সাহায্যে চাষ শুরু হয়। ফিরোজ তুঘলকের কাটানো আর একটা বড় খালের নাম ফিরোজশাহী। শতদ্রু নদী থেকে কাটা হয়েছিল। এছাড়াও ছোট বড় অনেক খালের কথা জানা যায়। মুলতান অঞ্চলে কয়েকটা খাল স্থানীয় লোকেরাই কাটে এবং তারাই রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে।

সুলতানি আমলে নতুন কোন শস্যের চাষ শুরু হয়েছিল বলে জানা যায় না। মুঘল আমলে অবশ্য নতুন ফসল যেমন তামাক, টম্যাটো লঙ্কা প্রভৃতির চাষের প্রচলন হয়। সমসাময়িক বর্ণনা থেকে জানা যায় ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে ভারতে অন্তত পঁচিশ রকমের কৃষিজপণ উৎপন্ন হত। প্রধান কৃষিজ পণ্য ছিল গম, যব, ধান, ডাল, জোয়ার, আখ ও তুলো। সবচেয়ে বেশি চাষ হত যবের। নীলের উল্লেখ নেই, তবে নীল চাষ যে হত তার প্রমাণ আছে। ইবন বতুততা লিখেছেন কৃষকরা এক জমিতে দুবার ফসল ফলাত—খারিফ ও রবি মরসুমে। এটা সাধারণভাবে সত্যি নয়। দুবার চাষ ছোট কোন এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। অবশ্য দুবার চাষের সুযোগ এসেছিল পরের দিকে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে। সেচের সাহায্যে শীতকালে জল সরবরাহ নিশ্চিত হলে আখ, গম, ডাল প্রভৃতির উৎপাদন বাড়ে। তুর্কি শাসনে শহরে অভিজাতদের উচ্চমানের জীবন যাপনের জন্য তথা রপ্তানির জন্য চিনির চাহিদা বাড়ে, ফলে আখ চাষ বৃদ্ধি পায়। তুর্কিরা এদেশে সুতো কাটার জন্য পারসীয়ান চড়কার প্রচলন করে। এর দ্বারা সুতোর উৎপাদন বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বোনার পদ্ধতিরও উন্নতি হওয়ায় তুলোর চাহিদা বাড়ে। ফলে তুলোর চাষ বেড়ে যায়।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি শুরু হয়। প্রাক্ ইসলামি যুগে অন্যান্য ধরনের রেশম যেমন তসর, মুগা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। গুটিপোকা থেকে তৈরি করা রেশম চীন থেকে ঘুরপথে খোটান পারস্য হয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দেশে আসে। চীনা-পরিব্রাজক মা-হুয়ান ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে গুটিপোকার চাষ ও রেশম উৎপাদনের কথা লিখেছেন।

ইবন বতুতার লেখায় পাওয়া যায় ভারতে আমের খুব কদর ছিল এবং উৎপাদনও প্রচুর হত। তবে কলমের পরিবর্তে বীজ থেকেই গাছ তৈরি করা হত। এছাড়া আঙুর, খেজুর প্রভৃতিরও চাষ ছিল। দিল্লির সুলতানরা ফলের উৎকর্ষ বাড়াতে যত্নশীল ছিলেন, ফিরোজ তুঘলক দিল্লির আশেপাশে ১২০০ ফলের বাগান তৈরি করেন। এগুলিতে সাতটি বিভিন্ন রকমের আঙুর ফলানো হত। চাহিদার তুলনায় আঙুর খুব বেশি উৎপন্ন হতে থাকায় আঙুর-এর দাম পড়ে যায়।

সমসাময়িক বিবরণীতে সুলতানি আমলের জিনিষপত্রের দাম সম্পর্কে ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। ঐতিহাসিকদের লেখায় দুর্ভিক্ষ ও অনটনের সময়ের দ্রব্যমূল্যের উদাহরণ যেমন আছে, তেমনি আছে অতি উৎপাদনের মরসুমে জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিকরকম নেমে যাওয়ার বিবরণ। সাধারণভাবে বলা যায় যান-বাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ধরনের ওপর পণ্য নির্ভর করত। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হলে স্বভাবতই দাম খুব নেমে যেত। আমরা আলাউদ্দিন, মহম্মদ তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলকের আমলে পণ্যমূল্যের যে বিবরণ পাই তাতে দেখা যায় আলাউদ্দিনের সময়ে পণ্যমূল্য মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল, মহম্মদ তুঘলকের সময় দাম বেড়ে গিয়েছিল এবং ফিরোজ তুঘলকের সময় দাম কমে এসে মোটামুটি আলাউদ্দিনের সময়ের মূল্যস্তরে পৌঁছেছিল।

অবশেষে বলতে হয়, জমি ও জঙ্গল অনেক থাকার ফলে পশুচারণ ক্ষেত্রের অভাব ছিল না এবং চাষীদের ঘরে প্রচুর সংখ্যায় গবাদি পশু ছিল। প্রচুর পরিমাণ ঘি ও দুগ্ধজাত জিনিস তৈরি হত, এগুলি চাষীদের আয়ের মূল্যবান উৎস ছিল। বলদের সাহায্যে শুধু চাষই হত না, দূর দূর অঞ্চলে বলদের পিঠে করে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া হত।

২১.৩.২ ভূমি রাজস্ব

সুলতানি শাসন শুরু হওয়ার আগে ভারতে কি হারে ভূমি রাজস্ব আদায় করা হত তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। প্রাক্-সুলতানি আমলের ভূমি ব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক বলা যায় কিনা, এ নিয়েও বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে ঐ সময়ে ইউরোপীয় সামন্তশ্রেণীর অনুরূপ এক অভিজাত শ্রেণী ভারতের গ্রামাঞ্চলে বাস করত। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তাদেরকে রাষ্ট্র রাণা বা তাদের সেনাপতিদের রাওয়াত বলে বর্ণনা করেছেন। এরা তুর্কি আক্রমণের বিরোধিতা করে, পরে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে। রাই, রাণা, রাওয়াতরা তাদের প্রজাদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের এক অংশ কর হিসাবে আদায় করত। সুলতানি শাসনের গোড়ার দিকে পুরানো ব্যবস্থা চলতে থাকে। দিল্লির সুলতানরা রাই, রাণা, রাওয়াতদের কাছ থেকে নিয়মিত 'থোক' টাকা আদায় করতেন। যে সব অঞ্চল সুলতানদের পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করেনি (যেমন, গঙ্গা থেকে রোহিলখণ্ড, দোয়াব, অযোধ্যা, বিহার ইত্যাদি) সে সব অঞ্চল থেকে সুলতানি সৈন্যরা লুঠ করে গবাদি পশু ও দাসদাসী নিয়ে আসত।

ইসলামিক জগতে নিয়ম ছিল ভূমি কর হিসাবে 'খারাজ' আদায় করা। খলজিদের আগে পর্যন্ত দিল্লির সুলতানরা এই ধরনের কোন কর আদায় না করে রাই, রানা, রাওয়াতদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। ইলতুতমিস, বলবন এবং পরে আলাউদ্দিনের চেষ্টায় সুলতানি শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন হয়। আপনারা নীচে আলাউদ্দিনের সময় থেকে রাজস্বের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছিল, তা পরপর জানতে পারবেন।

আলাউদ্দিনের রাজস্ব সংস্কার জানার আগে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করে নিন। যে সব জমির খাজনা সরাসরি কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা পড়ত তাকে 'খালিসা' বলা হত। আলাউদ্দিনের সময়ে দিল্লি ও আশেপাশের অঞ্চল ও দোয়াব এলাকা খালিসার অন্তর্ভুক্ত হয়। খালিসা ছাড়া অন্য অঞ্চলের রাজস্ব রাই, রাণা, রাওয়াতদের হাত হয়ে রাজকোষে আসত। উভয় ক্ষেত্রেই কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করত খুত, মুকদ্দম ও চৌধুরী নামের রাজস্ব আদায়কারী। এরা গ্রামেই বাস করত। ওই সময় সাধারণভাবে তিনটি কর আদায় করা হত উৎপন্ন শস্যের অংশবিশেষ যা ইসলামী আইনে খারাজ নামে পরিচিত। তাছাড়া গবাদি পশুর ওপর কর যার নাম ছিল চরাই, এবং বাড়ি পিছু একটা কর 'ঘরি' বা ঘরাই আদায় হত।

আলাউদ্দিন প্রথম থেকেই কঠোরভাবে রাজস্ব সংস্কারে হাত দেন। তিনি দেখলেন খুত, মুকদ্দম ও চৌধুরীরা নিজেদের জমির ওপর খাজনা দেয় না, কৃষকদের ভূমি-করের ওপর একটা বাড়তি কর (কিসমৎ-ই-খোটি) আদায় করে এবং নিজেদের দেয় 'চরাই' ও 'ঘরি' অন্য কৃষকদের ওপর চাপিয়ে দেয়। আলাউদ্দিন খোট, মুকাদ্দম ও চৌধুরীদের সাধারণ কৃষকের মত খারাজ দিতে বাধ্য করলেন, ঐ সঙ্গে কিসমৎ-ই-খোটি আদায় নিষিদ্ধ করলেন ও খুত্, মুকাদ্দম ও চৌধুরীদের ওপরও 'চরাই' ও 'ঘরি' কর ধার্য করলেন। আলাউদ্দিন সমস্ত জমি জরীপ করিয়ে বিশওয়া প্রতি (১ বিঘার ১/২০ ভাগ) উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক (৫০%) ভূমি কর ধার্য করলেন। মধ্যযুগে এই হারই ছিল সবচেয়ে বেশি হারে কৃষি কর। সাধারণত নগদ টাকায় খাজনা আদায় করা হত। আলাউদ্দিন জিনিসপত্রের দাম কম রাখার জন্য বাজার নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করেন। ওই সময় খালসা অঞ্চল থেকে জমির খাজনা নগদ অর্থের পরিবর্তে শস্য আদায় করা হত। তাঁর কর আদায় ব্যবস্থা এমনি কঠোর ছিল যে খালসা এলাকার বাইরে প্রজারা ফসল উঠলেই বিক্রি করে খাজনা দিয়ে তবে বাকি ফসল ঘরে তুলত। আলাউদ্দিনের

রাজস্ব সংস্কারের বিস্তারিত বিবরণ ঐতিহাসিক বারাণীর লেখায় পাওয়া যায়। বারাণী লিখেছেন আলাউদ্দিনের ভূমি-সংস্কার পাঞ্জাবের দিনালপুর ও লাহোর থেকে উত্তর প্রদেশের কারা এবং কাটেহার ও পূর্ব রাজস্থান পর্যন্ত চালু হয়। বারাণী আরও লিখেছেন, আলাউদ্দিনের কর ব্যবস্থায় খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীরা তাদের দেয় কর আর গরীব কৃষকদের ওপর চাপাবার সুযোগ পেল না। তারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো, সিল্কের জামা-কাপড় পরা বা পান খাওয়ার মত বিলাসিতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তারা এমন গরীব হয়ে গেল যে, অনেক সময় তাদের স্ত্রীলোকেরা অভিজাত মুসলমান পরিবারে ঝি-এর কাজ নিতে বাধ্য হয়।

গিয়াসুদ্দিন তুঘলক আলাউদ্দিনের কর ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন করেন। খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীরা চরাই ও ঘরি কর দেওয়া থেকে অব্যাহতি পেল। তাদের নিজেদের জমির ওপর দেয় করও মুকুব করা হয়। কিসমৎ-ই-খোটির পরিবর্তে তাদের নিয়মিত রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্য বরাদ্দ করা হয়।

মহম্মদ তুঘলকের সময় আবার কর ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। পুনরায় অভিজাতদের কাছ থেকে চরাই ও ঘরি আদায় শুরু হয়। ঐ সময় জমি জরিপ করিয়ে, সরকারিভাবে ফসলের গড় উৎপাদন স্থির করে, ফসলের মূল্য ঘোষণা করা হয় এবং সেইমত কর আদায় হয়। সরকারিভাবে স্থিরীকৃত উৎপাদন ও শস্যমূল বাস্তব থেকে ফারাক হত। ফলে কৃষকদের বোঝা এবং অসন্তোষ বাড়ে। দোয়াব অঞ্চলের অভিজাতরা বিদ্রোহ করে, হিন্দুরা তাদের শস্যগোলায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সাধারণ কৃষকরাও বিদ্রোহ সমর্থন করতে এগিয়ে আসে। সরকারি কর্মচারী ও সৈন্যরা বিদ্রোহীদের ওপর প্রচণ্ড উৎপীড়ন চালায়। দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহের খবর পেয়ে দূর অঞ্চলের কৃষকরাও চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। মহম্মদ তুঘলকের সেনাবাহিনী জঙ্গল ঘিরে ফেলে বিদ্রোহীদের হত্যা করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছারখার হয়ে যায়। বারাণীর বিবরণ থেকে এসব জানা যায়। বারাণী লিখেছেন বিদ্রোহ অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল। ফলে চাষবাস বিপর্যস্ত হয়, দিল্লিতে ফসল আনা বন্ধ হয় এবং রাজধানী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। প্রায় সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ চলেছিল (খ্রিঃ ১৩৩৪-৩৫ থেকে ১৩৪১-৪২)।

বারাণী বেশিমাত্রায় ভূমি রাজস্ব আদায়কেই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করেছেন। মহম্মদ তুঘলক শেষ পর্যন্ত তাঁর ভূল নীতি বুঝতে পারেন এবং কৃষি সম্প্রসারণের জন্য এক বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি চাষীদের কূপ খনন, বীজ, লাঙল প্রভৃতি কেনার জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সুলতানি আমলে এই ঋণকে সোন্ধার (Sondhar) বলত। মহম্মদ তুঘলক চাষবাসের উন্নতি ঘটানোর জন্য একজন দেওয়ান-এর অধীনে "দিওয়ান-ই-আমীর কোহী" নামে নতুন এক কৃষিদপ্তর স্থাপন করেন। তিনি চাষ পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য আদেশ দেন। যেখানে যব চাষ করা হত সেখানে গম হবে, অথবা যেখানে গম চাষ হত সেখানে আখ হবে, যেখানে আখ চাষ করা হত সেখানে আঙুর, খেজুর প্রভৃতির চাষ হবে। সবশেষে 'শিকদার' নামে একশ জন কর্মচারী নিয়োগ করে তাদের মাইনের উপরি লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে চাষের উন্নতির কাজে পাঠানো হল। প্রত্যেককে "তিরিশ গুণিত তিরিশ" করোহ (এক করোহ = প্রায় $১^{১}/_{২}$ মাইল) এলাকায় চাষ বাড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু লোভী অসৎ এই কর্মচারীরা হাজারের এক অংশও উন্নতির কাজে ব্যয় না করে টাকা আত্মসাৎ করে। মহম্মদ তুঘলক এই সময় সিন্ধুপ্রদেশে অভিযানে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন এবং পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সময়মত ফিরে এলে অসাধু কর্মচারীদের ভাগ্যে নিশ্চিত শাস্তি ছিল। যাই হোক মহম্মদ তুঘলকের বিশাল পরিকল্পনা তদারকির অভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

পরবর্তী সুলতান ফিরোজ তুঘলকের সময় মহম্মদ তুঘলকের সব পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। যারা সোন্ধার নিয়েছিল বা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে রাজকর্মচারীরা রাজকোষ থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়েছিল, তা সবই মকুব করা হয়। ফিরোজ খারাজ ছাড়া সব রকম বাড়তি কর আদায় (আবওয়াব) বন্ধ করে দেন। অর্থাৎ এখন থেকে 'চরাই' ও 'ঘরি' কর আদায় পরিত্যক্ত হল। অবশ্য তিনি হিন্দুদের কাছ থেকে নতুন একটা কর, 'জিজিয়া' আদায় করা শুরু করেন। স্ত্রীলোক এবং শিশু ছাড়া প্রত্যেক হিন্দুকেই এই কর দিতে হত। আপনারা আগেই ফিরোজ তুঘলকের সময়

নতুন নতুন খাল কাটার বিবরণ জেনেছেন। যারা খালের জল নিয়ে চাষ করত তাদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ বাড়তি কর বসানো হল। এই করের নাম দেওয়া হয়েছিল 'কিসমৎ-ই-সরাব।' সাধারণভাবে হরিয়ানা অঞ্চলে এই কর বসানো হয়।

ফিরোজের পর রাজস্ব আদায়ের ইতিহাস খুব বেশি জানা যায় না। লোদীদের আমলে মুদ্রা ব্যবস্থায় একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সারা পৃথিবী জুড়েই সোনা-রূপার যোগান কমে যায়। ভারতেও মুদ্রার প্রচণ্ড অভাব হয়। ফলে জিনিসপত্রের দাম খুব কমে গিয়েছিল, প্রজাদের পক্ষে ফসল বিক্রি করে নগদ টাকায় কর দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ইব্রাহিম লোদী উৎপন্ন ফসলের কর নেবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশ দেন। ষোড়শ শতকে আমেরিকা থেকে সোনা-রূপা আমদানি হতে থাকলে এবং ভারতেও সোনা-রূপার যোগান বাড়লে শেরশাহ আবার অর্থমূল্যে কর নেওয়া শুরু করেন। আকবরের সময় কেবল অর্থমূল্যেই কর আদায় করা হত।

২১.৩.৩ কৃষি সম্পর্ক

আলোচ্য অনুচ্ছেদে আপনারা সুলতানি যুগে গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তনের কথা জানতে পারবেন।

প্রাক্-সুলতানি যুগের গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে খুব বেশি কথা জানা যায় না। তবে একটা বিষয়ে পণ্ডিতরা নিশ্চিত যে ঐ সময়ের শাসকশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করত এবং কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব বা অন্য কোন নামে কর আদায় করত। এই অভিজাতরা তুর্কি আক্রমণের বিরোধিতা করে। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ এবং বারাণী এদের রাই, রাণা বা তাদের সেনাপতিদের রাওয়াত নাম দিয়েছেন। রাই, রাণা, রাওয়াতরা তুর্কিদের কাছে পরাজিত হলে নিয়মিত থোক টাকা উপঢৌকন হিসাবে দিতে স্বীকৃত হয়। পুরনো শাসকশ্রেণী তাদের নিজস্ব কর আদায়কারীদের দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করত। ঐতিহাসিক আফিফের লেখায় তার পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে দিপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক তার এলাকার এক রাজা রাণা মালভট্টকে এক বছরের রাজস্ব আগাম দেবার জন্য জোর করে। মালভট্ট ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করলে গাজী মালিক সেখানকার মুকাদ্দম ও চৌধুরীদের টাকা দেবার জন্য উৎপীড়ন শুরু করে। সারা এলাকায় সন্ত্রাস নেমে আসে। বাধ্য হয়ে রাণা মালভট্ট মালিক গাজীর প্রস্তাবে রাজি হন। এই ঘটনা থেকে অনুমান হয় যে পুরনো শাসকশ্রেণী আগের মতই খুত, মুকাদ্দম, চৌধুরীদের দিয়ে কর আদায় করত এবং আলাউদ্দিনের ভূমি সংস্কারের আগে পর্যন্ত গ্রামের শাসন কাঠামোয় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

কৃষক শ্রেণী :

গ্রামকে কেন্দ্র করে কৃষিকাজ গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক আফিফের মতে এক-একটা গ্রামে পুরুষ লোকের সংখ্যা ছিল দুশ থেকে তিনশ। তারা নিজেরাই বীজ, লাঙ্গল ও অন্যান্য চাষের যন্ত্রপাতির মালিক। লোকসংখ্যার তুলনায় জমি অপর্যাপ্ত থাকায় জমির মালিকানার প্রশ্ন উঠত না। চাষীরা নিজেদের ফসল নিজেরাই বিক্রি করতে পারত। আপাতদৃষ্টিতে কৃষকরা স্বাধীন মনে হলেও বাস্তবে তারা পুরোপুরি স্বাধীন ছিল না। উৎপন্ন ফসলের অংশ বিশেষ কর হিসাবে দিতে বাধ্য থাকত। তারা ইচ্ছা করলেই গ্রাম ছেড়ে গিয়ে অন্যত্র বাস করতে পারত না।

চাষীদের মধ্যে উঁচু-নীচু ভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। নীচের তলার চাষীদের বলা হত বালাহার। তাদেরও নীচে ভূমিহীন কৃষক বাস করত—তাদেরকে অন্ত্যজ বলা হত। অন্ত্যজদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে তাদের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে। বালাহারদের ওপরে ছিল গ্রামের মোড়ল। খুত, মুকাদ্দম এই শ্রেণীর মধ্যেই

পড়ে। প্রত্যেক গ্রামে একজন করে পাটোয়ারী থাকত। পাটোয়ারীদের কাজ ছিল গ্রামে কোন্ প্রজা কত খাজনা দিচ্ছে লিখে রাখা। তাদের হিসাব বই পরীক্ষা করলে বোঝা যেত প্রজাদের কাছ থেকে বে-আইনি কর আদায় করা হচ্ছে কিনা, গ্রামের লোকেরাই পাটোয়ারীদের নিয়োগ করত—তারা সরকারি কর্মচারী ছিল না।

অভিজাত শ্রেণী :

আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন রাই, রাণা, রাওয়াতরা প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করত খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীদের মারফৎ। ত্রয়োদশ শতকের লেখায় চৌধুরীদের উল্লেখ বেশি পাওয়া যায় না। চতুর্দশ শতকে বারাণী বারবার তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। একদিক থেকে খুত, মুকাদ্দমরা কৃষকশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা নিজেরা জমি চাষ করত এবং তাদের নিজেদের নামের জমির জন্য খাজনা দিতে বাধ্য থাকত। তাছাড়া অন্য কর 'চরাই' ও 'ঘরি'ও তাদের দেয় ছিল। কিন্তু কার্যত তারা জমির খাজনা এবং 'চরাই' ও 'ঘরি' কর নিজেরা না দিয়ে গ্রামের প্রজাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিত। এছাড়াও তারা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের পারিশ্রমিক বাবদ "কিসমৎ-ই-খোটি" নামক কর আদায় করত। বারাণী লিখেছেন খুত, মকাদ্দমরা বেশ বড়লোক। তারা ভাল ভাল জামা-কাপড় পরে, ঘোড়ায় চড়ে, পান খায়। কিন্তু আলাউদ্দিন যখন তাদের দেয় কর অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া বন্ধ করলেন এবং নিজেদের কর নিজেদেরকেই দিতে বাধ্য করলেন, তখন খুত, মুকাদ্দমরা খুব গরীব হয়ে পড়ল এবং অনেক সময় জীবন ধারণের জন্য তাদের স্ত্রীলোকদের মুসলমান অভিজাতদের বাড়িতে বাধ্য হয়ে ঝি-এর কাজ নিতে হয়। আলাউদ্দিনের কঠোর ব্যবস্থার পরেও খুত, মুকাদ্দমরা খালসা এলাকার বাইরে কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত ছিল এবং খালসা এলাকতেও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল।

সাধারণত খুতরা এক-একটা গ্রামের কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত ছিল। কয়েকটা গ্রাম নিয়ে এক-একটা পরগণা হত। পরগণার দায়িত্বে ছিল মুকাদ্দম। ইবন বতুতা লিখেছেন চৌধুরীরা ১০০টা পরগণার কর আদায়ের দায়িত্বে ছিল। গুর্জর-প্রতিহার এবং চালুক্যদের সময় এক ধরনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী চুরাশিটি পরগণার দায়িত্বে ছিল। সম্ভবত চৌধুরীরা এদেরই উত্তরপুরুষ, তবে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী। ভারত চৌরাশী পরগণার জমিদারের ঐতিহ্য অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত টিকে ছিল। কবি ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে চুরাশি পরগণার অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। ফিরোজ তুঘলকের রাজস্ব সংস্কারের পর গ্রামের অভিজাতদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। কালক্রমে চৌধুরীদের জমিদার বলা হতে থাকে।

২১.৪ ইকতা প্রথা

দিল্লি সুলতানি রাজ্যসীমা বাড়তে থাকলে কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী বিজিত রাজ্যগুলি শাসনের সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইকতা প্রথার প্রচলন হয়।

বহুদিন থেকেই ইসলামিক জগতে কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি-কর আদায় এবং কর থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত আয় শাসক শ্রেণীর মধ্যে বিতরণের জন্য ইকতা প্রথার চল ছিল। অনুগত কর্মচারীদের পুরস্কৃত করাও এই প্রথার উদ্দেশ্য। ইকতার দায়িত্বে যারা থাকত তাদের নাম ছিল মুকতি বা ওয়ালি। একাদশ শতাব্দীর এক লেখায় মুকতি বা ওয়ালিদের কাজ এবং দায়িত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখা হয়েছে—এদের কাজ হচ্ছে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা। খাজনা দিয়ে দিলে কৃষকরা বা তাদের পরিবার ও ধন-সম্পত্তি মুকতিদের সব রকম দাবী থেকে মুক্ত থাকবে। মুকতিরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করলে প্রজারা সুলতানের কাছে নালিশ জানাতে পারে। সুলতান মুকতিদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন, প্রয়োজনে তাদের ইকতা বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। মুকতির দায়িত্ব কেবল রাজস্ব আদায়ের—দেশ ও কৃষকরা সুলতানের অধিকারে।

ঘোরীরা উত্তর ভারত জয় করলে সেনানায়করা বিজিত এলাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। পরাজিত রাজা ও অভিজাতরা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করলে সেনানায়করা তাদের কাছ থেকে থোক টাকা কর নিত। যে এলাকা রাজার বশ্যতা স্বীকার করেনি সে এলাকা থেকে সৈন্য পাঠিয়ে লুঠ করে গবাদি পশু ও দাসদাসী নিয়ে আসত। ঐ সেনা নায়করাই কালক্রমে নিজেদের মুকতি বা ওয়ালি বলতে থাকে। তাদের এলাকাকে ইকতা বা কখনও কখনও ওয়ালিয়ৎও বলা হয়। মুকতিরা তাদের আয় থেকে অধীনস্ত সৈন্যদের ভরণপোষণের এবং নিজেদের খরচ মেটাত।

দিল্লি সুলতানির গোড়ার দিকে ইকতাগুলির আয় এবং সেখানে কত সৈন্য রাখা হচ্ছে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ধারণা ছিল না। সুলতানি শাসন দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইকতার ব্যাপারে নজর দেওয়া হয়। এবং ইকতা প্রথার পরিবর্তন শুরু হয়। ইলতুতমিস মুকতিদের এক ইকতা থেকে অন্য ইকতায় বদলি করতেন। ক্রমে তিন-চার বছর অন্তর মুকতিদের বদলি ইকতা প্রথার অঙ্গ হিসাবে গণ্য হল। ফিরোজ তুঘলকের সময় পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থা চলে। বলবন প্রতিটি মুকতির সঙ্গে একজন হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ করেন। উদ্দেশ্য, ইকতাগুলির প্রকৃত আয়-ব্যয় অনুসন্ধান করা।

ইকতাগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বড় রকমের হস্তক্ষেপ শুরু হয় আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রক (দেওয়ান-ই-উজারাত) প্রত্যেক ইকতার আনুমানিক আয়ের একটা তালিকা প্রস্তুত করে। হিসাব পরীক্ষকরা আয়-ব্যয় খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, গরমিল পাওয়া গেলেই দায়ী কর্মচারীদের শাস্তি এবং মুকতিদের নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা হত। আয়ের তালিকা তৈরি হলে নানা অজুহাতে আয় বাড়ানো হতে থাকে। আপনারা আগেই জেনেছেন কিভাবে খুত মুকাদ্দমদের কর ফাঁকি বন্ধ করা হয় এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভূমি কর ধার্য করা হয়। আলাউদ্দিনের সময় সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়তে থাকলে দূরবর্তী এলাকায় নতুন নতুন ইক্‌তা গঠন করা হয় এবং দিল্লির আশপাশ ও দোয়াড় অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে খালিসার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সময় ইকতা প্রথায় কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি, শুধু করের বোঝা কমানোর চেষ্টা হয়েছে। বলা হল এখন থেকে একসঙ্গে ইকতার আয় $^{১}/_{১০}$ বা $^{১}/_{১১}$ অংশের বেশি বাড়ানো হবে না।

মহম্মদ তুঘলকের সময় ইকতাগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ আরও বাড়ানো হয়। প্রত্যেক ইকতায় মুকতির সঙ্গে একজন করে আমীর বা সেনানায়ক নিয়োগ করা হল। মুকতি ইকতার আয়ের বিশ ভাগের এক ভাগ নিজেদের পারিশ্রমিক ও খরচের জন্য রেখে বাকী টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে জমা দেবে। সেনানায়কদের মাইনে বাবদ ইকতার একটি এলাকার আয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। সাধারণ সৈনিককে কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে মাইনে দেবার ব্যবস্থা হয়।

ফিরোজ তুঘলক ক্ষমতায় এসেই অভিজাতদের সমর্থন আদায় করার জন্য মন্ত্রী, আমীর প্রভৃতির মাইনে অনেক বাড়িয়ে দিলেন। অনেক সময় মাইনের পরিবর্তে ইকতা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। সৈন্যদের নগদ মাইনে দেবার পরিবর্তে গ্রাম থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার দেওয়া হল, একে ওয়াজা বলে। যারা ওয়াজা পেল না তাদের নগদ অর্থে মাইনে দেওয়া হত। ফিরোজ তুঘলকের সময় ইকতার আয় নতুন করে নির্ধারণ করা হয়। সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ছয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ (৬,৭৫,০০,০০০) টঙ্কা। রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ করা হল। ফিরোজ তুঘলকের সময়ে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে উত্তরাধিকারের স্বত্ত্ব মেনে নেওয়া। অর্থাৎ এখন থেকে মুকতি, সেনানায়ক, সাধারণ সৈন্য সকলেই পুরুষানুক্রমে জমির দখল রাখতে পারবে ও আয় ভোগ করবে।

ফিরোজ তুঘলকের পর ইকতার ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আর চেষ্টা হয়নি। লোদীদের রাজত্বকালে ইকতা কথাটার ব্যবহার কমে আসে। এখন থেকে ইকতার পরিবর্তে সরকার ও পরগণা কথাগুলির প্রচলন হয়।

২১.৫ শহরের উদ্ভব ও শহর জীবনের বিকাশ

নীচের অংশ পাঠ করলে আপনারা সুলতানি যুগে নতুন নতুন শহরের উদ্ভব ও শহর জীবনের বিকাশের কথা জানতে পারবেন।

সবার আগে আপনারা শহর বলতে কি বুঝবেন জেনে নিন। সাধারণত কোন সীমিত স্থানে যদি পাঁচ হাজার বা তার বেশি লোক পাশাপাশি বাস করে অথবা যদি কোন সীমিত স্থানে লোকসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগ (৭০%) বা তার বেশি অ-কৃষি নিযুক্ত থাকে তবে সেই স্থানকে শহর বলে। ছোট শহরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শর্তটিই বেশি প্রযোজ্য। দুটি শর্তই একসঙ্গে প্রযোজ্য হতে পারে।

প্রাচীন ভারতে অনেক শহরের নাম পাওয়া যায়। যেমন, কাশি, কোশল, কৌশাম্বী, কপিলাবস্তু, উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি সবই গুপ্তোত্তর যুগে অবক্ষয়ের মুখে পড়ে। অনেক ছোট-বড় শহর একেবারে লোপ পায়। খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে শহরগুলির অবক্ষয়ের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ বলেন গুপ্তোত্তর যুগে বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে গেলে রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ হয়, ছোট ছোট রাজা এবং অভিজাতরা বেশির ভাগ গ্রামেই বাস করে, যে কয়েকটি শহর টিকে থাকে সেগুলি তীর্থস্থান, প্রশাসনিক কেন্দ্র বা সৈন্য ছাউনি ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও কোনও ঐতিহাসিক যেমন রামশরণ শর্মা বলেন গুপ্তোত্তর যুগে রাজারা মন্দির, ব্রাহ্মণ ও অনুগত কর্মচারীদের জমি দান করতেন। জমি গ্রহীতারাই কালক্রমে ভূস্বামী বা ইউরোপের অনুরূপ সামন্ত শ্রেণীতে পরিণত হয়। তারা গ্রামে বাস করত এবং গ্রামগুলি স্বনির্ভর হয়ে পড়ে। ফলে, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচন হয়। এর সঙ্গেই নগরের অবক্ষয় জড়িত। রামশরণ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণ দিয়ে. ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচনের পক্ষে কারণ হিসাবে দেখান যে সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীতে মুদ্রার প্রচলন খুবই কমে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে কোথাও কোন রাজার মুদ্রা বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়নি, বা এক জায়গার মুদ্রা অন্যত্র বা বিদেশি মুদ্রার বেশি খোঁজ পাওয়া যায় নি। এগুলিই ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচনের প্রমাণ। সপ্তম প্রথার উদ্ভব বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচন বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু একটা বিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত যে সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীতে ভারতে শহর এবং শহর জীবনের অবক্ষয় হয়।

সুলতানি যুগের ঐতিহাসিক বিবরণীতে অনেক বড় বড় শহরের উল্লেখ আছে। যেমন লাহোর, মুলতান, দিল্লি, অনহিলওয়ারা, কাম্বে, কারা, হান্সী, দৌলতাবাদ প্রভৃতি। এই শহরগুলির কোনও কোনটি খুবই বড় মাপের। ইবন বতুতা বলেছেন দিল্লি প্রাচ্যে ইসলামি জগতের সবচেয়ে বড় শহর। দৌলতাবাদও প্রায় একই রকমের বড়। এছাড়াও অনেক নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে যেমন আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে পূর্ব রাজস্থানে ছেইন বা ঝেইন শহর। ক্যারাভান (Caravan) পথ বা যে পথ দিয়ে বণিকরা দলবেঁধে পণ্য নিয়ে চলাচল করত সে পথেও ছোট ছোট শহরের উত্থান হয়।

আপনারা এর পরে জানবেন সুলতানি যুগে কি কি কারণে নগরায়ণের বিস্তার হয়।

সুলতানি যুগে নগরায়ণের বিস্তারের একটা বড় কারণ ইকতা প্রথা। তুর্কি আমলের গোড়ার দিকে শাসকশ্রেণীর লোকেরা নতুন পরিবেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পরিবর্তে একসঙ্গে থাকতে চাইত। তারা ইকতার সদর দপ্তর

যেখানে অবস্থিত, সেখানে মুকতি ও ওয়ালিরা অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাস করত, সেইসব জায়গাতেই থাকা পছন্দ করত। আগেই জেনেছেন ইকতা প্রথার মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। আলাউদ্দিনের সময় থেকে উৎপন্ন ফসলের পরিবর্তে নগদ টাকায় কর আদায়ের ফলে শাসকশ্রেণীর হাতে সে যুগের মাপকাঠিতে প্রচুর অর্থ আসতে থাকে। শাসকরা বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়। তারা পারস্য বা বাগদাদ থেকে কবি, লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, কারিগর, চিকিৎসক বা স্থপতি নিয়ে আসে। ভারতীয় মিস্ত্রি এবং মজুরের সাহায্যে খিলান দেওয়া বাড়ি তৈরি শুরু হয়। বিদেশ থেকে বিলাসী ভোগ্যপণ্য আমদানি করা হতে থাকে। বিদেশি কারিগরের সাহায্যে কার্পেট, সিল্কের কাপড় প্রভৃতি উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হয়। ভারতীয় কারিগররা বিদেশি কারিগরের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে খাদ্যদ্রব্য ও উচ্চমানের হস্তশিল্প আমদানি হতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমুখী ছিল। গ্রামগুলিতে বিক্রি করার মত জিনিস শহরে উৎপন্ন হত না। গ্রাম থেকেই জিনিস আসত শহরে। অনেক সময় দেশের ভিতরের দূরবর্তী শহরগুলোর মধ্যে ব্যবসা হত। এইভাবে আমরা দেখি ইকতা প্রথা শহরের উত্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। ইকতাকে কেন্দ্র করে যে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল, হান্সী, কারা, অনহিলওয়ারা প্রভৃতি।

দ্বিতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছোট শহর খুব বড় হয়, আবার ছোট ছোট শহরেরও উত্থান হয়। জলপথে বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে গুজরাটের উপকূলে বাণিজ্য শহরগুলি কাম্বে, ব্রোচ প্রভৃতি আরও বড় হয়। স্থলপথে বাণিজ্যের ফলে মুলতানের মতো ছোট শহর খুবই বড় হয়। তাছাড়া পণ্য চলাচলের রাস্তার ধারে, অর্থাৎ যে পথে দিয়ে বণিকরা দল বেঁধে গরুর গাড়িতে বা বলদের পিঠে মাল চড়িয়ে যাতায়াত করত (Caravan) সে পথের ধারেও ছোট ছোট শহর গড়ে উঠে। স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন দ্রব্য কেনাবেচা করতে বা পণ্য বিনিময়ের কেন্দ্র হিসাবে এইসব শহরের উদ্ভব। মালব হয়ে গুজরাটের পথে এই ধরনের অনেক শহর গড়ে উঠে।

তৃতীয়ত, সুলতানরা অনেক সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে শহর স্থাপন করেন। মহম্মদ তুঘলক দৌলতাবাদ এবং ফিরোজ তুঘলক ফতেহাবাদ, হিসার, জৌনপুর, ফিরোজাবাদ প্রভৃতি শহরের পত্তন করেন।

২১.৬ বাণিজ্যের বিস্তার

সুলতানি আমলে ব্যবসার পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। দূরপাল্লার পথ তৈরি হয় যার মধ্যে দূরত্ব মাপার জন্য মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল। কিছু দূরে দূরে সরাইখানা তৈরি হয়। বাংলার গিয়াসুদ্দিন খলজী উঁচু বাঁধের পথ তৈরি করেছিলেন যা দিয়ে. বর্ষাকালে এমনকি বন্যার সময় যাতায়াত করা যেত।

২১.৬.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

আপনারা ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে নগরায়ণের প্রসার সম্পর্কে জেনেছেন। শহরে বসবাসকারী লোকেদের স্বভাবতই খাদ্য—চাল, গম, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি সরবরাহ করতে হত। শহরে স্থাপিত কারখানাগুলিতেও নিয়মিত কাঁচামালের (যেমন তুলো, রেশম প্রভৃতি) যোগানের প্রয়োজন ছিল। আলাউদ্দিনের সময় থেকে নগদ টাকায় কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় শুরু হলে কৃষকরা ফসল উৎপাদনের পরই শস্য-বণিকদের (তাদের কারওয়ানি বা নায়ক বলত) শস্য বিক্রি করে দিত। কারওয়ানিরা এইসব শস্য শহরে নিয়ে এসে বিক্রি করত। এইভাবে গ্রাম ও শহরের মধ্যে এক ধরনের বাণিজ্য গড়ে উঠে। সাধারণত অল্প দূরত্বের মধ্যে এই ধরনের

বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধরনের বাণিজ্যের আর একটা বৈশিষ্ট্য, শহরে-উৎপন্ন জিনিসের বিশেষ চাহিদা গ্রামে ছিল না, গ্রাম থেকে শহরে একতরফা জিনিস যেত। আর এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হল, এক শহরের কারখানায় উৎপন্ন বিলাসী দ্রব্য অন্য শহরে, অনেক সময় দূরবর্তী শহরে নিয়ে গিয়ে কেনাবেচা। যেমন দৌলতাবাদ থেকে মসলিন কাপড়, লখ্‌নৌতি থেকে ছিট কাপড় এবং অযোধ্যা থেকে গরিবদের জন্য মোটা কাপড় দিল্লিতে আসত। দিল্লি থেকে লাহোর, মুলতান প্রভৃতি শহরে মিছরি চালান যেত। ইবন বতুতার বিবরণ থেকে এগুলি যানা যায়। অনেক সময় বিদেশ থেকে সীমান্তবর্তী শহরে জিনিস আমদানি করা হয়, তারপর দেশের দূর দূর প্রান্তে সরবরাহ করা হত।

২১.৬.২ বহির্বাণিজ্য

আপনারা আগেই জেনেছেন গুপ্তোত্তর যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। বস্তুত নবম-একাদশ শতকে ভারতের সঙ্গে আরব দেশগুলির জলপথে বাণিজ্যের চরম বিকাশ হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গ থেকে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গেও বাণিজ্য অব্যাহত ছিল।

সুলতানি যুগে বহির্বাণিজ্য সাধারণত গুজরাটের বন্দরগুলির সঙ্গে দুই ধারায় বিকাশিত হয়। পারস্য উপসাগর দিয়ে হরমুজ কারার পথে এবং লোহিত সাগর হয়ে এডেন, মোকা, জেড্ডা, আলেকজান্দ্রিয়ার পথে। পারস্য উপসাগরের পথে খাদ্য শস্য ও কাপড় রপ্তানি হত, আর লোহিত সাগরের পথে ভূমধ্যসাগর ও ইউরোপের দেশগুলির জন্য মশলা রপ্তানি হত। গুজরাটের বন্দর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কাপড় রপ্তানি হত এবং পরিবর্তে ঐসব অঞ্চল থেকে মশলা আমদানি করে পশ্চিম এশিয়া এবং আলোকজান্দ্রিয়ার পথে ইউরোপে রপ্তানি হত। দক্ষিণবঙ্গের বন্দর থেকে সাধারণত মালাক্কা, চীন ও দূর প্রাচ্যে সূতী ও সিল্কের বস্ত্র, চিনি প্রভৃতি জিনিস রপ্তানি হত। ঐসব দেশ থেকে মশলা ও সোনা-রূপা আসত। হরমুজ থেকে নুন এবং মালদ্বীপ থেকে কড়ি আসত। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কড়ি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হত।

জলপথে ভারতের উপকূল এলাকার মধ্যেও বাণিজ্য হত। সিন্ধু থেকে গুজরাটের বন্দর হয়ে মালাবার, করমণ্ডল ও বঙ্গদেশের বন্দরে বাণিজ্যপোত যাতায়াত করত। স্থানীয় উৎপন্ন জিনিস কেনা এবং বিদেশি দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো এইসব বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ছিল।

মুলতান হয়ে স্থলপথে মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের সম্পর্ক বহুদিনের। সুলতানি যুগে মধ্য এশিয়া ও পারস্যের ওপর ক্রমাগত মোঙ্গল আক্রমণ হতে থাকলে স্থলপথে বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। তবে আরবদেশ ও খোরাসান থেকে ঘোড়া আসা বন্ধ হয়নি এবং ভারত থেকে নিয়মিত ক্রীতদাস রপ্তানি হত।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার জলপথে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় বণিকদের ভূমিকা আরব বণিকদের তুলনায় নগণ্য ছিল। সুলতানি আমলের শেষের দিকে (১৪৯৮ খ্রিঃ) পর্তুগীজরা জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছালে ভারতীয় ও আরব বণিকদের ভূমিকা আরও কমে গেল। পর্তুগীজরা তাদের উন্নত ও সামরিক দিক থেকে সুসজ্জিত নৌপোত ছিল সমুদ্রপথে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। নানা শর্তে এবং ফি দিয়ে (Charges) এক ধরনের অনুমতি পত্র (Cartaz) নিয়ে তবেই ভারতীয় বা অন্য বিদেশিরা জলপথে ব্যবসা করতে পারত।

২১.৭ সারাংশ

ভারতে তুর্কি সুলতানি শাসন তিনশ বছরেরও বেশি (১২০৬-১৫২৬) স্থায়ী হয়েছিল। সুলতানি রাজত্বকালে সেচের সম্প্রসারণ হয় এবং চাষবাসের প্রসার ঘটে। কিন্তু রাজস্ব ব্যবস্থা এমনি কঠোর ছিল যে প্রজাদের বাড়তি

উৎপাদনের প্রায় সবটুকু রাষ্ট্রকে খাজনা হিসাবে দিয়ে দিতে হত। তুর্কিরা মুসলিম দুনিয়ার অনেক প্রথা এদেশে এনেছিলেন। ইকতা প্রথা এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইকতা প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় হত এবং বাড়তি রাজস্ব অভিজাতদের মধ্যে বিতরণ করা হত।

গুপ্তোত্তর যুগে শহর জীবনের অবক্ষয় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তুর্কি শাসনে রাস্তাঘাট তৈরির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের বিস্তার হয়। ঐ সময় ছোট বড় অনেক নতুন শহর গড়ে ওঠে। শহর জীবনের বিস্তারের অনেক কারণ থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ অন্যতম কারণ।

২১.৮ অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে ইকতা প্রথা ব্যাখ্যা করুন।

২। সুলতানি যুগে নগরায়ণের প্রসারের কারণ আলোচনা করুন।

৩। সুলতানি শাসনে কেন্দ্রীয় সরকার ইকতা শাসনে (administration) কিভাবে হস্তক্ষেপ করে?

৪। তিন লাইনে সংজ্ঞা লিখুন :

(ক) খালিসা; (খ) কিসমৎ-ই-খোটি; (গ) সোন্ধার; (ঘ) মুকাদ্দম ও (ঙ) ওয়াজা।

২১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। Ed. R. C. Majumdar : *The Delhi Sultanate (The History and Culture of India Vol. VI) Bombay, 1960.*

২। Ed. Tapan Roychoudhury and Irfan Habib : *The Cambridge Economic History of India—(2 Vol.) Vol.-I 1982.*

৩। অনিরুদ্ধ রায় : *সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস, কলকাতা ১৯৯৭।*

৪। অনিরুদ্ধ রায় : *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর কলকাতা, ১৯৯৯।*

৫। Ram Saran Sharma : *Urban Decay in India. Delhi, 1987.*

একক ২২ □ ভারতীয় সমাজের ওপর ইসলামের প্রভাব—সুফিবাদ—ভক্তি আন্দোলন—ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলীর ভূমিকা

গঠন

২২.০ উদ্দেশ্য

২২.১ প্রস্তাবনা

২২.২ সুলতানি শাসনের ভারতীয় সমাজের ওপর ইসলামীয় প্রভাব

২২.৩ সুফিবাদ

২২.৩.১ সুফিবাদের বৈশিষ্ট্য

২২.৩.২ ভারতে সুফিবাদের বিস্তার

২২.৪ হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ী ভাবনা

২২.৫ ভক্তি আন্দোলন

২২.৫.১ দক্ষিণ ভারতে প্রাক্ মুসলিম যুগের ভক্তি আন্দোলন

২২.৫.২ সুলতানি যুগে উত্তর ভারতে একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিরোধী ভক্তি আন্দোলন

২২.৫.৩ বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন

২২.৫.৪ উত্তর ভারতে একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণ বিরোধী ভক্তি আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

২২.৬ ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য শৈলী ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়

২২.৭ সারাংশ

২২.৮ অনুশীলনী

২২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- সুলতানি শাসনে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের কয়েকটি ধারা।
- সুফিবাদ বলতে কি বুঝায়, ভারতে সুফিবাদের বিস্তার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে সুফিবাদের ভূমিকা।

- ভক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা ও বৈশিষ্ট্য।
- ভারতে ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলীর বিকাশ এবং কিভাবে ভারতীয় ও ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণ ঘটে।

২২.১ প্রস্তাবনা

আগের এককে আপনারা সুলতানি যুগে কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং শহরের বিকাশের কথা পাঠ করেছেন। আলোচ্য এককে সুলতানি আমলে ভারতীয় সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কয়েকটি ধারা জানতে পারবেন।

ভারতের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও বর্ণভেদভিত্তিক হিন্দু সমাজে পরিবর্তন শিল্পভিত্তিক সমাজের পরিবর্তনের মত দ্রুত ও স্পষ্ট নয়। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন মন্থর গতিতে চলায় বাহ্যত অনেক সময় চোখে পড়ে না। ফলে মুঘল আমলের শুরুতে বাবরের চোখে অথবা আরও পরে কার্ল মার্কসের মনে হয়েছিল ভারতীয় সমাজ অপরিবর্তনীয়। নীচের আলোচনা থেকে জানতে পারবেন এই ধারণা ঠিক নয়।

২২.২ সুলতানি শাসনে ভারতীয় সমাজের ওপর ইসলামীয় প্রভাব

তুর্কিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং স্থানীয় রাজা-মহারাজা, বিশেষভাবে রাজপুত রাজাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হলে গুপ্ত-পরবর্তী যুগ থেকে ব্রাহ্মণরা যে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছিল তার অবসান হতে থাকে। এর ফলে বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রভাব শিথিল হয়েছিল কিনা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এটা ঠিক যে নিম্নবর্ণের লোকেরা ইসলাম ধর্মের সমতা ও ভ্রাতৃত্ব বোধে আকৃষ্ট হতে থাকে। এই সময়ে নতুন শহরগুলিতে গ্রামাঞ্চল থেকে অনেক কারিগর ও মিস্ত্রি চলে আসে। প্রাক্ মুসলিম যুগে রাজা-রাজড়া সামন্ত ও হিন্দু মন্দিরগুলি নানাভাবে এদের কর্মসংস্থান করত। নতুন শহরে জীবনধারণের সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক বেশি হওয়ায়, শহরগুলির লোকসংখ্যা বাড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকেদের উপর উচ্চ বর্ণের প্রভাব আগের মত কঠোর হওয়া সম্ভব ছিল না। এই সমস্ত লোকেদের ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য সুলতানি আমলে সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের প্রসার হয়। আপনারা এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে নীচে জানতে পারবেন।

সুলতানি শাসনে আদায়ীকৃত রাজস্বের এক বড় ভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শহরবাসী ইকতাদার বা মুক্তি ও আমীর ওমরাহ এবং উলেমাদের হাতে চলে যায়। তারা আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করত, অনেকেই বিলাসী পণ্য উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন করে বহুসংখ্যক ক্রীতদাস নিয়োগ করে। ভারতীয় সমাজে উচ্চধনীদের জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য আগেও ছিল, সব সমাজেই থাকে, কিন্তু মধ্যযুগে এই পার্থক্য আরও ব্যাপক ও উগ্রভাবে প্রকাশ পায়। ক্রীতদাস প্রথার কথাই ধরা যাক। ভারতীয় সমাজে আগেও ক্রীতদাস ছিল। কিন্তু তুর্কি আমলে এদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। সাধারণত যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস করা হত। শহরাঞ্চলের বাজারেও বাইরের দেশ থেকে ক্রীতদাস আমদানি করে কেনা-বেচা হত। অনেক সময় শিশু ক্রীতদাস কিনে তাদের নপুংসক করে ভবিষ্যতে হারেমে কাজ দেওয়া হত। সুন্দরী ক্রীতদাসীদের ভোগের সামগ্রী হিসাবে অন্য কদরও ছিল। বেশি সংখ্যায় পরিচারক-পরিচারিকা এবং ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী রাখা অভিজাতদের সামাজিক মর্যাদার

পরিচয় ছিল। মুসলমান অভিজাতদের দেখাদেখি হিন্দু অভিজাত ব্যক্তিরাও গার্হস্থ্য কাজে বহুসংখ্যায় ক্রীতদাস নিয়োগ করা আরম্ভ করলেন। লোকের এমন ধারণা হল যে ক্রীতদাসরা কায়িকশ্রম করবে আর অভিজাতরা মানসিক বা যা কিছু চিন্তা-ভাবনার কাজ করবে। অবশ্য তারা যুদ্ধেও যেত। সাধারণভাবে বলা যায় কায়িক শ্রম বিমুখতা ও মানুষকে যথোচিত মর্যাদা দানের নীতিজ্ঞানের অভাব মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতে ঋগবেদের যুগে স্ত্রীলোকেরা সংসার-পরিচালনায় পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। শাস্ত্রকাররা স্ত্রীলোকের ভূমিকা সম্পর্কে লেখেন, পুত্রলাভের জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন। স্ত্রীলোকেদের মধ্যে ঘোমটা দেওয়া রীতি প্রচলিত হয়। মুসলমান শাসনের আগে ভারতীয় নারীরা ঘোমটার ব্যবহার করত। সুলতানি শাসনে পর্দার ব্যবহার শুরু হয়।

পর্দা কথাটার অর্থ আড়াল। অভিজাত মুসলমানেরা তাদের সম্ভ্রান্ততার প্রতীক হিসাবে হারামে পর্দার ব্যবহার করত। ইসলাম ধর্মে একের বেশি বিয়ে স্বীকৃত ছিল। বিত্তবানেরা একাধিক স্ত্রী ছাড়াও বহু দাসী-বাঁদী রাখত। পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে এদের লুকিয়ে রাখার জন্য হারামে পর্দার প্রয়োজন হয়। হিন্দু অভিজাত পরিবারও অভিজাত মুসলমানদের অনুকরণে পর্দা ব্যবহার শুরু করে, অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি শাসনের অনিশ্চয়তা ও বিধর্মীদের হাত থেকে আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদে। তবে মনে রাখতে হবে যে চাষী বা খেটে খাওয়া পরিবারের সাধারণ মেয়েরা কি হিন্দু কি মুসলমান লম্বা ঘোমটা ব্যবহার করত না বা পর্দার আড়ালে নিজেদের গোপন রাখত না। অবশ্য অনেক সময় সাধারণ মুসলমান পরিবারের মেয়েরা বোরখা পরে গ্রামে বা শহরে ঘুরত।

আপনারা সবশেষে জানুন হিন্দুদের জনপ্রিয় আমোদ-উৎসবের ওপর ইসলামের প্রভাব এবং ইসলামী উৎসবের ওপর ভারতীয় প্রভাবের কথা।

হিন্দুদের জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে পড়ে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব। নীচে ভক্তি আন্দোলনের আলোচনা পড়তে গিয়ে দেখবেন ভক্তিসাধকদের প্রভাবে এই দুই মহাপুরুষের প্রতি মুসলমানেরাও ভক্তি নিবেদন করছে। হিন্দুদের অন্যান্য জনপ্রিয় আমোদ-উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বসন্ত উৎসব, হোলি, শিবরাত্রি, দেওয়ালি প্রভৃতি। রাজনৈতিক পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা ব্যক্তিগত দুর্দশা সত্ত্বেও ঐ সব উৎসবের ধারা বন্ধ হয়নি বা লোকের আনন্দ-উৎসবে ভাঁটা পড়েনি। ইসলামের আবির্ভাবে হিন্দু জনপ্রিয় উৎসবের প্রকৃতি বদলায়নি, বরং বহিরাগত হিন্দুদের উৎসবাদিকে আরও বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে। এর কারণ বোধহয় অল্প লোকই উৎসবে ধর্মীয়ভাবে মূল্য দেয়। বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে এগুলির আবেদন এই কারণেই যে এইগুলি সামাজিক মেলামেশা ও হই-হুল্লোড়ের সুযোগ দেয়। সলুতানি আমল থেকেই মুসলমান রাজা থেকে অনেক সাধারণ মুসলমানও হোলি, দেওয়ালি উৎসবে অংশ নিত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইসলাম ধর্মে সাধারণত সব ধর্মীয় উৎসবেরই পরিবেশ ছিল গুরুগম্ভীর ও অনাড়ম্বর। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশে এইসব অনুষ্ঠানের পরিবেশ বদলাতে থাকে। নওরোজ হত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়—নদীতীরে বিশাল বাগিচায়, ফুলে ফুলে, গানে গানে আতসবাড়ি জ্বালিয়ে। বড়লোকদের উৎসব হলেও এর বাহ্যিক আড়ম্বর সব শ্রেণীর লোককে আকৃষ্ট করত। শবেবরাত বা পাপপুণ্য লিপিবদ্ধ করার রাত হল মুসলমানদের পবিত্র অনুষ্ঠান। অনেকের মতে হিন্দুদের শিবরাত্রির অনুকরণেই এই অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ঐ দিন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পড়ে রাত কাটাত, কিন্তু সাধারণত মুসলমানেরা উল্লাস ও আতসবাড়ি ফাটিয়ে ঐ উৎসব পালন করত। মহরমের বিষণ্ণতা এক বিশেষ শ্রেণীর মুসলমানদেরই প্রভাবিত করে। অধিকাংশই শোভাযাত্রাসহ আড়ম্বর ও উল্লাসের মধ্যে ঐ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করত এবং হিন্দুরাও তাতে অংশ নিত। বছরের কোন নির্দিষ্ট দিনে বিখ্যাত

পীরদের সমাধিস্থল দর্শন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উরস উৎসবের অঙ্গ। যেহেতু খ্যাতনাম পীরদের হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকেরাই সম্মান করত, সেইহেতু উরসকে কেন্দ্র করে মুসলমানেরা যে সামাজিক মেলামেশা ও আনন্দ-উৎসব করত তাতে হিন্দুরাও যোগ দিত। এছাড়াও সুলতানি আমলে হিন্দুরা মুসলমানদের বেশভুষা ও খানাপিনার অনুকরণ শুরু করেছিল। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে রাজনৈতিক বিদ্বেষ সত্ত্বেও বহুদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে সুলতানি আমলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে ধীরে ধীরে সামাজিক সমন্বয় গড়ে উঠে।

২২.৩ সুফিবাদ

এই অংশটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন কিভাবে সুফিবাদের উদ্ভব হয়, সুফি সাধকদের ধর্মমত, সুফদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাদের প্রচারের ধারা, সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সুফিদের বিস্তার ও ইসলাম ধর্ম প্রচারের বিবরণ। পণ্ডিতেরা ‘সুফি’ কথাটার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন কথাটা এসেছে ‘সাফা’ বা পবিত্রতা থেকে, কেউ বলেন ‘সুফি’ এসেছে ‘সাফ্‌ফা’ থেকে যার অর্থ কম্বলপরিধানকারী ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনকারী সন্ত। সুফিবাদের উদ্ভব হয় ইসলাম ধর্মের মধ্য থেকেই। সুফিরা ধর্মগুরু মহম্মদ ও ধর্মগ্রন্থ কোরাণকে মেনে নেয় কিন্তু মুসলমান ধর্মাচার্যদের (উলেমা) দেওয়া কোরাণ এবং শরিয়তের বহু শ্লোকের ব্যাখ্যায় একমত নয়। সুফি দর্শনের মূল কথা ঈশ্বর উপলব্ধি। প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুভূতিই সুফিবাদের মূল লক্ষ্য। তারা অতীন্দ্রিয়বাদ (mysticism)-এ বিশ্বাস করত।

আরব, পারস্য, বাগদাদ, খোরাসান প্রভৃতি পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সুফিবাদের জন্ম হয় খ্রিস্টিয় অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে। ক্রমে সুফিরা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে, সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই তারা ভারতবর্ষে আসা শুরু করে। সুফিদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল, যেমন সুরাবর্দি চিস্তি, কাদিরি নকসা বন্দী প্রভৃতি। এক এক গুরু বা পীরের নেতৃত্বে এক এক সম্প্রদায় বা সিলসিলাহ গঠিত হয়েছিল। এদের সকলেরই উদ্ভব ভারতবর্ষের বাইরে।

সুরাবর্দি সিলসিলাহ-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেখ শিহাবুদ্দিন সুরাবর্দি (মৃত্যু ১২৩৪ খ্রিঃ)। চিস্তি সিলসিলাহ-এর প্রতিষ্ঠাতা শেখ মইনুদ্দিন চিস্তি (মৃত্যু ১২৩৬ খ্রিঃ)। কাদিরি সিলসিলাহ প্রতিষ্ঠা করেন শেখ আবদুল কাদের জিলানী (মৃত্যু ১১৬৮ খ্রিঃ) ও নকসাবন্দী সিলসিলাহ-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাহাউদ্দিন নকসাবন্দী (মৃত্যু ১৩৯৮ খ্রিঃ)।

২২.৩.১ সুফিবাদের বৈশিষ্ট্য

আপনারা এবার সুফিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে নিন।

প্রত্যেক সুফি সম্প্রদায়ই মনে করতেন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন বা অনুভূতি পেতে হলে কতকগুলি ধারা (তারিখা) মানতে হবে। প্রথম যিনি সম্প্রদায়ে যোগ দিচ্ছেন তাঁকে কতকগুলি পর্যায়ের (দশা) মধ্য দিয়ে যেতে হবে। একজন পীর (বা মুর্শেদ) এর কঠোর তত্ত্বাবধানে পর্যায়গুলি অতিক্রম করে ধর্মের গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে। অধিকাংশ সুফিই ধর্মীয় গান (সামা) গাওয়াতে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা অনেক সময় গান গাইতে গাইতে ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হয়ে জ্ঞান হারাতেন। গোঁড়া উলেমারা সামা বিরোধী ছিলেন। সুফি সাধকরা যেখানে অবস্থান করতেন সেগুলিকে বলা হত খানকাহ। খানকাহগুলো বেশিরভাগই শহরের প্রান্তে স্থাপিত হত। এক-

এক পীরের এক-একটা পৃথক খানকাহ। ভক্তরা এখানে ভীড় করত পীরদের মুখ থেকে ধর্মের বাণী শোনার জন্য। ব্যক্তিগত দান বা রাষ্ট্রে বদান্যতার ওপর নির্ভর করে খানকাহ-এর ব্যয় সঙ্কুলান হত।

২২.৩.২ ভারতে সুফিবাদের বিস্তার

নীচের অংশটি পাঠ করলে জানতে পারবেন এদেশে বিশেষ যে সুফি সম্প্রদায়গুলি প্রভাবশালী বা জনপ্রিয় হয়ে উঠে তাদের কথা।

দ্বাদশ শতকের মধ্যেই ইরান, ইরাক, খোরাসান প্রভৃতি দেশে সুফি সম্প্রদায়গুলি সুসংগঠিত হয়। এরপর এক-একটি সিলসিলাহ তাদের প্রচারক পাঠাতে থাকে দেশে-বিদেশে। ভারতে যে সিলসিলাহ বিশেষ প্রভাবশালী হয় সেটি ছিল সুরাবর্দি সিলসিলাহ। ভারতে এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (১১৮২-১২৬২)। শেখ বাহাউদ্দিন দিল্লির সুলতান ইলতুতমিসের সময় প্রথমে মুলতানে আসেন। মুলতান তখন ইলতুতমিসের প্রতিদ্বন্দ্বি কুবাচার দখলে। কুবাচার শাসনের সমালোচনা করায় কুবাচার সঙ্গে বাহাউদ্দিনের বনিবনা হয়নি। তিনি তখন ইলতুতমিসের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। সুরাবর্দি সিলসিলাহ প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে এবং শাসকশ্রেণীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার চেষ্টা করে। ইলতুতমিস তাঁকে শেখ-উল-ইসলাম (ইসলাম ধর্মের নেতা) পদবী দেন। সুরাবর্দি সিলসিলাহ সিন্ধু, গুজরাট, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এরা ভারতে মুসলিম ধর্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এদের এক শিষ্য শেখ জালালুদ্দিন তাব্রিজি বঙ্গে খানকাহ স্থাপন করেন। বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনে তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল। এদের খানকাহ-এর সঙ্গে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। গরীব লোকেরা সেখানে নিয়মিত খাবার পেত। সুরাবর্দি সিলসিলাহ-এর এক শাখার নাম ফিরদৌসী। এদের নেতা শেখ শরীফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরী চৌদ্দ শতকে বিহারের রাজগীরে খানকাহ স্থাপন করে বিহারে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

সুরাবর্দি সিলসিলাহ প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করেছিল এবং শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলত। এদের ঠিক বিপরীত নীতি নিয়েছিল চিস্তি সিলসিলাহ। ভারতে চিস্তি সিলসিলাহ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত দানের ওপর নির্ভর করে এই সিলসিলাহ গড়ে উঠে। ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও ভারতীয় ও ইসলামীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথা বলতে গেলে এদের নাম সবার আগে করতে হবে।

চিস্তি সিলসিলাহ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথমে আফগানিস্থানের হিরাটে। এদের নেতা খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের পর এদেশে আসেন এবং আনুমানিক ১২০৬ সালে আজমীর-এর স্থায়ীভাবে খানকাহ স্থাপন করেন। খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির উদার চিত্ত এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষ সকলকে আকৃষ্ট করে। মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁকে নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করে।

মইনুদ্দিন চিস্তির দুই শিষ্য খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি এবং শেষ হামিদউদ্দিন নাগৌরি যথাক্রমে দিল্লি ও রাজস্থানের নাগোরে খানকাহ স্থাপন করেন। নাগৌরি সাধারণ রাজস্থানী কৃষকের মত জীবনযাপন করতেন, নিরামিষ ভক্ষণ করতেন ও সব সময়ে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের পরিহার করে চলতেন। তিনিই প্রথম পার্শী ভাষায় লেখা সুফি কবিতা হিন্দাভিতে (উর্দুর আদিরূপ) অনুবাদ করেন।

দিল্লিতে খাজা কুতুবউদ্দিন কাকির উত্তরাধিকারী ছিলেন খাজা ফরিদউদ্দিন মাসুদ (১১৭৫-১২৬৫)। তিনি বাবা ফরিদ নামেই বেশি পরিচিত। বাবা ফরিদ তাঁরা পূর্বসূরীদের মত ক্ষমতাসীন ও ধনী লোকেদের কাছ থেকে দূরে থাকতেন। তিনি দিল্লি থেকে চলে এসে পাঞ্জাবে তাঁর খানকাহ স্থাপন করেন। নাথপন্থী যোগীরা প্রায়ই

তাঁর আস্তানায় আসতেন এবং মরমীবাদ (mysticism) নিয়ে আলোচনা করতেন। পাঞ্জাবে বাবা ফরিদ এমনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেন যে তিনশ বছর পর যখন শিখদের ধর্মপুস্তক আদিগ্রন্থ রচনা করা হয় তখন তাঁর অনেক দোঁহা এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ও তাঁর কবরস্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

চৌদ্দ শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত চিস্তি শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া (১২৩৬-১৩২৫) ফরিদের শিষ্য ছিলেন। খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সময় দিল্লির চিস্তি খানকাহ্-এর খ্যাতি দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক বারাণী এবং কবি আমীর খসরুর লেখায় সে বিবরণী পাওয়া যায়। আমীর শসরু নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া সাতজন সুলতানকে (নাসিরুদ্দিন থেকে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক) দিল্লির সিংহাসনে বসতে দেখেছেন কিন্তু তিনি কোনদিন রাজদরবারে যাননি, বা কোন রাজপুরুষের আনুকূল্য গ্রহণ করেননি। তার লঙ্গারখানায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই আহার গ্রহণ করত। নাথপন্থী যোগীরা তাঁর খানকাহ্‌য় নিয়মিত যেত— চিস্তিরা নাথেদের অনেক যৌগিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। মহম্মদ তুঘলকের সময় দিল্লির খানকাহ্‌গুলো কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং চিস্তি সাধকদের জোর করে দৌলতাবাদে পাঠান হয়। এক চিস্তি সাধক শেখ বাহাউদ্দিন ঘারীব দৌলতাবাদে তাঁর খানকাহ্ স্থাপন করেন।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর এক শিষ্য নাসিরুদ্দিন মাহমুদ দিল্লিতে খ্যাতিলাভ করেন। দিল্লির লোকেরা তাঁকে 'চিরাগ-ই-দিল্‌হী' (দিল্লির প্রদীপ) বলে সম্মান জানাত। নাসিরুদ্দিন চিস্তিদের উপাসনার ধারায় কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। উলেমাদের তিনি সামা গানের বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত করারও চেষ্টা করেন।

সুরাবর্দ্দি, ফিরদৌসী ও চিস্তি সম্প্রদায় ছাড়া আর যে সব সম্প্রদায় ভারতে সুফিবাদ প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় তাদের মধ্যে কাদিরি সিলসিলাহ্-এর নাম করতে হয়। বাগদাদে শেখ আবদুল কাদির জিলানি প্রতিষ্ঠিত কাদিরি সিলসিলাহ ভারতে খানকাহ স্থাপন করে চৌদ্দ শতকে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে এরা ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মীয় অবস্থানে এদের সঙ্গে গোঁড়া উলেমাদের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। কাদিরিরা শাসকশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত এবং রাষ্ট্রের আনুকূল্য গ্রহণ করতে দ্বিধা করত না।

কাশ্মীরে সুফি সাধকরা প্রথমে ইসলাম ধর্ম প্রচারে নামেন মীর সৈয়দ আলি হামদানির নেতৃত্বে চৌদ্দ শতকে। কিন্তু তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। পরে স্থানীয় এক সুফি-সন্ত শেখ নুরউদ্দিন ওয়ালি (মৃত্যু ১৪৩০) সুফি ধর্ম প্রচারে অগ্রসর হন। নুরউদ্দিন ওয়ালির মতবাদের সঙ্গে কাশ্মীরী শৈব সাধিকা লালদেদের মতবাদের বহুলাংশে মিল ছিল। তাই কাশ্মীরের গ্রাম্য পরিবেশে নুরউদ্দিন সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

২২.৪ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ী ভাবনা

আপনারা জেনেছেন যে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় অষ্টম-দ্বাদশ শতকে ইসলাম ধর্মের মধ্য থেকেই সুফিবাদের উদ্ভব হয় এবং ক্রমে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যে সব দেশে সুফিবাদের প্রসার হয় ঐ সমস্ত দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার-আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুফিবাদ এক-এক দেশে এক-একভাবে বিকাশলাভ করে। ভারতে সুলতানি আমলে সুফিবাদ সারা দেশে শত-শত খানকাহ্-এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রের উদ্যোগ ছাড়াই জনসাধারণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে বড় ভূমিকা নেয়। সুফি সাধকদের

অনাড়ম্বর, পবিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবন-প্রণালী ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত খানকাহ্গুলিতে গরিব লোকেরা ভিড় করত তাদের ধর্মীয় বাসনা চরিতার্থ করার আশায়। খানকাহ-এর সাধকরা গরীবদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁরা সাধারণের ভাষা আয়ত্ত করে এবং স্থানীয় গল্প-গাথা ও প্রতীকীর (imageries) সাহায্যে ধর্মের তত্ত্ব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। ভক্তদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই থাকত। এইভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব কমে আসে।

সুফিরা ভারতীয় ধর্মাচরণের অনেক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। পীর এবং গুরুর ভূমিকা তুলনীয়। প্রথম যারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আসত খানকাহ্তে তাদের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হত। নাথ যোগীরা প্রায়ই খানকাহ্তে যাতায়াত করত। সুফিরা অনেকে নাথদের প্রাণায়াম পদ্ধতি গ্রহণ করে উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মাচরণে মরমীবাদ (mysticism) প্রাধান্য পায়। 'সামা' গানের সঙ্গে হিন্দুদের ধর্ম সঙ্গীত গাইবার পদ্ধতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গান গাইতে গাইতে ভগবদ চিন্তায় বিভোর হয়ে চেতনা হারানো হিন্দু-মুসলমান ধর্মচর্চার অঙ্গ হয়।

সামাগান থেকে কাওয়ালি সঙ্গীতের উদ্ভব হয়। আমীর খসরু এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেন। স্থানীয় ভাষায় ধর্ম প্রচারের ফলে সুফি প্রচারক বিশেষভাবে চিস্তি সাধকদের মাধ্যমে হিন্দাভি ভাষা গড়ে উঠে। হিন্দাভি থেকেই উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। হিন্দীতে লেখা মুসলমান কবি মোল্লাদউদ-এর (চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লেখা) 'চান্দায়ণ'-এর পার্শী ভাষায় অনুবাদ হয়।

এইভাবে সুলতানি আমলে সুফিবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে উঠে।

২২.৫ ভক্তি আন্দোলন

মোক্ষলাভের জন্য অথবা উপাস্য দেবতার প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য ভক্ত তার দেবতার কাছে একান্তভাবে যে আত্মনিবেদন করে তাকেই ভক্তি বলে। সব ধর্মের মধ্যেই ভক্তির ধারণা খুঁজে পাওয়া যায়। হিন্দুদের শাস্ত্র-গ্রন্থে বিশেষভাবে গীতায় ভক্তির আলোচনা আছে। দক্ষিণ ভারতে সপ্তম থেকে দশম শতকের মধ্যে সমাজের উঁচু-নীচু সব শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রথম ভক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। দশম শতকের পর এই আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয় এবং একাদশ শতকে রামানুজ এবং পরে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য আচার্যগণ ভক্তি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা শুরু করেন। সুলতানি আমলে সুফি সাধকদের চেষ্টায় ইসলাম ধর্মে বিস্তার হয়, অন্যদিকে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে শহরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে কারিগর মিস্ত্রিরা এসে শহরে ভিড় করে। স্বভাবতই তাদের ওপর উচ্চবর্ণের সামাজিক কর্তৃত্ব কঠোর হওয়া সম্ভব ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ভারতে বিভিন্ন ভক্তি মতবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কবীর, রুইদাস, দাদুদয়াল, নানক প্রভৃতি সাধকরা এইসব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের মূল কথা একেশ্বরবাদ (monotheism) ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় আচার-আচরণের বিরোধিতা (non-conformism)। প্রাক্-মুসলমান যুগের দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে কিছু কিছু মিল থাকলেও উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলন ছিল নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র। একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিরোধী ভক্তি আন্দোলন ছাড়াও পূর্বভারতে ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে আর এক ধরনের ভক্তি আন্দোলনের সূচনা হয় যাকে আমরা বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন বলতে পারি। নীচের আলোচনা থেকে আপনারা প্রাক্-মুসলিম যুগের দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলন, সুলতানি আমলে উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলন ও বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারবেন।

২২.৫.১ দক্ষিণ ভারতে প্রাক্‌-মুসলিম যুগে ভক্তি আন্দোলন

সপ্তম থেকে দশম শতকে দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলন দুটো ধারায় প্রভাবিত হয়েছিল—বৈষ্ণব আলভার বা আলোয়ার আন্দোলন ও শৈব নায়নার আন্দোলন। আলভার আন্দোলন বিষ্ণুর উপাসনাকে কেন্দ্র করে এবং নায়নার শিবের উপসনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। আলভার ও নায়নার আন্দোলন দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই সমস্ত ভক্তিবাদের প্রচারকরা সমাজের নীচুস্তরের লোকেদের মধ্য থেকে উঠে এসেছিলেন। তাঁরা সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণের কথ্য ভাষায় প্রচার করতেন এবং নাচ-গান করতে করতে ভাবাবিষ্ট হয়ে সমাজের উঁচু-নিচু, স্ত্রী-পুরুষ সব লোকেদেরকেই ধর্মের বাণী শোনাতেন। ধর্মানুষ্ঠানের গোঁড়ামি তারা অস্বীকার করেন এবং নিম্নবর্ণের লোকেদেরও ধর্মাচরণের অধিকার দেন। সকল বর্ণের লোকেদেরই বেদপাঠের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। এইসব ভক্তি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব খর্ব করা। তবে আলভার ও নায়নাররা ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে সমতা আনার চেষ্টা করলেও বেদ-ব্রাহ্মণকে অস্বীকার করেননি বা মূর্তিপূজাও বাতিল করেননি। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা সাধারণের ভাষা তামিলভাষা ব্যবহার করে, সকলকে ধর্মাচরণের অধিকার দিয়ে, পুরোহিতের সাহায্য ব্যতিরেকে আরাধ্য দেবতার কাছে ভক্তি নিবেদনের পদ্ধতি প্রচার করেন। দক্ষিণ ভারতের এই আন্দোলন দশম শতাব্দীতে গতি হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে যায়। একাদশ শতকে রামানুজ এবং পরে নিম্বার্ক, মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ আচার্যরা দার্শনিক স্তরে ভক্তির ব্যাখ্যা দেন। ঈশ্বর উপাসনার অঙ্গ হিসাবে ভক্তি নতুন করে স্বীকৃতি পায়। এইসব আচার্যরা ভাগবত পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্তা) ও জীবের সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। তাঁদের মতবাদের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠে।

দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলন এবং উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন রামানন্দ। এবারে আপনারা উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

২২.৫.২ সুলতানি আমলে উত্তর ভারতে একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-বিরোধী ভক্তি আন্দোলন

সুলতানি আমলে চৌদ্দ ও পনের শতকে উত্তর ভারতে যে ভক্তিবাদের প্রচার হয় তার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের প্রায় সব সাধকই কোন না কোনওভাবে দক্ষিণের সাধকদের কাছে ঋণী ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক সমতার ভিত্তিতে ও প্রেম-ভক্তি দ্বারা উপাস্য দেবতার আরাধনার কথা প্রচার করা হয়। উভয়ই সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু মিল ঐ পর্যন্তই। উত্তর ভারতে এক বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব। ফলে উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলন ভিন্নপথে এগিয়ে চলে।

আগেই জেনেছেন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছিলেন রামানন্দ। রামানন্দ দক্ষিণ ভারত থেকে এসে বারাণসীতে তাঁর আশ্রম স্থাপন করেন। বারাণসীতে তখন সাধু-সন্তদের ভিড়। রামানুজীয় ভক্তিতত্ত্বে তাঁর গভীর জ্ঞান তাঁকে সহজেই বারাণসীর সাধু সমাজে জনপ্রিয় করে তোলে। রামানন্দের ভক্তিবাদ উদারতা ও মানবতাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ চলতি ভাষা হিন্দীতে তিনি রামভক্তি প্রচার করেন। ব্রাহ্মণ, অস্পৃশ্য, বিদ্বান, নিরক্ষর নারী ও পুরুষ সব মানুষই তার শিষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন। উত্তর ভারতের অধিকাংশ ভক্তিবাদী ও মরমিয়া সাধক তাঁর ভাবধারায় প্রভাবিত হন। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন মুসলমান জোলা কবীর, চর্মকার রুইদাস (বা রবিদাস), ক্ষৌরকার সেন, জাঠ শাদক ধন্না এবং মহিলা সাধকদের মধ্যে পদ্মাবতী, সুরেশ্বরী প্রভৃতি। বিশিষ্ট হিন্দীকবি ও সাধক তুলসীদাস রামানন্দের উত্তরসাধক। সব সাধকই হিন্দীর নানা উপভাষায় শিষ্যদের উপদেশ দিতেন এবং সহজবোধ্য ছোট ছোট কবিতায় (দোঁহা) বাণী রচনা করেন।

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন কবীরদাস। কবীরই রামানন্দের উদার ধর্মমত উত্তর ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে দেন।

বারাণসীর এক গরিব মুসলমান জোলার ঘরে কবীরের জন্ম। বাবা নিরু ও মা নিমা কাপড় বুনে কোনওভাবে সংসার চালান। উত্তর ভারতের এই জোলারা কয়েকপুরুষ আগেও ছিলেন হিন্দু, নাথ-যোগীদের শিষ্য। পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। পরিবারে আগের ধর্মজীবনের ঐতিহ্য কিছুটা থেকেই যায়।

বারাণসীতে তখন বহু সাধু-সন্তদের আনাগোনা। ছেলেবেলা থেকেই ধর্মপ্রাণ কবীর এদের সঙ্গ পাবার চেষ্টা করতেন। এইভাবেই তিনি উদার সাধক রামানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামানন্দ তাঁকে রাম মন্ত্রে দীক্ষা দেন। কবীরের জীবনে আসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। তিনি ভগবতপ্রেমে বিভোর হয়ে দিনরাত নাম জপ করতে থাকেন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য সাধনা শুরু করেন। রামানন্দের শিষ্য হলেও কবীরের রামভক্তি রামানন্দের রামভক্তি থেকে ছিল স্বতন্ত্র। কবীরের রাম অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম নন, কবীরের নাম নির্গুণ ঈশ্বর। সেখানে 'রাম' 'রহিমে'র পার্থক্য নেই। কবীর একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, সমসাময়িক দুই প্রধান ধর্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। নিরন্তর নাম জপের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব, এমনি এক মরমিয়াবাদ কবীর প্রচার করেন। কবীর অসংখ্য দোঁহা বা 'সাথী' রচনা করে গেছেন। হিন্দিতে লেখা এই দোঁহাগুলি সাধারণের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। এইসব দোঁহাতে সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষ এবং পুরোহিত ও উলেমাদের নানাভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই শ্লেষাত্মক রচনাগুলি হিন্দি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কবীর উত্তর ভারতের বহুস্থান ঘুরে বেড়ান এবং বহু আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। ফলে তাঁর লেখার মধ্যে নানা অঞ্চলের কথিত ভাষার শব্দ ও সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা উপমা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সমসাময়িক সাধকদের মধ্যে কবীরের স্থান খুব উঁচুতে। রুইদাস, দাদুদয়াল প্রভৃতি সাধক কবীরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। শিখ ধর্মের আদি গ্রন্থেও কবীরের দোঁহা স্থান পেয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় গুরু নানকও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

গুরু নানক ছিলেন কবীরের পরবর্তী প্রজন্মের লোক। পাঞ্জাবের লারকানা জেলার তালওয়ান্দী গ্রামে (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) এক সাধারণ ক্ষত্রিয় পরিবারে নানক জন্মগ্রহণ করেন। কবীরের মতই তিনি ভক্তিবাদী মরমী সাধক এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন। নানক যে ঈশ্বরের ভজনা করতেন তিনি নির্গুণ, নিরাকার, অন্তহীন, বর্ণনাতীত নিরংকার, অকাল ও অলখ। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। গুরু নানকের ধর্মচর্চার উপায় হল নিরন্তর ঈশ্বরের ভক্তিমধুর ভজনা ও নামজপ করে যাওয়া। তিনি সমকালীন বহু ভক্তি ও সুফি সাধকদের সঙ্গ লাভ করেন ও ভারতের তীর্থস্থানগুলি ঘুরে বেড়ান। মুসলমান তীর্থস্থান মক্কা, মদিনাও ঘুরে আসেন। শিষ্যদের প্রতি তাঁর উপদেশগুলি পরবর্তীকালে পঞ্চম গুরু অর্জুন আদিগ্রন্থ নামক ধর্মগ্রন্থে একত্রিত করে প্রকাশ করেন। আদিগ্রন্থে বহু ফার্সি শব্দের ব্যবহার আছে। এর থেকে অনুমান করা হয় নানক ফার্সি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। নানক সম্প্রদায়ের লোকেরা 'শিখ' এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সংগঠিত হয়। নানক তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে অঙ্গকে গুরুরূপে মনোনীত করেন। তখন থেকে শিখধর্মে গুরু পরম্পরাবাদ চলে আসছে।

কবীর নানক ছাড়াও উত্তর ভারতে একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিরোধী মরমী সাধকদের মধ্যে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন রুইদাস ও দাদু তাঁদের অন্যতম। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে শিষ্যরা রুইপন্থী, দাদুপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায় গড়ে তোলে।

২২.৫.৩ বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন

আপনারা সাধক রামানন্দের কথা পড়েছেন। বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য—সব মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অধিকার দান এবং সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণের কথিত ভাষায় ধর্মপ্রচার—

রামানন্দ প্রবর্তিত আন্দোলনেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। তাই রামানন্দকেই বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে গণ্য করা হয়। সুলতানি আমলে বঙ্গাদেশে, আসামে, মহারাষ্ট্র অঞ্চলে বৈষ্ণব-ভক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আপনারা পরপর এইসব আন্দোলনের ইতিহাস জানতে পারবেন।

বঙ্গে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন : চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩)

বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের প্রেরণা আসে 'ভাগবত পুরাণ' গ্রন্থ থেকে। চৈতন্যর জন্মের আগেই গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা বঙ্গাদেশে কাব্য ও গানের মধ্য দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। দ্বাদশ শতকে জয়দেব তাঁর সুললিত সংস্কৃতে গীতগোবিন্দ রচনা করেন। বঙ্গে সুলতানি আমলে সমাজের নীচুস্তরের লোকেদের মধ্যে নাথপন্থী ধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। তাছাড়া বৌদ্ধধর্ম বিকৃত হয়ে সহজিয়া ধর্মরূপে জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। এরা নানারূপ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধর্মাচরণ করত। অতীন্দ্রিয়বাদের নামে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার দেখা দিয়েছিল। নাথপন্থী ও সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব চৌদ্দ ও পনের শতকে যথাক্রমে বাংলাভাষায় লেখা চণ্ডীদাসের ও মৈথিলি ভাষায় লেখা বিদ্যাপতির কাব্যে গানে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এইভাবে রাধাকৃষ্ণ ভক্তির একটা ঐতিহ্য বঙ্গে গড়ে উঠেছিল। চৈতন্য জয়দেব—বিদ্যাপতির কাব্য-গানে আকৃষ্ট হলেও নাথপন্থী, সহজিয়া বা সুফিবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ভাগবত পুরাণকে ভিত্তি করেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যর জন্ম। পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। সংসার আশ্রমে চৈতন্যর নাম ছিল গৌরাঙ্গ ও নিমাই। তিনি ছিলেন সুদর্শন, অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ভাগবত পুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভিত্তি করে চৈতন্যর বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলেও ভাগবত পুরাণের বৈষ্ণব ধর্ম ও চৈতন্যর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণভক্তির আলোচনা আছে। চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা রাধা-কৃষ্ণ প্রেমভক্তি। তিনি মনে করেন রাধা ছাড়া কৃষ্ণ অভাবনীয়। চৈতন্যর ভক্তিবাদ প্রচার পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য দিক হল ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণনাম প্রচার, শোভাযাত্রাসহ নগর কীর্তন এবং বাংলা ভাষায় মাধ্যমে প্রচার। এই ধর্মে গুরুর স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জাতি-ধর্ম, উচ্চ-নীচ, মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে এই ধর্ম গ্রহণের অধিকারী। চৈতন্য শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন মুসলমান হরিদাস।

চৈতন্য প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অস্বীকার করেননি, সমাজে ব্রাহ্মণদের উচ্চস্থান মেনে নিয়েছিলেন। দেব-দেবীর পূজা ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান চলতে থাকে। চৈতন্য নিজে জীবন-কালেই শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে পূজিত হন।

চৈতন্যর ভক্তি আন্দোলন বঙ্গের বাইরে বিশেষভাবে উড়িষ্যায় প্রসারলাভ করে। উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলন বড় শহর কেন্দ্রিক হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন ছোট ছোট শহর ও গ্রামে বেশি জনপ্রিয় হয়। গ্রামের ভূস্বামীরা নিজেরা দীক্ষিত হয়ে এই ধর্মের অনুগামীদের সাহায্যে চাষবাসের বিস্তার ঘটায়। এই সময়ের বৈষ্ণবীয় মন্দির নির্মাণ ও গ্রামে গঞ্জের বৈষ্ণব মেলা অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করে।

আসামে ভক্তি আন্দোলন :

উত্তর ভারতে রামানন্দ, কবীর, রুইদাস, পাঞ্জাবে গুরুনানক, বঙ্গে ও উড়িষ্যায় চৈতন্যদেব যেমন ভক্তি ধর্মের জোয়ার এনেছিলেন, তেমনি শঙ্করদেব তাঁর ধর্মপ্রচার ও অধ্যাত্ম সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অনগ্রসর ও বহু-বিচ্ছিন্ন আসামে ভক্তিধর্মের বিপুল জোয়ার আনেন।

শঙ্করদেবের জন্ম হয় এক অ-ব্রাহ্মণ ভুঁইয়া পরিবারে, আসামের নওগাঁর কাছে। তাঁর জন্ম সাল নিয়ে মতভেদ আছে। তাঁর একমাত্র জীবনীকার অনিরুদ্ধের মতে তিনি ছিলেন দীর্ঘজীবী—জন্ম ১৪৬৩ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু

১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে শঙ্কর বার বছর ধরে ভারতের তীর্থস্থানগুলি ঘুরে এসে আসামে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূলকথা এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ হচ্ছেন বিষ্ণু বা তাঁর অবতার শ্রীকৃষ্ণ। এই অদ্বিতীয় পরমপুরুষের চরণেই নিতে হবে 'একান্ত শরণ'। আসামে বিভিন্ন স্থানে সত্র বা মঠ প্রতিষ্ঠা করে 'একান্ত শরণ' ধর্ম প্রচার করা হয়। সত্রগুলির নাম-ঘরে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, নির্ধন মিলিত হয়ে নাম-কীর্তন করত। পরে সত্রগুলি সামাজিক মিলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। শঙ্কর অসমীয়া ভাষায় ভাগবত-পুরাণের সহজবোধ্য ও সুললিত অনুবাদ করেন। এই ভাগবত পুরাণ ও তাঁর লেখা অসংখ্য নাম-কীর্তন অসমীয়া সাহিত্যের উৎসরূপে গণ্য করা হয়।

শঙ্করের সমকালীন আসাম ছিল তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্র। তবে তন্ত্রধর্ম মূলত রাজপুরুষ, পুরোহিত ও উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমিত ছিল। তন্ত্রসাধকেরা প্রায়ই সাধনার নামে ভোগ-ব্যভিচারে লিপ্ত হত। শঙ্কর গভীর মানবতাবোধ প্রচার করেন। তাঁর সংগঠন-নিপুণ প্রচার-কুশল শিষ্যরা জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করেন। স্বাভাবিকভাবেই শঙ্করদেবকে উচ্চবর্ণ ও পুরোহিতদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ তাঁকে আশ্রয় দিয়ে ধর্ম প্রচারে নানাভাবে সাহায্য করেন।

মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলন :

তেরো শতকে মারাঠাদের ধর্মজীবনে দুই ধরনের প্রভাব লক্ষ করা যায়—এক, নাথগোষ্ঠী সাধকদের শৈব প্রভাব; দুই, পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব-ভক্তি প্রভাব। জ্ঞানদেব (১২৭৫-১২৯৬) এই দুই প্রভাবের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন এক ভক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর পবিত্র জীবন, অলৌকিক প্রতিভা ও তাঁর রচিত অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ মহারাষ্ট্রের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপান্তর ঘটায়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে ভাগবত পুরাণের ভাষ্য রচনা করেন। 'অমৃতানুভব' তাঁর এক মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ। এই বই থেকে জ্ঞানদেবের ওপর নাথযোগীদের প্রভাব জানা যায়। তাঁর ভক্তিবাদের পরিণত রূপ পাওয়া যায় 'অভঙ্গ' বা ভক্তিরসাশ্রিত অসংখ্য পদাবলীতে।

পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করে ভক্তির যে জোয়ার জ্ঞানদেব বইয়ে দিয়ে যান তা মহারাষ্ট্রের জনজীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞানদেবের ভক্তি সাধনার ধারা বয়ে একের পর এক আত্ম-প্রকাশ করেন নামদেব (১২৭০-১৩৫০), একনাথ (১৫৩৩-১৫৯৯) ও তুকারাম (১৫৯৮-১৬৫০)।

সুলতানি আমলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাশ্মীরে লালদেদের শৈব ভক্তি প্রচার এবং গুজরাটে কবি-সাধক নরসিংহ মেহতার বৈষ্ণব ভক্তি প্রচার। লালদেদের প্রচার কাশ্মীরে সুফিবাদ প্রচারে সাহায্য করেছিল, নরসিংহ মেহতার প্রচার বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল গুজরাটের জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেদের।

২২.৫.৪ উত্তর ভারতের একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণ বিরোধী ভক্তি আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

উত্তর ভারতের একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণ বিরোধী ভক্তি আন্দোলনগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। আপনারা এই বৈশিষ্ট্যগুলি নীচের অংশ পাঠ করে জেনে নিন।

প্রথমত, ঐ সময়ের বহু সাধকই সমাজের নীচুস্তর থেকে উঠে এসেছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কবীর, রুইদাস, ধন্না, পিপা একে অপরকে চিনতেন এবং অপরের বাণীর উদ্ধৃতি দিতেন। এর থেকে বোঝা যায় এই সাধকদের ধর্মীয় মনোভাবের যথেষ্ট মিল ছিল।

দ্বিতীয়ত, এই সময়ের সাধকরা বৈষ্ণব ধর্ম, নাথ-যোগী ধর্ম বা সুফিবাদের দ্বারা কোনও না কোনভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোনও সাধকই ঐ সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেননি।

তৃতীয়ত, উত্তর ভারতের সাধকরা বৈষ্ণব ভক্তি সাধকদের মতই একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু বৈষ্ণব সাধকরা সগুণ ঈশ্বরের আরাধনা করতেন আর উত্তর ভারতের সাধকরা নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন।

চতুর্থত, উত্তর ভারতের একেশ্বরবাদীরা সমকালীন দুই প্রধান ধর্মের আচার-আচরণে ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বর্ণভেদ বা পৌত্তলিকতা মানতেন না।

পঞ্চমত, এঁরা সাধারণের কথিত ভাষায় তাঁদের উপদেশ দিতেন। তাঁরা তাঁদের বাণী ছোট ছোট কবিতা বা দোঁহা আকারে লেখার সময় উত্তর ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত শব্দ, উপমা ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন যাতে বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তরা তাঁদের উপদেশ সহজে বুঝতে পারে। তাঁরা প্রত্যেকেই উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর সমাজের নীচু স্তরের লোকেরাই বেশি সংখ্যায় তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই শ্রেণীর মানুষ শত শত বৎসর ধরে তাঁদের স্মরণ করে আসছে।

ষষ্ঠত, উত্তর ভারতের সাধকরা কেউই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাননি। সকলেই গার্হস্থ জীবন যাপন করেছেন। তাঁরা পরস্পরকে এবং শিষ্যরা তাঁদেরকে সন্ত বা ভগত বলতেন। শিখদের ধর্মপুস্তক আদিগ্রন্থ-এ কবীর, রুইদাস, ধন্না, পিপা, নামদেব সবাইকে 'ভগত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তমত এবং সবশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, কবীর রুইদাস, দাদুদয়াল বা নানকের ভক্তরা কালক্রমে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় বা পন্থ-এ সংগঠিত হয়। এঁদের মধ্যে কেবল নানক পন্থীদের সংখ্যাই ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কবীর, রুইদাস বা দাদুপন্থীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসে।

২২.৬ ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলী ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়

আপনারা ভারতীয় সমাজের ওপর ইসলামের প্রভাব এবং সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ী ভাবনার কথা জেনেছেন। এখন ভারতীয় স্থাপত্য রীতির সঙ্গে ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে সুলতানি আমলে যে নতুন শিল্পধারা গড়ে উঠেছিল, যাকে পণ্ডিতেরা অনেক সময় ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলী বলে থাকেন তার ইতিহাস জানুন। প্রথমে ইসলামীয় স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্য ও উপাদান এবং পরে ভারতীয় শিল্পরীতির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত শিল্পরীতির ক্রমিক বিকাশের কথা আলোচনা করা হবে।

ইসলামীয় স্থাপত্য রীতি বৈশিষ্ট্য ও উপাদান—

তুর্কিরা আরব-পারস্য-বাগদাদের স্থাপত্য রীতি ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। মরুভূমির দেশ আরবে স্থাপত্যশৈলীর খুব একটা উন্নতি হয়নি। সেখানে নির্মাণকার্য মসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে বাগদাদ ও পারস্যে স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। মুসলমানরা আফ্রিকা, ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার যে সব দেশ জয় করেছিল সেইসব দেশের উন্নত স্থাপত্য রীতি বাগদাদ পারস্যে নিয়ে এসেছিল। এখন এই বাগদাদ-পারস্যের স্থাপত্য রীতি ভারতে আনা হল। ইসলামীয় স্থাপত্যের যে বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা হল খিলান (arch), খিলান যুক্ত ছাদ (vault) এবং গম্বুজের (dome) নির্মাণ। ভারতীয়রা বড় বড় বাড়ির প্রবেশপথে থাম, কাঠ বা পাথরের কড়ি এবং জানলা দরজার গাঁথনির উপর লম্বা পাথর (lintel) ব্যবহার করত। থাম-কাঠ লিনটেল তৈরির প্রথাকে ইংরেজিতে traleeate বলে। তুর্কীরা এই traleeate প্রথার পরিবর্তে archuate অর্থাৎ খিলান, ভল্ট, গম্বুজের ব্যবহার নিয়ে আসে। ভারতীয় স্থাপত্য রীতিতে ছাদ ছিল সমতল (flat)। এর পরিবর্তে খিলানের সাহায্যে তৈরি ছাদ ভল্ট এবং গম্বুজের ব্যবহার শুরু হয়। থামের ব্যবহার কমে আসার ধর্মীয় সমাবেশের জন্য বড় বড় হলঘর তৈরি সহজ হয়।

তুর্কিরা গাঁথনির জন্য এক নতুন আস্তর বা সংমিশ্রণ নিয়ে আসে। চুন, সুরকি ও অন্যান্য উপাদান দিয়ে বিশেষভাবে এই আস্তর তৈরি হত। ভারতে সাধারণত কাদা দিয়ে ইঁট গাঁথা হত বা পাথর টুকরো টুকরো করে কেটে পাশাপাশি বা ওপর ওপর রেখে বড় বড় প্রাসাদ বা মন্দির তৈরি হত। তুর্কিদের ব্যবহৃত আস্তর ভারতীয় আস্তর তুলনায় আরও উঁচুমানের। ফলে খিলান বা গম্বুজ তৈরি সহজ হয়।

সুলতানি আমলে কখনও কখনও মন্দির কিছুটা ভেঙে তার ওপরই মসজিদ তৈরি হত। কখনও কখনও হিন্দু-জৈন মন্দির ভেঙে থাম বা বাড়ির অংশবিশেষ এনে তার ওপর মসজিদ বা বাড়ি তৈরি হত। কিন্তু এইভাবে সংগৃহীত উপকরণের যোগান কমে গেলে ছোট ছোট পাথর (pebbles) বা পাথরের চাঁই এনে (boulder) নতুন বাড়ির ভিত্তি নির্মাণ করা হয় এবং পাথর টুকরো টুকরো কেটে গাঁথনির কাজে লাগানো হয়। খলজী আমল থেকে লাল বেলে পাথরের প্রচলন হয়। লাল পাথরের ওপর অলংকরণের সুবিধা ছিল। তুঘলক আমল থেকে দেওয়ালের গায়ে পলেস্তরার (plaster) প্রচলন হয়। জিপসাম অথবা চুণের বিশেষ সংমিশ্রণে এই পলেস্তরা তৈরি হত। পলেস্তরা ব্যবহারে বাড়িগুলোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

অলংকরণের কাজেও ইসলামী স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। হিন্দু-জৈনদের মন্দিরে দেব-দেবী, মানুষ বা পশুর মূর্তি আঁকা হয়। কিন্তু ইসলামে দেব-দেবী নেই। পশু ও মানুষের মূর্তি আঁকাও নিষিদ্ধ। তাই ইসলামী স্থাপত্যে সুন্দর হস্তাক্ষরে কোরাণের বাণী লেখা হয় (Calligraphy)। অনেক সময় লতাপাতা ফুল এঁকে দেওয়াল সাজানো হত। লতাগুলো শুরু হয়ে ছন্দোবদ্ধভাবে নানা শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে আবার মূল লতায় মিশে যেত (foliage)। তাছাড়া নানা জ্যামিতিক আকার—যেমন বৃত্ত থেকে ত্রিভুজ, চতুর্ভুর্জ বা বহুভুজ—আবার বৃত্তে মিশে যাওয়া অলংকরণে ব্যবহার হত। আপনারা ইসলামী স্থাপত্যরীতির উপাদান ও অলংকরণের কথা জানলেন এবারে এই স্থাপত্য রীতির সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণের বিবরণ পাঠ করুন।

তুর্কিরা এদেশে পশ্চিম এশিয়া থেকে স্থপতি বা বাড়ি তৈরির কারিগর কদাচিৎ আনতেন। তাদের ভারতীয় কারিগর-মিস্ত্রির ওপরই বেশি করে নির্ভর করতে হত। ভারতীয় মিস্ত্রিরা পুরুষানুক্রমে অর্জিত নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রাসাদ বা মসজিদ গড়ত। ফলে অনিবার্যভাবে মুসলমানী স্থাপত্য রীতির ওপর ভারতীয় স্থাপত্য রীতির ছাপ পড়ে। উভয় স্থাপত্য রীতিতেই অলংকরণের প্রাচুর্য ছিল। ধীরে ধীরে তুর্কিরা ভারতীয় অলংকরণ পদ্ধতি যেমন পদ্মফুলের ব্যবহার অনুকরণ করে। তুর্কি আমলের শেষের দিকে প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিতে যে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ হয় তাতে স্থানীয় উপকরণ এবং ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয় আরও গভীর হয়। বঙ্গদেশে কুটিরে বা মন্দিরে দো-চালা চৌ-চালার ব্যবহার হত। মসজিদ গঠনের আঙ্গিকে পরিবর্তন হয়ে বঙ্গে দো-চালা, চৌ-চালার অনুকরণে মসজিদ তৈরি হতে লাগল। জৌনপুরের স্থাপত্য রীতিতে হিন্দু স্থাপত্য রীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে মসজিদগুলির গম্বুজে হিন্দুরীতির প্রভাব চোখে পড়ে। কাশ্মীরের স্থাপত্য শিল্পের প্রধান উপাদান স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কাঠ। সুলতানি আমলের পূর্বেই গুজরাটে এক নূতন স্থাপত্য রীতি গড়ে উঠেছিল। সুলতানি যুগের স্থাপত্যে আগেকার স্থাপত্য রীতির ছাপ—যেমন অধিক সংখ্যায় স্তম্ভ নির্মাণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

সবশেষে আপনারা ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতি বিকাশের পর্যায়গুলি জেনে নিন।

প্রথম পর্যায় শুরু হয় দাস সুলতানদের সময়ে দিল্লী বিজয়-এর পরে (১১৯২ খ্রিঃ)। রায় পিথৌরা কেল্লা দখল করে দিল্লীর উপকণ্ঠে নতুন দিল্লী শহর নির্মাণে হাত দেওয়া হয়। এখান কুতুবউদ্দিন কু-ওয়াটুল মসজিদ নির্মাণ করেন। শোনা যায় সাতাশটি হিন্দু ও জৈন মন্দির ভেঙে, তাদের অংশবিশেষ দিয়ে এটি গঠিত। হিন্দু মিস্ত্রিরাই তৈরি করে ফলে সমগ্র স্থাপত্য কীর্তির ওপর ভারতীয় স্থাপত্য রীতির ছাপ সহজেই চোখে পড়ে।

মন্দিরের ভাঙা অংশের অলংকরণ ঢাকার জন্য অনেক সময় উল্টো করে গাঁথা হত। অনেক সময় পুরনো অলংকরণের পাশেই কোরনের বাণী লেখা হত। এই সময়ের দুটি বিখ্যাত স্তাপত্য নির্দশন—আজমীরের আড়াই দিনকা ঝুপড়া ও ২২৫ ফুট উঁচু কুতুব মিনার। ইলতুতমিস কুতুব মিনার নির্মাণ করান সুফি সাধক কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাফির স্মরণে।

ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় খলজি সুলতানদের আমলে। এই সময়ের বিখ্যাত কীর্তির মধ্যে পড়ে আলাউদ্দিনের দ্বিতীয় দিল্লী শহর। কুতুব মিনারের চত্বরে 'আলাই-দরওয়াজা' এবং চিস্তি সাধক নিজামুদ্দিনের সমাধির কাছে 'জামাইত-খানা' মসজিদ। উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় স্থাপত্য রীতির ছাপ লক্ষ করা যায়। খলজী স্থাপত্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল—প্রথম, ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে ছুঁচালো খিলান তৈরি। দ্বিতীয়, খিলানের ওপর গম্বুজ নির্মাণ। তৃতীয়, অলংকরণের সুবিধার জন্য লাল বেলে পাথরের ব্যবহার। চতুর্থ, খিলানের নীচে পদ্মকুঁড়ির ব্যবহার। পঞ্চম, প্রবেশদ্বারে পর্যায়ক্রমে সরু ও চওড়া খিলানের ব্যবহার।

ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় তুঘলক আমলে। তুর্কী আমলের প্রথম দিকের স্থাপত্য ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। তুঘলক আমলে এই আড়ম্বর স্তিমিত হয়ে আসে। তুঘলকদের শিল্পরীতি অনেক সাদামাটা। এই বংশের প্রথম তিনজন সুলতান স্থাপত্য কীর্তির জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক যমুনা নদীর ধারে তৃতীয় দিল্লী শহর 'তুঘলকবাদ' নির্মাণ করেন। এটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে। মহম্মদ তুঘলক চতুর্থ দিল্লী শহর 'জাহানপনাহ' নির্মাণ করেন। এটিও এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। জাহানপনাহ ছাড়াও তিনি তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী দৌলতাবাদ শহরটি গড়েছিলেন। স্থাপত্য কীর্তিতে ফিরোজ তুঘলক বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তিনি পঞ্চম দিল্লী শহর ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। এখানেই তাঁর বিখ্যাত প্রাসাদ ও দুর্গ ফিরোজশাহ কোটলা অবস্থিত ছিল। এছাড়াও ফিরোজ ফতেহাবাদ, হিসার, জৌনপুর প্রভৃতি শহর পত্তন করেন। শহর, প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি, জলাধার, খাল, সেতু, সরাই, বাগান প্রভৃতি অসংখ্য নির্মাণ কাজের সঙ্গে ফিরোজ তুঘলকের নাম জড়িত আছে।

আমরা এখানে তুঘলক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে নেব। বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

প্রথম, এই সময় দেওয়ালগুলিতে পলেস্তরা (plaster) করা হত। দ্বিতীয়, দেওয়ালগুলি কিছুটা কাত করে (battered) গাঁথা হত। তৃতীয়, এ সময়ে খলজি আমলের ছুঁচালো (pointed) খিলানের পরিবর্তে আরও প্রশস্ত খিলানের ব্যবহার হয়। প্রবেশপথ চওড়া করার জন্য এইসব খিলান গাঁথা হত। চওড়া খিলান গাঁথার জন্য থাম ও বিম (beam)-এর সাহায্য নেওয়া হত। চতুর্থ, গম্বুজগুলি পুরোপুরি গোলাকার না হয়ে শিখরদেশে একটা ভাঁজ দিয়ে (stifled) গাঁথা হত। সবশেষে লক্ষণীয় যে সমাধি সৌধগুলি এখন থেকে অষ্টভুজ আকৃতিতে গড়া হয়।

তুঘলকদের পর সৈয়দ ও লোদী বংশের রাজত্বকাল দিল্লী সাম্রাজ্যের সীমা সংকুচিত হয়ে দিল্লী ও আশেপাশেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময় দিল্লীর আশেপাশে বহু সংখ্যক মসজিদ ও কবর তৈরি হয়। এগুলি এতই চোখে পড়ার মত যে দিল্লীকে লোকে কবরীস্থান (graveyard) আখ্যা দেয়।

২২.৭ সারাংশ

সুলতানি আমলে রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্বেও বহুদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতীয় সমাজের ওপর ইসলামীয় প্রভাব ব্যবহারিক জীবনে, উৎসব-অনুষ্ঠানে, বেশভূষা, খানা-পিনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। ওই সময় হিন্দুরা সুফি সাধকদের প্রতি এবং অনেক

মুসলমান ভক্তি সাধকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইভাবে ধর্মের ক্ষেত্রে একটা সমন্বয়ীভাব গড়ে উঠে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সমন্বয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে স্থাপত্য শিল্পে। তুর্কীরা পশ্চিম এশিয়া থেকে এদেশে স্থাপত্য শিল্পে উন্নত আস্তরের (mortar) ব্যবহার এবং খিলান-গম্বুজ নির্মাণ ও অলংকরণ পদ্ধতি নিয়ে আসে। ভারতে স্থাপত্য শৈলী ইতিপূর্বে যথেষ্ট উন্নত ছিল। ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলী এবং ভারতীয় শৈলীর সংমিশ্রণে সুলতানি যুগে এক নতুন স্থাপত্যশৈলীর, যাকে অনেকে ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য শৈলী বলেন, উদ্ভব হয়। সুলতানি আমলের স্থাপত্য কীর্তি শত শত বৎসর ধরে দেশী-বিদেশি পর্যটকদের প্রশংসা পেয়ে আসছে।

২২.৮ অনুশীলনী

১। ভারতে চিস্তি সিলসিলাহ-এর জনপ্রিয়তার কারণ উল্লেখ করুন।

২। ভক্তি আন্দোলনের কারণগুলি আলোচনা করুন।

৩। বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৪। সুফি সিলসিলাহ বলতে কি বোঝায়?

৫। খলজি স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৬। তুঘলক আমলের স্থাপত্য আগের সুলতানি স্থাপত্য কোনদিক থেকে পৃথক?

৭। নীচের ব্যক্তি/বিষয়ের ওপর তিন লাইন করে লিখুন :

(ক) জ্ঞানেশ্বর, (খ) "এক ধর্ম শরণ", (গ) সামা, (ঘ) খানকাহ, (ঙ) সুলতানি স্থাপত্যে অলংকরণ।

২২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। K. M. Ashraf : *Life and Condition of People of Hindustan.*

(বাংলা অনুবাদ : হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্যা, কলিকাতা, ১৯৯৪)।

২। Tarachand : *Influence of Islam on India. 1946.*

৩। Yusuf Hussain : *Glimpses of Medieval Indian Culture, Kolkata 1957.*

৪। রমাকান্ত চক্রবর্তী : বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, কলকাতা ১৯৯৬।

৫। Percy Brown : *Indian Architecture (Islamic period) Bombay. 1968.*

একক ২৩ □ সুলতানি শাসনের পতন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—বাবর—মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা—শেরশাহ

গঠন

২৩.০ উদ্দেশ্য

২৩.১ প্রস্তাবনা

২৩.২ সুলতানি শাসনের পতনের কারণ

২৩.৩ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

২৩.৩.১ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক পরিস্থিতি

২৩.৩.২ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি : পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ

২৩.৪ বাবর

২৩.৫ মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা

২৩.৬ শেরশাহ

২৩.৬.১ শেরশাহের সংস্কার

২৩.৭ সারাংশ

২৩.৮ অনুশীলনী

২৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- দিল্লী সুলতানির ভাঙনের কারণ।
- ষোড়শ শতকের শুরুতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দেশগুলির রাজনৈতিক বিবরণ ও বাবর কর্তৃক পৈতৃক রাজ্য ফরগণার সিংহাসন লাভ ও সিংহাসনচ্যুত হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
- বাবরের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা।
- পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে আফগানদের পরাজয় ও বাবর কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার।
- মুঘল-আফগান ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিভিন্ন পর্যায় ও অবশেষে আফগানদের চূড়ান্ত পরাজয়।
- শেরশাহ-এর উত্থান ও দিল্লীর সিংহাসন লাভ।
- শেরশাহ-এর সংস্কার ও সংস্কারের মূল্যায়ন।

২৩.১ প্রস্তাবনা

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। মুঘল সাম্রাজ্য যে তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নয়। পাণিপথের যুদ্ধের পরও বাবর ও তাঁর পুত্র হুমায়ুনকে সিংহাসন রাখার জন্য চিতোর, গুজরাট, মালব এবং বিহার ও বঙ্গদেশের আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আফগান নেতা শেরশাহের হাতে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন পনের বছর দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিরহিন্দের যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। এর পরও আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁকে আফগান সুলতান আদিল শূরের হিন্দু সেনাপতি হিমুকে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) পরাজিত করতে হয়। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করার পরই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আপনারা মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পড়ার আগে দিল্লি-সুলতানির পতনের কারণগুলি জেনে নিন।

২৩.২ সুলতানি শাসনের পতনের কারণ

দীর্ঘ তিনশ' বছরেরও বেশি সময় (১২০৬-১৫২৬) সুলতানি শাসন দিল্লিতে টিকে ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই সুলতানরা কতকগুলি সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হন। এই সমস্যাগুলিই সুলতানি শাসনে ভাঙন সৃষ্টি করেছিল। সমস্যাগুলির মধ্যে প্রথম হচ্ছে উত্তরাধিকারের সমস্যা। ইসলামি আইনে উত্তরাধিকারের নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসনে বসার অধিকার স্বীকৃত হয়নি। ফলে প্রত্যেক সুলতানের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে বিবাদ দেখা দিত। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র আরাম শাহ-এর পরিবর্তে কুতুবউদ্দিনের অনুগত ক্রীতদাস ও জামাই ইলতুতমিস সিংহাসনে বসেন। ইলতুতমিসের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে দীর্ঘ বিরোধের পর ইলতুতমিসের ক্রীতদাসদের নিয়ে গড়া "চল্লিশ আমীর গোষ্ঠী"-র সভ্য বলবন সিংহাসন দখল করেন। বলবন রাজবংশকে দৃঢ় করার জন্য ও রাজতন্ত্রের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে রক্তস্রোত বয়ে যায়। বলবন কাইখসরুকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। কিন্তু কাইখসরুর পরিবর্তে কাইকোবাদকে সিংহাসনে বসান হয়। কাইকোবাদও গদী রাখতে পারেননি। জালালউদ্দিন খলজি তাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নতুন খলজি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার জালালউদ্দিন নিজে ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিনের হাতে নিহত হন। পরাক্রান্ত সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় এবং গিয়াসুদ্দিন তুঘলক নতুন রাজবংশ, তুঘলক বংশের সূচনা করেন। ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। অভিজাতদের চক্রান্তে সৈয়দরা ক্ষমতা দখল করে ও সৈয়দ বংশের রাজত্বকাল শুরু হয়। এইভাবে উত্তরাধিকারের নির্দিষ্ট আইনের অভাবে তরবারিই ক্ষমতার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যযুগে সুলতানের আত্মীয়স্বজন ও অভিজাতরাই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিত। সিংহাসন নিয়ে হানাহানিতে বহু দক্ষ শাসককে হারিয়ে রাষ্ট্র ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। লোদীদের শাসনকালে এক নতুন সমস্যা দেখা দেয়। লোদীরা ছিল আফগান। আফগান অভিজাতরা রাজাকে তাদেরই একজন মনে করত। ফারমুলী, মারওয়ানি, লোহানী, নিয়াজী প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত আফগানরা সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার দাবী জানাত। এজন্যই ইব্রাহিম লোদী তাঁর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলে তাঁর পিতৃব্য আলম খাঁ, পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ প্রভৃতি আফগান নেতারা বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়।

দ্বিতীয় যে সমস্যা সুলতানি শাসনের পতন ঘটিয়েছিল সেটি হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বাঁটোয়ারা নিয়ে অভিজাত ও সুলতানদের মধ্যে ক্রমাগত লড়াই। পরাক্রান্ত সুলতানরা কখনও কখনও লোভী স্বার্থপর

অভিজাতদের বশে রাখতে পারলেও তাদের দুর্বল উত্তরাধিকারীরা অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। ইলতুতমিস বিরোধীদের দমন করে অনুগত ক্রীতদাসদের নিয়ে ‘তুরকান-ই-চিহিলগানি’ বা ‘চল্লিশের আমীর গোষ্ঠী’ তৈরি করেন। তারাই রাষ্ট্রের সব সুবিধা এবং ক্ষমতা ভোগ করত। ক্ষমতাহীনেরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ইলতুতমিসের মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। রাজিয়া আবিসীনীয়দের উচ্চপদ দিতে থাকলে রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। বলবন ‘চল্লিশ আমীর গোষ্ঠী’র সভ্য হলেও সিংহাসন দখল করে ঐ গোষ্ঠীর সব প্রভাবশলী সদস্যদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেন। এবং অনুগতদের নিয়ে নতুন করে অভিজাত গোষ্ঠী, ‘বলবনী’, সংগঠিত করেন। ‘চল্লিশ আমীর গোষ্ঠী’র সব সদস্যই শাসনকার্যে দক্ষ ছিল। রাষ্ট্র তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বলবনের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই দাসবংশকে উচ্ছেদ করে খলজীরা ক্ষমতা দখল করে। আলাউদ্দিন খলজী দক্ষ লোকেদের, তারা যে গোষ্ঠীরই হোক না কেন, উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে রাজকার্যে নিযুক্ত করতেন। তাঁর সময়ে আবিসীনয়িরা (যেমন মালিক কাফুর) উঁচুপদ লাভ করেছিল। দক্ষতা দেখালে ভারতীয় মুসলমানদেরও বিশেষ অনুগ্রহ দেখানো হত। আলাউদ্দিন নতুন করে অভিজাত গোষ্ঠী তৈরি করেন। তাদের বলা হত ‘আলাই’। কিন্তু স্বার্থান্বেষী আলাইরাও ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং আলাউদ্দিনের মৃত্যুর (১৩১৬) চার বৎসরের মধ্যেই তুঘলকরা ক্ষমতা দখল করে।

তুঘলক বংশের সুলতান মহম্মদ তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলক উভয়েই সুলতানি সাম্রাজ্য ভাঙনের জন্য নানাভাবে দায়ী। মহম্মদ তুঘলক নতুনভাবে অভিজাত সম্প্রদায় গঠন করার চেষ্টা করেন। তাঁর সময়ে বিদেশিরা বিশেষভাবে খোরাসানীর (যাঁদের তিনি ‘আইয়্যা’ বা ‘প্রিয়’ বলে সম্বোধন করতেন) অনেক উঁচুপদ লাভ করে। দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় মুসলমান এবং হিন্দুরাও বিশেষ অধিকারভোগী অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে পুরনো অভিজাতরা অসন্তুষ্ট হয়। মহম্মদ তুঘলকের সময় বাইশবার বিদ্রোহ হয় এবং দক্ষিণে বাহমনী রাজ্য সুলতানি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফিরোজ তুঘলক সিংহাসনে বসেই মহম্মদ তুঘলকের সময় অভিজাতদের হারানো ক্ষমতা ও সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। যারা ঐ সময় মোটা টাকার ঋণ নিয়েছিল তাদের ঋণ মকুব করা হয়, যারা ইকতা শাসন করত তাদের পুরুষানুক্রমে ইকতা ভোগের অধিকার দেওয়া হয়। এমনকি উঁচু রাজপদ ও সেনাবাহিনীর পদও পুরুষানুক্রমে ভোগের অধিকার দেওয়া হল। রাজকর্মচারী ও সাধারণ সৈনিকদের মাইনের পরিবর্তে জায়গির অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব আদায় ও ভোগের অধিকার দেওয়া হল। ফিরোজ তুঘলক প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে মোটামুটি রাজ্যে শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু ঐ সময় অভিজাতদের প্রচুর ক্ষমতা এবং অর্থ সঞ্চয় করে। ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পরই তাদের অনেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ফিরোজ তুঘলক সামরিক বাহিনীতে উত্তরাধিকার সূত্রে পদ ভোগ করার অধিকার দিয়ে এবং কার্যত আলাউদ্দিন প্রবর্তিত ‘দাগ’ প্রথার অবসান ঘটিয়ে সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করে দেন। তুর্কি সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডই ছিল সামরিক বাহিনী। এই মেরুদণ্ডই দুর্বল হওয়ায় সাম্রাজ্যও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। লোদীরা ছিল আফগান। আফগানদের প্রবল স্বতন্ত্র্যবোধ এবং সর্দারদের অধীনে উপজাতিভিত্তিক সেনাবাহিনীগঠন কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনীকে আরও দুর্বল করে। ফলে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী বহিরাক্রমণ রোধের ক্ষমতা হারায়।

সবশেষে দিল্লি সুলতানির আর একটা সমস্যার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম থেকেই সুলতানি সাম্রাজ্য বহিরাক্রমণ অর্থাৎ মোঙ্গালদের আক্রমণে বিব্রত ছিল। আলাউদ্দিনের সময় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পর, তুর্কি সাম্রাজ্যের দুর্বলতা পরিষ্কার হয়ে গেলে, মঙ্গোল নেতা তৈমুরলঙ দিল্লি আক্রমণ করেন। তিনি শুধু অগণিত নিরীহ লোকেদের হত্যাই করেননি, দিল্লি থেকে অগাধ ধনসম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে যান। তৈমুরলঙের আক্রমণের ফলে দিল্লি-সুলতানির প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়, কঙ্কালসার দেহটি পড়ে থাকে। বাবরের পক্ষে চূড়ান্ত আঘাত হানতে বেগ পেতে হয়নি।

২৩.৩ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সুচনা করেন। মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ জানার আগে আপনারা ষোড়শ শতকের শুরুতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পাণিপথের যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি জেনে নিন।

২৩.৩.১ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ষোড়শ শতকের শুরুতে ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুটো বড় দেশ ছিল—একটি ইরান ও অন্যটি তুরান। ইরানের অন্য নাম পারস্য। মধ্য-এশিয়ার সির ও আমু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে তুরান বলা হত। তুরানের অন্য নাম ট্রান্স-অক্সিয়ানা (Trans-Oxiana)। আমরা যে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করছি ঐ সময়ে তুরানের অধিবাসীদের উজবেগ বলা হত। 'উজবেগ' কথাটা এসেছে চেঙ্গিজ খাঁনের এক বংশধর উজবেগ খাঁর (রাজত্বকাল ১৩১২-১৩৪০ খ্রিঃ) নাম থেকে। উজবেগরা চাগতাই ভাষায় কথা বলত। ধর্মে তারা ছিল গোঁড়া সুন্নি।

ইরান বা পারস্যে যে রাজবংশ রাজত্ব করত তার নাম সাফাভি। আদি থেকে পারস্যরই অধিবাসী। ধর্মে শিয়া মুসলমান। ইরানের সাফাভি সাম্রাজ্য আয়তনে বাড়তে থাকলে স্বভাবতই তুরানের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। ধর্মের দিক থেকে পার্থক্যও এই বিরোধকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

তৈমুরলঙ মধ্য-এশিয়া থেকে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশধররা এই সাম্রাজ্য ধরে রাখতে পারেনি। উত্তরাধিকারের নির্দিষ্ট নিয়মের অভাব, পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্যতা তাদের মধ্যে অবিরত কলহের কারণ ছিল। বাবর ছিলেন তৈমুরলঙের প্রত্যক্ষ বংশধর, আবার মাতৃকুলে চেঙ্গিজ খাঁর বংশের সঙ্গেও সম্পর্কিত। তৈমুরলঙের বংশধরদের মধ্যে রাজ্য ভাগাভাগিতে বাবরের বাবা ওমর শেখ মির্জার ভাগে পড়ে ফরগণা নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে ওমর শেখের মৃত্যু হলে বাবরের ওপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব আসে। বাবরের বয়স তখন মাত্র বার। এদিকে উজবেগ সম্রাট সাইবানু খাঁ তৈমুরলঙের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে মধ্য-এশিয়ার দেশগুলি একে একে গ্রাস করছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ফরগণাও দখল করেন। বাবর পৈতৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ইরানের সাফাভি রাজাদের আশ্রয়ে চলে যান। সাফাভিরা তাঁকে কাবুল দখল করতে সাহায্য করে। কাবুলের দখল মজবুত করে বাবর ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে সাফাভিরাজ শাহ-ইসমাইলের সাহায্য নিয়ে আবার ফরগণা দখলের চেষ্টা করেন। এবার ফরগণা তাঁর দখলে আসে। কিন্তু ফরগণার অধিবাসীরা (যাঁরা ধর্মে সুন্নী) শিয়া পারস্যের সহায়তা পছন্দ করেনি, বরং তারা সুন্নী উজবেগদের শাসনই পছন্দ করল। ফলে অচিরেই ফরগণা বাবরের হাতছাড়া হয়ে যায়। উজবেগের কাছে পরাজিত হয়ে বাবর কাবুলের অধিকার আরও দৃঢ় করতে সচেষ্ট হন। ক্রমে তাঁর নজর পড়ে ভারতের ওপর।

২৩.৩.২ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি; পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ

ষোড়শ শতকের শুরুতে উত্তর ভারতে লোদীরা রাজত্ব করছিলেন। লোদী বংশের সবচেয়ে সফল সুলতান সিকান্দার শাহ (১৪৮৯-১৫১৭) দিল্লি-সুলতানির হৃতগৌরব কিছুটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহী আফগান সমস্ত অভিজাতরা

সিকান্দারের নেতৃত্ব মানতে বাধ্য হন। সিকান্দার-এর পুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে বসলে আফগান স্বাতন্ত্র্যবোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। রাজ্যের প্রভাবশালী আফগান নেতাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ করতে ইব্রাহিম তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার নীতি নেন। জৌনপুরের শাসনকর্তা জালাল খান, সেনাপতি আজম শেরওয়ানি ও আরও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী একে একে নিহত হলে আফগান সর্দাররা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়। বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান এদের নেতৃত্বে দেন। বিহারের জায়গিরদার শেরখান শূর (পরে ইনিই শেরশাহ নামে বিখ্যাত হন) এবং পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেয়।

মধ্য ভারতে ঐ সময় তিনটি বড় রাজ্য ছিল—গুজরাট, মালব ও মেবার। মালবের সুলতান মহম্মদ দ্বিতীয় খলজীর অবস্থা তুলনায় দুর্বল। গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মুজফ্ফর এবং মেবারের সিসোদিয়া বংশের রাণা সঙ্গা (সংগ্রাম সিংহ) উভয়েই মালব দখল করার চেষ্টা করছিলেন। উত্তর ভারত থেকে গুজরাটের বন্দরে পণ্য চলাচল হত মালবের ওপর দিয়ে। কৃষির দিক থেকেও মালব ছিল বেশ উন্নত। তাছাড়া লোদী সাম্রাজ্য এবং গুজরাট ও মেবারের মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (buffer state) মালব সামরিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মালবের প্রধান মন্ত্রী মেদিনীরাই অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও লোদী সাম্রাজ্য, গুজরাট ও মেবার-এর চাপ থেকে রাজ্য সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন, রাণা সঙ্গা রণথম্ভোর ও চান্দেরী জয় করে গুজরাট, মালব ও উত্তর ভারত তিন দিকেই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য দুটি উত্তর ভারতের রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখত। (বাবরের আত্মচরিত 'বাবরনামা' গ্রন্থে ষোড়শ শতকের গোড়ায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সুন্দর বিবরণ আছে।) ওপরের বিবরণ বাবরের আত্মচরিত 'বাবরনামা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু বাবর লিখেছেন ভারতের রাজ্যগুলি ধর্মের ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হিন্দুরা রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে দিল্লির সাম্রাজ্য দখল করে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করার চেষ্টায় ছিল। বাবরের এ ধারণা ভুল। হিন্দু রাই, রাণারা, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রাজাদেরই অনুগত ছিল। আবার মুসলমান হাসান মেওয়াটি বাবরের বিরুদ্ধে রাণা সঙ্গাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। অতএব ধর্মের ভিত্তিতে ভারতে রাজনৈতিক বিভাজনের ধারণাটা ভুল।

কাবুল থেকে বাবর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। তিনি উজবেগদের হাতে পরাজিত হয়ে মধ্য-এশিয়ায় পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের আশা তখনকার মত ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনুর্বর আফগানিস্তান নিয়েও তার ক্ষুধা মেটেনি। ভারতের বিপুল ঐশ্বর্যের দিকেই তাঁর নজর। তাছাড়া বাবর মনে করতেন তৈমুরলঙের উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতের ওপর তাঁর অধিকার আছে। বাবরের সামনে সুযোগ উপস্থিত হল যখন পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান এবং ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান বাবরকে ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। সম্ভবত রাণা সঙ্গাও বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

পাণিপথের বিখ্যাত যুদ্ধের আগে বাবর চারবার ভারত আক্রমণ করেন। প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারতে প্রবেশপথ ভীরা (১৫১৯-২০), পরে শিয়ালকোট (১৫২০) এবং লাহোর (১৫২৪) অধিকার করেন। এরপর কুরুক্ষেত্রের কাছে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ শুরু হয় (১৫২৬ খ্রিঃ)। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পক্ষে ছিল এক লক্ষ সৈন্য এবং সহস্রাধিক হস্তী। অন্যদিকে বাবর এনেছিলেন বার হাজার অশ্বারোহী এবং একটি গোলন্দাজ বাহিনী। 'রুমি' প্রথায় বাবর যুদ্ধ করেন। এই প্রথায় সামনা-সামনি যুদ্ধ না করে মোঘল সৈন্য দুই পাস দিয়ে আফগানদের আক্রমণ করে এবং দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে আফগানদের ঘিরে ফেলে। পরে গোলন্দাজ বহিনী সামনে থেকে আক্রমণ করলে বিশাল আফগান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয় ও পরাজিত হয়। বাবরের আত্মচরিত 'বাবারনামা' থেকে জানা যায় যে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে প্রায় কুড়ি হাজার আফগান সৈন্য প্রাণ হারায় এবং স্বয়ং ইব্রাহিম লোদী মারা যান। যুদ্ধের পর মুঘল সৈন্যরা দিল্লী এবং লোদীদের রাজধানী আগ্রায় সঞ্চিত অগাধ ধনরত্ন লুট

করে। লুটের পরিমাণ এতই বিপুল ছিল যে বাবর তাঁর সৈন্য ও অনুচরদের পুরস্কৃত করেও বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন কাবুলে নিয়ে যান এবং মুসলমান দুনিয়ার প্রভাবশালী সুলতানদের উপঢৌকন পাঠান।

আপনারা আগেই জেনেছেন যে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পারেনি। কেন না রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে রাজপুতরা ভারতে স্থায়ী মুঘল রাজত্বের ঘোর বিরোধী ছিল এবং পূর্ব ভারতে আফগানরা পাণিপথের পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বাবরের পরবর্তী পদক্ষেপ হল মেবারের রাণা সঙ্গাকে পরাজিত করা।

রাণা সঙ্গা মালবের মেদিনীরাই, হাসান খাঁ মেওয়াটি এবং বহু বিক্ষুব্ধ আফগান সর্দারদের সহায়তা পান। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ার প্রান্তরে মুঘল সৈন্য রাজপুত-আফগান মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হয়। 'বাবরনামা' এবং মুঘল যুগের দুই ঐতিহাসিক ফিরিস্তা ও বদাউনির লেখায় খানুয়ার যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজপুতদের বীরত্বের কাহিনী জেনে এবং তাদের বিপুল সৈন্যবাহিনী দেখে মুঘল সৈন্য ভীত হয়ে পড়ে। বাবর তখন তাদের উন্মাদনাময় বক্তৃতা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। নাটকীয়ভাবে পান-পাত্র ভেঙে ফেলে আর জীবনে মদ স্পর্শ করবেন না শপথ নেন। সৈন্যদেরও তিনি কোরাণ ছুঁইয়ে আপ্রাণ যুদ্ধ করার শপথ নেওয়ান। মুঘলরা এখানেও 'রুমি' প্রথায় যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত রাজপুতরা পরাজিত হয়। রাণা সঙ্গা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যান কিন্তু হাসান খাঁ মেওয়াটি প্রাণ দেন। এরপর বাবর চান্দেরীর যুদ্ধে মেদিনীরাইকে পরাজিত করেন। এইভাবে রাজপুত প্রতিরোধ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।

বিহারে সিকান্দার লোদীর পুত্র, ইব্রাহিম লোদীর ভাই মহম্মদ লোদীর নেতৃত্বে আফগানরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল। বঙ্গের শাসনকর্তা নসরৎ খাঁ এদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। পাটনার উত্তরে গঙ্গা-ঘর্ঘরার মিলন স্থান ঘর্ঘরা বা ঘাগরায় ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘল বাহিনী আফগানদের সম্মুখীন হয়। এখানেও বাবরের কাছে আফগানরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। এইভাবে পাণিপথ, খানুয়া, চান্দেরী এবং ঘাগরার যুদ্ধে মুঘল-বিরোধীদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি তখনও সুদৃঢ় হয়নি। ঐ কাজে হাত দেওয়ার আগেই বাবরের মৃত্যু হয় (১৫৩০ খ্রিঃ)। পুত্র হুমায়ুনের ওপর আরব্ধ কাজ শেষ করার দায়িত্ব আসে।

২৩.৪ বাবর

জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর ছিলেন তৈমুরলঙের প্রত্যক্ষ বংশধর ওমরশেখ মির্জার পুত্র। জন্ম ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে। তৈমুরলঙের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য আত্মীয়দের মধ্যে ভাগাভাগি হলে ওমরশেখের ভাগে পড়ে ট্রান্স-অক্সিয়ানার (সাধারণ নাম তুর্কিস্তান) ফরগণা নামে ক্ষুদ্র রাজ্য। বাবরের বয়স যখন মাত্র বার বছর তখন ওমরশেখের মৃত্যু হয়। বাবরের উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব আসে। কৈশোরেই বাবর যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। ১৪৯৬ ও ১৪৯৭ সালে দুবার তিনি সমরখন্দ দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু দুবারই ব্যর্থ হন। ঐ সময় উজবেগ সুলতান সাইবানু খান তুর্কীস্থানের রাজ্যগুলি একে একে জয় করছিলেন। ফরগণার অভিজাতদের চক্রান্তে ফরগণা রাজ্যও সাইবানু দখল করেন। রাজ্যহারা হয়ে কিছু বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে বাবর একবছর ভ্রাম্যমান অবস্থায় কাটান। পরে ইরানের সাফাভিরাজ ইসমাইল শাহ-এর সহায়তায় ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে কাবুল দখল করেন। তুরানী অধিপতি শাহবানুর মৃত্যু হলে ইরানের সহায়তায় বাবর ফরগণা পুনরুদ্ধার করেন এবং সমরখন্দ ও বুখারাও জয় করেন। কিন্তু ফরগণার অভিজাতদের চক্রান্তে পৈতৃক রাজ্য এবং তুর্কীস্তানের অন্য বিজিত অঞ্চলও বাবরের হাতছাড়া হয়। বাবর কাবুলের অধিকারই মজবুত করতে থাকেন। ঠিক ঐ সময় ভারতবর্ষ থেকে ইব্রাহিম লোদীকে আক্রমণ করার আমন্ত্রণ আসে। আপনারা ওপরে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ ও খানুয়া ও ঘাগরার যুদ্ধে বাবরের জয়লাভও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা পড়েছেন। ১৫৩০ খিস্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়। তাঁরই ইচ্ছামত কাবুলের নির্জন পর্বতগাত্রে অনাড়ম্বর পরিবেশে তাঁর মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়।

যোদ্ধা হিসাবে বাবর তৈমুরলঙের দিগ্বিজয়ের ঐতিহ্য বহন করে চলেছিলেন। মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ করা ছাড়াও বাবরের চরিত্রের এক মহত্তর দিক ছিল। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের প্রকৃতি প্রেমিক লেখক। মধ্য-এশিয়া ও পারস্যের সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতীক। তুর্কীভাষায় লেখা তাঁর আত্মচরিত 'বাবরনামা' (গ্রন্থের অন্য নাম তুজুক-ই-বাবরী) তাঁকে অমরত্ব দান করার পক্ষে যথেষ্ট। সহজ সাবলীল ভাষায় লেখা এই বই-এ বাবর নিজের দেশের ফল, ফুল, জীবজন্তু, জলবাতাস সম্পর্কে তাঁর গভীর ভালবাসার কথা লিখেছেন। ভারতবর্ষ তাঁর ভাল লাগে না। এখানে আঙুর, খরমুজ পাওয়া যায় না, এখানকার আবহাওয়া ভাল নয়, এখানকার মানুষের পোশাক তাঁর পছন্দ নয়। এসব কথা খুব সহজ ভাষায় তিনি লিখে গেছেন। বাবরের আত্মচরিত থেকে ষোড়শ শতকের গোড়ায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা জানা যায়। লেখক ছাড়াও বাবর ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি। তুর্কী ও ফারসী ভাষায় তিনি বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেছেন।

স্বল্পস্থায়ী জীবনে বাবর শাসন-সংস্কার বা প্রজাহিতৈষী আইন-কানুন রচনা করে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেননি। তবে তিনি ঢোলপুর ও আগ্রার আশেপাশে এবং আফগানিস্তানে বহু উদ্যান স্থাপন করেছিলেন এবং আরও অনেক উদ্যানের নকশা রচনা করেছিলেন। বাবরের ভারত-বিজয়ের পর মধ্য-এশিয়া এবং ভারতের মধ্যে আবার নতুন করে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

২৩.৫ মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস আপনারা তিনটি পর্যায়ে পাঠ করবেন। প্রথম পর্যায় শুরু হয় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান ও ইব্রাহিম লোদির পিতৃব্য আলম খান কর্তৃক বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানানো থেকে, শেষ হয় পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ও ঘাগরায় আফগানদের পরাজয়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হুমায়ুনের সিংহাসনে আরোহণ থেকে (১৫৩০), শেষ কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০) শেরশাহের হাতে হুমায়ুনের পরাজয়ে। এরপর পনের বছরের (১৫৪০-১৫৫৫) বিরতি। ঐ সময় শেরশাহ ও তাঁর পুত্র ও আত্মীয়রা দিল্লীর সিংহাসন দখল করেছিল। তৃতীয় ও শেষ পর্যন্ত আরম্ভ হয় হুমায়ুনের দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা থেকে (১৫৫৪ খ্রিঃ), শেষ হয় পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে বৈরাম খাঁর হাতে হিমুর পরাজয় ও মৃত্যুতে (১৫৫৬ খ্রিঃ)।

আপনারা মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস ইতিমধ্যেই পাঠ করেছেন। এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ইতিহাস জানুন।

হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করে (১৫৩০ খ্রিঃ) নানা বিপদের সমুখীন হন। প্রথম বিপদ আসে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও আমীর-ওমরাহ-এর কাছ থেকে। বাবরের রাজত্বকালে মধ্য-এশিয়া থেকে তাঁর অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছিলেন। বাবর তাঁদের উচ্চ রাজপদ দেন। এঁরা এবং অন্যান্য আমীর-ওমরাহরা হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। আত্মীয়দের মধ্যে একজন, মহম্মদ সুলতান মির্জা নিজেকে তৈমুরলঙের বংশধর বলতেন। তিনি এখন দিল্লির সিংহাসনের দাবি জানান দ্বিতীয়ত, হুমায়ুনের ভাইরা হুমায়ুনের শত্রুতা করে। হুমায়ুন বড় ভাই কামরানকে কাবুল, কান্দাহার এবং পাঞ্জাবের হিসার পর্যন্ত রাজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরের ভাই আসকারিকে দিয়েছিলেন সাম্ভালপুর, আর ছোট ভাই হিন্দালকে মেওয়াট শাসনের ভার দেন। এদের মধ্যে কামরান ছিলেন সবচেয়ে লোভী ও কুচক্রী। যে সব জায়গা থেকে মুঘল সেনাবাহিনীতে সেরা সেপাই সংগ্রহ করা হত সেগুলি কামরানের হাতে পড়ে। ফলে মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই অবস্থাতেই হুমায়ুনকে আফগানদের মোকাবিলা করতে হয়। আফগানরা লোদী সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখত। ইব্রাহিম লোদীর ভাই মহম্মদ লোদী এবং গুজরাটের সুলতান বাহাদুর খান বিক্ষুব্ধ আফগানদের নেতৃত্ব দেন। বাহাদুর শাহ ছিলেন ভারতীয় রাজাদের

মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মালব দেশ অধিকার করেন এবং চিতোর আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। হুমায়ুন তখন চূণার দুর্গ অধিকারে ব্যস্ত। মধ্য ভারতের অবস্থার গুরুত্ব বুঝে আগ্রায় ফিরে আসেন। বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় তৈরি ছিলেন না। দূত পাঠিয়ে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং হুমায়ুনের শত্রুদের আশ্রয় দেবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দু'বছরের মধ্যেই তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মহম্মদ মির্জাকে আশ্রয় দেন এবং চিতোর অধিকার করেন। চিতোর থেকে গুজরাট ফেরার পথে পড়ে মাণ্ডু। হুমায়ুন দ্রুত মাণ্ডু পৌঁছে বাহাদুরের ফিরে যাওয়ার এবং গুজরাট থেকে সাহায্য আসার পথ অবরোধ করেন। বাধ্য হয়ে বাহাদুর শাহ আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু পরে গোপনে দিউদ্বীপে পালিয়ে যান। হুমায়ুন গুজরাট দখল করে আসকারিকে শাসনের দায়িত্ব দিয়ে আগ্রা ফিরে যান। গুজরটের বিপুল সম্পদ মুঘল সৈন্যরা অবাধে লুঠ করে। এতে গুজরাটবাসী ক্ষিপ্ত হয়। এই সুযোগে বাহাদুর শাহ দিউ থেকে ফিরে এলে পুরোনো সৈন্যদের সাহায্যে আসকারিকে গুজরাট থেকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বাহাদুর শাহ নিজে পর্তুগীজদের হাতে নিহত হন। গুজরাটে হুমায়ুনের বড় বাধা দূর হয়।

বাহাদুর শাহ-এর মৃত্যুর পর বিক্ষুব্ধ আফগান সর্দাররা বিহারের শেরখানের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সাসারামের সামান্য জায়গিরদার শেরখান নিজের দক্ষতা বলে বিহারে দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। হুমায়ুন চূণার দুর্গ অবরোধ অসমাপ্ত রেখে আগ্রা ফিরে গেলে (১৫৩১ খ্রিঃ) শেরখান চূণার দখল করেন। তিনি বঙ্গের সুলতান নসরৎ খান এবং পরে সুলতান মাহমুদ শাহ-এর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে প্রচুর ধনসম্পত্তি হস্তগত করেন ও গোরক্ষপুর থেকে বেনারস অঞ্চল লুটপাঠ করে বেড়াতে থাকেন। হুমায়ুনের কাছে সব সংবাদই পৌঁছে যাচ্ছিল। তিনি শেরখানকে জব্দ করার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিহারের দিকে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে শেরখান বঙ্গাদেশের রাজধানী গৌড় আক্রমণ করে বসলেন।

হুমায়ুন প্রথমে চূণার দুর্গ অবরোধ করেন। চূণার দুর্গ এমনিতেই দুর্ভেদ্য। শেরখান সেখানে যে সৈন্যদল রেখেছিলেন তারা ছয় মাস পর্যন্ত দুর্গের দখল ছেড়ে দেয়নি। ফলে চূণার জয় করতে হুমায়ুনের বড্ড বেশি সময় লেগে যায়। ঐ সময়ে শেরখান গৌড় জয় করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে মুঘল সৈন্য এড়িয়ে বিহারে রোটাসগড় দুর্গে রেখে দেন এবং বিহারে ফিরে গিয়ে অবাধে লুঠপাট করে ঘুরে বেড়ান। হুমায়ুন চুণার জয় করে গৌড়ে যান এবং গৌড় জয় করে প্রচুর ধনরত্ন লুঠ করে বিহারের মধ্য দিয়ে আগ্রায় পাঠান। পরে গৌড়ে চারমাস ধরে বিজয় উল্লাসে মত্ত হন। শেরখান হুমায়ুনের পাঠানো ধনরত্ন বিহারে লুঠ করেন এবং আগ্রা থেকে মুঘল সৈন্যকে সাহায্যের পথ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেন। হুমায়ুন এবার গৌড় থেকে আগ্রায় ফেরার পথে বক্সার-এর কাছে চৌসায় শেরখানের সৈন্যের সম্মুখীন হন। ইতিমধ্যেই তাঁর আগ্রার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। হুমায়ুন নদী পার হয়ে শেরখানকে আক্রমণ করতে গেলে শেরখান তাঁকে সহজেই পরাজিত করেন। হুমায়ুন কোনওভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু শেরখান ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। কনৌজের কাছে আবার হুমায়ুনকে পরাস্ত করেন (১৫৪০ খ্রিঃ)। হুমায়ুন সিন্ধুপ্রদেশে পালিয়ে যান আর শেরখান 'শেরশাহ' উপাধি নিয়ে দিল্লীর মসনদে বসেন। মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বিতীয় পর্যায় এখানেই শেষ হয়।

শেরশাহ আফগান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ কালে বারুদের স্তূপে আগুন লাগার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। শেরশাহ-এর পুত্র ইসলাম খান পিতার সাম্রাজ্য অটুট রেখেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই (১৫৫৪ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়। ইসলামের মৃত্যুর পর আফগান স্বাতন্ত্র্য আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। শেরশাহ-এর আত্মীয়দের মধ্যে আদিলশাহ শূর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। পাঞ্জাবে সিকান্দার শূর এবং গুজরাটে ইব্রাহিম খান প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকে। এদেরও দৃষ্টি ছিল দিল্লীর সিংহাসনের ওপর।

কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন সিন্ধু প্রদেশে পালিয়ে যান। সিন্ধু জয় করারও চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাইয়েদের কাছ থেকে কোনওরূপ সাহায্য না পেয়ে ব্যর্থ হন। এরপর কিছুদিন সিন্ধুর মরু অঞ্চলে পালিয়ে বেড়িয়ে অবশেষে ইরানের শাহ তামাহস্প (Tamahsp)-এর আশ্রয় নেন। তামাহস্প তাঁকে কাবুল ও কান্দাহার উদ্ধার করতে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। যুদ্ধে কামরান পরাজিত ও বন্দী হন। কাবুল ও কান্দাহার হুমায়ুনের দখলে আসে। কামরানকে অন্ধ করে মক্কায় পাঠান হয়। পরে আসকারিকেও মক্কায় পাঠানো হয়। ছোট ভাই হিন্দাল হুমায়ুনের পক্ষে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। এইভাবে ভাইয়েদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হুমায়ুন কাবুলে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। ভারতে শূরদের বিবাদের ওপর তাঁর দৃষ্টি ছিল। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে সিকান্দার শূরকে আক্রমণ করলে মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার তৃতীয় ও শেষ পর্যায় শুরু হয়। লাহোরে জয়লাভ করে মুঘল সৈন্য এগিয়ে গিয়ে আবার সিরহিন্দ-এ আফগান বাহিনীকে পরাজিত করে। হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হুমায়ুনের মৃত্যু হয় (জানুয়ারি ১৫৫৬)। হুমায়ুনের নাবালক পুত্র আকবর তখন পাঞ্জাবের কালানোরে। বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে আকবরকে 'বাদশাহ' ঘোষণা করা হয়। দিল্লীর শাসনকর্তা তখন মুঘল প্রতিনিধি তার্দিবেগ। আদিল শূরের হিন্দু সেনাপতি হিমু তার্দিবেগকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করে নেয়, এবং হিমু নিজেকেই দিল্লীর বাদশাহ রূপে ঘোষণা করে। পাঞ্জাব থেকে বৈরাম খাঁ স্বসৈন্যে এসে হিমুকে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) পরাজিত ও নিহত করলে মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩.৬ শেরশাহ

ছেলেবেলায় শেরশাহ-এর নাম ছিল ফরিদ। জন্ম ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে (অনেকের মতে ১৪৮৬ খ্রিঃ)। তাঁর বাবা হাসান খান শূর ছিলেন বিহারের সাসারাম, হাজীপুর ও বেনারসের কাছে ভাণ্ডার জায়গিরদার। প্রথম জীবনে বিমাতার দুর্ব্যবহারে ফরিদ জৌনপুর চলে যান এবং সেখানে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করেন। এক সময়ে বিহারের শাসনকর্তা বাহার খান লোহানীর অধীনে চাকরী করেন। বাহার খান ফরিদের বীরত্বে (তিনি নিজ হাতে বাঘ শিকার করেছিলেন) খুশি হয়ে তাঁকে শেরখান নাম দেন। পিতার মৃত্যুর পর শেরখান বাদশাহ-এর ফরমান নিয়ে পৈতৃক জায়গিরের উত্তরাধিকার ফিরে পান।

সামান্য জায়গিরদার থেকে দিল্লীর মসনদ দখল করা অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয়। শেরখানের এই সাফল্যর মূলে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। প্রথম, অল্পদিনের মধ্যে অগাধ সম্পত্তি লাভ; দ্বিতীয়, দক্ষ সামরিক বাহিনী গঠন এবং তৃতীয়, তাঁর সুপ্রসন্ন ভাগ্য।

লোদী আমল থেকে আফগান সর্দাররা সামরিক বাহিনীতে কাজ করে অথবা ইকতাদার হিসাবে প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হয়েছিল। অনেক সময় সর্দাররা তাদের সম্পদ পত্নীদের হাতে গচ্ছিত রেখে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে প্রাণ হারাত। তখন তাদের বিধবা পত্নীরা ঐ সম্পত্তির মালিক হয়ে বসতেন। শেরখান তিনজন সম্ভ্রান্ত আফগান বিধবার বিপুল ধনরত্ন হস্তগত করেন। এঁরা হলেন বাহার খান লোহানীর বিধবা পত্নী গহর গুঁসাই, চুণার দুর্গের অধিপতি তাজখান-এর বিধবা পত্নী লাড মালিকা এবং অযোধ্যা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জায়গিরের বিধবা পত্নী বিবি ফতে মালিকা। প্রথম দুইজন বিধবা মহিলাকে শেরখান বিয়ে করে শত শত মণ সোনা ও হীরে-জহরৎ লাভ করেন। ফতে মালিকা তাঁকে বিয়ে না করলেও শেরখান কৌশলে তাঁর অগাধ ধনরত্ন (কেবল সোনা-ই ছিল ৩০০ মণ) হস্তগত করেন। এছাড়াও দুবার বঙ্গদেশের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে তিনি তাঁদের ধনরত্ন লুঠ করেন এবং গৌড় আক্রমণ করে প্রথমবার ১৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দ্বিতীয়বারে অপরিমেয় ধনরত্ন বিহারে নিয়ে আসেন। শেরখানের পর হুমায়ুন আবার গৌড় আক্রমণ করে ৫০০ খচ্চরের পিঠে ধনরত্ন বোঝাই করে মুঘল সৈন্যের পাহারায় আগ্রা পাঠান। কিন্তু বিহারের

ওপর দিয়ে যাবার সময় শেরখান ঐ সব সম্পদ লুঠ করে নেন। লক্ষণীয় যে হুমায়ুন যখন প্রায়ই আর্থিক অনটনে ভূগতেন তখন শেরখানের কোনওদিন আর্থিক টান পড়েনি।

শেরখানের অর্থবল তাঁকে একটা অনুগত সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। লোদী আমলে প্রচুর যুদ্ধবাজ আফগান সেনাবাহিনীতে এসে যোগ দেয়। তারা সাধারণত উপজাতিভিত্তিক কোন সর্দারের অনুগত থেকে যুদ্ধ করত। ফলে বিভিন্ন সৈন্যদলের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তারা পৃথক পৃথক নেতার নির্দেশে চলত। শেরখানের কৃতিত্ব যে, তিনি সাসারাম অঞ্চলের সাধারণ আফগান ও হিন্দু-কৃষকদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেন। সৈন্যরা তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে নিয়মিত নগদ অর্থে মাইনে পেত, এবং সময় সময় লুঠপাটের অর্থেরও ভাগ পেত। শেরখানের সেনাবাহিনী কখনও সামন্ততান্ত্রিক সেনাবাহিনীর রূপ নেয়নি। এই দক্ষ, অনুগত, শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনাবাহিনীই শেরখানের সাফল্যের বড় কারণ।

'হুমায়ুন' কথাটার অর্থ ভাগ্যবান। কিন্তু হুমায়ুনের প্রতি ভাগ্য কখনও সুপ্রসন্ন ছিল না। অন্যদিকে শেরখান বিভিন্ন সময়ে ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। হুমায়ুন গুজরাটে বাহাদুর খানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে শেরখান বিহারে নিজের অধিকার দৃঢ় করতে সুযোগ পান। হুমায়ুন যখন চুণার দুর্গ অবরোধ করতে ছয়মাস কাটিয়ে দেন তখন সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করে শেরখান অবাধে গৌড় লুঠ করেন। আবার হুমায়ুন বঙ্গাদেশে গৌড় বিজয়ের উল্লাসে মত্ত থাকলে শেরখান মুঘলদের আগ্রার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। চৌসায় ভুল করে হুমায়ুন নদী পার হয়ে আক্রমণ করতে গেলে শেরখান সহজেই মুঘল সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারেন।

আপনারা শেরখানের সাফল্যের কারণগুলি পাঠ করলেন। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে (১৫৪০) তিনি 'শেরশাহ' উপাধি নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে বলেন। মাত্র পাঁচ বছর তিনি রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। এই অল্প সময়ে তিনি মালব ও রাজপুতানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং পাঞ্জাব নিজের রাজ্যভুক্ত করতে পারেন। তাছাড়া রাজ্য শাসনে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন। আপনারা এখন শেরশাহের সংস্কারগুলি জানুন।

২৩.৬.১ শেরশাহের সংস্কার

শেরশাহ কেন্দ্রীয়করণ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য একার পক্ষে শাসন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি স্থানীয় ভিত্তিতে দেশ শাসন প্রচলন করেন। শেরশাহ সমগ্র সাম্রাজ্যকে গ্রাম থেকে প্রদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে এক মসৃণ শাসন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। গ্রাম শাসনের ভার ছিল মুকদ্দাম নামে গ্রামের মোড়লদের ওপর। তারা গ্রামের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক রক্ষা করে চলত। মুকাদ্দমরা সরকারি কর্মচারী না হয়েও গ্রামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করত। পাটোয়ারী নামক কর্মচারীরা গ্রামের লোকেদের দিয়েই নিযুক্ত হত। প্রজারা যে কর-খাজনা দিত পাটোয়ারীরা তার হিসাব রাখত। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে পরগণা গঠিত হয়। পরগণার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শিকদার ও মুনসেফ নামক কর্মচারীর ওপর। শিকদাররা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করত ও রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করত। মুন্সেফ বা আমিনরা জমি মাপজোপ, রাজস্ব আদায় এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করত। কতকগুলি পরগণা নিয়ে সরকার গঠিত হয়। সমগ্র দেশে ৬৬টি সরকার ছিল। প্রতি সরকারের প্রধান দুই কর্মচারী হল শিকদার-ই-শিকদারান এবং মুন্সেফ-ই-মুন্সিফান। শিকদার ই-শিকদারান-এর কাজ ছিল পরগণার শিকদারদের কাজের তদারকি করা আর মুনসেফ-ই-মুন্সিফানের কাজ ছিল সরকারি স্তরে রাজস্ব আদায় ও হিসাব রক্ষা করা। শেরশাহ তুর্কি সুলতানদের মতো মন্ত্রী নিয়োগ না করে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদগুলির জন্য সচিব নিয়োগ করতেন। এইভাবে তিনি এক সুসংহত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

দিল্লী-সুলতানরা কেউ কেউ (যেমন, আলাউদ্দিন ও মহম্মদ তুঘলক) রাজস্ব আদায়ের জন্য জমি জরিপ করাতেন। কিন্তু শেরশাহই প্রথম সমগ্র রাজ্যের ভূমি জরিপ করিয়ে প্রজাদেরকে পাট্টা দান করেন। প্রজারাও সরপকারকে কবুলিয়ত লিখে দিত। পাট্টাতে প্রজাদের জমির বিবরণ এবং খাজনার হার লেখা থাকত আর কবুলিয়তে প্রজারা সরকার নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেওয়ার অঙ্গীকার লিখে দিত।

শেরশাহের ভূমিরাজস্ব সংস্কার-এর মূল নীতি ছিল, উৎপাদনের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করা। তুর্কি-সুলতানদের আমলেও অনেকটা এই ধরনের প্রথা ছিল, একে বলত ঘাল্লাবক্স (Ghallabaksh)। এই প্রথায় ফসল কাটার সময় দাঁড়িয়ে থেকে খাজনা আদায় করতে হত। এটি ব্যয়সাপেক্ষ এবং এতে দুর্নীতির সম্ভাবনা বেশি ছিল। শেরশাহ ঘাল্লাবক্স প্রথার পরিবর্তন করলেন। প্রথমে সমস্ত কর্ষিত জমিকে উৎপাদনশীলতা (productivity) অনুসারে ভাল, মাঝারি ও কম ফসলের জমি এই তিনভাগে ভাগ করে, প্রত্যেক ভাগ থেকে এক-এক অংশ নিয়ে গড় উৎপাদনের হার নির্ধারণ করা হল। তারপর বড় উৎপাদনের $^{১}/_{৩}$ ভাগ খাজনার হার ঘোষণা করা হল। এই ব্যবস্থাকে বলে 'কানকুট' (কানকুত)। একবার খাজনার হার নির্ধারিত হলে ধীরে স্থিরে নগদ অর্থে বা ফসলে খাজনা আদায় করা যেত। কিন্তু এই প্রথাও ত্রুটিমুক্ত ছিল না—ফসল না কাটা পর্যন্ত প্রজাদের খাজনার হার জানার জন্য অপেক্ষা করতে হত। তাই পরের ধাপে, 'কানকুট' ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তন করে ফসল উঠার আগেই অনুমানের ভিত্তিতে গড় উৎপাদন স্থির করে $^{১}/_{৩}$ অংশ খাজনা ঘোষণা করা হল। এই দ্বিতীয় প্রথা 'জাবতি (Zabti)' প্রথা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে আকবর 'জাবতি' প্রথা সামান্য পরিবর্তন করে 'দহ্‌শালা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে বিশদ আপনারা পরে পাঠ করবেন।

আপনারা ইতিমধ্যেই শেরশাহের সামরিক সস্কার সম্বন্ধে জেনেছেন। দিল্লীর মসনদে বসার আগে শেরশাহ যে প্রথায় সৈন্যবাহিনী গঠন করতেন, সেই প্রথাই পরে বহাল থাকে। লুঠপাট থেকে আর সম্পদ না এলেও ভূমিরাজস্বের দরুন নিয়মিত বিপুল অর্থ রাজকোষে জমা হতে থাকে। ফলে নগদ মাইনে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকে অনুগত, দক্ষ সৈন্য নির্বাচন করতে শেরশাহের অসুবিধা হয়নি।

সবশেষে আপনারা শেরশাহের আর্থিক সংস্কার সম্পর্কে জানুন। শেরশাহ-এর সময়ে সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা "রুপেয়া"-ই প্রধান মুদ্রা হিসাবে গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে টাকশাল স্থাপন করে নির্দিষ্ট ওজনের মুদ্রা তৈরি করা হত। সাধারণ লোকও 'ফি' দিয়ে (Charge) তাদের সোনা-রূপা (bullion) মুদ্রায় পরিণত করতে পারত। 'ফি' মারফৎ সরকারের নিয়মিত আয় হত। নির্দিষ্ট ওজনের মুদ্রা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল। আকবরের সময়েও "রুপেয়া" প্রধান মুদ্রা হিসাবে চলে থাকে। শেরশাহ যেখানে সেখানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর আদায় বন্ধ করেন। কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকা পার হওয়ার সময় শুল্ক সংগ্রহ করা হত।

সামরিক প্রয়োজনে শেরশাহ যে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অসীম। আপনারা সকলেই জানেন শেরশাহ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁ বন্দর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সুদীর্ঘ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়াও আগ্রা থেকে দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুর পর্যন্ত, আগ্রা থেকে যোধপুর হয়ে চিতোর পর্যন্ত এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে পুরনো রাস্তা মেরামত বা প্রশস্ত করা হয়। রাস্তার ধারে নিয়মিত দূরত্বের ব্যবধানে শেরশাহ ১৭০০ সরাই নির্মাণ করেছিলেন। সরাইগুলিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের থাকার পৃথক ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক সরাই-এর পাশে বাজার

বসত এবং ওখানে দেশি-বিদেশি বণিকরা কেনা-বেচা করত। সরাইগুলি পোষ্ট-অফিসের মতো ছিল এবং গুপ্তচরেরা এখান থেকে রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাস্তাগুলি নির্মিত হওয়ায় গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের সঙ্গে মুলতান হয়ে কাবুল-কান্দাহার ও মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্য সুগম হয়। বঙ্গাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এতদিন জলপথে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বেশি হত। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় বঙ্গাদেশের বিপুল সঞ্চিত সম্পদ উত্তর ভারতের কাছে উন্মুক্ত হয়। এইজন্যই মুঘল সম্রাটরা বঙ্গাদেশকে সব সময় করায়ত্ত রাখতে চেষ্টা করতেন।

শেরশাহ-এর শাসন-সংস্কার, রাজস্ব-সংস্কার, মুদ্রাসংস্কার, হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমভাব নীতি ইত্যাদি অনুসরণ করে মুঘল সম্রাটরা ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন।

২৩.৭ সারাংশ

সুলতানি শাসনে প্রথম থেকেই উত্তরাধিকারের সুষ্ঠু নিয়মের অভাব এবং সুলতান ও অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনের সমস্যা রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া প্রথম থেকেই দিল্লী সুলতানিকে মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হত। ফিরোজ তুঘলকের সময় সেনাবাহিনীর লোকেদের এবং উচ্চ রাজ-কর্মচারীদের উত্তরাধিকার স্বত্তে পদ ভোগ করার অধিকার দেওয়ায় শাসনব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তুঘলক রাজত্বের শেষের দিকে তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণ সাম্রাজ্যের বড় ধরনের ভাঙন সৃষ্টি করে। ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে মুঘল আক্রমণ সুলতানি শাসনের অবসান ঘটায়।

তুর্কিস্তানের ফরগণা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বাবর কাবুল অধিকার করেন। ফরগণার লোকেরা নিজেদের মুঘল বলত। কাবুল থেকে বাবরের নজর ছিল ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। তাঁর কাছে সুবর্ণ সুযোগ আসে যখন বিক্ষুব্ধ আফগান নেতারা তাঁকে দিল্লী আক্রমণের আহ্বান জানায়। বাবর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ভারত আক্রমণ করেন এবং পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী-আগ্রা দখল করেন। ভারতে মুঘল অধিকার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হয়নি। ১৫২৬ সাল থেকে ১৫৫৬ সাল পর্যন্ত মুঘল-আফগান ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। বাবরের পুত্র হুমায়ুন ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে আফগান নেতা শেরশাহের কাছে পরাজিত হয়ে সিংহাসন হারান। শেরশাহ দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শেরশাহ খুব অল্পদিন (১৫৪০-১৫৪৫ সাল) রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই অল্পসময়েই নানাবিধ শাসন-সংস্কার করে স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। শেরশাহের পুত্র ইসলাম শূরের মৃত্যুর পর (১৫৫৪ খ্রিঃ) আফগান নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হুমায়ুন তখন কাবুলে। সুযোগ বুঝেই তিনি আফগান সম্রাট আদিল শূরকে সিরহিন্দ-এর যুদ্ধে পরাজিত করে (১৫৫৫ খ্রিঃ) দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। হুমায়ুনের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর (১৫৫৬ খ্রিঃ) পুত্র আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ আদিল শূরের হিন্দু সেনাপতি হিমুকে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রিঃ) পরাজিত ও নিহত করে ভারতে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

২৩.৮ অনুশীলনী

১। সুলতানি শাসনের ভাঙনের কারণ আলোচনা করুন।

২। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করুন।

৩। শেরশাহের সাফল্যের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি উল্লেখ করুন।

৪। শেরশাহের ভূমিরাজস্ব সংস্কার আলোচনা করুন।

৫। নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর তিন লাইন করে লিখুন :

(ক) বাবরনামা, (খ) বুমিপ্রথা, (গ) উজবেকিস্তান, (ঘ) খানুয়ার যুদ্ধ এবং (ঙ) শেরশাহের মুদ্রা-সংস্কার।

২৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. R. P. Tripathi : *Rise and Fall of The Mughal Empire, Allahabad 1956.*
2. A. L. Srivastava : *The Mughal Empire—1526-1803, Agra, 1977.*
3. K. R. Kanungo : *Sher Shah And His Times, Bombay, 1965.*
4. Ed. J. F. Richards : *Mughal Empire (The New Cambridge History of India) Cambridge University Press, 1993.*
5. Ed. Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam : *The Mughal State, Oxford, 1998*.

একক ২৪ □ আকবরের নেতৃত্বে সুসংহত মুঘল সাম্রাজ্য

গঠন

২৪.০ উদ্দেশ্য

২৪.১ প্রস্তাবনা

২৪.২ আকবরের প্রথম জীবন

২৪.৩ আকবরের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পদক্ষেপ

২৪.৩.১ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগান শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ

২৪.৩.২ তত্ত্বাবধান থেকে ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করা

২৪.৩.৩ আকবরের রাজ্যবিস্তার ও তার প্রকৃতি

২৪.৪ আকবরের রাজপুত নীতি ও হিন্দুনীতি

২৪.৫ আকবরের প্রশাসনিক সংস্কার : ভূমি রাজস্ব নীতি

২৪.৬ মনসবদারী নীতি

২৪.৭ সারাংশ

২৪.৮ অনুশীলনী

২৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি আকবরের

- রাজত্বকাল সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রাজপুত ও হিন্দু নীতি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- প্রশাসনিক সংস্কার ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা বুঝতে পারবেন।
- মনসবদারী নীতির রূপরেখা পাবেন।

২৪.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় প্রজন্ম আকবর সম্পর্কে জানতে পারা যায়। তিনি পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত আগ্রা ও দিল্লীর শিথিল রাজ্যখণ্ডকে এক বিশাল ভূখণ্ডে রূপান্তরিত করেছিলেন। তার বিস্তৃতি ছিল হিমালয় থেকে নর্মদা আর হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তরাঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্যের বেশকিছু অংশ। বাবর কিংবা হুমায়ুন মুঘল শাসনের কোনও স্থায়ী কাঠামো গড়ে তুলতে পারেননি। বহুবিধ সমস্যায় আকীর্ণ দুর্বল মুঘল সাম্রাজ্য আকবরের সুযোগ্য নেতৃত্বে এমনই রূপ ধারণ করে যার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল যুগ একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হতে পেরেছে।

২৪.২ আকবরের প্রথম জীবন

আকবরের পিতামহ বাবর প্রথম মুঘল শাসক যিনি ১৫২৬ থেকে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ ব্যাপী চার বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করতে সমর্থ হন। বাবরের পুত্র হুমায়ুন, ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে আফগান সর্দার শেরশাহ কর্তৃক ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হন। ভাগ্যবিড়ম্বিত হুমায়ুন যখন আশ্রয়ের সন্ধানে সিন্ধুপ্রদেশে মরু অঞ্চলে ভ্রমণরত, সেই সময়ে ১৫৪২ খিস্টাব্দে অমরকোটে আকবরের জন্ম হয়। আকবরের বাল্যজীবনে বলাই বাহুল্য কোনও স্থিতিশীলতা ছিল না। হুমায়ুন স্বজন বিদ্বেষে ব্যথিত ও ভারতবর্ষে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবই পিতার এই ভাগ্যবিড়ম্বনা আকবরের বাল্যকালে শৈশবসুলভ নিরাপত্তাবোধ ও স্বাচ্ছন্দ্য দেয়নি। ফলে আকবর হয়ে উঠেছিলেন কষ্টসহিষ্ণু এবং বাস্তববাদী। পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব যখন তিনি কৈশোরেই আকবরকে নিতে হয়েছিল তখন তাঁকে যেসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেগুলি অতিক্রম করা আকবরের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হয়নি।

২৪.৩ আকবরের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পদক্ষেপ

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে নাবালক আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাঞ্জাবের কালানৌরে আকবরের অভিষেক হয়। কারণ এই সময়ে হুমায়ুনের বিশ্বস্ত সহযোগী বৈরাম খাঁর সঙ্গে আকবর গুরুদাসপুরে এক আফগান বিরোধী সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। বৈরাম খাঁ সত্বর আকবরের অভিষেকের ব্যবস্থা করেন পাঞ্জাবে। পরবর্তী চার বৎসর বৈরাম খাঁর তত্ত্বাবধানে আকবর তাঁর শাসনপর্ব চালিয়েছিলেন।

২৪.৩.১ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগান শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর মুঘল শাসনের সূচনা করেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পুনরায় আফগানদের পরাস্ত করে আকবরকে ভারতবর্ষের ওপর তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতে হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সাম্রাজ্য আকবর লাভ করেছিলেন তা ছিল নিতান্তই ভঙ্গুর। মুঘলদের সম্পর্কে ভারতীয়রা সন্দিগ্ধ ছিল কারণ তারা ছিল নবাগত। বাবর কিংবা হুমায়ুন কেউই ভারতবর্ষে প্রকৃত ক্ষমতা বিস্তার করতে পারেননি। কাজেই আকবরের নাবালকত্বের সুযোগে পুনরায় ভারতবর্ষে মুঘলবিরোধী শক্তিগুলি মাথা তুলে দাঁড়ায়। আফগানরা ছিল অন্যতম প্রধান বিরোধী শত্রুগোষ্ঠী।

মুঘলদের এই সময়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হিমু। তিনি আদিল শাহর প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আফগান সেনাপতি হলেও হিমু মূলত হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যু দিল্লি থেকে দূরে পাঞ্জাবে আকবরের অভিষেকের ফলে দিল্লিতে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের জন্য হিমু এগিয়ে আসেন। আগ্রার শাসনকর্তা ইস্কান্দার খানকে পরাজিত করে হিমু দিল্লিতে উপস্থিত হন। তার্দিবেগে সেই সময়ে দিল্লির শাসক ছিলেন। তুঘলকাবাদের যুদ্ধে তার্দিবেগ পরাজিত হয়ে পাঞ্জাবে অকবরের শরাণাপন্ন হন। সাময়িকভাবে দিল্লি-আগ্রা হিমুর দখলে আসে। তিনি ‘রাজা বিক্রমাদিত্য’ উপাধি নেন।

মুঘলরা পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হয়। অধিকাংশ মুঘল অভিজাতদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তাঁরা স্বদেশভূমি মধ্য-এশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। এই সময়ে বৈরাম খাঁর নেতৃত্ব ছিল প্রশংসনীয়। সকল প্রতিকূলতাকে মাথায় রেখে তিনি আকবরকে নিয়ে হিমুর মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন।

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর পাণিপথের যুদ্ধে হিমু পরাজিত হন। প্রথম পর্যায়ে হিমু অবশ্য মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে হিমু তীরবিদ্ধ হন। পরবর্তী পর্বে বৈরাম খাঁর নির্দেশে হিমুকে হত্যা করা হয়। ফলে আফগান বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুঘল শাসনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিমুর মৃত্যু মুঘলদের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বীর শেষ বলে গণ্য করা হয়। হিমুর মৃত্যুর পরে আফগানদের নেতৃত্ব দিতে আর কেউ এগিয়ে আসতে পারেননি। অন্যান্য আফগান নেতারা যেমন সিকান্দার শাহ, আদিল শাহ এবং ইব্রাহিম শূর ক্রমে পরাজিত ও নিহত হন। ফলে আফগানদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আকবরকে আর তেমন কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। বাবর আফগানদের পরাস্ত করে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে যে মুঘল শাসনের সূত্রপাত করেছিলেন ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেই আফগান শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

২৪.৩.২ তত্ত্বাবধান থেকে ক্ষমতা সরাসরি নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করা

১৫৫৬ থেকে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আকবরকে সাম্রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করেন বৈরাম খাঁ। কিন্তু আকবর দীর্ঘদিন বৈরাম খাঁর নির্দেশে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না—যদিও হুমায়ুন ও তাঁর পরিবারের প্রতি বৈরাম খাঁর আনুগত্য ছিল সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে। বৈরাম খাঁর সময়োচিত পরামর্শ আকবরকে সাম্রাজ্য শত্রুমুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে বৈরাম খাঁ ছিলেন স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত। প্রশাসনে তিনি সর্বেসর্বা হতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন আকবর শুধুমাত্র তাঁর অনুগত থাকবেন। স্বাভাবিকভাবেই বৈরাম খাঁ ও আকবরের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত শুরু হয়। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে এক ‘ফরমান’ বা রাজকীয় নির্দেশ জারী করে আকবর বৈরাম খাঁকে অভিভাকত্বের পদ থেকে সরিয়ে দেন। বৈরাম খাঁ মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যাত্রাপথে আফগান আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৫৬০ থেকে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আকবরের শাসনকালকে ‘অন্তঃপুরিকার শাসনকাল’ বলে অভিহিত করা হয়। আকবরের ধাত্রীমাতা মহাম আনাঘা আকবরের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। প্রশাসনে মহাম আনাঘা ও তাঁর পুত্র আধম খাঁ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। স্বভাবতই আকবর পুনরায় এই চক্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হন। মহাম আনাঘাকে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিতে বাধ্য করেন এবং আধম খাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। অতঃপর আকবর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন।

২৪.৩.৩ আকবরের রাজ্যবিস্তার ও তার প্রকৃতি

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে যুদ্ধবিগ্রহ ও বিভিন্ন কৌশলে আকবর এক বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মুঘল শাসক, যিনি ভারতবর্ষে এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়বে না। অর্থাৎ সামরিক শক্তির ওপর আশ্রয় করে রাজ্যসীমা বিস্তার করলেও তার গঠন হয় সুদৃঢ় ও সুসংহত। এবং তার জন্য দরকার প্রজাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। এইখানেই ছিল আকবরের বিশেষত্ব। তিনি একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আরো একজন দূরদর্শী বাস্তবমুখী চরিত্রের সন্ধান পাই। ফলে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুঘল শাসন গড়ে তুলতে হলে, তার জন্য প্রয়োজন ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সখ্যতা, সহযোগিতা ও বিশ্বাস। আকবর এই লক্ষ্যে অনেকটাই এগুতে পেরেছিলেন। এটাই তাঁর চরম কৃতিত্ব; আর তার ফলে ভারতবর্ষে এমন এক প্রশাসন গড়ে উঠল যার ব্যক্তি ছিল কমবেশি তিনশ বছর। শুধু তাই নয়—এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমাজের বিভিন্ন

স্তরে পারস্পরিক লেনদেনে গভীরভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তার ফলে মধ্যযুগে ভারতবর্ষে একটি মিশ্র শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে।

ভারতে আকবরের রাজ্যবিস্তার নীতির মূল সূত্র ছিল চারটি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে পারস্পরিক বিবাদমান রাজ্যগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র যথাযোগ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া আকবরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আকবর তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতাকে প্রশাসনের মূল নীতি করেছিলেন। অন্যথায় হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত ভারতে কোনও একক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যে সম্ভব নয় সে কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

আকবর তাঁর শাসক জীবনের প্রাথমিক পর্বে আজমীর, গোয়ালিয়র, লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আফগানদের উচ্ছেদ করে নিজের আধিপত্যাধীনে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি মালব দখল করেন। এরপর আকবর মধ্যভারতের গাণ্ডোয়ানা রাজ্যে তার ক্ষমতা বিস্তার করেন। গণ্ডোয়ানা ও মালব অধিকারে আকবরের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রটিই ছিল প্রবল। সম্ভবত এই দুই রাজ্যের অর্থসম্পদ আকবরকে রাজ্য দুটি অধিকারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নচেৎ মালব বা গণ্ডোয়ানার সাথে মুঘল রাজশক্তির কোনও বিরোধ ছিল না।

রাজপুতানা সম্পর্কে আকবরের রাজ্যবিস্তার নীতিতে প্রগতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি সাম্রাজ্য গঠনের জন্য রাজপুতদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। যেখানে তাদের মধ্যে যারা আনুগত্য স্বীকার করেননি একমাত্র আকবর সেখানেই অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। উপরন্তু পরাজিত রাজার আনুগত্য লাভের পর তাঁকে নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অম্বরের রাজা বিহারীমল আকবরের আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। উপরন্তু বিহারীমলের কন্যা মনিবাঈ আকবরের প্রধানা মহিষী হন।

মেবারের সঙ্গে আকবরের সংগ্রাম সুদীর্ঘকাল চলে। হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় আকবরকে অবশেষে মেবার লাভ করতে সাহায্য করে। রণথম্ভোর, যোধপুর, বিকানীর এবং জয়সলমীরও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তবে প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ পুনরায় আকবরের বিরোধিতা শুরু করেন। আকবর অমর সিংহের বিরুদ্ধে মেবার আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবে হয়ে ওঠেনি।

রাজপুতানার পরে আকবর গুজরাট ও বঙ্গদেশ বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ইতিপূর্বে হুমায়ুন গুজরাট আক্রমণ ও জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বিজয় ছিল সাময়িক। তাঁর মৃত্যুর পর গুজরাট পুনরায় বিভিন্ন কারণে মুঘল শাসন নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসে। সম্ভবত ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আকবর গুজরাট সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গুজরাটের সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে প্রভৃতি বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলির বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অথচ সেই সময়ের গুজরাটের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আকবরকে গুজরাট জয়ে কিছুটা উৎসাহিত করেছিল। সেখানকার শাসক তৃতীয় মুজফ্ফর শাহ ছিলেন অযোগ্য এবং অপদার্থ। ফলে গুজরাটের 'মির্জা' অভিজাতরা অনেকটা গুজরাটের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। আকবর এই পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহারে উদ্যোগী হন। অরাজকতায় পূর্ণ এই সমৃদ্ধশালী প্রদেশটি অধিকার করে রাজ্যসীমা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও তিনি বিবেচনা করেছিলেন। ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে আকবর অনায়াসে মুজফ্ফর শাহ'র আনুগত্য লাভ করেন। কিন্তু 'মির্জা' অভিজাতরা এতো সহজে আকবরের বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পুনরায় আকবর গুজরাট আসেন এবং গুজরাটকে সরাসরি মুঘল সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে একটি পৃথক সুবায় পরিণত করেন।

গুজরাট অভিযান আকবরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গুজরাট মুঘল সুবায় পরিণত হওয়ার ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ মুঘলদের হাতে চলে আসে। ফলে মুঘল অর্থনীতি আরও মজবুত হয়ে উঠেছিল। আরব সাগরে পর্তুগীজদের আনাগোনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল। আকবর তাদের মুখোমুখি হন। উপরন্তু গুজরাট বিজয়ের ফলে তার মধ্যে দিয়ে দাক্ষিণাত্য অভিযানের সহজতম পথটি গড়ে উঠে।

গুজরাট বিজয়ের পর আকবর বাংলার আফগান শাসক দাউদ কররাণীর বিদ্রোহ দমন করতে প্রস্তুত হন। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তুকরাই বা তুর্কার যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হয়ে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু পুনরায় তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দেন। অতঃপর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে আকবরের নির্দেশে মুজফ্ফর খান, খান-ই-জাহান ও টোডরমল দাউদকে পরাজিত ও নিহত করেন।

দাউদের মৃত্যু বাংলাদেশের সুদীর্ঘকালের সুলতানি শাসনের অবসান ঘটায়। আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও আকবর কখনই এখানে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কারণ বাংলার বারো ভুঁইয়ারা, যাঁরা জাহাঙ্গীরের আমল থেকে নিজ নিজ এলাকায় ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা সহজে আকবরের কাছে নতিস্বীকার করতে চাননি। তাঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। তবে আকবর যথেষ্ট পরিশ্রম করে তাঁদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন।

গুজরাট ও বাংলা জয়ের পর আকবরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজ্যবিস্তার নজর দেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক চিত্রটি এই সময়ে অত্যন্ত অস্থির ছিল। একজন মুঘল হিসাবে কাবুলের ওপর তাঁর দুর্বলতা ছিল। উপরন্তু আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই মীর্জা হাকিম এবং সেখানকার গোঁড়া মুসলমানরা আকবরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তবে মীর্জা হাকিমের জীবদ্দশায় আকবর কাবুল অধিকার করেননি। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে মীর্জা হাকিমের মৃত্যুর পর আকবর আনুষ্ঠানিকভাবে কাবুল দখল করেন।

কাশ্মীরের শাসক ইউসুফ শাহ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতেন। এই কারণে রাজপুতানার অম্বরের রাজা ভগবান দাসের নেতৃত্বে আকবর কাশ্মীরে অভিযান পাঠান। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ইত্যবসরে সিন্ধুপ্রদেশও মুঘল নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সিন্ধুপ্রদেশের গুরুত্ব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার দিক দিয়ে ছিল অসীম। এর ফলে কান্দাহার সহজেই আকবরের অধীনে চলে আসে। কান্দাহারের মধ্য দিয়ে মধ্য-এশিয়া ও পারস্যের সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বিদ্রোহী উজবেগ-উপজাতিরাও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

আকবরের দক্ষিণ ভারত অভিযান তাঁর ভারতবর্ষব্যাপী অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনের অভিলাষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত ছিল। তাঁর দক্ষিণ ভারত অভিযান বিশ্লেষণ করলে সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও কিছু প্রগতিমূলক চিন্তাধারারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তালিকোটা যুদ্ধের পর থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে চরম অব্যবস্থার সূচনা হয়। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম সর্বক্ষেত্রে এখানকার রাজ্যগুলি পারস্পরিক কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকে নিজেদের ধ্বংস করে চলেছিল। এই অবসরে আরব সাগরে পর্তুগীজদের প্রাধান্য ও ঔদ্ধত্য বেড়ে চলে। আরব সাগরের ভারতীয় বণিক ও মক্কাগামী তীর্থযাত্রীদের ওপর পর্তুগীজদের উৎপীড়নের সীমা ছিল না। দক্ষিণী রাজ্যগুলি পর্তুগীজদের এই ঔদ্ধত্য দমনে ব্যর্থ হয়। কারণ দক্ষিণ ভারত তখন দক্ষিণী ও পরদেশী বা আফাকি এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিরোধে জর্জরিত। শিয়া-সুন্নী সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বও তখন দক্ষিণকে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি এনে ফেলেছিল। এই সুযোগে গোয়া পর্তুগীজদের দখলে চলে আসে। এমতাবস্থায় আকবর নিশ্চয় সাম্রাজ্যবাদের আকাঙ্ক্ষায় দাক্ষিণাত্য অভিযানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। দক্ষিণের ধর্মীয় বিভেদ বা জাতিগত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব উত্তর ভারতকে স্পর্শ করতে পারার সংশয় সম্ভবত আকবরের মধ্যে কাজ করেছিল। স্বভাবতই প্রগতিশীল আকবর এই ধরনের সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। উপরন্তু ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের আধিপত্য মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতির পক্ষেও বিপজ্জনক। কাজেই তাদের দমন করতে হলে দক্ষিণ ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা আশু কর্তব্য ছিল। ফলে দাক্ষিণাত্য অভিযান আকবরের পক্ষে জরুরি ছিল।

বাহমনি সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর যে পাঁচটি সুলতানি রাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে উল্লেখযোগ্য ছিল—বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, আহম্মদনগর ও খান্দেশ। আকবর প্রথমেই এই রাজ্যগুলির

বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করতে চাননি। এদের সহযোগিতাই তাঁর কাম্য ছিল। কিন্তু খান্দেশ ব্যতীত আর কোনও রাজ্য আকবরের মৈত্রী আহ্বানে সাড়া দেননি।

এই সময়ে আহম্মদ নগরে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার সুযোগে আকবর দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসেন। আহম্মদনগরের শাসক বুরহান নিজাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভগ্নী ও বিজাপুরের আদিল শাহ'র বিধবা পত্নী চাঁদবিবি নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারে রাজি হননি। মুঘলদের সঙ্গে সংগ্রামে চাঁদবিবি জয়ী হন এবং ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে এক সন্ধিতে মুঘলরা বাহাদুর শাহকে আহম্মদনগরের সুলতান হিসাবে মেনে নেন ও পরিবর্তে চাঁদবিবি মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেন। সন্ধির শর্ত হিসাবে বেরার প্রদেশটি আহম্মদনগর মুঘলদের দিয়ে দেয়। কিন্তু অভিজাতদের একাংশ এই সন্ধি মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাঁরা চাঁদবিবিকে ক্ষমতাচ্যুত করে মুঘলদের বিরোধিতা করে এবং বেরার থেকে মুঘলদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে অস্তির যুদ্ধে মুঘল বাহিনী আহম্মদনগরকে পরাস্ত করে। তবে এই যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে আকবরের প্রাধান্য বিশেষ বিস্তৃত করতে পারেনি। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের আগে, অর্থাৎ চাঁদবিবি নিহত হওয়ার পর মুঘলরা আহম্মদ নগরের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা এরপর আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে খান্দেশের অন্তর্গত দুর্ভেদ্য আসিরগড় দুর্গটি দখল করে আকবর তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযান সমাপ্ত করেন। অনুমান করা হয় আকবর সরাসরি এই দুর্গ দখল করতে অসমর্থ হওয়ায়, কিছুটা শঠতার আশ্রয় নিয়ে আসিরগড় দুর্গ দখল করেন।

আকবর দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্যগুলি জয় করেছিলেন, তার ফলে মুঘল সীমানা দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তবে আকবর দক্ষিণ ভারতে তাঁর অধিকারকে বিশেষ সুদৃঢ় করে যেতে পারেননি। দক্ষিণ ভারত থেকে দিল্লীর অবস্থান ছিল বহু দূরে। কাজেই দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় কর্মচারীদের আনুগত্য লাভ করা মুঘল সম্রাটের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল বলা যেতে পারে। তাছাড়া দাক্ষিণাত্য সুদৃঢ় করার পর্যাপ্ত সময় আকবর পাননি। আসিরগড় দুর্গ জয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

২৪.৪ আকবরের রাজপুত নীতি ও হিন্দু নীতি

আকবর সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন এ কথা যেমন সত্য, তেমনই এটাও অনস্বীকার্য যে নিছক বাহুবলে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। আকবরের বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞা তাঁকে উপলব্ধি করিয়েছিল যে ভারতবর্ষে মুঘলদের স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হলে হিন্দু তথা রাজপুতদের সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট ভাবনাচিন্তা করা প্রয়োজন। আকবর বুঝতে পেরেছিলেন যে, এককভাবে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন ও বাহুবলের ওপর নির্ভর করে হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কোনও সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায় না। তাই হিন্দু এবং রাজপুতদের সম্পর্কে আকবরের পদক্ষেপ ছিল উদার এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ। একজন যথার্থ সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে আকবরের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বোধহয় এইখানে।

আকবর সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে সব বিরোধিতা, চক্রান্ত ও অবিশ্বস্ততার পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। ফলে ভারতবর্ষের হিন্দু জনগোষ্ঠীর সহায়তা লাভের কথা তাঁকে চিন্তা করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছিল আকবরের হিন্দুনীতি তথা রাজপুতনীতি।

আকবর রাজপুতদের মৈত্রীলাভের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমত, রাজপুত পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। অম্বরের রাণা বিহারীমলের কন্যা

মনিবাঈকে আকবর বিবাহ করেন। বিকানীর ও জয়পুরের সাথেও আকবরের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আকবর তাঁর পুত্র সেলিমের সাথে উদয় সিংহের কন্যা যোধাবাঈয়ের বিবাহ দেন। ফলে যোধপুরের সাথেও আকবরের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আকবরের পূর্বেও মুসলমান শাসকের সাথে রাজপুত পরিবারের বিবাহ সম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়। কিন্তু এই ধরনের বিবাহের পশ্চাতে কোনও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কাজ করেনি। ফলে ভারতের রাজনীতিতে তার কোনও স্থায়ী প্রভাবও পড়েনি। কিন্তু আকবরের রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক নীতি গড়ে তোলার পশ্চাতে সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা ছিল। ফলে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়েছিল। বিবাহের ফলে রাজপুত রাণাদের সখ্যতা ছাড়াও আকবর লাভ করেছিলেন মানসিংহ, বিহারীমল, টোডরমলের মতো দক্ষ রাজপুত রাজকর্মচারী যাঁদের অনলস পরিশ্রমের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমে এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

সকল রাজপুত রাজারা যে নিঃশর্তভাবে আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল এ কথা বলা যায় না। তাদের কারুর কারুর বিরুদ্ধে আকবরকে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। মালব, রণথম্ভোর, বিকানীর এবং জয়সলমীরের বিরুদ্ধে আকবরকে যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু আকবর যুদ্ধ করলেও পরাজিত রাজাদের সঙ্গে কখনও অসম্মানজনক ব্যবহার করেননি। তাদের ব্যক্তিগত ধর্মেও তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। ফলে রাজপুতরা পরাজিত হলেও তাঁরা আকবরের উদার ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহারে অনুগত হয়ে পড়েন। এইসব অনুগত রাজারা আকবরের কাছ থেকে বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে নিজ নিজ রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি রাজপুত রাণাদের এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন যা এতদিন পর্যন্ত একচেটিয়াভাবে কেবলমাত্র মুসলিম অভিজাতরাই ভোগ করত। উদাহরণস্বরূপ অম্বরের ভগবান দাসকে লাহোরের যুগ্ম শাসকরূপে নিযুক্ত করা হয়। মানসিংহ প্রথমে কাবুল এবং পরে বাংলা-বিহারের দায়িত্বে আসেন। অন্যান্য সুদক্ষ রাজপুত কর্মচারীদের ওপর গুজরাট, আজমীর, আগ্রা প্রভৃতি প্রদেশের প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এমনকি তাদের বংশগত জায়গীর ছাড়াও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জায়গিরদারী লাভ করার ফলে রাজপুতদের অর্থ ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা সমকালীন মুঘল অভিজাতদের থেকে প্রতিপত্তি ও মর্যাদায় কোনও অংশে কম ছিলেন না। এইভাবে মুঘল রাজনীতিতে রাজপুতদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গড়ে ওঠে।

একমাত্র মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ ব্যতিরেকে সমগ্র রাজপুতানা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ সিংহ মুঘলদের কাছে পরাজিত হন। প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র অমর সিংহ আকবরের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যান। রাজপুত নীতির বন্ধনে আকবর মেবারকে আবদ্ধ করতে অসমর্থ হন।

প্রকৃতপক্ষে আকবরের রাজপুতনীতি এবং হিন্দুনীতির মুল কথা ছিল বিজেতা ও বিজিতের সম অধিকার। তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে ‘জিজিয়া’ কর তুলে দেন। আকবর এই কর রহিত করে প্রমাণ করেন যে ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই। হিন্দু যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস করার প্রথা আকবর নিষিদ্ধ করেন এবং হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করাও আকবর পছন্দ করতেন না। এইভাবে আকবর মধ্যযুগে একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে হিন্দু সমাজ আকবরের অনুগত হয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার ভিত্তিতে সাম্রাজ্য গড়ে তোলায় আকবর একজন জাতীয় সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

২৪.৫ আকবরের প্রশাসনিক সংস্কার : ভূমি-রাজস্ব নীতি

প্রশাসন বলতে এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান বোঝায় যার মাধ্যমে রাষ্ট্র কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করে। ইংরেজ ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড আকবরের শাসন ব্যবস্থাকে একান্তভাবে বাস্তব বলে মনে

করেন। কারণ আকবরের প্রশাসনিক সংস্কারের মূল কাঠামো ছিল ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা। যদিও সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা তথা ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাতে শেরশাহের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তথাপি আকবরই প্রথম মুঘল সম্রাট যিনি ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে শেরশাহ প্রবর্তিত পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে রাজস্ব-ব্যবস্থাকে উন্নততর ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য চেষ্টা করেন। প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেবার পরিবর্তে আকবর পরাজিত রাজাদের মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মেনে নিতেন। আবার তিনি রাষ্ট্রের সঙ্গে রায়তদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনেও উৎসাহী ছিলেন। অর্থাৎ রাজস্ব-ব্যবস্থার লাগাম সরাসরিভাবে সম্রাটের হাতে ছিল।

আকবরের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল জনকল্যাণ। রাজস্ব বিষয়ক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। আকবর যদিও শেরশাহকে অনুসরণ করেছিলেন, কারণ মুসলমান শাসকদের মধ্যে শেরশাহ সর্বপ্রথম রাজস্বনীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও শেরশাহ্র নীতিতে বেশকিছু ত্রুটি ছিল। প্রথমত, দেয় রাজস্বকে নগদ মূল্যে রূপান্তরিত করতে অনেক সময় লাগতো। যার ফলে রাজকোষে অর্থাগম হতো দেরী করে। দ্বিতীয়ত, ফসলের পরিমাণ নগদ মূল্যে রূপান্তরিত করার সময়ে বাজারদর একটা সমস্যা ছিল। কারণ দেশের নানা অংশে বাজারদরের তারতম্য ছিল। উপরন্তু দিল্লীর বাজারদরের সঙ্গে দূরবর্তী অঞ্চলের বাজারদরের অনেক পার্থক্য ছিল। এছাড়া জমির যথার্থ মাপ এবং প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তির ব্যাপারটি বিবেচনা সাপেক্ষ ছিল।

আকবর প্রথমে বাৎসরিক রাজস্ব নিরূপণের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে দেওয়ান নিযুক্ত হন খাজা আব্দুল মজিদ। আকবর বিভিন্ন ‘সরকার’-এর খালিসা জমির উৎপাদনের গড় নির্ধারণ করেন এবং তৎকালীন বাজার নিরীক্ষণ করে উৎপাদিত ফসলের ওপর বার্ষিক রাজস্ব বসান। এই কাজের জন্য তিনি কানুনগোদের নিযুক্ত করেন। এদের ওপর নিজ নিজ এলাকার জমির প্রকৃত উৎপাদন এবং ফসলে স্থানীয় বাজারদর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রকে ওয়াকিবহাল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ কানুনগোই নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। কাজেই আকবরের এই ব্যবস্থা ফলপ্রসু হতে পারেনি।

আকবরের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বৎসরে দেওয়ান নিযুক্ত হন মুজফ্ফর তুরাবতী। তুরাবতীর তত্ত্বাবধানে মুঘল-ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অনেকটা কার্যকরী হয়ে ওঠে। তিনি প্রথমে দশজন কানুনগোর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। স্থির হয় এই কমিটি সমগ্র দেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে উপযুক্ত কার্যবিধি জানিয়ে কেন্দ্রকে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেবেন। কিন্তু এখানেও সততার প্রশ্নটি আবার ঘুরে-ফিরে চলে আসে। বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত তথ্যের অভাবে আকবরের প্রচেষ্টা পুনরায় ব্যর্থ হয়।

১৫৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল রাজস্ব সম্পর্কে একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করেন। বাংলা, বিহার ও গুজরাট বাদ দিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যকে খালিসা জমিতে পরিণত করা হয় এবং জায়গীর প্রথা তুলে দেওয়া হয়। ক্রোরি নামে একদল রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীর ওপর ১৮২টি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়। টোডরমল আশা করেছিলেন, যে প্রতিটি পরগণা থেকে এক কোটি ‘দাম’ অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আদায় করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু ক্রোরিও ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে টোডরমল ক্রোরিদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বন্ধ করে দেন।

আকবরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় পরবর্তী পদক্ষেপ তাঁর বিখ্যাত ‘দহশালা’র (Ten years assessment) প্রবর্তন। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণে ফসলের দশ বৎসরের গড় হিসাব ধরা হোত। এবং আকবর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উৎপাদনের গড়ের এক-দশমাংশকে বাৎসরিক উৎপাদন হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তার এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হবে। সেই আমলে রাজস্ব আদায়ে ফসলের পরিবর্তে নগদ অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হতো বলে সরকারি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা বাজার দরের গড়পড়তা ভিত্তি অনুযায়ী ফসলের নগদ মূল্য নির্ধারণ করতেন। আকবর প্রবর্তিত ‘দহশালা’ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অস্থায়ী তাই তাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হবে না। তবে আকবর প্রবর্তিত এই বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থা সরল করে দেওয়ার ফলে সরকার ও কৃষক উভয়পক্ষের

সুবিধা হয়। যেটুকু জমি চাষ করা হতো তার ওপর রাজস্ব নির্ধারিত হতো বলে কৃষক সম্প্রদায়ের বিশেষ অসুবিধা হতো না। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সরকার থেকে কৃষকদের কর রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল।

আকবরের 'দহশালা' ব্যবস্থা মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার মূল কাঠামো হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল তাঁর রাজস্ব সংক্রান্ত নির্দেশনামা জারী করেন। একে বলা হতো 'দস্তুর-অল্-অমল'। এটিকে সাধারণ্যে টোডরমলের বন্দোবস্তও বলা হয়ে থাকে। টোডরমলের বন্দোবস্তের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—(১) জমি জরিপ, (২) জমির গুণগত মান নির্ণয়, (৩) দেয় রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করা। টোডরমলের রাজস্ব-সংক্রান্ত নির্ধারণ ব্যবস্থা জাবত্ পদ্ধতি নামে সমধিক পরিচিত। সম্ভবত জরিপ-এর সমার্থক জাবত শব্দটি।

টোডরমল জমির উৎপাদন ও উর্বরতার ওপর ভিত্তি করে জমিকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন—পোলজ, পরৌতি, চাচর এবং বঞ্জর। যে জমিতে প্রতিবছর চাষ হত তাকে বলা হত পোলজ। মাঝে মাঝে যে জমি পতিত পড়ে থাকে তাকে বলা হতো পরৌতি। তিন বা চার বৎসর পতিত রাখা জমির নাম ছিল চাচর। যে জমিকে পাঁচ বৎসর বা আরো বেশি সময়ের জন্য ফেলে রাখতে হতো তাকে বলা হতো বঞ্জর। পোলজ ও পরৌতি শ্রেণীভুক্ত জমিকে আবার উর্বরতা অনুযায়ী উৎকৃষ্ট, ভালো, নিকৃষ্ট এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করে আনুমানিক উৎপাদনের গড় হিসাব করা হতো এবং তার এক-তৃতীয়াংশকে রাজস্ব হিসাবে ধরা হতো।

আকবরের সমকালীন রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে এক ধরনের রাজস্ব নীতি প্রচলিত ছিল না। টোডরমলের জাবত্ পদ্ধতি ব্যতীত সাম্রাজ্যে আর যে দু-ধরনের রাজস্ব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা হলো গাল্লা বখশী বা বাটাঈ অথবা ভাওলি, দ্বিতীয়টি হলো নসক। অনেকে মনে করেন কানকূত বা দানাবন্দী নসক ব্যবস্থাই ইঙ্গিত করে।

গাল্লা বখশী মূলত ফার্সী শব্দ। ভারতবর্ষে ভাগচাষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে তিনভাবে উৎপাদন ও সরকারের প্রাপ্য স্থির করা হতো। (১) করার—দাদ পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার ও কৃষকের উপস্থিতিতে খামারে চুক্তি অনুযায়ী শস্য ভাগ করা হতো। (২) ক্ষেত—কটাঈ ব্যবস্থায় শস্য কাটার আগেই শস্য ভাগ করে নেওয়া হতো। (৩) লাঙ্গ বটাঈ পদ্ধতি ছিল শস্য কাটার পর মাঠে স্তূপাকারে রাখা হতো এবং তারপর ভাগের ব্যবস্থা হতো। গাল্লা বখশী রাজস্ব আদায়ের যথাসম্ভব ন্যায্য পদ্ধতি বলা যেতে পারে। তবে এর উপযোগিতা নির্ভর করত সরকারি রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের সততার ওপর। এই পদ্ধতি সিন্ধ, কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর অঞ্চল প্রচলিত ছিল।

আকবরের আমলে প্রচলিত নসক পদ্ধতি সম্পর্কে সবিস্তারে কিছু জানা যায় না। প্রশাসন ঐতিহাসিক ব্লখম্যানের মতে, নসক এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে রায়ত ও রাজস্ব আদায়কারীরা ভূমি রাজস্ব স্থির করে। মনে করা হয় যে, নসক বলতে পৃথক কোনও রাজস্ব পদ্ধতি বোঝায় না। বরং এটা কৃষক ও রাজস্ব সংগ্রহকারীদের রাজস্ব হিসাব করার একটি সরকারি পদ্ধতি। বাংলা, কাথিয়াবাড় এবং গুজরাটের বেশকিছু অঞ্চলে নসক পদ্ধতির প্রচন ছিল।

কানকূত বা দানাবন্দী ব্যবস্থা বলে আর একটি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার কথা জানতে পারা যায়, যাকে অনেকেই মনে করেন নসক ব্যবস্থার অভিন্ন। এই ব্যবস্থায় দড়ি বা পা ফেলে জমি মাপ করা হতো। তারপর সেই অঞ্চলের উৎপদনী ক্ষমতা থেকে বিচার-বিবেচনা করে রাজস্বের হার নির্ধারণ করা হতো। এই ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, রাজস্ব নগদ অর্থে দেওয়া আবশ্যক ছিল না। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে, কানকূত ব্যবস্থা অনেক দক্ষ ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। এতে প্রশাসনিক দূর্নীতির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল।

আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব-ত্রুটিহীন বলা যেতে পারে। আকবর চাষের জমি সম্প্রসারণের জন্য চাষীদের উৎসাহ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য মনে করেছিলেন। সরকারি উদ্যোগে সেচখাল খনন বা অন্যান্য সংস্কারের

কার্যেও আকবর উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। আকবর এ কথাও বুঝেছিলেন যে চাপ সৃষ্টি করে কৃষকদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা উচিত নয়। এর ফল ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো নয়। প্রয়োজনের সময়ে কৃষকদের তক্‌বি বা কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও আকবরের আমলে প্রচলিত হয়েছিল। সম্ভবত এই ঋণের জন্য কোনও সুদ দিতে হতো না। যে জমিতে নতুন চাষ করা হতো সেখানে আকবরের নির্দেশে প্রচলিত হারের চেয়ে কম রাজস্ব আদায় করা হতো। জমিতে ভোগ্য শস্যের (ধান, বাজরা, গম) পরিবর্তে অর্থকরী শস্যের উৎপাদন হলে, যেমন—তুলো, পাট, কম হারে রাজস্ব নেওয়ার রীতি ছিল। ঋণ মকুব করে দেওয়ার কথাও জানতে পারা যায়। অর্থাৎ আকবরের রাজস্ব নীতিতে প্রয়োজনের তাগিদ থাকলেও তার জনকল্যাণমুখী দিকটিকে অস্বীকার করা যায় না। অনেকের মতে, আকবরের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি-রাজস্ব আদায় একটু বেশি ছিল। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, তিনি জিজিয়া, জাকাত, তীর্থকর এবং অন্যান্য বহু ধরনের শুল্ক রদ করে সাধারণ লোককে স্বস্তি দিয়েছিলেন। রাজস্ব ব্যতিরেকে অন্যান্য অতিরিক্ত কর আদায় যাতে না হয় তার প্রতি তিনি যত্নবান ছিলেন। সার্বিকভাবে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে আকবরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট আধুনিক ও কার্যকরী ছিল বলা যেতে পারে।

২৪.৬ মনসবদারী নীতি

স্থিতিশীল আমলাতান্ত্রিক সরকার গঠন ব্যতীত আকবরের অপর একটি কীর্তি হল মনসবদারী সংগঠন। মুঘল রাজত্বকালে সামরিক ও বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল এই মনসবদারী প্রথা। এঁরাই ছিলেন মুঘল আমলের প্রধান শাসকগোষ্ঠী।

অনুমান করা হয় পরাস্য দেশে মনসবদারী প্রথা বহু পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল। আকবর এর অনুকরণ করেছিলেন মাত্র। মুঘল প্রশাসনিক সংগঠনের মূল ভিত্তি ছিল সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। আকবরের পূর্বে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা বিশেষ হয়নি বললেই চলে। উপরন্তু শেরশাহ প্রবর্তিত জায়গীরদারী প্রথাতেই কিছু কুফল দেখা গিয়েছিল। আমীররা বিশাল জায়গীর লাভ করার ফলে এবং সামরিক প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ার সুবাদে উচ্চকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন। আমীররা দুর্নীতিগ্রস্থ ও অর্থলোভী হয়ে পড়েন। অথচ এদের ওপরেই সামরিক প্রয়োজনে সম্রাটকে নির্ভর করতে হতো। যথেচ্ছভাবে জায়গীর বিতরণ করার জন্য সরকারি খালসা ভূমি কমে এসেছিল। রাজকোষে এর ফলে অর্থাগম কমতে থাকে। জায়গীরদাররা সাধারণত দক্ষ সৈন্য ও উন্নতমানের ঘোড়া রাখতেন না। ফলে যুদ্ধের সময়ে নিম্নমানের ঘোড়া ও অপদার্থ সৈন্য সম্রাটের প্রয়োজনে পাঠিয়ে রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া হতো। আকবর এই ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কাজেই সেনাবাহিনীকে এইসব ত্রুটি থেকে মুক্ত করে তিনি একটা সুদক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

'মনসব' শব্দটির অর্থ পদমর্যাদা। অধ্যাপক আতাহার আলি 'মনসব' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে 'মনসব' হল কোনও ব্যক্তির পদমর্যাদা এবং একই সঙ্গে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তি। মনসবদারী ব্যবস্থা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। অধ্যাপক কুরেশী বলেছেন যে, সামরিক ও বে-সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই 'মনসব' প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কাউকে সামরিক ও বে-সামরিক দু-ধরনের কাজই দেখতে হতো আবার কেউ নির্দিষ্ট কোনও কাজের দায়িত্বে থাকতেন। কিন্তু মনসবদাররা কে কি ধরনের কাজ করবেন তা স্থির করতেন সম্রাট স্বয়ং। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ও বলেছেন যে, মনসবদারদের ক্ষেত্রে সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে যে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতো এ কথা ঠিক নয়।

১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে আকবর তাঁর প্রিয় মীরবক্সী শাহবাজ খানের সাহায্যে মনসবদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা মীরবক্সী প্রস্তুত করে সম্রাটের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতেন। সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মনসবদারের সাক্ষাৎ নিতেন এবং তাদের পদমর্যাদা যোগ্যতা অনুযায়ী স্থির করতেন। বদাউনি

এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কর্তব্য পালনে গাফিলতি হলে মনসবদারদের পদের অবনতি ঘটতে পারত। আবার মনসবদারদের দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতিও ঘটত।

মুঘল আমলে, আকবরের রাজত্বকালে সম্রাট জাতি-ধর্ম বা বর্ণকে কখনই মনসবদার নিয়োগের সময়ে গুরুত্ব দিতেন না। সতীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মুঘল সম্রাটরা এই ধরনের সংকীর্ণতা মনসবদার নিয়োগের সময়ে কখনই দেখাননি। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, অভিজাতদের পক্ষে উচ্চপদস্থ মনসবদার রূপে নির্বাচিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

পদমর্যাদা অনুযায়ী মনসবদাররা বহু ভাগে বিভক্ত ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল বলেছেন যে, মনসবদাররা ৬৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। অধ্যাপক অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, সম্ভবত আকবর ৬৬টি শ্রেণীতে মনসবদারদের বিভাজনের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ৩৩টি শ্রেণী গঠন করা সম্ভবপর হয়েছিল। বলা হয় যে, সর্বনিম্ন মনসবদারের অধীনে দশজন এবং সর্বোচ্চ মনসবদারের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য থাকত। আরও বেশি সংখ্যক সৈন্যের দায়িত্বে থাকতেন যে সব মনসবদাররা তাঁরা সাধারণত রাজপরিবারের সদস্য হতেন। যেমন, মানসিংহ বা টোডরমল সাত হাজারী মনসবদার ছিলেন।

বলা হয় যে, এক হাজারী ও তার বেশি মনসবদাররা 'ওমরাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। বার্ণিয়ে বলেছেন যে, মুঘল প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিলেন এই ওমরাহরা।

মনসবদারী ব্যবস্থার সাথে সাথে 'জাট' ও 'সওয়ার' এই দুটি শ্রেণীর কথা চলে আসে। ব্লখম্যান বলেছেন যে, 'জাট' শব্দটির অর্থ একজন মনসবদারের অধীনে কত সৈন্য রয়েছে। 'সওয়ার' শব্দটি বলতে বোঝায় পদমর্যাদার অতিরিক্ত সেনা। ড. ত্রিপাঠী মনে করেন যে, 'সওয়ার' ছিল মনসবদারদের পদের অতিরিক্ত মর্যাদার ইঙ্গিত এবং এর জন্য তাঁরা রাজকোষ থেকে অতিরিক্ত অর্থ পেতে পারতেন। ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোলাধ্যায় বলেন যে, আকবরের মনসবদারী ব্যবস্থা একদিনে গড়ে ওঠেনি। তাঁর সুদীর্ঘকালের চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল এই মনসবদারী প্রথা। প্রথম কুড়ি বছর মনসবদারদের মধ্যে 'সওয়ার' পদটি ছিল না। আকবর খেয়াল করেন যে, মনসবদাররা যতটা সৈন্য রাখা প্রয়োজন তা রাখেন না, তখনই তিনি 'সওয়ার' পদটির কথা চিন্তা করেন। তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন যে, 'সওয়ার' পদ অনুযায়ী সৈন্য পোষণ করতে মনসবদাররা বাধ্য এবং এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হবে। তবে সকল মনসবাদরই যে 'সওয়ার' পদের অধিকারী হবেন তা নয়। কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, আকবরের রাজত্বকালের শেষ পর্বে প্রায় সব মনসবদারই 'জাট' ও 'সওয়ার' দুটি পদেরই অধিকারী ছিলেন।

'জাট' ও 'সওয়ার' সংখ্যার ওপর নির্ভর করে মনসবদাররা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর মনসবদার তাঁকেই বলা হতো যিনি সমসংখ্যক 'জাট' ও 'সওয়ার' রাখতেন। 'সওয়ারের সংখ্যা যদি 'জাটের' অর্ধেক হয়, তবে সেই মনসবদাররা দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে গণ্য হতেন। যে সব মনসবদারদের অধীনে কোনও 'সওয়ার' থাকত না, অথবা 'সওয়ার' সংখ্যা যদি 'জাট' সংখ্যার অর্ধেকেরও কম থাকত তবে তাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদার বলে বিবেচিত হতেন।

মনসবদারদের বেতন দেওয়া হতো নগদে কিংবা জমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে। যাঁরা সরকার থেকে বেতন পেতেন তাঁদের বলা হতো মনসবদার-ই-নগদি। আর যাঁরা সরকার থেকে নির্দিষ্ট জমি লাভ করতেন নিজের ও সৈন্যদের খরচ চালানোর জন্য তাঁদের বলা হতো 'জাগিরদার'। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম দিকে মনসবদারী প্রথা আদৌ বংশানুক্রমিক ছিল না। মনসবদারের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করতেন ফলে মনসবদাররা অমিতব্যয়ী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়তেন। যদিও আকবর চেয়েছিলেন যে মনসবদার উত্তরাধিকারীর জন্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে উৎপীড়ন করতে যাতে না পারেন, সেইজন্য মনসবদারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পত্তি সম্রাট বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে নিতেন—কার্যত ফল হয়েছিল বিপরীত। উপরন্তু এই ব্যবস্থার ফলে স্বনির্ভর কোনও অভিজাত সম্প্রদায় মুঘল আমলে গড়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কালে

এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। সেই যুগে রাজ্য রক্ষার জন্য বা শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খলতকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কোনও শক্তিশালী অনুগত রাজকর্মচারীর দল এগিয়ে আসেনি।

আকবর মনসবদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোর ভিতরে এক বিরাট সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তবে আকবরের আমলে মনসবদারী ব্যবস্থা মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারের পক্ষে সহায়ক হলেও কালক্রমে এই ব্যবস্থার মধ্যে নানা অসুবিধার উদ্ভব হয়। ঐতিহাসিকদের একাংশ মনে করেন যে, মনসবদারী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি তার সংগঠন ব্যবস্থার সঙ্গেই যুক্ত ছিল, তবে আকবরের সহজাত ব্যক্তিত্বের জন্য সেগুলি সেইযুগে তেমনভাবে প্রতীয়মান হয়নি। মনসবদাররা যে সকলেই সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিলেন তা নয়। দক্ষ প্রশাসক মনসবদারদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে এদের বিদ্রোহ করার সুযোগ ছিল সর্বাধিক। কারণ তাদের অধীনে সৈন্য যেমন থাকত, তেমনই তাদের আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সাধারণ লোক সম্রাটের সম্পর্কে যতটা না অনুগত ছিল তার থেকে বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তারা মনসবদারদের সম্পর্কে বলে মনে করা হয়—কারণ তারা ছিল স্থানীয় প্রভু। মনসবদারদের এই ধরনের স্থানীয় প্রতিপত্তি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। আবুল ফজল নিজেও লিখে গিয়েছেন যে, মনসবদারদের একটি বিরাট অংশ ছিলেন অসৎ এবং সুযোগসন্ধানী। তারা তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সৈন্য বা ঘোড়া সব সময়ে রাখতেন না। আকবর যদিও 'সওয়ার' ব্যবস্থার মাধ্যমে এই দুর্নীতি রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং 'দাগ' (Branding) ও 'চেহারা' (Descriptive roll) প্রথা চালু করেছিলেন। অর্থাৎ ঘোড়ার গায়ে চিহ্ন দেওয়া হতো, এবং প্রতিটি সৈনিক সম্পর্কে প্রশাসন বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখত—তা সত্ত্বেও মনসবদারদের দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে মনসবদারী ব্যবস্থা মুঘল সেনাবাহিনীর ঐক্য ক্ষুণ্ণ করে তুলেছিল। কারণ মনসবদারদের অধীনস্থ সৈন্যদের সাথে মনসবদারদের যে সংযোগ ও আনুগত্যের বন্ধন ছিল তা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। কারণ মুঘল সেনাপতিদের আঞ্চলিক সৈন্যদলের ওপর কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। ফলে মুঘল সেনাবাহিনীর সামগ্রিক সংহতিতে ফাটল দেখা যায়। আকবর তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে মনসবদারী প্রথাকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রে পরিণত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মনসবদারী প্রথার সহজাত ত্রুটিগুলি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ে মনসবদারদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতেও দেখা গিয়েছিল।

২৪.৭ সারাংশ

এই এককটিতে আকবরের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মূল বিষয় করা হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে আকবর যে রাজ্য উপহার পেয়েছিলেন সেখানে সংহতি, স্থিতিশীলতা, আনুগত্য শব্দগুলি ছিল অনুপস্থিত। একক প্রয়াসে, উদ্যম ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে, কখনও যুদ্ধ করে, কখনও মৈত্রীর পথ ধরে আবার কখনও বা প্রশাসনিক সংগঠনের মাধ্যমে আকবর এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন—যা মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা এবং মনসবদারী সংগঠন মুঘল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল পদক্ষেপ বলে স্বীকৃত। পরবর্তী পর্বে সুদীর্ঘকাল এই দুটি ব্যবস্থা ভারতবর্ষের প্রশাসনের অঙ্গ ছিল।

২৪.৮ অনুশীলনী

১। মুঘল সাম্রাজ্য গঠনের পর্বে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব কতটা ছিল?

২। গুজরাট ও দক্ষিণ ভারত বিজয়ের ক্ষেত্রে আকবরের মনোভাব কি একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ছিল?

৩। আপনি আকবরের রাজপুত নীতির মূল্যায়ন কিভাবে করবেন?

৪। আকবরের পক্ষে ভুমি-রাজস্ব ব্যবস্থা কতটা কৃতিত্বের ছিল?

৫। মনসবদারী ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে এই প্রথার যথার্থতা বিচার করুন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন---

(ক) পর্দা শাসন বা অন্তঃপুরিকার শাসন বলতে কি বোঝায়?

(খ) বৈরাম খাঁ কে ছিলেন?

(গ) হিমু কে ছিলেন?

(ঘ) মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধে চাঁদবিবির ভূমিকা।

(ঙ) 'দহশালা' কি?

(চ) 'মনসবদার' বলতে কি বোঝায়?

(ছ) 'জাট' ও 'সওয়ার'-এর পার্থক্য কোথায়?

মনে রাখুন :

দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ—১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (আকবর ও হিমুর মধ্যে)।

মহাম আনাঘা—আকবরের ধাত্রীমাতা।

হলদিঘাটের যুদ্ধ—১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে (মেবারের রাণা প্রতাপ ও আকবরের সেনাপতি মানসিংহের মধ্যে)।

মজুফ্‌ফর তুরাবতী—আকবরের দেওয়ান।

ক্রোরি—রাজস্ব আদায়কারী কর্মচরী।

দস্তুর-অল্-অমল—টোডরমলের রাজস্ব-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত।

গাল্লা-বখ্‌শী—ফার্সী শব্দ, ভাগচাষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পোলজ—যে জমিতে প্রতিবছর চাষ হয়।

পরৌতি—যে জমি মাঝে মাঝ পতিত পড়ে থাকে।

চাচর—যে জমি তিন বা চার বছর পতিত পড়ে থাকে।

বঞ্জর—যে জমি পাঁচ বছর বা আরও বেশি সময়ের জন্য ফেলে রাখা হয়।

আবুল ফজল—'আইন-ই-আকবরী'র প্রণেতা।

'দাগ'—ঘোড়ার গায়ে 'চিহ্নিতকরণ' (Branding)।

'চেহারা'—সৈনিকের বিবরণ লিপিবব্ধ রাখার প্রশাসনিক ব্যবস্থা (Descriptive roll)।

২৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. Bharatiya Vidyabhavan : *The Mughal Empire.*
2. Iswari Prasad : *A Short History of Muslim Rule in India.*
3. Vincent Smith: *Akbar The Great Mughal 1542-1605.*
4. ইরফান হাবিব (সম্পাদিত) : *মধ্যযুগে ভারত (দুই খণ্ড)।*

একক ২৫ □ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ—মুঘল শাসকশ্রেণীর সুদৃঢ়করণ

গঠন

২৫.০ উদ্দেশ্য

২৫.১ প্রস্তাবনা

২৫.২ প্রারম্ভিক কথা

২৫.৩ ১৬১২ : বাংলার বিদ্রোহ দমন

২৫.৪ ১৬১৪ : মেবার দমন : সাম্রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে সংহতিকরণ

২৫.৫ ১৬১৬ : আহমদনগর জয় : দাক্ষিণাত্য নীতি

২৫.৬ ১৬২০ : কাংগ্রা বিজয় : উত্তর পার্বত্যাঞ্চলে অভিযান

২৫.৭ ১৬২২ : কান্দাহারের হস্তচ্যুতি : পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে মোগল সম্পর্ক

২৫.৮ পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে রাজ্যবিস্তার প্রচেষ্টা : উত্তরের ক্ষুদ্র রাজ্যজয়

২৫.৯ শিখ-মোগল সম্পর্ক : গুরু অর্জুনের আত্মত্যাগ

২৫.১০ জাহাঙ্গীরের প্রয়াণ : সাম্রাজ্যের দৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণে শাহজাহানের নতুন প্রয়াস

২৫.১০.১ আভ্যন্তরীণ সীমার সংহতিকরণ : রাজধানীর পরিবর্তন : শাহজাহানাবাদ দিল্লী

২৫.১০.২ পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে রাজ্যজয়

২৫.১০.৩ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরপারে রাজ্যবিস্তারের প্রয়াস : মোগলদের মধ্য-এশীয় নীতি

২৫.১০.৪ উত্তর ও উত্তর-পূর্বে রাজ্যজয় ও পূর্বে শাসনবিস্তারের প্রয়াস

২৫.১০.৫ আদিলশাহী ও কুতুবশাহী শাসনের অবসান

২৫.১১ মোঘল রাজশক্তির সংহতিসাধন : শাসকশ্রেণীর নতুন সংগঠন

২৫.১১.১ মনসবদার ও জাগিরদার

২৫.১২ সারাংশ

২৫.১৩ অনুশীলনী

২৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

২৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগলদের—

- বাংলা ও মেবারের বিদ্রোহ দমন
- দাক্ষিণাত্য নীতি
- পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক

- শিখ-মোগল সম্পর্ক
- শাসকশ্রেণীর নতুন সংগঠন

২৫.১ প্রস্তাবনা

মোগল যুগের ইতিহাস পড়ার অর্থ হল প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে জানা। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনের ইতিহাস শুরু হয়েছে। সাম্রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে দেশের ঐক্যও রচিত হয়েছিল দীর্ঘকাল আগেই। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিবর্তনের একটি পর্যায় হল মোগল সাম্রাজ্য। তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্তান থেকে আগত মানুষরা ভারতবর্ষে এসে কেমন করে এদেশের মানুষদের সঙ্গে মিশে একটি মহামানবের সম্মিলন ঘটিয়েছিল, কেমন করে বাইরে থেকে আনা ভাবধারা আমাদের দেশে চৈতন্য-চিন্তার সাথে মিশে একটা বৃহত্তর সার্বভৌম জীবনবোধ গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করেছিল তারই কাহিনী আমরা জানতে পারি মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে। এর সঙ্গে জানতে পারি আরও বড় একটি কথা। অনেক মানুষ ভারতবর্ষে এসেছে বাইরে থেকে। তারা কেউই শেষপর্যন্ত ভারতীয় জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেনি। নানা ভাষা, নানা পথ, নানা মত, নানা পরিধানের মধ্যেও একটা জাতীয় ঐক্য, আবহমানকাল ধরে ভারতীয় জীবনধারার অন্তর্লীন বিষয় হয়ে রয়েছে। এই নিরবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কেমন করে গড়ে উঠল তার ইতিহাস আমরা পাই মোগল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের কাহিনীর মধ্যে। আবার, ইতিহাস পড়তে গেলে তার একটা দৃষ্টিকোণ থাকা দরকার। মোগলদের ইতিহাস পড়তে গেলে আমাদের এই দৃষ্টিকোণকে একটু বুঝে নিতে হবে। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঘাত-প্রতিঘাত থাকে, সব দেশে থাকে, আমাদের দেশেও ছিল। আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উঠে এসেছে একটা সার্বজনীন, সার্বভৌম জাতীয় স্বত্বা, যার অংশ হিসাবে দেশের প্রত্যেক মানুষ তার বিশিষ্টতা পেয়েছে। মোগল সেনাবাহিনীতে যেমন পাঠান সৈন্যরা ছিল, সেইরকম মোগল সম্ভ্রান্তদের মোগল সম্ভ্রান্তদের মধ্যে রাজপুতরাও ছিল। মহামতি আকবর যেমন ইসলাম ধর্মের বাণীকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন, সেইরকমভাবে অন্য ধর্মের প্রেরণাকেও ভারতীয় জাতিসত্তার মধ্যে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এই সামগ্রিক সম্পৃক্তির ধারার মধ্যে কাউকে বিদেশি, বিজাতি, বিধর্মী বলে চিহ্নিত করা যাবে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠের এই দৃষ্টিকোণ হল একটি সংশ্লেষের দৃষ্টিকোণ (integrationist outlook)। এটি ভিন্ন অন্য কোন দৃষ্টিকোণ দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বোঝা যাবে না। আমরা এই দৃষ্টিকোণ দিয়েই মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তারের ইতিহাস পড়ব।

২৫.২ প্রারম্ভিক কথা

আকবর মুঘল সাম্রাজ্যকে তিনটি ধারা দিয়ে গিয়েছিলেন—এক, সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ধারা; দুই, রাজত্ব ব্যবস্থার সংহতিকরণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ দৃঢ়করণের ধারা এবং তিন, সহাবস্থান ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মধ্য দিয় সাম্রাজ্যের সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার ধারা। এই তিন ধারার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান মোটামুটিভাবে এই পরিকাঠামোর মধ্যেই কাজ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ১৬০৫ সালের ৩ নভেম্বর। তাঁর মৃত্যু হয় ১৬২৭ সালের ২৮ অক্টোবর—তাঁর রাজত্বের বাইশতম বছরে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান তথ্য আমরা যে সব থেকে পাই তাদের মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ হল জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী—**তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি**। এই গ্রন্থ এবং আরও কয়েকটি সহযোগী গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের সমস্ত যুদ্ধের ফল হয়েছিল পাঁচটি—১৬১২ সালে বাংলার বিদ্রোহ দমন, ১৬১৪ সালে মেবার দমন, ১৬১৬ সালে আহমদনগর জয়, ১৬২০ সালে কাংড়া বিজয় এবং ১৬২২ সালে কান্দাহারের হস্তচ্যুতি।

২৫.৩ ১৬১২ : বাংলার বিদ্রোহ দমন

১৬০৬ সালে সুবে বাংলা থেকে রাজা মানসিংহের প্রত্যাবর্তন এবং সেখানকার সদ্যনিযুক্ত শাসক কুতুবুদ্দিনের অকস্মাৎ মৃত্যু পূর্বভারতে মোগল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তোলে। বিহার ও বাংলায় আফগান অভিজাতরা শক্তিশালী থাকায় সেখানে আফগান শক্তির শিকড় তখনও মজবুত ছিল। মুঘল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তাদের বৈরী মনোভাব এই অঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যকে কখনো সুস্থিত হতে দেয়নি। সাম্রাজ্যের এইরকম অসংগঠিত অবস্থার মধ্যেই বাংলা থেকে মানসিংহকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে আফগানদের মধ্যে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়। কুতুবুদ্দিনের উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর কুলি খান ছিলেন বৃদ্ধ এবং অথর্ব—অতএব শাসক হিসাবে অসহায়। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন উদ্যোগ নেবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাংলার শাসক হয়ে আসেন ইসলাম খাঁ। পূর্বাঞ্চলীয় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত থেকে কেন্দ্রে আসার নীতি গ্রহণ করে তিন রাজমহল থেকে ঢাকায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

> প্রান্তলিপি
>
> এই গ্রন্থটি আলেকজাণ্ডার রজার্স (Alexander Rogers) এবং হেনরি বেভারিজ (Henry Beveridge) মেময়ার্স অফ জাহাঙ্গীর (Memoirs of Jahangir) নামে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে যথাক্রমে ১৯০৯ ও ১৯১৪ সালে দুই খণ্ডে এই গ্রন্থটি ছাপা হয়। পরে ১৯৬৮ সালে মুন্সিরাম নামে পুস্তকবিক্রেতা ভারতীয় মুদ্রণ হিসাবে বইটি ছাপেন।

ইতিমধ্যে ১৬১১-১২ সালে উসমান খাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে আফগানরা বিদ্রোহ করে। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন যে, আফগান বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে আকবরের সময় থেকেই চলছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে হিন্দুরাজ্য ও জমিদারদের কার্যকলাপের ফলে তা আরও জটিল হয়ে পড়ে। আফগানরা নতুন রাজধানী ঢাকা জয় করার চেষ্টা করে। ইসলাম খাঁ কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৬১২ সালে উসমান খাঁর মৃত্যু হয়। সমকালীন কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে “শেষ আফগান’—"the last of the Afghans"—বলে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের আফগান বিদ্রোহ দমনের আনুষঙ্গিক ঘটনা হল বারভুঁইয়াদের বশীভূত করার প্রয়াস। সোনারগাঁওয়ের মুসা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্যকে দমন করার কাজ এই সময়ে শুরু হয়। প্রতাপাদিত্যর মত কয়েকজন বারভুঁইয়াদের হাতে ছিল শক্তিশালী নৌবহর। তপন রায়চৌধুরী বলেছেন যে, নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌবহর (flotilla) কত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিপক্ষের হাতে তা কত বিপজ্জনক তা বুঝতে পেরেই বারভুঁইয়া দমনের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়। প্রতাপাদিত্যর নৌবহর ধ্বংস করা হয়েছিল। ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পর কাসিম খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ সুবাদার হিসাবে বারভুঁইয়াদের দমন করেন।

বিদ্রোহ দমনের সঙ্গে সঙ্গে বশকরণের নীতি গ্রহণ করতে হয়। আফগানদের সম্বন্ধে এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন জাহাঙ্গীর। **মখজান-ই-আফগান**-তে বলা হয়েছে যে, জাহাঙ্গীর “তাদের (আফগানদের) ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার প্রাক্তন প্রয়াসকে ক্ষমা করে তাদের উদার্যে বাঁধতে চেয়েছিলেন যাতে তারা নিজেদের শুভ কাজের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ ওমরাহ পদে উন্নীত হয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যের শাসকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন

করতে পারে”। এইভাবে বারভুঁয়াদের নৌবহর ভেঙ্গে দেওয়া এবং আফগানদের দমন ও আলিঙ্গনের নীতি দ্বারা বশীভূত করার ফলে বাংলাদেশ তথা পূর্বভারতে মুঘল শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৫.৪ ১৬১৪ : মেবার দমন : সাম্রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে সংহতিকরণ

বাংলার বিদ্রোহ দমন প্রমাণ করেছিল যে, জাহাঙ্গীর তাঁর সাম্রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে সংহতিসাধনের বিষয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন। এই সংহতিসাধনের প্রথম পদক্ষেপ হল মেবার দমন। রাজপুত জাতির শিশোদিয়া শাখার সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাষ্ট্রশক্তি ছিল মেবার। স্বাধীনতা রক্ষার ও আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের যে ঐতিহ্য রাজপুতজাতি দীর্ঘদিন ধরে বহন করে আসছিল তার শেষ শিখাকে অন্তরে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন মেবারের রাণা প্রথাম সিংহ ও তাঁর পুত্র অমরসিংহ। ফলে এই দুই প্রজন্মের শিশোদিয়া শক্তির বিরুদ্ধে আকবর থেকে জাহাঙ্গীর এই দুই প্রজন্মের মোগলদের লড়াই করতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ লিখেছেন যে, মেবারের রাজশক্তি নিজের ভৌগোলিক অবস্থানের খুঁটিনাটি জানত। কোথায় পাহাড় দুর্গম, কোথায় গিরিপথ সঙ্কীর্ণ, কোথায় অজানা পাহাড়ের বুক চিরে সংগোপন পথ আছে, কোথায় সাধারণের অগোচরে আছে চলাচলের পথঘাট তা তাদের জানা ছিল। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরিতে বলা হয়েছে যে, রাণা অমর সিংহ ও তাঁর পূর্বপুরুষরা কেউই হিন্দুস্থানের কোন শাসকের কাছে নতি স্বীকার করেননি কারণ তাঁদের পার্বত্য অবস্থানের ঘেরাটোপে তাঁদের নিরঙ্কুশ অবস্থান ছিল নিশ্চিত।

আকবরের সময় থেকেই জাহাঙ্গীর মেবার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেই বাদশাজাদা পারওয়াজের নেতৃত্বে মেবারে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু যুবরাজ বিদ্রোহ এবং ঐতিহাসিক জন এফ. রিচার্ডস্-এর মতে, শিশোদিয়াদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এ অভিযান ব্যর্থ হয়। এর পর থেকে অভিযান প্রায় বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৬০৮ সালে মহাবত খাঁর অধীনে এবং ১৬১৩ সালে যুবরাজ খুররামের নেতৃত্বে শক্তিশালী অভিযান প্রেরিত হয়।

মেবারের বিরুদ্ধে মোগলরা দুধরনের সামরিক নীতি গ্রহণ করেছিল। এক, মেবারের চারপাশের বসতি ছারখার করে মানবশক্তি সঞ্চায়নের দ্বারা শত্রুবাহিনীকে অগ্রবর্তী প্রতিরোধ দেবার যে ক্ষমতা মেবারের ছিল তা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক সামরিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (military checkpoints) স্থাপন করে মোগল বাহিনীর অগ্রবর্তী ঘাঁটির সঙ্গে পশ্চাৎঘাঁটির শৃঙ্খল বিন্যাসিত যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। দুই, মেবারের চারপাশের সমস্ত শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে মেবারের সরবরাহের উৎস ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এইরকম অবরোধের পরিস্থিতি তৈরি করে মোগলবাহিনী নিরন্তর অশ্বারোহী সৈন্যর দ্বারা আক্রমণের চাপকে অক্ষুণ্ণ রাখে এবং মর্যাদাসম্পন্ন শিশোদিয়া পরিবারের লোকজনকে ধরে এনে বন্দী করে রাখা হয়।

এই চাপকে দীর্ঘদিন প্রতিরোধ করা যায় না। অবশেষে রাণা অমর সিংহ সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করতে রাজী হলেন। ১৬১৫ চুক্তির দ্বারা রাণা মোগলদের ‘আনুগত্য ও বশ্যতা’ ('obedience and loyalty') প্রদান করলেন। জাহাঙ্গীর ‘রাণার ঔদ্ধতা’ ক্ষমা করলেন এবং তাঁকে একটি ‘মর্যাদাসম্পন্ন ফারমান’ প্রদান করা হল, যার ওপর বাদশাহ লিখেছেন, ‘আমার কল্যাণ হস্তের ছাপ মুদ্রিত ছিল।’ রাণাকে চিতোর দূর্গ ফেরত দেওয়া হল, তাঁর পরিবারের কোন কুমারী কন্যাকে মোগল হারেমে যাওয়ার নীতি পরিহার করা হল এবং রাণার বার্ধক্যহেতু তাঁর পরিবর্তে তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী করণকে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করা হল। বাদশাহর দরবারে তাঁকে উচিত মর্যাদায় সম্রাটের ডানদিকে বসার ব্যবস্থা করা হয়। যে কদিন তিনি সম্রাটের দরবারে ছিলেন সে কদিনই তাঁকে কোন না কোন নতুন উপহার সম্রাট দান করেছিলেন। মোট তাঁকে ২,০০,০০০ টাকা, ১১০টি অশ্ব, পাঁচটি হাতি প্রদান করা হয়েছিল। জাহাঙ্গীর লিখেছেন “যেহেতু অমর সিংহ ছিলেন অমার্জিত প্রকৃতির, যেহেতু তিনি

কখনো সভাসমিতি দেখেননি এবং যেহেতু তিনি পাহাড়ে পাহাড়েই কাটিয়েছেন সেহেতু তাঁর হৃদয়কে জয় করার জন্য আমি প্রতিদিনই তাঁকে কিছু না কিছু উপহার দিয়েছি।" প্রতিপক্ষকে উপহার ও উপঢৌকনের মাধ্যমে বশীভূত করার এই নতুন নীতি অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল।

২৫.৫ ১৬১৬ : আহমদনগর জয় : দাক্ষিণাত্য নীতি

আকবরের রাজত্বকালেই মোগল সাম্রাজ্যের দাক্ষিণাত্য সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল। সেখানকার মুসলিম সুলতানদের স্বাধীনতাকে চূর্ণ করার যে নীতি আকবর শুরু করেছিলেন তার ফলে খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগরের উত্তরাঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। হঠাৎ করে উত্তর ভারতে পুত্র সেলিমের বিদ্রোহ দমন করার জন্য ১৬০১ সালে আকবরকে অসিরগড়ের অবরোধ তুলে নিতে হয়। সেই সময় থেকে শুরু হয় মালিক অম্বর নামে এক হাবসী দাস-সৈনিকের তৎপরতা। পাহাড়-দুর্গ দৌলতাবাদের থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে সুলতান মুরতাজা নিজাম শাহের (১৫৯৯—১৬৩১) রাজধানী খাড়কি বা খিড়কিকে ভিত্তি করে মালিক অম্বর তার প্রভাবাধীন এলাকা বাড়িয়ে চলছিলেন। তিনি মারাঠাদের সামরিক প্রতিভার বিশেষ দিকগুলি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন এবং রাজা টোডরমলের অনুকরণে নিজের রাজস্ব ব্যবস্থাকে সাজিয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা ও নিজ রাজ্যের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যাদব সম্প্রদায়ের মানুষ ও মারাঠা পরিবারগুলির কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে নিজামশাহী রাজ্য দাঁড়িয়েছিল।

আহমদনগরের বিরুদ্ধে অভিযানে মোগলদের মূল ঘাঁটি হয়েছিল বুরহানপুরে। সেখান থেকে পর পর কয়েকটি ব্যর্থ অভিযান চালানোর পর ১৬১৬ সালে যুবরাজ পারভেজ-এর নেতৃত্বে জালনার যুদ্ধে আহমদনগরের বাহিনী পরাজিত হয়। মোগলবাহিনী খাড়কি (খিড়কি) শহর লুঠ করে। আহমদনগরের স্থায়ীবাহিনীর অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শত্রু সংহারের এইটুকু কৃতিত্ব অর্জন করতে মোগলবাহিনীর আটবছর সময় লেগেছিল—কারণ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আহমদনগরের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান ১৬০৮ সালে মোগল সেনাপতি খান-ই-খানানের নেতৃত্বে প্রেরিত হয়েছিল। অথচ আট বছরের চেষ্টায় কোন স্থায়ী সাফল্য আসেনি। মালিক অম্বর মোগলদের কাছে পরাজিত হয়ে দৌলতাবাদ দুর্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে শুরু হয় তাঁর গেরিলা যুদ্ধ। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, দক্ষিণ ভারতে গেরিলা যুদ্ধের প্রকৃত প্রবর্তক তিনি। তাঁর কাছ থেকেই মারাঠারা নিখুঁতভাবে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিখে নিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করে। অতর্কিত আক্রমণের পটুত্ব তাঁর ছিল বলেই যতদিন মালিক অম্বর জীবিত ছিলেন ততদিন মোগলদের শান্তি ছিল না। ১৬২৬ সালে মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়। অতএব জালনার যুদ্ধের পর দশ বছর লঘু মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনীকে পরিচালনা করে তিনি মোগল স্থিতিশালতাকে বিপর্যস্ত করেন। দুটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। এক, দাক্ষিণাত্যে মোগলবাহিনীকে এগিয়ে দিতে স্বয়ং সম্রাট মাণ্ডু (Mandu) পর্যন্ত এসেছিলেন এবং পরে গুজরাত হয়ে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ সম্মুখভাবে যে মোগলবাীহনী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তার পশ্চাৎভূমিতেই বিরাট মোগল শক্তি স্বয়ং সম্রাটের নেতৃত্বেই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। বোঝা যায় যে, আহমদনগরকে সহজে বশীভূত করা যাবে না এ সচেতনতা দিয়েই মোগল প্রস্তুতি তৈরি হয়েছিল। দুই, মোগল সম্রাটের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পরে পরেই মালিক অম্বর আহমদনগরের ওপর আরোপিত মোগল চুক্তিকে অস্বীকার করে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে মোগল বিতাড়নের কাজ শুরু করেন। যুবরাজ খুররামের নেতৃত্বে ছয়মাস বিপুল অভিযান চালিয়ে আহমদনগরকে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে এক দীর্ঘ সময় ধরে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে অস্থিরতা কায়েম হয়েছিল। এই অস্থির সময়ের মধ্যে আহমদনগর কখনো বশীভূত, কখনো বিদ্রোহী—কিন্তু নিরঙ্কুশভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অংশ বা তার করদ রাজ্য কোনটিই ছিল না। কখনো বিদ্রোহ, কখনো আত্মসমর্পণ—এই দুই বিপরীত

ধারার মাঝে থেকে মারাঠা প্রধানরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে—যেমন রাজ্য বাড়ানো, লুঠ করা, নিজেদের ঐশ্বর্য ও স্বয়ংক্রিয়তার সীমাকে অবিরত বাড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এরই মধ্যে ১৬২১ সালের মাঝামাঝি খবর আসে যে জাহাঙ্গীর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অতএব সব দৃষ্টি নিবদ্ধ হল উত্তরে। দাক্ষিণাত্যে মোগল রাজনৈতিক তৎপরতায় ভাটা পড়ল। রিজভি লিখেছেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোগলদের দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধগুলি খুব ফলপ্রসূ হয়নি। দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চল ছিল তাদের দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারের শেষ সীমা, তার দক্ষিণে নয়।

২৫.৬ ১৬২০ : কাংড়া বিজয় : উত্তর-পার্বত্যঞ্চলে রাজ্যবিস্তার

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যজয় হল কাংড়া বিজয়। এই দুর্গটি আকবরও জয় করতে পারেননি। উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবে অবস্থিত এই দুর্গটির ভৌগোলিক সংস্থানই তার নিরঙ্কুশ প্রতিরক্ষার কাজ করেছিল। শাস্-ফাত্-ই-কাংগ্রার (Shash Fat-i-Kangra) বর্ণনা অনুযায়ী পাহাড়ের এত উচ্চ চূড়ায় এটি অবস্থিত ছিল যে কোনদিনই বহিঃশত্রু এই দুগ দখল করতে পারেনি। জাহাঙ্গীরের সময় পর্যন্ত মোট ৫২ বার একে আক্রমণ করা হয়েছিল, কিন্তু কোনবারই তাকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে একই রাজবংশের হাতেই রয়ে গিয়েছিল এই দুর্গ। প্রাচীনকালে কোন্ সময়ে তা নির্মিত হয়েছিল তা কারও জানা ছিল না। ফলে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন স্বাধীন দুর্গগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম।

শুধু স্বাধীনতার দর্পচূর্ণ করার জন্য জাহাঙ্গীর এর দিকে হাত বাড়াননি। মোগল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ-শীলতার মধ্যবর্তী পর্বে উত্তর ভারতের ভূ-রাজনীতি (geopolitics) ও পার্বত্যাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির চাপ বিশেষভাবে কাজ করেছিল। নিউ কেমব্রিজ ঐতিহাসিক রিচার্ডস্ দেখিয়েছেন যে, আকবর ছোট-বড় সমস্ত রাজপুত রাজ্যগুলিকে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল সরাসরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করেও তাদের আভ্যন্তরীণ স্বশাসনের (autonomy) অধিকার দিয়ে তাদের অধীন করদরাজ্যে পরিণত করার নীতি। এইসব রাজারা সম্রাটের আধিপত্য (supremacy) মেনে নিয়ে তাঁকে বাৎসারিক কর ও সামরিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করে নিজেদের স্ব-শাসনের অধিকার বজায় রাখতে পারতেন। প্রয়োজনবোধে তাদের উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্রাট নিজের হাতে রেখে দিয়েছিলেন। এর ফলে কাশ্মীরের সীমানা থেকে বাংলাদেশের সীমানা পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশের একটানা দীর্ঘ অঞ্চল মোগলদের উত্তর-অভিযানের বুনিয়াদি ভূমি হিসাবে কাজ করতে পারত। তার মধ্যে কয়েকজন পার্বত্য রাজ্য সাম্রাজ্যের মনসবদাররূপে রাজসেবায় নিযুক্ত ছিল। এটি ছিল উত্তরে সমরাভিযানের ভূ-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল।

এই ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পার্বত্যঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির একটা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। হিমালয়ের গিরিপথগুলি দিয়ে বণিক ও যাযাবররা চলাফেরা করতে পারত। কিন্তু কোন সামরিক তৎপরতা সেখানে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আকবর হিমালয়ের পাদদেশের রাজ্যগুলিতে সারিবদ্ধ ফৌজদার বা সামরিক প্রশাসকদের বসিয়ে দিয়ে পাহাড়ে একটা সুসংবদ্ধ সামরিক বেষ্টনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এইবার আকবরের অর্ধসমাপ্ত এই কাজকে সম্পূর্ণ করে সাম্রাজ্যের উত্তর সীমাকে সুরক্ষিত করার দরকার হল। যুবরাজ খুররামের নেতৃত্বে কাংগ্রাবিজয় এই কাজ সমাপ্ত করে।

কাংড়া-অভিযানের যুবরাজ খুররাম প্রায় একই সামরিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যা মেবার জয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছিল। দুর্গকে অবরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে রসদ সরবরাহের সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। মজুত করা খাদ্য ও সঞ্চিত জলে দুর্গের মানুষ চারমাস বেঁচে ছিল। তারপর মৃত্যু অনিবার্য জেনে নিরুপায় দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ করে। জাহাঙ্গীর স্বয়ং এই বিজিত দুর্গ পরিদর্শন করেন এবং প্রথানুযায়ী একটি গো-বলিদান করে একটি বড় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন।

২৫.৭ ১৬২২ : কান্দাহারের হস্তচ্যুতি : পারস্য ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে মোগল সম্পর্ক

মোগল-ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরপারে পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার ইসলামিক রাজ্যগুলি সম্বন্ধে শুরু থেকেই মোগলরা স্পর্শকাতর ছিল। উত্তর-পশ্চিম থেকে ভারতবর্ষে অবিরত নেমে এসেছে বিদেশি আক্রমণের ধারা। এই ধারাকে প্রতিরোধ করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত একটি সামরিক সীমারেখা (Scientific Military line of frontier) টানার দরকার ছিল। মোগল শাসকরা সেদিকে লক্ষ্য রেখে বহুমানবসমন্বিত, সুপরিচালিত, সংসংবদ্ধ মধ্য-এশিয়া অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রিচার্ডস লিখেছেন যে, এর জন্যই তাঁদের কাবুল এবং পেশোয়ার এবং সম্ভব হলে কান্দাহার ও গজনী দখল রাখার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও তার ওপারে সঙঘবদ্ধ বণিকগোষ্ঠীর যে বাণিজ্য চলত [যাকে ঐতিহাসিকরা ক্যারাভান বাণিজ্য বলেছেন] তার ফসলকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্নও জড়িত ছিল। মোগল সম্ভ্রান্তদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা পারস্য ও মধ্য-এশিয়া থেকে আগত এবং মোগল প্রশাসকদের মধ্যে এক বিরাট কৌমগোষ্ঠী (ethnic group) হিসাবে তারা চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখত। পরিশীলিত মুসলিম সংস্কৃতির ধারক পারস্যের কাছে মোগলভারত ছিল অধস্তন সংস্কৃতির অঞ্চল। মোগলরা না চাইলেও দুঃখের সঙ্গে এ ধারণাকে তাদের মেনে নিতে হয়েছিল। অতএব ভারতীয় মোগলদের লক্ষ্য ছিল তাদের অসামান্য সামরিক শক্তিকে জাহির করে তাদের সাংস্কৃতিক বীনমন্যাতাকে অপনোদন করা। আয়তনের দিক থেকে পারস্য সাম্রাজ্য ছিল মোগল সাম্রাজ্য থেকে ছোট অথচ তাদের আস্ফালন ছিল অনেক বেশি। সাফাভি (Safavi) পারস্যের সঙ্গে তিমুরি (Timurid) [তৈমুর থেকে তৈমুরি বা তিমুরি] ভারতের সংঘাত ছিল এইখানে।

এই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির মধ্যে কান্দাহার নিয়ে মোগল-পারসিক লড়াই। ১৫২২ সালে বাবর এ রাজ্য দখল করেন। তারপর হুমায়ুনও কামরান এ দখল বজায় রেখেছিলেন। ১৫৫৮ সালে একবার হস্তচ্যুত হয়ে কান্দাহার আবার মোগল সাম্রাজ্যে ফিরে আসে ১৪৯৪ সালে যখন আকবর তাকে জয় করেন। যুবরাজ খুসরু যখন বিদ্রোহ করে তখন পারস্যের শাসক শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯) খোরাসান ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রধানদের কান্দাহার আক্রমণের জন্য উস্কে দিয়েছিলেন। ১৬২০ সালে যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁর প্রভাবশালী রানী নূরজাহান ও যুবরাজ খুররাম-এর (পরে শাহজাহান) মধ্যে দরবারের আধিপত্য নিয়ে লড়াই বাধে। এই সুযোগে পারস্যের শাসক শাহ আব্বাস স্বয়ং এক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে কান্দাহার দখল করে নেন। এই দখলের পরে শাহ আব্বাস জাহাঙ্গীরকে লিখলেন যে কান্দাহার পারস্যের রাজ্যাংশ; জাহাঙ্গীরের উচিত ছিল অনেক আগেই তা প্রত্যর্পণ করা। এতদ্‌সত্ত্বেও দুই সম্রাটের বন্ধুত্ব ও মিলনের যে "বসন্তকালীন ফুল" ('the ever vernal flower of union and cordiality') তা নিরন্তর প্রস্ফুটিত থাকবে। জাহাঙ্গীর পারস্য সাম্রাজ্যকে প্রত্যাঘাত করতে চেয়েছিলেন—অভিযানের রথকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত। কিন্তু যুবরাজ খুররামের বিদ্রোহ এই মোগল প্রয়াসকে স্তব্ধ করে দিল।

২৫.৮ পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে রাজ্যবিস্তার প্রচেষ্টা : উত্তরের ক্ষুদ্র রাজ্যজয়

জাহাঙ্গীরের সময়ে বৃহৎ সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘটনার পাশে পাশে চলেছিল ছোট রাজ্যজয়ের অবিরত প্রয়াস। ১৬১১ সালে রাজা টোডরমলের পুত্র রাজা কল্যাণ খুরদা রাজ্য জয় করেন। এর ছয় বছর বাদে ১৬১৭ সালে খুরদার রাজা পুরুষোত্তম দেব বিদ্রোহ করলে খুরদা রাজ্যটি সরাসরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে মোগল

সাম্রাজ্যের সীমা দক্ষিণ-পূর্বে গোলকোণ্ডার সীমানা স্পর্শ করে। ১৬১৫ সালে নূরজাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ দুর্জন সালকে পরাজিত করে খোখারা (Khokhara) রাজ্যটি অধিকার করেন। এর ফলে একটা বড় হীরাখনি মোগল সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে এল। ১৬১৭ সালে কচ্ছের জাম ও ভারা অঞ্চলের উগ্র উপজাতিদের দমন করা হয়। ১৬২০ সালে কাশ্মীরের দক্ষিণে কিস্তওয়ার (Kishtwar) নামে ছোট রাজ্যটি দখল করে নেওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব আহোমদের সঙ্গে মোগলদের একাধিকবার লড়াই হয়েছিল। আহোমরা এসেছিল ব্রহ্মদেশ থেকে। তারা পুষ্ট হয়েছিল বাধাহীন রাজ্যজয়ের ঐতিহ্যে। জাত-ধর্ম কোনকিছুর বালাই তাদের ছিল না। ফলে তারা অনায়াসে মানবশক্তি সঞ্চালনের ক্ষমতা অর্জন করেছিল। প্রয়োজন হলে তারা তাদের সমস্ত পুরুষদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দিত। রাস্তা নির্মাণ, আল বাঁধা, সেচের ব্যবস্থা করে তারা যেমন অর্থনৈতিক উজ্জীবনের দিকে নজর দিত সেইরকমভাবে শ্রম ও ফসলের মধ্য দিয়ে কর আদায় করে নিজেদের লড়াই করার ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখত। এইরকম সংগঠনের পাশে তারা গড়ে তুলতে পেরেছিল সঙ্কল্পবদ্ধ শক্তিশালী পদাতিক বাহিনী তীক্ষ্ণ তীরধনুকের অসামান্য ব্যবহারে যারা ছিল পটু। তারা ভারতবর্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমরপ্রযুক্তিকে বহন করে এনেছিল যার সঙ্গে মোগলরা লড়াই করে পেলে ওঠেনি। রাতের অতর্কিত ঝটিকা আক্রমণে তারা দক্ষ ছিল বলে দিবালোকের গোলাবারুদ ও সৈন্য সঞ্চালনের যুদ্ধে অভ্যস্ত মোগলবাহিনী তাদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিতে পারেনি। তারা মোগল শক্তির অগ্রসরকে উত্তর-পূর্বে রুখে দিয়েছিল।

২৫.৯ শিখ-মোগল সম্পর্ক : গুরু অর্জুনের আত্মত্যাগ

আহোমদের থেকে অনেক বেশি সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েও উত্তর-পশ্চিমের শিখ শক্তি মোগলদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ধারাকে রোধ করতে পারেনি। মোগল শক্তির কেন্দ্র দিল্লি-আগ্রা থেকে আহোমরা ছিল অনেকদূরে, শিখরা ছিল অনেক কাছে—মোগলদের নাগালের মধ্যে। তাই ১৬০৫ সালে শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন বিদ্রোহী যুবরাজ খুসরুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন বলে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় (১৬০৬)। মনে রাখতে হবে, যে শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছিল তা দেশদ্রোহিতা ও বিদ্রোহের অপরাধে, বিধর্মী হওয়ার অপরাধে নয়। গুরু অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ শিখদের ষষ্ঠগুরু হিসাবে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অমৃতসরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং দুদিকে কৃপাণ ঝুলিয়ে সভাসদদের নিয়ে দরবার করতেন। তাঁর এই রাজার মত ভাব দেখে জাহাঙ্গীর তাঁকে বারো বছর (১২ বছর) গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখেন। পরে মুক্ত হয়ে তিনি হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলে শিখদের ঘাঁটি সরিয়ে নেন।

অনুশীলনী ১

১। নীচের উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল? (✓) অথবা (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান তথ্য আমরা যে সব বই থেকে পাই তাদের মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ হল জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী।

(খ) জাহাঙ্গীর মেবারের বিরুদ্ধে কোন অভিযান প্রেরণ করেননি।

(গ) আকবরের রাজত্বকালেই মোগল সাম্রাজ্যের দাক্ষিণাত্য সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল।

(ঘ) মোগলভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরপারে পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার ইসলামিক রাজ্যগুলি সম্বন্ধে শুরু থেকেই মোগলরা উদাসীন ছিল।

(ঙ) উত্তর-পূর্ব আহোমদের সঙ্গে মোগলদের একাধিকবার লড়াই হয়েছিল।

২। পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে মোগলদের কিরূপ সম্পর্ক ছিল? (দশ লাইনের মধ্যে উত্তর লিখুন)

২৫.১০ জাহাঙ্গীরের প্রয়াণ : সাম্রাজ্যের দৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণে শাহজাহানের নতুন প্রয়াস

১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে জাহাঙ্গীর প্রয়াত হন। তাঁর প্রয়াণকালে সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল এবং একটি শাসকবংশ হিসাবে মোগলদের পারিবারিক মর্যাদা ও ঐতিহ্যও হয়ে উঠেছিল অপরিসীম। এরকম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক। যুবরাজ শাহরিয়র লাহোরে নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করলেও শেষ পর্যন্ত যুবরাজ খুররাম আসফখানের সহযোগিতায় তাঁকে পরাজিত করে শাহজাহান উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট হন (২ জানুয়ারী, ১৬২৮)। সেই মুহূর্তে তিনি হলেন উপমহাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক এবং একটি প্রাচীন ও নিশ্চিদ্র রাজকীয় শাসন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। রিচার্ডস্-এর ভাষায়—He was heir to an ancient and impeccable royal lineage.

এইরকম রাজকীয়তাকে নিষ্কণ্টক করা আর নিজের সাম্রাজ্যের সীমাকে বাড়িয়ে নিজের অপ্রতিহত প্রতাপকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে শাহজাহান দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এক, তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করে, নূরজাহানকে বৃত্তিভোগী করে এবং তাঁর সুহৃদ আসফ খাঁকে ভকীল (wakil) পদে নিযুক্ত করে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছিলেন। দুই, ১৬২৯ থেকে ১৬৩১ সালের মধ্যে বলিষ্ঠ আফগান নেতা খান-ই-জাহান লোদীকে পরাজিত ও হত্যা করে ভারতবর্ষে আফগান শক্তির পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা বিনাশ করেন। খান-ই-জাহান মোগল সম্ভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রথমে দাক্ষিণাত্য এবং পরে বেরার ও আহমদনগরের শাসকও হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সম্রাজের আস্থাভাজন হতে পারেননি।

২৫.১০.১ অভ্যন্তরীণ সীমার সংহতিকরণ—রাজধানীর পরিবর্তন : শাহজাহানাবাদ দিল্লি

অভ্যন্তরীণ সীমানা সংরক্ষণের কাজে শাহজাহানের একটি বড় পদক্ষেপ হল ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে নতুন রাজধানীর পত্তন। পুরনো রাজধানী আগ্রা ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া দিল্লি ছিল যমুনা নদীর ওপর সনাতন হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র। সেখানে অনেক মুসলিম ধর্মীয় নেতার সমাধি থাকায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে তা ছিল একটি পবিত্র অঞ্চল। আঠারো শতকের একজন লেখক হাকিম মহরত খান ইসফাহানি (Hakim Maharat Khan Isfahani) তাঁর গ্রন্থ বাহ্জাত অল-আলম-এ (Bahajat al-Alam) লিখেছেন যে দীর্ঘদিন ধরেই দিল্লি ছিল মুসলমানদের কাছে দার-অল-মুলক (dar-al Mulk) বা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থান (seat of empire) এবং মরকজ-ই দায়রা ইসলাম (markaz-i dairah Islam) ফলে সঙ্গতভাবেই সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল।

২৫.১০.২ পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে রাজ্যজয়

রাজপুত রাজগুলির স্বাধীনতাকে হরণ করে উত্তরে ও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তারের কাজকে মোগল কর্মসূচির মধ্যে রেখেছিলেন আকবর এবং জাহাঙ্গীর। সেই কর্মসূচির প্রসার ঘটে শাহজাহানের রাজত্বকালে। ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাগ্লানার (Baglana) ছোট রাজপুত রাজ্যটিকে গ্রাস করে তাকে খান্দেশ প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সুরাট এবং পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির সংযোগরেখার মাঝখানে ছিল বাগ্লানা। বাণিজ্য ও রাজ্যশাসন উভয়কে সুরক্ষিত করতে হলে উপজাতীয় রাজনীতির (Tribal) ছোট ছোট কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করার দরকার ছিল। বালুচ ও রাজপুতদের অসংখ্য অশান্ত উপজাতিদের অরাজকতার ওপর উচ্ছৃঙ্খলতার ধারাবাহিক ঐতিহ্য ভেঙ্গে সেখানে সাম্রাজ্যের শক্তিকাঠামো (uthority structure) এবং একীভূত সাম্রাজ্য শাসন (standardized imperial administration) কায়েম করার জন্য সিন্ধুপ্রদেশে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছিল। সেওয়ান-নাসাপুর-টাট্টা থেকে অভিযান চালিয়ে সারিবন্ধ ছোট থানা এবং ছোট কেল্লা তৈরি করে বিরাট অঞ্চলের সদ্যুবৃত্তিপ্রবণ উট ও

অশ্বারোহী কৃষিজীবী এবং যাযাবর জাতিদের স্তব্ধ করে দেওয়া হয়িছেল। এর ফলে এক বিরাট অঞ্চল থেকে রাজস্ব আসতে শুরু করে। এর পর থেকে উপজাতীয় দস্যুতা (Tribal banditry) একবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বুন্দেলীদের পরাজয় :

রাজস্ব আদায় ও উপজাতীর দস্যুতা নিবারণ এবং সাম্রাজ্যের অধস্তন শক্তির সার্বভৌমত্বের সংহারসাধন—এই তিনকে লক্ষ করে বুন্দেলীদের বিনাশ করেছিলেন শাহজাহান। আগ্রা থেকে দাক্ষিণাত্যের মাঝখানে এক বিরাট অঞ্চলকে বুন্দোলখণ্ড বলা হত। বুন্দেলীরা ছিল নিম্নবর্গীয় রাজপুত। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে আবুল ফজলকে হত্যা করার পর বুন্দেলী প্রধান বীরসিংহদের বুন্দেলাকে মোগল আমীর করা হয় এবং তাকে সর্বোচ্চ রাজপুত রাজাদের সমান মর্যাদায় তাঁর ওয়াতান জাগীর নিজ আয়ত্তে রাখার অধিকার দেওয়া হয়। তাঁর পুত্র জুঝার সিংহ প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে আক্রমণ করে নিজের ঐশ্বর্য ও রাজ্যসীমা বাড়ানোর চেষ্টা করলে তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করা হয়। বুন্দেলখণ্ডের মত মধ্যভারতের গোণ্ডায়ানার ওপরেও এই সময়ে মোগল শাসন কায়েম করা হয়। ফলে মধ্যভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল মোগল শাসনের অধীনে চলে যায়। লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, শাহাজাহানের সময় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ও ভারত মানচিত্রের আবছায়া অঞ্চলগুলিতে মোগলবাহিনী পা রাখার চেষ্টা করেছিল। সাম্রাজ্যের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের তত্ত্বকে বেশ জোরের সঙ্গেই চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে শাহজাহানের মধ্যে একটা প্রাক্-আকর প্রতিহিংসা কাজ করত। অনেক সময়ে বিরাট আয়তনের মোগলবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে না পেরে প্রতিপক্ষ বাহিনী গেরিলা যুদ্ধের পথ গ্রহণ করত, যেমন করেছিল খান জাহান লোদীর সমর্থকরা বা বুন্দেলীরা। কিন্তু খান জাহান দীর্ঘকাল ধরে মোগলশক্তির সম্ভ্রান্ত বর্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গেরিলা যুদ্ধের প্রকরণ তার জানা ছিল না। কিন্তু বুন্দেলী গেরিলা বাহিনী মোগলদের কখনো শান্ত থাকতে দেয়নি।

২৫.১০.৩ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরপারে রাজ্যবিস্তারের প্রয়াস : মোগলদের মধ্য-এশীয় নীতি

তিনটি কারণে মধ্য-এশিয়ার ওপর মোগলের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল। প্রথমত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত রোশানাই, উজবেক, বালুচ প্রভৃতি উপজাতিদের উপদ্রব মোগল সাম্রাজ্যের প্রান্তিক একটি এলাকাকে প্রায় স্থায়ী অশান্তির মধ্যে নিবন্ধ রেখেছিল। দ্বিতীয়ত, মধ্য-এশিয়া ছিল মোগলদের উৎপত্তিস্থল যার সম্বন্ধে কোন মোগল শাসকই তাঁদের স্বপ্নময় রোমান্টিক উৎসাহকে কোনদিন বিলীন হতে দেননি। তৃতীয়ত, মধ্য-এশিয়ার উজবেক শাসকরা ছিলেন সুন্নী মুসলমান। অক্ষু নদের উত্তরে বুখারা ও সমরকন্দ এবং বলখ্ ও বদকশান প্রদেশ নিয়ে উজবেকদের রাজ্য গঠিত হয়েছিল। উজবেকরা ছিল সুন্নী মুসলমান। আবার তারাই ছিল মোগলদের সনাতন শত্রু। ফলে উজবেক শক্তি সম্বন্ধে যুগপৎ আকর্ষণ দুই-ই অনুভব করত মোগলরা। কাবুল ও পেশোয়ার যখন মোগলদের হাতে এল তখনই হয়ত উত্তর-পশ্চিমে একটা স্থায়ী সীমান্তরেখা টানা যেত। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার তৃণভূমিতে অস্থির উজবেক শক্তির অবস্থান মোগলদের স্থির থাকতে দেয়নি। এই ভূ-রাজনৈতিক (geopolitical) সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অক্ষু নদ (oxus) যা পামির মালভূমি থেকে উত্থিত হয়ে উত্তর-পশ্চিমে অরাল হ্রদ বা অরাল সাগরের দিকে ১৪০০ মাইল প্রবাহিত হয়েছে। অরাল সাগর (Aral Sea) পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিমে, কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বে ২৬,২৬৬ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট একটি হ্রদ। এই অঞ্চলটি মধ্য-এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। (অক্ষুনদকে আমুদরিয়া বলেও উল্লেখ করা হয়।) পরপারের (Trans-oxiana) রাজ্যজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষের হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন। বদকশান (Badakhshan) এবং তার থেকেও দূরে বলক্ প্রদেশ (Balkh) দখল করে এককথায় সমরকন্দকে (Samarqand) কেন্দ্র করে অক্ষু-পরপারের সমস্ত অঞ্চলকে ভারতীয় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে এক বিরাট এশিয়া সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন তাঁর পূর্বপুরুষদের মত শাহজাহানও দেখতে শুরু

করেছিলেন। ঠিক এই সময়েই উজবেক রাজ্যে গোলযোগ শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও উজবেক শাসককে গদিচ্যুত করার ঘটনা সে দেশে এক বিরাট অরাজকতা ডেকে আনলে সেখানকার শাসক পরিবার থেকে মোগল সম্রাটের কাছে সাহায্যের আবেদন করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুবরাজ মুরাদ বক্স আলি মর্দন খানের সহযোগিতায় ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে বদকশান এবং বলক্ প্রদেশ দুটি দখল করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যুবরাজ মধ্য-এশিয়ার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। ফলে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। অক্ষু নদের অববাহিকা অঞ্চল অরক্ষিত হয়ে পড়ে, আর সেই সুযোগে উজবেকরা মোগলদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৬৪৭ খিস্টাব্দে মোগলরা বলক্ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। ১৩৬৯ থেকে ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মধ্য-এশিয়ায় লড়াই করতে গিয়ে মোগলবাহিনী ৫০০০ সৈনিক এবং বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় ঘটিয়েছে। গেরিলা যুদ্ধে অপটু মোগলবাহিনী পাহাড়েও যুদ্ধ করতে অক্ষম। তাই মধ্য-এশিয়ার অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার শীতল, জনবিরল তৃণভূমির থেকে যৎসামান্য রাজস্ব আসতে পারত একথা জেনেও শাহজাহান ৪ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন পূর্বপুরুষদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। মোগল চাঘতাইরা উজবেক ও তুর্কোমানদের পরাজিত করতে আগেও পারেনি—এখনও পারল না। স্থানীয় মানুষের সঙ্কল্পবদ্ধ প্রতিরোধ, ভৌগোলিক দূরত্ব, জনবিরলতা, রসদের অপ্রাচুর্য মধ্য-এশিয়ায় মোগল সার্বভৌমত্ব বিস্তারের স্বপ্নকে ধুলিসাৎ করে দিল।

ঠিক একইভাবে ব্যর্থ হয়েছিল মোগলদের কান্দাহার জয়ের প্রচেষ্টা। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময়ে শাহজাহান পারস্য সম্রাটের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাননি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি কাবুলের মোগল শাসককে কান্দাহার জয়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কান্দাহারের বিরুদ্ধে কোন সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে হয়নি। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহারের সামরিক শাসক আলি মর্দন খান পারস্য সম্রাটের অত্যাচারে ভীত হয়ে মোগলদের হাতে এই দুর্গ তুলে দেন। এর পরিবর্তে তিনি কাশ্মীরের শাসক নিযুক্ত হন এবং তাকে ৬০০০ মনসাবের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মোগলরা কান্দাহারকে বেশিদিন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইরানীবাহিনী তা দখল করে নেয়।

কান্দাহার হাতছাড়া হওয়া মোগলবাহিনীর দুর্বলতার ফল। কাবুল ছিল মোগল ঘাঁটি—ভারতীয় সাম্রাজ্য থেকে অনেক দূরে—যেখান থেকে সরবরাহ রেখাকে (line of supply) অক্ষুণ্ণ রাখা ছিল কঠিন। মোগলবাহিনীর অবরোধ কৌশল—শত্রুর ঘাঁটিকে ঘিরে ফেলার কায়দা (siege tactics)–ছিল দুর্বল। মোগল গোলন্দাজ বাহিনী এ দুর্বলতাকে ঢেকে দিতে পারেনি। তারা সমতলে লড়তে অভ্যস্ত ছিল—দুর্গম অঞ্চলে চলাফেরার অস্বাচ্ছন্দ তারা জানত না। অন্যদিকে পারসিকবাহিনী ছিল সংকল্পবদ্ধ—তাদের গোলন্দাজরা তুরস্কের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে দুর্জয় হওয়ার কৌশলকে আয়ত্ত করে ফেলেছিল। ফলে মোগলবাহিনী অকারণ অর্থত্রয় ও জনক্ষয় ছাড়া মধ্য-এশিয়াতে আর কিছুই ঘটতে পারেনি।

২৫.১০.৪ উত্তর ও উত্তর পূর্বে রাজ্যজয় ও পূর্বে শাসনবিস্তারের প্রয়াস

পাহাড়ে প্রলম্বিত যুদ্ধ (prolonged warfare) করার ক্ষমতা মোগলবাহিনীর না থাকলেও শাহজাহান পাহাড়ের কোল ঘেষা অলক্ষ্যের (obscure) ছোট রাজ্যগুলিকেও নিষ্কৃতি দেননি। হিমালয়ের পাদদেশে গাড়োয়াল নামে ছোট রাজ্যটিকে সম্রাটের নির্দেশে আক্রমণ করেন কাশ্মীরের শাসক জাফর খাঁ। ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে ২০০০ অশ্বারোহী ও ১০,০০০ পদাতিক বাহিনী নিয়ে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল ভেদ করে তিনি এই রাজ্যটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই অঞ্চলটিকে ইতিহাসে 'ছোট তিব্বত'ও (Lesser Tibet) বলা হয়। (বাল্টিক পাহাড়মালার পাদদেশে বলে এই অঞ্চলকে বাল্টিক স্থানও বলা হয়।) জনবিরল এই অঞ্চলের মানুষ মেষপালক। সামান্য কৃষি-বাগিচার কাজে যুক্ত থেকে

বাল্টিক পাহাড়ের ধূলিশয্যা থেকে অনেক কষ্টে যৎসামান্য সোনা নিষ্কাশন করে বেঁচে থাকত। এইরকম অনগ্রসর অঞ্চলকে সাম্রাজ্যভুক্ত করার প্রয়াস থেকে বোঝা যায় যে, মোগল সম্রাট তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্যকে একটি প্রান্তিক বন্ধনীর মধ্যে বেঁধে ফেলতে চাইছিলেন।

উত্তর-পূর্বে এই বন্ধনীর প্রসার কুচবিহার ও কামরূপের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন শাহজাহান। হাজো (Hajo) ছিল কামরূপের রাজধানী। সেটিই ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মোগল সীমানার শেষ ঘাঁটি। এর বাইরে ছিল অহম্ (Ahom) রাজ্য। অহমদের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ লাগে ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কাজলির যুদ্ধে (Battle of Kajali) মোগলরা পরাজিত হয়। তখন মোগল ফৌজদার অহম্ রাজার সঙ্গে সন্ধি করে। অহম্ রাজা মোগল বশ্যতা মেনে নেন, আর মোগলরা অহম্ রাজ্যকে স্বশাসিত বলে স্বীকার করে নেয়। এইভাবে দূরবর্তী জোট রাজ্যের আনুষ্ঠানিক বশ্যতা ও বাস্তব স্বাধীনতা মেনে নিয়ে মোগল সাম্রাজ্য উত্তর-পূর্বে তার সীমানা বেঁধে ফেলে।

পূর্বদিকে মোগল শাসনকে দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের নেতৃত্বে বাংলার শাসক কাশিম খাঁ হুগলী বন্দর থেকে পর্তুগিজদের উচ্ছেদ করেন। পর্তুগিজরা এ দেশের মানুষকে ধরে নিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করছিল এবং ক্রীতদাসের ব্যবসার সঙ্গে তারা জুড়ে দিয়েছিল ধর্মান্তকরণের পরিকল্পনা। কিন্তু তাদের দমন করা যাচ্ছিল না কারণ তারা সরকারের অনুমতি নিয়েই লবণের ব্যবসা করত। আর তারা ছিল হারমাদ, তাদের ছিল শক্তিশালী নৌবহর, যার ফলে জলবিহারে তারা হয়ে উঠেছিল দুর্বার। পাহাড়ের যুদ্ধে বা অবরোধের যুদ্ধে মোগলবাহিনী ছিল যেমন দুর্বল ঠিক তেমনি জলযুদ্ধে তারা ছিল অতিশয় হীনবল। ইউরোপীয়দের বন্দুক ও গোলাবারুদকে তারা এতটা ভয় করত যে ৩০০ ইউরোপীয় এবং ৬০০ বা ৭০০ দেশীয় খ্রিস্টানদের নিয়ে গড়ে তোলা পর্তুগিজ বাহিনীর বিরুদ্ধে ১,৫০,০০০ সৈন্যের মোগলবাহিনী গঠিত হয়েছিল। এই বিপুল বাহিনী হুগলি থেকে পর্তুগিজদের উৎখাত করে।

২৫.১০.৫ আদিলশাহী ও কুতুবশাহী শাসনের অবসান

শাহজাহান উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে রাজ্যজয়ে অনেক বেশি সফল হয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময়ে দাক্ষিণাত্যের শাসক ছিলেন শাহজাহান নিজেই। তখনই তিনি দাক্ষিণাত্যের অবশিষ্ট মুসলিম রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সামরিক ও কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের ক্রমপ্রসারশীল মোগল সাম্রাজ্যের সামনে দাঁড়িয়েছিল তিনটি মুসলিম রাজ্য—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলে আহমদনগরের নিজামশাহী রাজ্য, পূর্বদিকে গোলকোণ্ডার (হায়দ্রাবাদের) কুতুবশাহী রাজ্য এবং পশ্চিমের মারাঠি ও কন্নাড় ভাষাভাষি অঞ্চলে বিজাপুরে আদিলশাহী রাজ্য। ১৬৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে যখন খান জাহান লোদীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছিল তখনই আহমদনগর এই অভিযানের শিকার হয়। তখন দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ চলছিল। কিছুটা সেই কারণে এবং কিছুটা সম্রাজের প্রিয় বেগম মমতাজ মহলের মৃত্যুর (৭ জুন, ১৬৩১) জন্য সম্রাটকে দাক্ষিণাত্যের খাঁটি বুরহানপুর ত্যাগ করতে হয়।

বুরহানপুর ত্যাগ করার সময়ে শাহজাহান দাক্ষিণাত্য শাসনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মহবত খানের ওপর। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহবত খান দৌলতাবাদ দুর্গটি অধিকার করেন। দীর্ঘদিন ধরে আহমদনগরের নিজামশালী রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন একজন দুর্ধর্ষ সৈনিক ও প্রশাসক—নাম মালিক অম্বর। ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়। তখন শাহজাহান প্রলোভন দেখিয়ে ও কৌশল প্রয়োগ করে আহমদনগরের কয়েকজন মারাঠা প্রধানকে নিজের দলে সরিয়ে আনেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি হলেন শাহজী ভোঁসলে। ঠিক একই সময়ে আহমদনগরের সিংহাসন নিয়ে রাজশিবিরে অন্তর্বিপ্লব শুরু হয়। এই অন্তর্বিপ্লব ও অন্তর্ঘাতে আহমদনগর দুর্বল হয়ে পড়ে। মালিক অম্বরের মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে নিজামশাহী রাজ্যটি তার সংহতি হারায়।

১৬৩৬ খিস্টাব্দে শাহজাহান দৌলতাবাদে আসেন। এরপর নতুন করে শুরু হয় তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযান। প্রথম অভিযান প্রেরণ করেন নিজামশাহী রাজ্যের বিরুদ্ধে। এই সময়ে শাহজী মোগল বিরোধিতা শুরু করেছিলেন বলে দ্বিতীয় অভিযান তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। তৃতীয় অভিযান এগিয়ে যায় বিজাপুরের দিকে। গোলকোণ্ডার কুতুবশাহী রাজ্য আহমদনগর ও বিজাপুরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে চতুর্থ অভিযানটি তার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। আহমদনগর, দুর্বল রাজ্য, সরাসরি মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা সম্রাটের সঙ্গে চুক্তি করে মোগল বশ্যতা মেনে নেয়। তৈমুর বংশের উপাধি ও সম্রাটের নাম মুদ্রায় ছাপানো হবে, শুক্রবারের দ্বিপ্রহরের উপাসনায়—খুতবায়—সুন্নী মতের প্রার্থনাকে গ্রহণ করা হবে, সম্রাটকে বাৎসরিক রাজস্ব দিতে হবে—এইসব শর্ত আদিলশাহী ও কুতুবশাহী শাসকরা মেনে নিলেন। এর পাশাপাশি শাহজীকে মোগল ও বিজাপুর বাহিনী তাড়িয়ে নিলে বেড়াল এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এক দুর্গ থেকে অন্য দুর্গে। খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা ও দৌলতাবাদকে চারটি মোগল প্রদেশে রূপান্তরিত করা হল। চৌষট্টিটি পাহাড়ি দুর্গ থেকে সমস্ত দাক্ষিণাত্যের ওপর মোগল শাসনকে কায়েম করা হল। ভবিষ্যৎ কয়েক দশকের জন্য দাক্ষিণাত্যে মোগল শাসনের সীমানা স্থির হয়ে গেল।

ক্রমপ্রসারমান মোগল সাম্রাজ্যের আয়তন শাহজাহানের সময়ে যা দাঁড়িয়েছিল তা এইরকম—উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশ থেকে উত্তর-পূর্ব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শ্রীহট্ট পর্যন্ত, আবার উত্তরে বলক্ রাজ্য থেকে দাক্ষিণাত্যের শেষ পর্যন্ত—একটানা বিরাট ভূখণ্ড যার মধ্যে ছিল বাইশটি প্রদেশ ও চার হাজার তিনশ পঞ্চাশটি পরগণা। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম দুই দশকের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আব্দুল হামিদ লাহোরী লিখেছেন যে, আগ্রা বা লাহোরের মত বড় প্রদেশের দু চারটি পরগণা থেকে যে রাজস্ব আসত তা বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকারও বেশি। সমস্ত বদকশান রাজ্যের যে বাৎসরিক বাজেট ছিল তার থেকেও এই কয়েকটি পরগণা-ওয়াড়ি আদায় বেশি ছিল বলে আব্দুল হামিদ লাহোরী মন্তব্য করেন।

অনুশীলনী ২

১। নীচের উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল? (✓) অথবা (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) অভ্যন্তরীণ সীমানা সংরক্ষণের কাজে শাহজাহানের একটি বড় পদক্ষেপ হলো দিল্লিতে নতুন রাজধানীর পত্তন।

(খ) সম্রাট শাহজাহান বুন্দেলাদের বিনাশ সাধন করেছিলেন।

(গ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরপারে উজবেক শক্তি সম্পর্কে মোগলদের কোন স্থায়ী চিন্তা ছিল না।

(ঘ) কান্দাহার কোনদিন মোগলদের হাতছাড়া হয়নি।

(ঙ) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা শাহ্জাহানের আমলে মোগল বশ্যতা মেনে নিয়েছিল।

২। সাম্রাজ্যের দৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণের জন্য শাহ্জাহান কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। (দশ লাইনের মধ্যে আলোচনা করুন)

৩। পর্তুগিজদের হাত থেকে শাহজাহান হুগলি বন্দরকে কিভাবে উদ্ধার করেন? (পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন)

৪। শাহ্জাহান উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে রাজ্যজয়ে অনেক বেশি সফল হয়েছিলেন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। দীর্ঘদিন ধরে মালিক অম্বর আহমদনগরে কতুবশাহী রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৫.১১ মোগল রাজশক্তির সংহতিসাধন : শাসকশ্রেণীর নতুন সংগঠন

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যবিস্তার—এই দুই কাজের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবেই চলেছিল একটি তৃতীয় কাজ—রাজশক্তির সংহতিসাধন। আকবর ও তাঁর প্রশাসকেরা প্রথম থেকেই একটি কেন্দ্রায়িত প্রশাসন (centralizing administration) গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ প্রশাসনের এমন একটা স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) ছিল যাতে রাজ্যবিজয়ের ধারার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে একটি স্থিতিশীল অথচ প্রসারকামী রাজশক্তির জন্ম দিতে পেরেছিল। ভারতীয় মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে যে পারসিক-প্রশাসনিক ধারা ছিল তার সঙ্গে আকবর মিশিয়েছিলেন মধ্য-এশিয়ার তুর্কো-মঙ্গোল সাম্রাজ্য বিজয়ের ধারার মধ্যে নিহিত শোষণধর্মী শাসন-সংগঠনের ঐতিহ্য। যে শাসনব্যবস্থা মোগল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড তৈরি করেছিল তার চারটি বৈশিষ্ট্য ছিল—এক, তা ছিল কেন্দ্রায়িত, যার মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনের স্বরূপ ধরা পড়ত। দুই, তা ছিল ক্রম-কাঠামোভিত্তিক (hierarchical)। তিন, তার একটা আমলাতান্ত্রিক বিন্যাস (bureaucratic) ছিল এবং চার, তা ছিল শোষণমূলক (extractionist)।

এই সমস্ত কাঠামোর পুরোভাগে ছিল মোগল সম্ভ্রান্ত সমাজ (The Mughal Nobility)। সম্রাটের হুকুম তালিম করে সাম্রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকতেন এক বিরাট সৈনিক অভিজাত (warrior-aristocrats) সমাজ। এই সমাজের সদস্য ছিলেন সমস্ত যুবরাজ, রাজপরিবারের সমুদয় সদস্য, এবং তুর্কিস্থান—ইরাক—ইরান—আফগানিস্তান—হিন্দুস্তান থেকে আহূত অসংখ্য সম্ভ্রান্ত প্রশাসক ও যুদ্ধবাজ মানুষ যাদের বলা হত **আমীর**। এঁরাই প্রাদেশিক শাসনকর্তা হতেন এবং প্রশাসনিক ওপরতলার জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের যোগান দিতেন। এই রকম প্রশাসনিক মানুষ যারা অন্যদিকে তারাই হতেন সেনাবাহিনীর পরিচালক, স্তরে স্তরে বিভক্ত সৈনিকদের অধিকর্তা এবং আরও এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি। শাসন ও লড়াই এই দুই বিপরীতের অবিমিশ্র ভেদকে মুছে দিয়ে সৈনিক ও প্রশাসককে একটা ঐক্যবদ্ধ সমারোহের মধ্যে এনেছিল মোগল সাম্রাজ্য। এর ফলে যে মোগল সম্ভ্রান্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তা ছিল বহুজাতিক, আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক। এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে আশ্রয় পেয়েছিল রাজপুত, আফগান, ভারতীয়, আরব, পারসিক, মধ্য-এশিয়ার উজবেক, চাঘতাই ইত্যাদিরা। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বেশিরভাগই ছিল সুন্নী মুসলমান; তা হলেও শিয়া মতাবলম্বী এবং হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্থানও ছিল অব্যাহত। এইভাবে গড়ে ওঠা বহুজাতিক, বহুধর্মীয়, বঙ্গভাষাভাষী, বহু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী মানুষদের তিন ধরনের শক্তি ও সম্পদকে সমবায়িত করতে হত—এক, তাদের লড়াই করার শক্তি ও সামরিক সম্পদ; দুই, তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা এবং তিন, তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা (entrepreneurial strength)। এদের সবাইকে নিয়ে গড়ে উঠত মোগল পিতৃতান্ত্রিককতা। এই দিক থেকে বিচার করে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকরা মোগল রাষ্ট্রকে 'পিতৃতান্ত্রিক-আমলাতান্ত্রিক' (patrimonial-bureaucratic) বলে অভিহিত করেছেন।

২৫.১১.১ মনসবদার ও জাগিরদার

প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরই একটি **মনসাব** ছিল, কিন্তু প্রত্যেক **মনসবদার** তা বলে সম্ভ্রান্ত (noble) ব্যক্তি ছিলেন না। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে মনসাব মানে—খুব আনুষ্ঠানিক অর্থে—একটা পদমর্যাদা (rank)–অর্থাৎ সরকারনির্দিষ্ট মর্যাদারক্রম কাঠামো (hierarchy) একটি অবস্থানমাত্র। সাধারণত যে সমস্ত কর্মচারী ৫০০ জাট (zat) বা তদূর্ধ্ব জাটের অধিকারী ছিলেন তাদেরই বলা হত সম্ভ্রান্ত (noble)। সপ্তদশ শতাব্দীতে ১০০০ বা তার চেয়ে বেশি **জাটের** (zat) অধিকারীকে সম্ভ্রান্ত বলা হত। সাম্রাজ্যের উচ্চতর প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তি কত বেতন

পাবেন তার একটা সারণি ছিল। বেতনভিত্তিক পদমর্যাদার এই সারণি ছিল আসলে বেতনের মধ্য দিয়ে দশমিক সংখ্যায় নির্ণয় করা অভিজাত-ক্রম কাঠামো একজন সম্ভ্রান্ত মানুষের অবস্থান মাত্র (decimal rank) অর্থাৎ ১০, ২০, ২০০, ৫০০, ১০০০ এইরকম সংখ্যায় নির্ণীত বেতনভিত্তিক মর্যাদার সোপানকে **জাট** (zat) বলা হত। আল্লাহ্ শব্দের মধ্যে যে কটি বর্ণ আছে, আরবি বর্ণমালায় তাদের ক্রমিক সংখ্যা যা (তা যথাক্রমে ১+৩০+৩০+৫; 'আল্লাহ' শব্দে আরবি বর্ণমালা ও তাদের ক্রমিক সংখ্যা এইরকম—১, লাম—৩০, লাম—৩০, হে—৫) তার যোগফল যা হবে (এক্ষেত্রে ৬৬) ঠিক ততগুলি হবে **জাট** বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের স্তর। কিন্তু এই নিয়ম আকবর চালু করলেও তাঁর সময়ে নিম্নতম সংখ্যা ১০ আর ঊর্ধ্বতম সংখ্যা ১০,০০০ ধরে মোট ৩৩টি স্তরে বিভক্ত মনসবদার বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পদবিন্যাস করা হয়েছিল।

আকবরনামায় বলা আছে যে, ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে আকবর নির্দেশ দেন যে সাম্রাজ্যের কাজে নিযুক্ত সমস্ত অশ্বকে চিহ্নিত করে—**দাগ** (dagh) দিয়ে—পর্যায়ভুক্ত করতে হবে। এর সাথেই নির্ণীত হবে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের অবস্থানগত মর্যাদা। রাষ্ট্র বা **মরতিব** (maratib)-এর অন্তর্ভুক্ত পদস্থ কর্মচারীদের এই প্রক্রিয়ায় নির্ণীত অবস্থানই হল **মনসাব**। আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে যে **মনসবদারদের** সোপান ছিল **দহবাশি** (১০-এর অধিকর্তা) থেকে **দহ হাজারি** (১০,০০০-এর অধিকর্তা)। কিন্তু ৫০০০-এর ওপর মনসাবগুলি সব দেওয়া হত শুধুমাত্র যুবরাজদের। কখনো কখনো সম্রাটের পরিবারের বা রাজরক্তসম্ভূতরা এই মনসাব পেতেন। তবে মোটের ওপর ৫০০০-এর ওপর মনসাব ছিল সংরক্ষিত। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মোট ১,৮২৩ জন ব্যক্তি মনসব লাভ করেছিলেন। তাদের অধীনে ১,৪১,০৫৩ জন মানুষ শক্তিশালী অশ্বারোহী হয়ে এবং যথেষ্ট হাতিয়ার সম্বলিত থেকে সাম্রাজ্যের সেবা করত। এদের জন্য খরচও ছিল বিপুল। আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে **মনসবদার** ও তাদের অনুচরেরা সাম্রাজ্যের বার্ষিক বাজেটের ৮২ শতাংশ আত্মসাৎ করত—অর্থমূল্যে তা ছিল নয় কোটি নব্বই লক্ষের মধ্যে আট কোটি দশ লক্ষ টাকা।

১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে সম্ভ্রান্তদের পদমর্যাদা **জাট** (zat) এবং **সওয়ার** (sawar) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। **জাট** বলতে বোঝাতো বেতনসারণি অনুযায়ী নির্ধারিত মর্যাদার ক্রমকাঠামো। আর **সওয়ার** বলতে বোঝাত কোন কর্মচারী তার অধীনে কত অশ্বারোহী বাহিনী মজুত রাখছেন তার ভিত্তিতে নির্ধারিত মর্যাদা (rank)। মিরজা শহরুক (Mirza Shahrukh) ছিলেন প্রথম উল্লিখিত **আমীর** যিনি ৫০০০ **জাট** এবং ২০০০ **সওয়ারের** অধিকর্তা হয়েছিলেন। সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত এই দুধরনের মর্যাদার জন্য পৃথক পৃথক খাতে সম্ভ্রান্তদের অর্থ দেওয়া হত। শাহজাহানের সময় থেকে যে বেতনসারণি আমাদের হাতে এসেছে তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, **জাট** (zat) এবং **সওয়ার** (sawr) মর্যাদার বেতন ভিন্ন ছিল। জাট মর্যাদার জন্য যে বেতন একজন **মনসবদারকে** দেওয়া হত তার অন্তর্ভুক্ত হত তার ব্যক্তিগত বেতন এবং অশ্ব, হস্তী, উট ও শকটের খরচ। এর বাইরে অন্য খরচ ছিল সওয়ারভুক্ত। ঔরংজেবের সময়ে দেখা গেছে যে একজন মনসবদারের **সওয়ার-মর্যাদা** (sawar rank) তার **জাট-মর্যাদার** (zat rank) থেকে বেশি ছিল। ফলে **সওয়ার** বেতন **জাট** বেতনের থেকে বেশি ছিল। একজন **মনসবদার** তার অধীনে মজুত সৈন্যের ভিত্তিতে সওয়ার মর্যাদা পেতেন। তাহলে **সওয়ার** বেতন বেশি হওয়ার অর্থই হল যে রাষ্ট্র অনেক বেশি সৈন্য-নির্ভর হয়ে পড়ছিল। প্রশাসক যখন সৈনিক হিসাবে বেশি মর্যাদা পান তখন বোঝাই যায় যে রাষ্ট্র অনেক বেশি আপৎকালীন অবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে।

প্রথম দিকে যে সমস্ত ইংরেজ ও ভারতীয় ঐতিহাসিক মোগল সৈন্যবাহিনী ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা কিন্তু **জাট ও সওয়ার** মর্যাদার অন্তর্নিহিত রূপ নিয়ে একমত হতে পারেননি। ব্লকম্যান (Blochmann) একসময়ে লিখেছিলেন যে জাট হল একজন **মনসবদারের** অধীনে কত সৈন্য থাকবে তার মাপ আর **সওয়ার** হল তার অধীনে অশ্বারোহীর হিসাব। আরভিন (Irvine) বললেন **জাট** হচ্ছে প্রকৃত অশ্বারোহী বাহিনীর মাত্রাচিহ্ন, আর

সওয়ার হল সাধারণ মর্যাদা। অনেকটা একই ধরনের মত পোষণ করেছিলেন আর. পি. ত্রিপাঠী (R.P. Tripathi)। তিনি মনে করতেন **সওয়ার** হচ্ছে অতিরিক্ত সম্মান। তার সাথে অশ্বারোহী বাহিনী সংরক্ষণের কোন যোগ নেই। আব্দুল আজিজ (Abdul Aziz) বললেন যে **জাট** বলতে বোঝাত একজন **মনসবদারের** নিয়ন্ত্রণাধীন হস্তী, অশ্ব, ভারবাহী পশু, শকট ইত্যাদি, আর সওয়ার ছিল মনসবদারে অধীনে সংরক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনীর মাপ। মোটের ওপর যে কথাটা বুঝতে হবে তা হ'ল এই যে **জাট** কথাটা কোন অভিজ্ঞানসূচক (symbolic) নয়। রিজভি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, **জাট** শব্দটির দ্বারা সম্ভ্রান্তদের কোন অগ্রাধিকার বোঝাত না। বরং **'জাট' ও 'সওয়ার'** শব্দ দুটির দ্বারা বোঝাত একটি সমাহৃত মর্যাদা যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত দায়িত্ব, কর্তব্য এবং বেতন। রিচার্ডশ-এর (Richards) লেখায় দেখি **জাট ও সওয়ার** হল গাণিতিক মর্যাদা-বিন্যাসের দুটি নিরিখ যার মধ্য দিয়ে **মনসবদারদের** সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য (uniformity), শৃঙ্খলা (discipline) এবং অভ্যন্তরীণ বন্ধন দৃঢ় হত।

মনসবদাররা ছিল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় সামরিক স্তম্ভ। সমরনায়ক ছিল বলে তাদের কেন্দ্রীয় সেনানি-সচিব (army minister) মীর বক্‌শির অধীনে রাখা হত। **মীর বক্‌শি** সেনাপতি ছিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে রণকৌশল, রণনীতি ও সৈন্য পরিচালনা তাঁর কাজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সেনাপতি ছিলেন সম্রাট নিজেই। **মীর বক্‌শির** কাজ ছিল বিধিসম্মত নিয়োগের ব্যবস্থা করা (recruitment), মর্যাদার সুচারু বিন্যাসকে সুপারিশ করা (recommendations for proper ranks) এবং যথাযথ বেতন ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

এইভাবে **মীর বকশির** অধীনে সংগঠিত সমস্ত মনসবদার শেষ পর্যন্ত ছিলেন সম্রাটের সেবক। তাদের অধীনে যাবতীয় মানুষ, পশু ও সাজসরঞ্জাম ছিল সম্রাটের সম্পদ। ফলে মনসাবদারদের নিয়মমাফিক সম্রাটকে আনুগত্য জানাতে হত—এবং তার মধ্য দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করতে হত—যে তারা যে সৈন্যবাহিনী রেখেছেন তা পূর্ণমাত্রায় হাতিয়ার ও সরঞ্জাম সম্বলিত হয়ে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত। যে **অশ্ব মনসবদারদের** রাখতে হত তা ছোট মাপের দেশীয় ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি নয়। তা মধ্য-এশিয়ার এবং পারস্যের প্রজাতির (Central Asian and Persian breeds) ঘোড়া। নিজেদের অধীনে সেনাবাহিনীর সমজাতীয়তা (homogeneity) রাখার জন্য **মনসবদাররা** বেশিরভাগ সময়ে নিজেদের ধর্ম ও নিজেদের গোষ্ঠী (ethnicity) থেকে লোক নিয়োগ করতেন। পরে এবিষয়ে আইন তৈরি হয়েছিল—মনসবদাররা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে নিজেদের কৌমগোষ্ঠীর বাইরে মানুষ নিয়োগ করতে পারবেন। অর্থাৎ একজন রাজপুত মনসবদার তার অধীনে অধিকাংশ রাজপুতদেরই নিয়োগ করতে পারবেন, ভারতীয় মুসলমানরা পারবেন ভারতীয় মুসলমানদের নিয়োগ করতে। স্বাভাবিক নিয়মে মনসবদাররা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে লোক নিয়োগের চেষ্টা করতেন। প্রত্যেক বড় শহরেই দক্ষ সৈনিক ও অশ্বারোহী মানুষ থাকত যাদের ক্ষমতা ভাড়া করা যেত। এইসব মানুষদের বেতন কি হবে **মনসবদার** নিজেরাই পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে স্থির করতেন। অশ্বারোহী সৈনিকের বেতন মোগল দলিল-দস্তাবেজে বলা আছে। সাধারণত একজন অশ্বারোহী নগদে বেতন পেতেন এবং তাকে প্রতিমাসে ২০টি রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হত।

কোন কোন **মনসবদারকে** কেন্দ্রীয় রাজকোষ থেকে নগদে বেতন দেওয়া হত। কিন্তু প্রথানুযায়ী প্রত্যেক **মনসবদার** বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নগদ অর্থের বদলে **জাগির লাভ** করতেন। বেতনের পরিবর্তে মনসবদারকে জমি (Territory) প্রদত্ত হলে সেই প্রদত্ত জমিকে (Assigned territory) **জাগির** বলা হত। জাগির লাভ করে মনসবদার হতেন **জাগিরদার।** মনসবদার ছাড়াও উচ্চপদস্থ প্রশাসকরা **জাগির** পেতেন। অতএব **জাগিরদার** মানেই **মনসবদার** একথা ভাবার কোন কারণ নেই। কোন **জাগিরদার** তাকে প্রদত্ত জাগিরের সমস্ত রাজস্বটুকু আত্মসাৎ করতেন, কিন্তু সেই জাগিরের অন্তর্ভুক্ত জমির মালিক হতেন না। অর্থাৎ **জাগিরদার** কখনো সেই **জাগিরের জমিদার** ছিলেন না। মোগল যুগে **জাগিরদাররা** বদলি হতেন। তিন-চার বছর বাদেবাদেই **জাগির** হস্তান্তরিত হত। **জাগিরদাররা** স্থির থাকতেন—প্রজন্ম পরম্পরায় **জমিদারি** পারিবারিক দায়িত্ব বোঝাত।

প্রাক্-মোগল যুগে যাকে ইক্তা (Iqta) বলা হত **জাগির** ছিল অনেকটাই তাই। **জাগির** ছিল নিঃসন্দেহে এক-একটি রাজস্ব—একক (Revenue unit) কিন্তু রাজস্বের দিক থেকে সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করা এক-একটি রাজস্ব বিভাগ (Revenue Divisions) নয়। **জাগিরের** প্রশাসনে নিযুক্ত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা, **জাগিরদারের** কর্মচারী নয়। **জাগিরদারের** কর্মচারী হয়ত জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব কিংবা কখনো কখনো কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা আদায় [এই কাজটি ছিল মূলত জমিদারের] করতে পারত, কিন্তু কোন সময়েই তারা সম্রাটের বিধিবদ্ধ রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো বা রাজস্ব নীতি ও আইনকে লঙ্ঘন করতে পারত না। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা গেছে যে সাম্রাজ্যের মোট নির্ধারিত রাজস্বের [তাকে বলা হত **জমা** (Jumma)]। ৬০ শতাংশ ৫০০ ও তদূর্ধ্ব মর্যাদার (rank) ৪৪৫ জন মনসবদারের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সমস্ত সম্পদের সিংহভাগ পাঁচশতরও কম পরিবারের হাতে জমা হয়েছে। মোগল যুগে ধনবণ্টন এইরকম ছিল।

মনে রাখতে হবে যে **মনসবদারের** যে বেতন তা এক জটিল সারণি থেকে তৈরি হত। নিয়ম অনুযায়ী একজন মনসবদারের যে বেতন তার সমপরিমাণ রাজস্ব যে **জাগির** থেকে আসত সেইরকম **জাগিরই** তাকে দেওয়া হত। কিন্তু সবসময়ে এ নিয়ম প্রতিপালিত হত না। প্রায়ই দেখা যেত যে, সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ের যে **মনসবদার** যেমন আকবরের সময়ে আবদুর রহিম খান-ই-খানান, কিংবা শাহজাহানের সময়ে যুবরাজ দারা, শুকো, তারাও তাদের বেতন নিয়ে অসন্তুষ্ট। অনেক সময়ে **জাগিরের** হাত বদল হত, কিংবা **জাগিরদারকে** স্থান থেকে স্থানান্তরে বদলি করা হত। তখন **জাগিরদারদের** মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিত। **জাগিরদারদের** মধ্যে একটা প্রবণতা গড়ে উঠছিল যে তারা সবাই পছন্দমত জাগির চাইতেন। **দিওয়ান-ই-কুলকে** (Diwan-i-kull) চাপ দিয়ে কি করে সবচেয়ে কৃষিযোগ্য জমিসমেত, সবচেয়ে বেশি রাজস্ব উৎপাদনকারী গ্রাম বা সহজে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তা আয়ত্ত করা যায় সেই দিকে তাদের নজর ছিল। অথচ সরকারি নীতি ছিল **মনসবদার** যেখানে কর্মক্ষেত্র সেখানে থাকবেন, আর তার আশেপাশে সম্পাব্য **জাগির** তা যেমনই হোক তাকে দেওয়া হবে।

অনেক সময়ে যেমন **মনসব্** এবং **জাগিরের** সমতা থাকত না সেইরকম **মনসবদার** আর **মনসবদারের** মধ্যে বৈষম্য দেখা যেত। তাতে তাদের বেতনের হেরফের হত। যেমন, রাজপুত সৈন্যরা মোগল, আফগান ও ভারতীয় মুসলমানদের থেকে কম বেতন পেত। এটি জাতিগত বৈষম্যের ফল কিনা বলা যাবে না। হয়ত এমন হতে পারে যে রাজপুত সৈন্যদের প্রয়োজনের তুলনায় যোগান অনেক বেশি ছিল। সৈন্যদের মধ্যে অনেক সময়েই অতিমাত্রায় দক্ষ সৈনিক থাকত। তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে বলিষ্ঠ আর অনুগতদের সম্রাট নিজের প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। আকবর এ প্রথা চালু করেছিলেন এবং তাঁর বংশধরেরা তা অব্যাহত রাখেন। এই সৈন্যরা সচরাচর **মনসবদারের** তালিকাভুক্ত হত না। এদের বলা হত **আহাদি** (Ahadi)। **'আহাদ'** শব্দটির অর্থ হল 'এক'। আকবর ঐশী একত্বে (divine unity) বিশ্বাস করতেন, **'আহাদ'** শব্দটি তারই প্রতিফলন। প্রত্যেক **আহাদিকে** ৫০০টি মুদ্রা বেতন দেওয়া হত। তাদের অধীনে থাকত ৫টি উৎকৃষ্ট ঘোড়া এবং উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম। তাদের দেখাশোনা করতেন একজন স্বতন্ত্র **দেওয়ান** ও স্বতন্ত্র **বকশি**। প্রত্যেক চারমাস বাদে বাদে তাদের জমায়েত করা হত। তখন তারা সঙ্গে নিয়ে আসত তাদের অস্ত্র ও অশ্ব। সপ্তদশ শতব্দীর শেষ থেকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে **আহাদিরা** অলস হয়ে পড়ে। যে সব সৈন্যরা লড়াই করে বিঘ্ননাশ করত (crack troops) তাদের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তখন থেকেই তারা **অকর্মা** (Idler) বলে অভিহিত হতে থাকে। প্রথমদিকে **আহাদির** সংখ্যা কম ছিল, পরে বেড়ে যায়। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন ২,৯৪১ জন **মনসবদারের** প্রভুত্ব। এঁরা ২০ থেকে ৫০০ মর্যাদা-অঙ্কে বিভক্ত ছিলেন। শাহজাহানের

রাজত্বের বিংশতিতম বছরে মোগল রাজকোষ থেকে বেতন পেত ৭০০০ আহাদি এবং অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী। এছাড়া ছিল ৮০০০ **মনসবদার**। এই **মনসবদারদের** অনেকেই শেষপর্যন্ত ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী এই তিন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

অনুশীলনী ৩

১। মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল? (চার লাইনে উত্তর দিন)

২। মনসবদার সম্পর্কে দশ লাইনের মধ্যে আলোচনা করুন।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) বেতনের পরিবর্তে মনসবদারকে জমি দেওয়া হলে সেই জমিকে ----------- বলা হত।

(খ) 'আহাদ' শব্দটির অর্থ হ'ল ------------ হল।

(গ) মনসবদারদের অনেকেই শেষপর্যন্ত --------------- ------------- ও --------------- এই তিন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

৪। সমস্ত ভারতীয় উপমহাদেশব্যাপী এক সাম্রাজ্যের সর্বভারতীয়ত্ব হল মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

২৫.১২ সারাংশ

আপনারা যে আলোচনা পড়লেন তার মধ্যে দুটি দিক আছে যা আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন। এক, মোগল সাম্রাজ্য যেমন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম চারদিকে রাজ্যবিস্তার করছিল ঠিক সেইরকম একই সঙ্গে মোগল শাসকসমাজকেও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছিল। দুই, ভারতবর্ষের বাইরে মধ্য-এশিয়ার স্থায়ী রাজ্যবিস্তার যেমন সম্ভব হয়নি ঠিক সেইরকম ভাবেই সম্ভব হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে মোগল সীমানাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি শক্তিশালী সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। এই যে সমস্ত ভারতীয় উপমহাদেশব্যাপী এক সাম্রাজ্যের **সর্বভারতীয়ত্ব,** এটি মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। কাশ্মীর থেকে কামরূপ, গুজরাত থেকে বঙ্গদেশ কিংবা হিমালয় থেকে দাক্ষিণাত্যের শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় ভূখণ্ড এক শাসনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। একটি কথা দেশীয় শাসকদের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে ক্রমপ্রসারশীল মোগল শক্তির সামনে যে অন্তরায় সৃষ্টি করবে সেই নিশ্চিহ্ন হবে। এই নিরবচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য নির্মাণ (empire building) সপ্তদশ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মেবারের পতন, আহমদনগরের বিনাশ, বিজাপুর ও গোলকেণ্ডার আত্মসমর্পণ প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, মোগল শক্তিকে প্রতিরোধ করে লাভ নেই। সঙ্গে সঙ্গে মোগল সম্রাটরাও রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে শিখেছিলেন। সমতলের অবরোধ-টেকনিকে মোগলবাহিনী যতই পারদর্শী হোক পাহাড়ে, দুর্গম অঞ্চলে বা অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে যেখানে হিংস্র উপজাতীয় মানুষদের পেরিয়ে সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় সেখানে যুদ্ধ করার হিম্মৎ (stamina) যে তাদের নেই তা অনেক অর্থ ও মাবসম্পদের অপচয় ঘটিয়ে মোগল শাসকদের শিখতে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকে মোগল শক্তি সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অটল ছিল। হুগলির পর্তুগিজদের বে-আদবি বা খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন করে মোগল শাসকরা প্রমাণ করেছিলেন যে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তারা কোথাও আপোষ করতে রাজি নন। এই আকাশচুম্বি সার্বভৌমত্বের স্পর্ধাকে অটুট রাখার জন্য তাদের গড়ে তুলতে হয়েছিল **মনসবদার** আর **জাগিরদারের** আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক দুর্দান্ত শাসক ও সৈনিক বাহিনী যারা সাম্রাজ্যের সংহতিকে বজায় রাখতে নিরঙ্কুশ শোষণের পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। দেশের সিংহভাগ রাজস্বকে আত্মসাৎ করে শেষপর্যন্ত তারা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর

শেষ থেকেই রাজস্বের টান পড়ে, জাগিরদারদের মধ্যে বেসামাল লড়াই শুরু হয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

যে কথাটি লক্ষণীয় তা হল জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়ে ধর্ম নিয়ে কোন উত্তেজনা দেখা দেয়নি, শিখ ও রাজপুত জাতিগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যের এমন কোন মরণপণ লড়াই আরম্ভ হয়নি। কোন সম্রাটকে দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়ে সেখানে অবস্থা করে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ঐশ্বর্য ও মানবসম্পদকে উজাড় করে দিয়ে হয়নি। এর অনেক কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ হল যে প্রথমদিকের সম্রাটরা ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও অন্য ধর্মের প্রতি কিছুটা সহিষ্ণু মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। সহিষ্ণুতা থেকে এসেছিল ওদার্য, আর ঔদার্য রাষ্ট্রকাঠামোকে একটা সংহতি দিতে পেরেছিল। মোগল সামরিক সাফল্য অনেকটা এই সংহতির ওপর নির্ভর করত। কিন্তু এই সামরিক সাফল্যকে অতিরঞ্জিত করে ভাবা ঠিক হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শাহজাহানের সময়ে কান্দাহার হস্তচ্যুত হওয়া এবং তাকে উদ্ধার করতে তিনটে অভিযান ব্যর্থ হওয়া মোগল সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও তার নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অভাবকে সূচিত করে।

২৫.১৩ অনুশীলনী

১। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোগলদের দাক্ষিণাত্য নীতি বর্ণনা করুন।

২। পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে মোগলদের সম্পর্ক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন।

৩। শিখ-মোগল সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

৪। আভ্যন্তরীণ সীমার সংহতিকারণে শাহজাহান কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

৫। মনসবদারি ও জাগিরদারি ব্যবস্থা কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।

২৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

1. Beniprasad : History of Jahangir.
2. Sharma, S. P. : Mughal Empire in India.
3. Smith, V. A. : The Oxford History of India.
4. Macecliffe : The Sikh Religion.
5. Moosni, Shiram : The Economy of the Mughal Empire.
6. Irvine, W. : The Army of the Indian Moguls.

একক ২৬ □ ঔরংজেবের ইতিহাস—দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক সম্প্রসারণ—মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্ব—রাষ্ট্র ও ধর্ম

গঠন

২৬.০ উদ্দেশ্য

২৬.১ প্রস্তাবনা

২৬.২ প্রারম্ভিক কথা

২৬.৩ সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পরের সংস্কার

২৬.৪ উত্তরভারত : প্রথম দশবছর : সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের গৌরব

২৬.৪.১ রাজ্যশাসনের দীনতা ও সম্প্রদায়গত উত্তেজনার শুরু : মোগল বিপন্নতার আরম্ভ : জাঠ ও সৎনামি বিদ্রোহ

২৬.৪.২ মোগল নিপীড়ন ও শিখজাতির আত্মত্যাগ

২৬.৪.৩ আফগানদের সঙ্গো বিরোধ

২৬.৪.৪ রাজপুত বিদ্রোহ

২৬.৪.৫ যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ

২৬.৫ দক্ষিণ ভারত : ঔরংজেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয়ার্ধ

২৬.৫.১ ঔরংজেবকে দক্ষিণভারতে যেতে হল কেন?

২৬.৫.২ বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা বিজয়

২৬.৫.৩ দাক্ষিণাত্য বিজয় কি ভ্রান্ত হয়েছিল?

২৬.৬ মারাঠাদের উত্থান : শিবাজীর নেতৃত্বে নতুন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি : মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্ব

২৬.৬.১ শিবাজীর উত্থানের প্রথম পর্যায় : ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

২৬.৬.২ শিবাজীর উত্থানের দ্বিতীয় পর্যায় : (১৬৬০-১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ)

২৬.৬.৩ মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বের উত্তর-শিবাজী পর্যায়

২৬.৭ রাষ্ট্র ও ধর্ম

২৬.৮ সারাংশ

২৬.৯ অনুশীলনী

২৬.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন ঔরঙ্গজেবের—

- সাম্রাজ্য শাসনের ও সম্প্রসারণের প্রাথমিক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়

- রাজ্যশাসনের দীনতা, সাম্প্রদায়িকতা ও তার ফলস্বরূপ শিখ, আফগান, রাজপুত, জাঠ প্রভৃতির বিদ্রোহ
- দক্ষিণভারত অভিযান
- মারাঠাদের তথা শিবাজীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব
- রাষ্ট্র ও ধর্ম

২৬.১ প্রস্তাবনা

ইতিহাস পড়ার একটা উদ্দেশ্য হল ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভ করা। ঔরঙ্গজেবের শাসনাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, ধর্মান্ধতা, একদেশদর্শিতা, মদান্ধতা ভারতবর্ষের মত বহু ধর্ম, বহুজাতি, বহুভাষাভাষী মানুষের দেশে কোন মঙ্গলের সূচনা করে না। মোগল সাম্রাজ্য ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিল ঔরংজেবের রাজত্বকালেই। শাসকরূপে ব্যক্তির ব্যর্থতা এক্ষেত্রে ইতিহাসের একটি অনস্বীকার্য সত্য। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এ শিক্ষাও আমাদের লাভ করতে হবে যে, মোগল সাম্রাজ্য ছিল একটি বড় প্রতিষ্ঠান। কোন ঐতিহ্যবাহী, শতাব্দীলালিত প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তির একক ব্যর্থতায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে না। আসলে ঔরংজেবের রাজত্বকালে যুগশক্তির পরিবর্তন হচ্ছিল। ইতিহাসের বড় বড় অধ্যায় জুড়ে এরকম যুগশক্তির পরিবর্তনকে না বুঝলে মানবসমাজের রূপান্তরকে বোঝা যায় না। মধ্যযুগের শেষ পর্বে এই রূপান্তরের ধারা ভারতবর্ষে কিরকমভাবে কাজ করছিল তা বোঝা যায় ঔরংজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস পড়লে। সেই ইতিহাসই আমরা পড়ব।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য একটি সতত সম্প্রসারণশীল প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সম্রাট ঔরংজেবের সময়ে তা পরিণতি লাভ করে। এই প্রথম মোগল সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে তার চরম (final) সীমা লাভ করল। এই সীমানা সম্প্রসারণ আর রাজ্য সংগঠনের অবিরল ধারার মধ্যে দমনপীড়ন অনিবার্য রাষ্ট্রিক নীতির অঙ্গীভূত ভাব রূপে যেমন প্রকাশ পায় তেমন জাতিসত্তার গভীরে তিল তিল করে জমে ওঠা ক্ষোভও আত্মপ্রকাশ করে রাষ্ট্রিক স্থিতিশীলতাকে নাড়িয়ে দেয়। রাষ্ট্র সম্প্রসারণে শাসকের সন্তোষ আর তার প্রতিক্রিয়ায় জনরোষ এই দুইয়ের অপব্যাখ্যা হয়েছে নানাভাবে নানা সাম্প্রদায়িক খণ্ডিত ও একদেশদর্শী দৃষ্টিকোণ থেকে। এই পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস চর্চার বাইরে ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্ককে স্থির রেখে বস্তুগ্রাহ্য, তথ্যনির্ভর, নিরপেক্ষ ইতিহাসকে আমাদের পাঠ করতে হবে। কোন তত্ত্ব বা মডেলকে চোখের সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হব না। তথ্য আমাদের নিয়ে যাবে তত্ত্বে। আসুন আমরা সেই ইতিহাস পড়ি।

২৬.২ প্রারম্ভিক কথা

ঔরংজেবের রাজত্বকাল প্রায় পঞ্চাশ বছর (১৬৫৮-১৭০৭)। তাঁর রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়ে সবচেয়ে দীর্ঘ আকার ধারণ করেছিল। ইতিপূর্বে আর কোন ভারতীয় সাম্রাজ্যই এত বৃহদাকার ধারণ করতে পারেনি। অথচ রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহতি কমেছিল। সম্রাট নিজে অনেকখানি তার জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই কিছুটা তাঁর ভ্রান্ত নীতির জন্য, কিছুটা যুগের পরিবর্তনশীল ধারার জন্য মোগল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। এর ফলে সম্রাটের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই মোগল সাম্রাজ্যের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। মোগল সাম্রাজ্য কিভাবে গৌরবের শিখরে উঠল আর কিভাবেই বা তার সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকের রাজত্বকালে ভাঙ্গনের মধ্যে ঢলে পড়ল তার ইতিহাস আমরা এখন পড়ব। শুধু এখানে মনে রাখা দরকার—যে কথা যদুনাথ সরকার বলেছেন যে, ঔরংজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস হল সমস্ত

ভারতের ইতিহাস। এই ইতিহাসকে খণ্ড, ক্ষুদ্র করে ভাগ করা যাবে না। একে বুঝতে হবে সামগ্রিকতার প্রেক্ষিতে। ঔরংজেবের শাসনাধীন ভারতবর্ষের প্রায় পঞ্চাশ বছরের (১৬৫৮-১৭০৭) কালানুক্রমিক ইতিহাসের দুটি ভাগ আছে—প্রথম ভাগ ১৬৫৮ থেকে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—প্রায় ২৩ বছর। দ্বিতীয় ভাগ ১৬৮১ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—প্রায় ২৭ বছর। তাঁর রাজত্বের প্রথমভাগে সম্রাট উত্তরভারতে ছিলেন। তাঁর রাজধানী, রাজসভা, পরিবার, ব্যক্তিগত উপস্থিতি, রাজ্যপ্রসার, সৈন্য বাহিনী, আমলাতন্ত্র, রাজস্বব্যবস্থা সব নিয়ে যে রাজ্যপাট তার কেন্দ্র ছিল উত্তর ভারতে। রাজত্বের প্রথমার্ধ উত্তর ভারতে থাকার পর পরের পঁচিশ বছরেরও বেশি সময়—একটি শতাব্দীর সিকিভাগের বেশি সময়—সম্রাট রইলেন দক্ষিণ ভারতে। ফলে তখন দক্ষিণ ভারত হল সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র—উত্তরভারত অবহেলায় ডুবে গেল।

২৬.৩ সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পরের সংস্কার

ঔরংজেব সিংহাসন লাভ করার অব্যবহিত পরে কিছু সংস্কারকার্যে হাত দেন। নিজের অবস্থানকে সংহত করার জন্য সব শাসকই এ কাজ করেন—ঔরংজেবও করেছিলেন। অর্থদপ্তর ও রাজস্ব দপ্তরে হিন্দু প্রশাসকদের বহাল রেখেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্ম প্রচার করছে এই অভিযোগে বারাণসীতে ব্রাহ্মণদের ওপর তিনি উৎপীড়ন করেন এবং হিন্দুমন্দির ভাঙ্গার চেষ্টা করেন। রিজভি অবশ্য বলেছেন যে, ধর্মান্ধ জনতা বারাণসীর মন্দির ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিল, সম্রাট স্বয়ং তা বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু ইসলামের অনুশাসন মেনে তিনি নতুন মন্দির সেখানে গড়তে দেননি।

১৬৬০-৬১ খিস্টাব্দে মেবারকে কেন্দ্র করে রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন কিছুটা বাধ্য হয়েই সম্রাট কৃষকদের দেয় কর (taxes and cesses) ও খাজনা সাময়িকভাবে মকুব করেন। প্রায় আশি রকমের কর তিনি মকুব করেছিলেন এবং তার আদায়ের ওপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত এই নিষেধাজ্ঞায় কাজ হয়নি। কাফি খাঁ—যিনি ঔরংজেবের রাজত্বকালের সবচেয়ে প্রধান সমসাময়িক ঐতিহাসিক—বলেছেন যে, দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া এই 'রাজকীয় নিষেধাজ্ঞায় কোন ফল হয়নি'—('the royal prohibition had no effect')। আঞ্চলিক প্রভু আর স্থানীয় কর্মচারীরা সবাই প্রচলিত করগুলি থেকে নিজেদের ফায়দা তুলে নিত।

ঔরংজেব তার রাজত্বে একটা গোঁড়া সুন্নী মুসলমানের ভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পরেই তিনি আকবর প্রবর্তিত **ইলাহি** কালগণনা (Ilahi era) তুলে দিয়ে ইসলামীয় চান্দ্র কালগণনার (Muslim lunar calendar) পদ্ধতি চালু করেন। তাতে বাস্তব অসুবিধা দেখা দিলেও তাকে বহাল রাখা হয়। একজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন **মনসবদারকে মুহাতসিব-রূপে** (Muhatasib) নিযুক্ত করা হয়। তাঁর কাজ ছিল দেশে ইসলামীয় নৈতিকতাকে কায়েম করা। আসলে দেশে মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলতা কমানোর জন্য তিনি **শারিয়া** (Sharia) নিয়মকে ও কোরআন সম্মত নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আপাতভাবে তা খারাপ ছিল না, কারণ সম্ভবত অন্য ধর্মের মানুষকে তা স্পর্শ করেনি। কিন্তু তার বাড়াবাড়িটুকু শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছিল বিপজ্জনক। এতদিন ধরে মোগল সাম্রাজ্যে ইরানীয় **নৌরোজ** বা নববর্ষের যে অনুষ্ঠান প্রথা চালু ছিল তা তুলে দেওয়া হল। মুদ্রার মধ্যে **কালিমা** (Kalima) বা ধর্মবিশ্বাসের যে বাণী লিপিবদ্ধ থাকত তাও তুলে দেওয়া হল পাছে বিধর্মীদের হাতে পড়ে তার ধর্মীয় পবিত্রতা নষ্ট হয়। এই সমস্ত সংস্কার আকবর প্রবর্তিত ঔদার্যের ও সহিষ্ণুতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। হয়ত তিনি সাম্রাজ্যের রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে প্রশমিত করে তাঁর রাজ্যশাসনের সূচনাপর্বকে স্থিতিশীল করতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতায় থাকতে হলে ক্ষমতার আশেপাশে উত্তেজনাপ্রবণ জনগোষ্ঠীগুলিকে ধর্ম, কূটনীতি, উপহার ও উপঢৌকন প্রদান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রশমিত রাখতে হয়। ঔরংজেব চিরায়ত এই রাজ্যশাসন নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা এক সর্বধর্মীয় দৃষ্টিকোণ গ্রহণ

করেছিলেন। ঔরংজেব গ্রহণ করেছিলেন একধর্মীয় দৃষ্টিকোণ। ফলে শেষ পর্যন্ত ঔরংজেবের সমস্ত সংস্কার যতখানি হয়েছিল সাম্রাজ্যের পক্ষে সংহতি সহায়ক, তার থেকে অনেক বেশি হয়েছিল সাম্রাজ্যের সংহারের কারণ।

ঔরংজেবের সংস্কার কার্যগুলি মূলত চালু হয়েছিল তাঁর রাজত্বকালের প্রথম পঁচিশ বছরে—তাঁর উত্তরভারতে অবস্থানকালে। এই সময়ে তিনি মক্কা আর মদিনার পবিত্র মানুষদের উপহার পাঠিয়েছিলেন। রিজভি বলেছেন যে, তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের কষ্ট কমানো এবং পণ্যের ওপর আরোপিত করের বোঝা হ্রাস করা। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে বণিকদের দ্বারা আমদানি করা সমস্ত পণ্যের ওপর ধার্য কর কি হবে তা স্থির করে দিয়েছিলেন। মুসলমান বণিকরা যা আনবেন তার মোট মূল্যের ২১/২ শতাংশ হবে কর। হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হবে পাঁচ শতাংশ। দু বছর পরে মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্ত কর তুলে দেওয়া হল। এই ধরনের সংস্কারকার্যের মধ্যে বৈষম্য ছিল। এই বৈষম্য আকবর প্রতিষ্ঠিত সহযোগিতার নীতিকে ধূলিসাৎৎ করে দিয়েছিল।

২৬.৪ উত্তরভারত : প্রথম দশ বছর : সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের গৌরব

এইরকম ধর্মান্ধ ও পক্ষপাতদুষ্ট সংস্কারকার্য দিয়ে যে রাজত্বের সূচনা সে রাজত্বে শান্তি থাকে না। ঔরংজেবের রাজত্বে তাই শান্তি ছিল না। শুধু রাজত্বের প্রথম দশ বছর তিনি যতটুকু সামরিক ও কূটনৈতিক সাফল্য পেয়েছিলেন সেটুকুই ছিল তাঁর গৌরব। তার বাইরে পুরোটাই ছিল বিরোধের মধ্যে সমঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আয়োজন আর নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে শান্তিহীন সংগ্রাম। এইজন্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, ঔরংজেবের জীবন এক দীর্ঘ ট্র্যাজেডি, অদৃশ্য ও অমোঘ ভাগ্যের বিরুদ্ধে একজন মানুষের যুদ্ধ যার উপাখ্যান শেষ পর্যন্ত এক শ্রেষ্ঠ পুরুষকারের যুগশক্তির দ্বারা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস মাত্র।

ঔরংজেব সিংহাসনে বসেছিলেন **'আলমগীর'** উপাধি নিয়ে—এর অর্থ হল **বিশ্ববিজেতা**' (World-seizer)। এই উপাধি নিয়ে তাঁর পঞ্চাশ বছর রাজত্বের প্রথম তিরিশ বছর তিনি দুটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন—এক, একটি সুসংবদ্ধ ইসলামীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং দুই, সাম্রাজ্যের সীমানাকে এক আক্রমণশীল সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে চলমান ও প্রগতিশীল রাখা। ছোটখাটো বিদ্রোহকে তিনি শুরুতেই দমন করেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে বিকানীরের রাজা রাও করণ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এর দুবছর পরে তাঁর আদেশে বিহারের শাসনকর্তা ছোটনাগপুরের পাহাড় ও জঙ্গলঘেরা পালামৌ নামক স্থানটি দখল করেন। অন্যদিকে বিদ্রোহী চম্পৎ বুন্দেলাকে সম্রাটের নির্দেশে তাড়া করেন রাজ-অনুগত আরেক বুন্দেলী—শুভ করণ। বিদ্রোহী চম্পৎ শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়ে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আত্মহত্যা করেন। সেই একই বছরের শেষদিকে মীরজুমলা কুচবিহার দখল করেন এবং একের পর এক দুর্গ দখল করতে করতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অগ্রসর হন এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক ঘাঁটি (military outposts) স্থাপন করেন। মীরজুমলার এই অভিযান প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুটি কারণে—এক, বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য তখন উত্তর-পূর্বেও বাড়ছিল আর তার সঙ্গে বাড়ছিল সেই অঞ্চলের মুসলমান বসতি-সীমান্ত ("settler frontier")। দুই, কুচবিহারের রাজা প্রেম নারায়ণ বিদ্রোহ করেছিলেন এবং অহম রাজা (Ahom king) জয়ধ্বজ সিংহ কামরূপ অধিকারের চেষ্টা করেছিলেন। এদের দমন করার জন্য ও বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চল দখলের জন্য মীরজুমলা রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। রিচার্ড বলেছেন যে, বাংলার অর্থনীতির কেন্দ্র তখন পূর্ব দিকে সরে গিয়েছিল এবং জনপ্রবাহের ধারাও ছিল পূর্বগামী।

মীরজুমলা অহম রাজধানী গড়গাঁও (বর্তমান গুয়াহাটি) পর্যন্ত অগ্রসর হলেও এই রাজ্যজয় স্থায়ী হয়নি। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে গড়গাঁও মোগলদের হস্তচ্যুত হয়। এদিকে দক্ষিণে জলপথে আরাকানের মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুরা হিন্দু-মুসলমানদের লুঠ করে তাদের ক্রীতদাস করে বিক্রি করে দিত। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা, সম্রাটের মাতুল, শায়েস্ত খাঁ একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈরি করে জলদস্যুদের দমন করেন। এরপর আরাকানের কাছ

থেকে চট্টগ্রাম মোগলরা জয় করে নেয়। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের মোগল শাসকের চাপে পড়ে লাডাকের বৌদ্ধ শাসক সম্রাটের বশ্যতা (suzeranity) স্বীকার করে নেন। কুমায়ুনের রাজা বাহাদুর চাঁদকেও ঔরংজেব বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন (১৬৭৩)।

২৬.৪.১ রাজ্যশাসনের দীনতা ও সম্প্রদায়গত উত্তেজনার শুরু : মোগল বিপন্নতার আরম্ভ : জাঠ ও সৎনামি বিদ্রোহ

ঔরংজেবের রাজত্বকালের প্রথম দশ বছরের সাফল্য তাঁর রাজত্বের সার্থকতার মাপকাঠি নয়। সাম্রাজ্যের জনদুর্দশার ছবিটি আরম্ভ হয়েছিল প্রায় এই সাফল্যের সাথে সাথে। ইসলাম ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাঁকে ধর্মান্ধ করেছিল ঠিকই কিন্তু ধর্মান্ধ মানুষ রক্ষণশীল হলে অন্যের বেশি ক্ষতি হয় না যদি তিনি আগ্রাসী না হন। ঔরংজেব আগ্রাসী হয়েছিলেন হিন্দু ও ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর। এইখানেই তিনি ভুল করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক—যেমন যদুনাথ সরকার মনে করেন যে, ঔরংজেব একরকম সুপরিকল্পিতভাবেই হিন্দু-বিদ্বেষের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। আজকালকার ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ঔরংজেব ইসলামীয় হানাফি (Hanafi) মতবাদের বশবর্তী হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা সচেতন ইসলামীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরি করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রকর্তৃক ঘোষিত এই ধর্মীয় চাপ শেষপর্যন্ত আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের মধ্যে দিয়ে জনগণের ওপর নামতে শুরু করল। যেমন মথুরার ফৌজদার আব্দুন্নবি-র অত্যাচারে মথুরা আর আগ্রার চারপাশের জাঠরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। গোকুল নাম এক জমিদারের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কৃষকরা আব্দুন্নবিকে হত্যা করে। তারপর দুজন ফৌজদারও এই বিদ্রোহকে দমন করতে পারেনি। অবশেষে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট স্বয়ং সসৈন্যে বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হলেন। বিদ্রোহীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। গোকুল ও সাত হাজার কৃষককে বন্দী করা হয়। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় গোকুলকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয়। তার পুত্র ও কন্যাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

জাঠ-বিদ্রোহের দুবছর পরে—১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে সৎনামিরা বিদ্রোহ করে। দিল্লির থেকে পঁচাত্তর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নারনোল শহরের চারপাশে চার-পাঁচ হাজার সৎনামি পরিবার বসবাস করত। নারনোল থেকে মেয়াটের মধ্যেই ছিল তাদের বসতি। তারা ছিল কৃষিজীবী। অল্পস্বল্প শস্যের ব্যবসাও তারা করত। তারা ছিল কবীরের ভক্ত, একেশ্বরবাদী। সমস্ত বাহুল্য ও বিলাসকে বর্জন করে সাদামাটা কঠোর জীবনযাপন করত। তাদের নীতি ছিল ভিক্ষা করবে না, কারও দান গ্রহণ করবে না, জমিদার থেকে রাজা পর্যন্ত কারও সঙ্গে কোন সংযোগ রাখবে না এবং সবাই পরিশ্রম করে শুধুমাত্র উপার্জিত অর্থের দ্বারা জীবনযাপন করবে। ইরফান হাবিব লিখেছেন যে, শিখজাতিও এই কঠোর জীবনচর্যা ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করত বলে সৎনামি ও শিখদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এই সৎনামিদের সঙ্গে মোগলদের বিরোধ বাধল যখন একটি মোগল পদাতিক সৈন্য সামান্য কথা কাটাকাটির পর হাতের গদা দিয়ে সেই কৃষকের মাথা চুরমার করে দিল। অনেকদিনের অত্যাচারে—হয়ত ধর্মীয় অত্যাচারে—সৎনামিরা বিক্ষুব্ধ ছিল। হয়ত ধর্মীয় অত্যাচারই ছিল বিদ্রোহের কারণ। আজকাল অবশ্য ঐতিহাসিকরা সরাসরিভাবে ধর্মের কারণে সাম্প্রদায়িক উত্থান না বলে একে কৃষক বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেন। রিজভি লিখলেন যে, অকারণে এই উত্থানের ওপর অবাস্তব ধর্মীয় রং ("unrealistic communal colour") চড়ানো হয়। শত শত সৎনামি কৃষক যখন তাদেরই একজনকে হত্যা করার অপরাধে গর্জে উঠল—সশস্ত্র ও শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াল তখন এই **“গাঁওয়ার”**-দের গণজাগরণ দেখে তখনকার ঐতিহাসিক সাকি মুস্তাদ খাঁ চমকে উঠেছিলেন। আর এযুগের ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বিহ্বল হয়েছিলেন মেহনতী মানুষের উত্থান দেখে। এ দৃশ্য, তিনি বললেন, ভূমিতল মানুষের দৃশ্য (The sight of the plebian mass)—মোগলশক্তিকে একহাত নেওয়ার জন্য কোটি

গাঁওয়ারের জেগে ওঠার দৃশ্য (“ ‘an army of a crore of villagers [**ganwars**]’—taking on the armed might of the Mughal empire.....”)। অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল কিন্তু সৎনামিদের বীরত্ব তাদের শত্রুদেরও মুগ্ধ করেছিল।

২৬.৪.২ মোগল নিপীড়ন ও শিখজাতির আত্মত্যাগ

শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রিঃ)। হিন্দুধর্ম,ইসলাম ধর্ম ইত্যাদির উচ্চতম আদর্শ ও সহতম নীতিগুলি নিয়ে শিখধর্মের উদ্ভব হয়। তাই গুরুদাস বলেছিলেন যে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি বাদ দিলে যে স্বচ্ছতা থাকে তা নিয়ে শিখধর্মের জন্ম। বাবা নানক থেকে গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত দশজন শিখগুরু ছিলেন। তাঁদের কার্যকাল ১৪৬৯ থেকে ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—প্রায় বাবর থেকে ঔরংজেবের সময়কালের সমান। দ্বিতীয় শিখগুরু অঙ্গাদ (১৫৩৯-৫২) ছিলেন সম্রাট হুমায়ুনের সমসাময়িক (১৫৩০-৫৬)। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজ খুসরুকে সাহায্য করার ফলে জাহাঙ্গীরের সময়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর পুত্র হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫) সমস্ত শিখ সম্প্রদায়কে সৈনিকদের মত সুসংবদ্ধ করেন। “আমার দুটি তরবারি”, তিনি বলেছিলেন, “একটি ধর্মের এবং অন্যটি ঐহিক কর্তৃত্বের”। মাথা তুলে দাঁড়ানোর এই চেষ্টার জন্য বারো বছর তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী থাকতে হয়।

শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথমদিকে একটি রাজকীয় শিকার বাহিনীর সঙ্গে শিখদের বিরোধ ঘটলে তাদের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করা হয়। অমৃতসরের কাছে সংগ্রাণা (Sangrana) নামক স্থানে সম্রাটের অভিযান শিখদের কাছে পরাজিত হয়। এর পরেই শিখদের ওপর নেমে আসে বিপুল ও নির্মম সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন। হরগোবিন্দ পলায়ন করেন। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের পাহাড়ি অঞ্চলে কিরাতপুরে (Kiratpur) পরলোক গমন করেন।

শিখদের সপ্তম গুরু ছিলেন হররায় (হরি রায়, ১৬৪৫-১৬৬১)। [গুরু গোবিন্দ গুরু-পদে তাঁর দুই জীবন্ত পুত্রের দাবিকে অস্বীকার করে তাঁর অকালমৃত জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্তান হররায়কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন] এই গুরু হররায়ের কাছে মাঝে মাঝে যেতেন দারাশিকো। হয়ত ঔরংজেব যখন সিংহাসনের জন্য লড়াই করছিলেন তখন হররায় তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ঔরংজেব সিংহাসনে আরোহণ করে হররায়কে এই কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বললেন। তিনি হররায়কে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরায়কে (Ram Rai) সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। ঔরংজেব জানতেন যে, পঞ্চম গুরুর সময়েই ঢাকা থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা শিখদের দানে একটা অর্থভাণ্ডার অমৃতসরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, গুরু হরগোবিন্দের সময়েই উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক শিখঘাঁটি তৈরি হয়েছিল যা সহজে ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। তাই ঔরংজেবের লক্ষ্য ছিল দুটি—এক, শিখগুরুর পদে উত্তরাধিকারের সমস্ত প্রশ্নটিকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করবেন, এবং দুই, শিখদের সম্ভাব্য গুরুকে মোগল রাজসভায় এনে নতুন সাম্রাজ্যবাদী মোগল রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিক্ষাদান করবেন। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি শিখগুরুকে প্রলুব্ধ করার জন্য শিবালিক পার্বত্য অঞ্চলে কিছু জমিও দান করেন। সম্রাটের এই চাতুরি বুঝতে পেরে হয়রায় ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময়ে রাম রায়ের গুরুপদের দাবি খারিজ করে তাঁর অপর পুত্র হরকিষেণকে পরবর্তী গুরু বলে মনোনীত করলেন।

এইভাবে গুরুপদের দুই দাবিদার দেখা দিল—বিদায়ী গুরু কর্তৃক মনোনীত হরকিষেণ এবং সম্রাট কর্তৃক সমর্থিত রামরায়। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে অকস্মাৎ হরকিষেণ পরলোক গমন করেন। তখন শিখরা দ্রুত গুরু হররায়ের ভ্রাতা ও গুরু হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র তেগবাহাদুরকে গুরু বলে ঘোষণা করেন। সম্রাটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াইতে যাওয়াটা গুরু তেগবাহাদুর যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। তিনি বাংলা, আসাম ও উত্তরভারতে ধর্মপ্রচারে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি

ফিরে আসার পর তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ আনা হয়। ঔরংজেব শিখদের গুরুদ্বার ও হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। আগ্রায় গুরুকে বন্দী করে দিল্লিতে চালান করে দেওয়া হয়। সেখানে ধর্মদ্রোহিতার (blasphemy) অপরাধে তাঁর বিচার হয়। ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁর শিরোশ্ছেদ করা হয়। যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়। সে আদেশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তখন পাঁচদিন একটানা অত্যাচারের পর তাঁকে হত্যা করা হয়। এর ফলে এক মুহূর্তে উত্তরভারতের লক্ষ লক্ষ জাঠ ও ক্ষত্রিয় শিখ মোগলদের শত্রুরূপে কৃপাণ হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধর্মদ্রোহীর ভাগ্য কি হয় তা দেখানোর জন্য নিথর গুরুর দেহটি দিল্লির রাজপথে প্রদর্শন করা হয়। গুরু নাকি মরবার সময়ে বলেছিলেন, 'আমি মাথা দিয়েছি, কিন্তু সম্মান বা সার্বভৌমত্ব দান করিনি।' কানিংহাম বলেছেন যে, মরবার আগে তেগবাহাদুর তাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তাঁর হাতে হরগোবিন্দের অসি প্রদান করে যান। পিতা ও গুরুকে 'শহিদ' হতে দেখে গুরু গোবিন্দের মনে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে এবং তিনি সমস্ত হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করে মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে লড়ার অঙ্গীকার করেন। গল্পে আছে যে, সম্রাট শিখগুরুকে হত্যা করার আগে বলেছিলেন যে, গুরু নাকি সম্রাটের অন্তঃপুরিকাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিলেন। গুরু তখন হেসে বলেছিলেন : "সম্রাট ঔরংজেব! আমি যখন বন্দীশালায় সর্বোচ্চ তলে দাঁড়িয়েছিলাম তখন আমার দৃষ্টি আপনার অন্তঃপুরিকাদের উপর পড়েনি, পড়েছিল দূরে যেখানে সমুদ্রের পরপার থেকে ইউরোপীয়রা আসছে, যারা এসে আপনার পর্দা ছিন্ন করে সাম্রাজ্য ধ্বংস করবে।"

শিখদের আন্দোলন কি কৃষক আন্দোলন? এই প্রশ্ন নিয়ে আজকাল আলোচনা হচ্ছে। ইরফান হাবিব সুন্দর করে এই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শিখগুরুরা এসেছেন পাঞ্জাবের ক্ষত্রিয় জাতি [caste অর্থে জাতি] থেকে যারা সেই সময়ে ছিল মূলত বণিক শ্রেণীর মানুষ। তাদের অনুচরেরা ছিল জাঠ, যারা ছিল কৃষক—বৈশ্যদের মধ্যে সবথেকে নিম্নসোপানের মানুষ। সপ্তদশ শতাব্দীর শিখদের একটি বর্ণনায় বলা আছে যে জাঠরা হল গ্রামের মানুষ—একেবারে গেঁয়ো (rustic)। শিখগুরুরা ক্ষত্রিয়দের এই জাঠদের অধীনস্থ করতে সাহায্য করেছিল। এইভাবে শিখদের মধ্যে কৃষকদের 'উত্থান হয়। কিন্তু শিখগুরুদের সঙ্গে মোগলদের যে বিবাদ তা হল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। গুরু হরগোবিন্দ (মৃত্যু ১৬৪৫ খ্রিঃ) প্রথম গুরু যাঁর সময়ে অস্ত্রধারী অনুচর রাখার কাজ শুরু হয়। শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের (১৬৭৬-১৭০৮) সময়ে শিখদের মোগল-বিরোধী সংগ্রাম সবচেয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়। অথচ গুরু গোবিন্দ সিংহ ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগপত্র পেশ করেন সেখানে কৃষকদের ওপর অত্যাচারের কোন কথা নেই। অতএব, ইরফান হাবিব লিখেলেন, নেতৃত্বের মধ্যে কৃষক চরিত্র থাকলেও কৃষকমুক্তি শিখ নেতাদের সচেতন বা ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল না।

২৬.৪.৩ আফগানদের সঙ্গে বিরোধ

আফগানদের মধ্যে অনেক উপজাতি ছিল, যেমন ইউসুফজাই, আফ্রিদি, খটক ইত্যাদি, যাদের মোগলরা কোনদিনও সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। ঔরংজেবের রাজত্বকালে এই উপজাতিগুলি একের পর এক মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। দীর্ঘকাল ধরে এইসব উপজাতি নেতাদের অর্থ আর উপঢৌকন দিয়ে বশীভূত রাখা হত। কখনো কখনো এদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে হত। ঔরংজেবের রাজত্বকালে এদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু প্রভৃতি অঞ্চলে খটক উপজাতির মধ্যে বেড়ে ওঠা অসন্তোষকে মোগলরা বুঝতে পারেনি। তাই সৈন্য চালিয়েও তাদের উত্থানকে দমন করতে সম্রাটের অনেকদিন সময় লেগেছিল। তাদের নেতা ছিল খুশহাল খান (Khushhal Khan)। তিনি ছিলেন একজন **মনসবদার**। ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে তার উপজাতির মানুষদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করার জন্য তাঁকে বন্দী করা হয়। ১৬৬৬

খ্রিস্টাব্দে খটকদের চিরশত্রু ইউসুফজাইদের বিরুদ্ধে যখন মোগলবাহিনী প্রেরিত হল তখন তাঁকেও তার সাথে প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে আফ্রিদিদের উত্থান হলে তিনি মোগলদের ত্যাগ করে আফ্রিদিদের সঙ্গে হাত মেলান। খুশহাল খান পুস্তু ভাষায় কবিতা লিখে আফগানদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। পরে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন কোন মোগল নেতা ও সামরিক প্রধান আফগানদের দমন করতে পারল না তখন স্বয়ং ঔরংজেব ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে সসৈন্যে রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ারের মাঝখানে হাসান আব্দাল নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। এবার তিনি বাহুবলের বদলে কুটনীতি বেশি প্রয়োগ করতে লাগলেন। এই কূটনীতি ছিল এক উপজাতিকে অন্য উপজাতির বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার নীতি। এই নীতিকে তিনি বলতেন, "দুই হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে তাদের ভেঙ্গে ফেলা" ['breaking two bones by knowing them together']। এইভাবে দুর্দান্ত আফগানদের নিরস্ত করার পর তিনি কাবুলের মোগল শাসনকর্তা আমীর খানের ওপর দায়িত্ব দিয়ে চলে আসেন। ১৬৮৭ থেকে ১৬৯৮ পর্যন্ত আমীর খাঁ প্রবল বুদ্ধি ও কূটনীতির দ্বারা আফগান উপজাতিগুলিকে প্রশমিত করে রাখেন। এতে তাঁকে সাহায্য করেছিল সাহিবজী নামে তাঁর অতিশয় বুদ্ধিমতী স্ত্রী।

যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, আফগান যুদ্ধ ঔরংজেবের রাজকোষকে শুষে নিয়েছিল। রাজনৈতিকভাবে তার ফল হয়েছিল বিপজ্জনক। এর ফলে আসন্ন রাজপুত যুদ্ধে আফগানদের ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল যদিও আফগানরাই ছিল সেই শ্রেণীর সৈনিক যারা রাজপুতানার দুর্গম ও ঊষর অঞ্চলে যুদ্ধ করার জন্য ছিল যোগ্য। আফগানদের সঙ্গে লড়বার জন্য ঔরংজেবকে দাক্ষিণাত্য থেকে সৈন্যদের সরিয়ে আনতে হয়েছিল। ফলে সেখানে সামরিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে সেখানে শিবাজী রাজ্যবিস্তার করেন।

২৬.৪.৪ রাজপুত বিদ্রোহ : উত্তরভারতে মোগলদের সবচেয়ে বড় সঙ্কট

ঔরংজেব যে নতুন জঙ্গী রক্ষণশীলতা ('new militant orthodoxy'—Richards) তৈরি করেছিলেন তার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয়েছিল তাঁর রাজপুতনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে। রাজপুতরা ছিল অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়, অন্যদিকে তারাই ছিল সনাতন হিন্দুধর্মের স্তম্ভ। আবার রাজপুতরা ছিল মোগল সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, উচ্চ **মনসবের** অধিকারী মোগল সম্ভ্রান্তদের অনস্বীকার্য অংশ। এদের ওপর বলপ্রয়োগ করতে গিয়েই ঔরংজেব তাঁর উত্তরভারতে অবস্থানকালের সবচেয়ে বড় সঙ্কট তৈরি করেছিলেন যাকে রিজভি বলেছেন 'Aurangzeb's most desperate crisis'।

আপাতভাবে মোগলদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোন কারণ রাজপুতদের ছিল না। আতহার আলি দেখিয়েছেন যে মোগল সম্ভ্রান্তদের মধ্যে তখনও রাজপুতরা প্রভাবশালী ছিলেন। সাম্রাজ্যের অন্যতম সবচেয়ে বড় **মনসবদার** ছিলেন মির্জা রাজা জয়সিংহ [কচ্ছওয়া পরিবারের]। তাঁর পদমর্যাদা ছিল ৭০০০ জাঠ ও ৭০০০ **সওয়ার।** উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের সময়ে তিনিই ছিলেন ঔরংজেবের সবচেয়ে প্রধান সমর্থক। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে জয়সিংহ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা হন যে পদ শুধুমাত্র যুবরাজ বা সম্রাটের পরিবারের কেউ পেতে পারত। তাছাড়া ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের পর রাজকার্যে নিযুক্ত রাজপুতদের **জিজিয়া** (Jiziya) দেওয়া থেকে মুক্ত করা হয়েছিল—যদিও তাদের প্রজারা মুক্ত ছিল না।

ঔরংজেবের রাজত্বের বিংশতিতম বছরে—১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে—রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়ওয়ার রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা যশোবন্দ সিংহ সুদূর আফগানিস্তানের একটি অখ্যাত উপজাতীয় অঞ্চল জামরুদের মোগল থানাদর রূপে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। কিন্তু তাঁর দুই রানী সেই সময়ে সন্তানসম্ভবা ছিলেন, ফলে তাঁদের সহমরণে যেতে হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই দুই রানীরই দুটি পুত্রসন্তান

হয়—একটি জন্মের পর মারা যায়, আরেকটি—যেদি যশোবন্ত সিংহের শিশোদিয়া বংশজাত মহিষীর গর্ভে জন্মেছিল—সেটি বেঁচে যায়। এই শিশুর নাম অজিত সিংহ।

অজিত সিংহের জন্ম হয় লাহোরে। রাজপুতদের সিংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রচলিত প্রথানুযায়ী তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির কথা। আবার সর্বোচ্চ শক্তি (paramount power) রূপে ঔরংজেব এই দুই সন্তানের যে কোন একটিকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারতেন। অথবা রাজপরিবারের কোন বর্ষীয়ান পুরুষকে রাজপুত কৌমের (clan) প্রধান বলে মেনে নিয়ে তাকে সিংহাসন দান করতে পারতেন। প্রথম পর্বে ঔরঙ্গজেব অজিত সিংহকে রাজপুতদের রাজা বলে মানলেন না। যোধপুরের সিংহাসন নিয়ে গোলযোগ শুরু হল এইখানে।

প্রথমত, ঔরংজেব প্রয়াত মহারাজার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত (escheated) করে নিলেন এবং সমস্ত মাড়ওয়ারকে ‘খালিসা’ (crownland) বলে ঘোষণা করলেন। এর অর্থ মাড়ওয়ারের সাম্রাজ্যভুক্তি (annexation) নয়। এর অর্থ হল মাড়ওয়ারকে ভবিষ্যতে **জাগির** রূপে বণ্টন করার অধিকারকে হাতের মধ্যে নিয়ে রাখা। দ্বিতীয়ত, ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আজমীরে এলেন—তাঁর আপাত উদ্দেশ্য খাজা মৈনুদ্দিনের সমাধিতে এসে তীর্থ করা, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজপুতদের ভীতি প্রদর্শন করা। ঔরংজেবের তৃতীয় পদক্ষেপটি আরও মারাত্মক। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লিতে ফিরে তিনি হিন্দুদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জিজিয়া কর স্থাপন করলেন, যোধপুর শহরটিকে সরাসরি মোগল প্রশাসনের এক্তিয়ারভুক্ত করলেন, সেখানকার সমস্ত মন্দির ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং প্রয়াত মহারাজা যশোবন্তের অগ্রজ ভ্রাতার পৌত্র, নাগোরের প্রধান ইন্দ্রসিংহকে যোধপুরের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। গাড়ি বোঝাই করা হিন্দুদের মন্দির ও বিগ্রহের ধ্বংসাবশেষ দিল্লিতে আনা হল এবং সেখানে পুণ্যলোভী মুসলমানরা তা যথেচ্ছভাবে পদদলিত করে পুণ্যলাভ করল। এইভাবে ঔরংজেব রাজপুত ও হিন্দুমননের ওপর ছুরিকাঘাত করেছিলেন।

এখন ইন্দ্রসিংহকে রাজা বলে ঘোষণা করার দুটো দিক আছে—একদিকে তিনি যোধপুরের আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর রাজ্যলাভের অধিকারকে খারিজ করে আইনকে লঙ্ঘন করেছিলেন। অন্যদিকে যোধপুরের প্রকৃত উত্তরাধিকারকে তিনি তুলে ধরে আইনসঙ্গত কাজ করেছিলেন। ব্যাপারটি এইরকম। শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে মাড়ওয়ারের রাজা এবং পদস্থ মোগল আমীর গজসিংহ পরলোক গমন করেন। আগ্রায় মোগল দরবারে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন শাহজাহান প্রয়াত গজ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসনের দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র যশোবন্ত সিংহের কপালে অভিষেকসূচক লাল টিকা পরিয়েছেন। এর চল্লিশ বছর পর যখন যশোবন্ত সিংহ মারা যান তখন ঔরংজেব তাঁর উপেক্ষিত ভাইয়ের পৌত্রকে রাজা বলে মেনে নিলেন।

এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে মাড়ওয়ারের রাজপুতরা (রাজপুতানার পশ্চিমাংশের জনগণ) বিদ্রোহ করল (একে Richands 'a full-scale revolt' বলে বর্ণনা করেছেন।) যশোবন্ত সিংহের অনুগত কর্মচারী ও সেনাপতি দুর্গাদাস রাঠোর মাড়ওয়ারের সমস্ত রাঠোরদের ঐক্যবদ্ধ করে সম্রাটের কাছে আবেদন করলেন যে তিনি যেন অজিত সিংহকে স্বীকার করে নেন। দুর্গাদাস ছিলেন একজন কঠোর পুরুষ। তাঁকে ঐতিহাসিক টড (Tod) রাঠোরদের ইউলিসিস (ulysses) বলে বর্ণনা করেছেন। এহেন দুর্গাদাসের আবেদনকে ঔরংজেব অস্বীকার করলেন। ঔরংজেব সবসময়ে বাহুবল ও কূটনীতিকে পাশাপাশি ব্যবহার করতেন। তিনি দুর্গাদাসকে জানিয়ে দিলেন যে **ওয়াতন** (Watan) [কোন রাজার বা মানুষের নিজের দেশ, জন্মস্থান, পূর্বপুরুষের তালুক-মুলুক] কোন রমণীর বা কোন ভৃত্যের হাতে দেওয়া যায় না। আইনের দিক থেকে এ কথা অর্থবহ হলেও রাজনৈতিকভাবে এ যুক্তি ছিল বিপজ্জনক কারণ তা রাজপুতদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছিল। সম্রাট তাঁর অভিলাষও রাজপুতদের জানিয়ে দিলেন—অজিত সিংহ মোগল হারেমে লালিত হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হলে সম্রাট তার দাবি পর্যালোচনা করে দেখবেন। তবে তার একটা শর্ত ছিল—অজিত সিংহকে মোগল হারেমে মুসলমানরূপে বড় হতে হবে।

যখন এই আলাপ-আলোচনা চলছি তখনই অজিত সিংহের অনুজ দ্বিতীয় শিশুটি মারা যায়। এইবার দুই পক্ষেরই তৎপরতা শুরু হয়। দুর্গাদাস যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নীদ্বয় ও শিশু অজিত সিংহকে সম্রাটের হাতে সঁপে দিতে রাজী হলেন না। ঔরংজেব তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রেরণ করে শাহজাহানাবাদের রাঠোর প্রাসাদে যেখানে যশোবন্তের রানী ও শিশু অবস্থান করছিলেন তা অবরোধ করেন। ঔরংজেবের ধারণা ছিল রাজপুতরা সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল ভুল। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঔরংজেব যখন খান-ই-জাহান বাহাদুরের নেতৃত্বে মোগলবাহিনী পাঠিয়ে রাজাহীন অনাথ মাড়ওয়ারকে লুঠ করে সমস্ত মন্দির ভেঙ্গে, মহারাজার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে যোধপুর শহরে ও তার চারপাশের জনপদগুলিতে **ফৌজদার, কিল্লাদার, কোতোয়াল** এবং আমিন নিয়োগ করেছিলেন তখনই মাড়ওয়ারের রাঠোর রাজপুতরা সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিল। এইবার তারা দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হল।

অবরুদ্ধ রাঠোর প্রাসাদে রাজপুতরা দুই দাসীকে রানী সাজিয়ে তাদের কোলে শিশু রাজপুতদ্বয়ের অবিকল নকল দুই শিশুকে বসিয়ে অজিত সিংহ ও যশোবন্তের রানীদের নিয়ে পলায়ন করে। এই রাজকীয় অন্তর্ধানের সম্পূর্ণ ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দুর্গাদাস রাঠোর। এই অন্তর্ধানের আগে যশোবন্তের রানী অজিত সিংহের মা—ঔরংজেবকে এই প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে অজিত সিংহকে রাজা বলে সম্রাট যদি মেনে নেন তবে সব মন্দির তিনি নিজেই ভেঙ্গে ফেলবেন। ঔরংজেব কাউকে বিশ্বাস করতেন না। এই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

দুর্গাদাস অজিত সিংহকে নিয়ে যোধপুরে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আবু পাহাড়ের নির্জনতায় রাঠোরদের নিজস্ব পরিবেশে তাকে মানুষ করা হয়। ঔরংজেব এইবার তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। এক, তিনি পিছনে পড়ে থাকা বিপুল রাঠোর রাজপুতদের হত্যা করলেন। দুই, তিনি বন্দী হওয়া দাসীপুত্রকে আসল অজিত সিংহ বলে ঘোষণা করেন এবং প্রকৃত অজিত সিংহকে অবাঞ্ছিত নকল বলে অস্বীকার করেন। তিন, তিনি স্বয়ং আজমীরে যাত্রা করেন। এইখানে থেকে দ্বিতীয়বার মাড়ওয়ার আক্রমণের জন্য তিনি তাঁর চতুর্থ পুত্র যুবরাজকে নির্দেশ দেন। বিপুল মোগলবাহিনী পুষ্কর হ্রদের কাছে রাজসিংহের অধীনে রাজপুতদের সবচেয়ে যোদ্ধৃবাহিনী মৈর্তিয়া (Mairtia) রাঠোরদের হত্যা করে। রাজসিংহ এত প্রাণপণ লড়েছিলেন যে ঐতিহাসিকরা তাঁকে গ্রীক ইতিহাসের থার্মোপাইলি যুদ্ধের নায়ক লিওনিডাস (Leonidas)-এর সঙ্গে তুলনা করেন। এরপর মাড়ওয়ারের প্রত্যেক পরিবার লড়াইয়ের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেক রাঠোর হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সঙ্কল্পবদ্ধ সৈনিক। বলা হয়েছে যে আকাশ থেকে যেমন জল পড়ে মাটিতে সেইরকম ঔরংজেব তাঁর সৈন্যবাহিনী বর্ষণ করেন মাড়ওয়ারে।

মাড়ওয়ারের এই বিপর্যয় আসলে সমস্ত রাজপুতানার বিপর্যয়—এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন মেবারের মহারাণা রাজসিংহ। যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, মাড়ওয়ার জয় হল মেবার আক্রমণের প্রস্তুতিমাত্র। মন্দির ভাঙ্গার দুর্বার স্পৃহা আরাবল্লি পাহাড় আটকাতে পারবে না একথা রাজপুতরা বুঝে গিয়েছিল। তাছাড়া মহারাণার কাছ থেকেও জিজিয়া দাবি করা হয়েছিল। রাজা অজিত সিংহের মা ছিলেন মেবার-দুহিতা। অতএব মেবারের শিশোদিয়ারা মাড়ওয়ারের রাঠোরদের সঙ্গে জোট বাঁধল। যশোবন্ত সিংহের প্রধানা মহিষী, রানী হাদির (Rani Hadi) ডাক মহারাণা রাজসিংহ ফেলতে পারলেন না। রাজপুতরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেও তাদের যথেষ্ট পরিমাণ গোলন্দাজ বাহিনী ছিল না। ফলে মোগলদের মূল সমরবাহিনীকে ('main Mugal battle force') রুখে দেওয়া তাদের সম্ভব হয়নি। মোগলরা অচিরেই মেবারের রাজধানী উদয়পুর অধিকার করে এবং দ্বিতীয়বার যথেষ্ট লুঠতরাজ ও মন্দির ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়। মেবারের মহারাণা ও অবশিষ্ট শিশোদিয়া যোদ্ধারা পাহাড়ে পলায়ন করেন। সেখান থেকে শুরু হয় তাদের গেরিলা যুদ্ধ।

ইতিমধ্যে ঔরংজেব মোগল শিবিরে অজিত সিংহের নকল যাকে দাঁড় করিয়েছিলেন তাকে মহম্মদীরাজ নাম দিয়ে তার চারপাশে রাঠোরদের সমবেত করতে চেয়েছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল বলে বাহুবলে তিনি মাড়ওয়ারকে ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু রাঠোরদের পর্যুদস্ত করতে পারেননি। এইবার বাহুবলে মেবার ধ্বংস করেও শিশোদিয়াদের শায়েস্তা করতে পারলেন না। পাহাড় আর জঙ্গলের অদৃশ্য আস্তানা থেকে বের হয়ে এসে শিশোদিয়া গেরিলাবাহিনী ১০,০০০ শকটে বয়ে নিয়ে যাওয়া রাজস্ব ও মোগল সৈন্যদের জন্য প্রেরিত শস্য লুঠ করে পলায়ন করে। মোগল সেনাপতি যুবরাজ আকবর সম্রাটকে জানালেন—"আমাদের সৈন্যবাহিনী ভয়ে অনড় হয়ে রইল" (Our army is motionless through fear)।

পরাজয়ের এই নিঃসীম স্বীকারোক্তির পর ঔরংজেব তৃতীয়বার মাড়ওয়ার আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। মেবার-মাড়য়ারের জোটকে গুঁড়িয়ে দেওয়া ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যুবরাজ আকবরকে প্রেরণ করা হল মাড়ওয়ারে। মেবার ধ্বংসের দায়িত্ব দেওয়া হল যুবরাজ আজমকে (Azam)। স্থির হল যুবরাজ আজম অগ্রসর হবে চিতোর থেকে, যুবরাজ মুয়াজ্জম যাবেন রাজসমুদ্র থেকে আর যুবরাজ আকবর যাবেন দেওসুরি (Deosuri) থেকে। কিন্তু এই ত্রিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হয়নি। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ঔরংজেব স্বয়ং আজমীরে দ্বিতীয়বার এলেন সমগ্র অভিযানের পরিচালনার জন্য। সেই একই বছর মেবারের মহারাণার স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু হয়। তবুও রাজপুতরা তাদের গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেছিল। ইতিমধ্যে সম্রাটের পুত্র আকবর রাজপুতদের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করে। উত্তরভারতে মোগল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বড় সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়ায়। এইরকম এক জটিল মুহূর্তে মহারাণা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহ—পিতার শৌর্য থেকে বঞ্চিত এক দুর্বল শিশোদিয়া—সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করেন। ফলে মাড়ওয়ারের গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়বার ভার আজমীরের শাসকর্তার ওপর প্রদান করে ঔরংজেব দক্ষিণভারতে প্রস্থিত তাঁর বিদ্রোহী পুত্রকে শায়েস্তা করতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। তাঁর রাজত্বের উত্তরভারত পর্ব শেষ হয়।

যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ যেমন সম্রাটের মনকে অন্যদিকে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য করেছিল সেইরকম রাজপুতদের ওপর থেকে সামরিক চাপকে সরিয়ে নিতেও তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। রাজপুতদের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে বহু সৈন্যকে দক্ষিণে নিয়ে যেতে হয়েছিল কারণ সেখানে বিদ্রোহী যুবরাজের সঙ্গে মারাঠাদের একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এইভাবে মোগল সৈন্য বেশকিছুটা অপসারিত হওয়ার ফলে পরবর্তী এক প্রজন্ম রাঠোর গেরিলারা মোগলদের সঙ্গে লড়াই চালাতে পেরেছিল। পলাতক রাজা অজিত সিংহ যেভাবে এক গোপন আস্তানা থেকে অন্য আস্তানায় আত্মগোপন করে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন তার কাহিনী ভারতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এরপর অজিত সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন এবং তখনও মাড়ওয়ারের সঙ্গে মোগলদের লড়াই চলেছিল। প্রায় কুড়িবছর এভাবে লড়াই করার পর রাঠোরদের সঙ্গে মোগলদের সন্ধি হয়েছিল। আর এই দীর্ঘ সময় ধরে মোগল সাম্রাজ্য ও সৈন্যবাহিনী বীর রাঠোরদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন যে, রাজপুতদের নিজস্ব স্পর্শকাতরতার জায়গাগুলি যদি ঔরংজেব বুঝবার চেষ্টা করতেন তবে হয়ত রাঠোর ও শিশোদিয়াদের সঙ্গে বিরোধ এড়ানো যেত। কিন্তু ঔরংজেব সন্দেহ করতেন যে, দারাশিকোর সঙ্গে যশোবন্ত সিংহের যে দেওয়া-নেওয়া ছিল তা ঔরংজেবের স্বার্থবিরোধী। তিনি এও মনে করতেন—হয়ত বা কিছুটা সন্দেহের বশে যে যশোবন্তের সাহায্য ছাড়া শিবাজী পলায়ন করতে পারত না। কিন্তু সত্য যাই থাক শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অযাচিত প্রতিহিংসাস্পৃহাকে জাগিয়ে তোলা রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হয়নি। একেই তো তিনি আফগান শক্তির সহায়তা হারিয়েছিলেন। এবার হারালেন দুর্ধর্ষ রাজপুতদের সহায়তা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মোগল সাম্রাজ্য, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মোগলবাহিনী। রাজপুতদের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক স্থাপন করার মূলে ছিল ঔরংজেবের জঙ্গী ইসলামীয় ধর্মচেতনার দৃষ্টিকোণ যা তাঁকে আকবরের উদারনীতির থেকে যেমন সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেইরকমভাবে রাজপুত-মোগল বন্ধনকেও শিথিল করে দিয়েছিল।

২৬.৪.৫ যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ

রাজপুতরা মোগলদের সঙ্গো লড়াইয়ের সময়ে এক অভিনব কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তারা প্রথমে যুবরাজ মুয়াজ্জমকে এবং সেখানে ব্যর্থ হয়ে পরে যুবরাজ আকবরকে উস্কানি দিয়ে সম্রাটের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। দুর্গাদাস রাঠোরই ছিলেন এই কৌশলের প্রবক্তা। প্রথমে রাজপুতরা যুবরাজ আকবরকে বোঝাল যে তাঁর পিতা কিভাবে হিন্দুদের অত্যাচার করছেন, কিভাবে তিনি রক্ষণশীল ও আগ্রাসী ইসলাম ধর্ম পালন করে সাম্রাজ্যের কাঠামোকে দুর্বল করে ফেলছেন। যুবরাজকে বোঝান হল যে একমাত্র তিনিই পারেন সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে। দুর্গাদাস রাঠোর যুবরাজকে এই বলে প্ররোচিত করেন যে, যুবরাজ যদি সম্রাট হতে চান তবে রাজপুতরা তাঁকে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে। যুবরাজ আকবরের বয়স ছিল তখন তেইশ। তিনি প্ররোচিত হয়ে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। চারজন মোল্লা ফতোয়া দিলেন যে, ঔরংজেব ইসলামীয় শরিয়ত আইন লঙ্ঘন করেছেন (যদুনাথ সরকারের ভাষায় "Violation of the Islamic canon law")। তাঁরাই আকবরকে সম্রাটের পোশাক পরিয়ে দেন। দুর্গাদাস রাঠোর তিরিশ হাজার রাজপুত সৈন্য নিয়ে তাঁকে সমর্থন করেন।

এই বিদ্রোহের পর ঔরংজেবের প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল যে তড়িঘড়ি করে রাজপুত যুদ্ধকে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মেবারের রাণার সঙ্গো সন্ধি করে মোগলরা জিজিয়া আদায়ের দাবি পরিত্যাগ করল। এর বদলে রাণাকে এক বিরাট রাজ্যাংশ ছেড়ে দিতে হল। অবশ্য মাড়ওয়ারের সঙ্গো যুদ্ধ থামল না। তিরিশ বছর পর ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে ঔরংজেবের পরবর্তী সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে মোগলরা যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহকে মাড়ওয়ারের শাসক বলে মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

আকবর বিদ্রোহ করেছিলেন প্রধানত রাঠোরদের সাহায্য নিয়ে। ১৬৮২ খিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি বিদ্রোহী যুবরাজ আজমীরে পৌঁছালেন। যদিও এক বিশাল মুসলিম রাজপুত সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বে তিনি ছিলেন, তবে তাঁর গতি ছিল মন্থর। ১২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে তাঁর আজমীরে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল দু সপ্তাহ। স্পষ্টতই তাঁর অটল পিতার অভ্রভেদী ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তিনি প্রতি পদে দ্বিধান্বিত ছিলেন। ১৫ জানুয়ারী বিকেলে যুবরাজ মুয়াজ্জম অত্যন্ত পরিশ্রমশীল জবরদস্ত দৌড় করিয়ে পিতার হেফাজতে এনে দিলেন এক বিরাট বাহিনী। নিমেষে সম্রাটের বাহিনী দ্বিগুণ হয়ে গেল। এইবার প্রথমে বাহুবল প্রয়োগ করার আগে সম্রাট মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে নামলেন। এই যুদ্ধপ্রক্রিয়া ছিল ঔরঙ্গজেবের সহজাত প্রবণতার দান। তিনি আকবরকে একটা চিঠি লিখলেন। তাতে আকবর ও তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাজপুতদের পিষে ফেলার নির্মম কিন্তু সফল পরিকল্পনা করার জন্য তিনি পুত্রকে বাহবা দিলেন, তাঁর সেনানায়কত্বের প্রশংসা করলেন। এ সমস্ত কিছুই ছিল আসলে মিথ্যা। এই মিথ্যা পত্রটি সম্রাটের চক্রান্তে যথানিয়মে দুর্গাদাস রাঠোরের হাতে পৌঁছে গেল। রাজপুতরা ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করে তাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মাড়ওয়ারের দিকে পলায়ন করলেন। আকবরের অনেক সেনাপতি, পদস্থ কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনী সম্রাটের কাছে আত্মসমর্পণ করল। যুবরাজ কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে দ্রুত পলায়ন করলেন। ঔরংজেব যুবরাজ মুয়াজ্জমকে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজপুতরা সম্রাটের কৌশলকে বুঝতে পেরে যুবরাজ আকবরকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন। দুর্গদাস রাঠোর যুবরাজকে নিয়ে নানা ঘুরপথে বিপদসঙ্কুল যাত্রার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে নিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত মারাঠা শাসক শম্ভুজির দরবারে উপস্থিত হন। কাফিখান—একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক বলেছেন যে, যুবরাজ মুয়াজ্জম ও খান জাহান বাহাদুর ইচ্ছা করলেই যুবরাজ আকবরকে ধরতে পারত, কিন্তু বিদ্রোহী যুবরাজ সম্বন্ধে তাঁদের সহানুভূতি ছিল বলে তারা তাদের নিরাপদ দূরত্ব থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত যুবরাজ

আকবরের বিদ্রোহ ছিল এক স্থানসীমিত (localised) বিদ্রোহ—উত্তরাধিকারকে জোর করে আত্মসাৎ করার (to usurp) আইন বহির্ভূত ঘটনা। এইবার যুবরাজের দক্ষিণভারতে যাওয়ার ফলে এই স্থানসীমিত ঘটনা সাম্রাজ্যের একটা পূর্ণ সঙ্কটে রূপান্তরিত হল।

অনুশীলনী ১

১। নীচের বক্তব্যগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল? (✓) অথবা (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) ঔরংজেবের রাজত্বকাল প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ছিল।

(খ) ঔরংজেব এক সর্বধর্মীয় দৃষ্টিকোণ তৈরি করেছিলেন।

(গ) ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথম দশ বছর ছিল এক সাফল্যের অধ্যায়।

(ঘ) ঔরংজেব ইসলামীর হানাফি মতবাদের বশবর্তী হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা সচেতন ইসলামীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

(ঙ) জাঠ এবং সৎনামিদের সঙ্গে মোগলদের সম্পর্ক ছিল মধুর।

২। শিখদের আন্দোলন কি কৃষক আন্দোলন ছিল? (দশ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। ঔরংজেবের সময় মোগল-আফগান যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল? (পাঁচ লাইনে উত্তর দিন)

....

....

....

....

....

....

৪। উত্তরভারতে মোগলদের সবচেয়ে বড় সঙ্কট ছিল রাজপুত বিদ্রোহ।

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। দুর্গাদাসকে ঐতিহাসিক টড (Tod) রাঠোরদের ইউলিসিস বলে বর্ণনা করেছেন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

৬। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) মেবারের রাণা রাজসিংহের বীরত্বের জন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁকে গ্রীক ইতিসাহের থার্মোপাইলি যুদ্ধের নায়ক————এর সঙ্গে তুলনা করেন।

(খ) মোগলদের সঙ্গে রাঠোরদের যুদ্ধ চলেছিল প্রায়———বছর।

(গ) রাজপুতদের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক স্থাপন করার মূলে ছিল———জঙ্গী———ধর্মচেতনার দৃষ্টিকোণ।

২৬.৫ দক্ষিণভারত : ঔরংজেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয়ার্ধ (১৬৮১-১৭০৭খ্রিঃ)

১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী পুত্র যুবরাজ আকবরকে তাড়া করে সম্রাট ঔরংজেব দক্ষিণভারতের দিকে অগ্রসর হলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি যখন দক্ষিণভারতের দিকে পা বাড়ালেন তখন অদৃশ্য নিয়তির তাড়নায় প্রকৃত অর্থেই তিনি তাঁর সম্ভাব্য কবরের দিকেই পা বাড়িয়েছিলেন। এর আগে যুবরাজ থাকাকালীন প্রায় দশবছর তিনি দাঅিক্ষণাত্যের শাসক (viceroy) ছিলেন। তখন তিনি দক্ষিণভারতকে জয় করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতিকে কার্যকরী করে এক আসন্ন সাফল্য-প্রাপ্তির মুহূর্তে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাজকে অসম্পূর্ণ রেখে তাঁকে উত্তরভারতে চলে যেতে হয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার জন্য। ১৬৫৭ থেকে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরভারতে থাকার ফলে গোলকোণ্ডা, বিজাপুর ও শিবাজীর অধীনে মারাঠা রাজ্য নিজেদের কিছুটা স্থিতিশীল করতে পেরেছিল। বিশেষ করে শিবাজীর রাজ্যজয় অনেকটাই সম্ভব হয়েছিল ঔরংজেবের দক্ষিণভারতে অনুপস্থিতির ফলে। কারণ সিংহাসনের দাবিদার হিসাবে লড়াই করার জন্য ঔরংজেব দক্ষিণভারতের তার সমস্ত শক্তিশালী সৈন্যকে উত্তরভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন ফলে দক্ষিণে একটা সামরিক শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। শিবাজী সেই সুযোগ নিয়েছিলেন।

২৬.৫.১ ঔরংজেবকে দক্ষিণভারতে যেতে হল কেন?

উত্তরভারতে রাজপুত বিদ্রোহের অনুষঙ্গে দেখা দিয়েছিল যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ। এই আকবর যখন দক্ষিণভারতে গিয়ে মারাঠাদের কোলে ঢলে পড়লেন তখন মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্কট বিরাট আকার ধারণ করল। আজমীরের মরুভূমিতে যখন আকবর তাঁর পিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁর পেছনে ছিল বিশাল রাজপুত এবং রাজপুতদের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমর্থন। ঔরংজেবের সিংহাসনচ্যুতি প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। এবার আকবর গেলেন দক্ষিণে, বসলেন মারাঠা ছায়াছত্রের নীচে আর তার সঙ্গে ছিল দুর্গাদাস রাঠোরের নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ রাজপুত সমর্থন। তিনি ইশারা করলেই মোগল আক্রমণে জর্জরিত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মোগল-বিরোধী মুসলিম রাজ্যগুলি নেচে উঠতে পারত। রিচার্ডস বলেছেন যে, তৈমুরবংশীয় যুবরাজ হিসাবে আকবরের আকর্ষণ ("charisma") কম ছিল না। তাঁকে কেন্দ্র করে একটা প্রতিপক্ষ মোগল শক্তি জেগে উঠতে পারত দক্ষিণে। বিশেষ করে গোলকোণ্ডার শাসনের হাল ধরেছিলেন দুই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি, জাঠ-মারাঠাদের অসি, আর মুসলিম শাসকদের অর্থ যদি ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটাতে পারত তাহলে বিপদ সম্রাটের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারত। উত্তরভারতে রাজপুতরা গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। গেরিলা যুদ্ধে অপটু মন্থর মোগলবাহিনী তাদের শায়েস্তা করতে পারেনি। এদিকে দক্ষিণে মারাঠারা লঘু অশ্ব (light horse) ও দ্রুত সঞ্চারের (quick mobility) রণনীতি নিয়ে অকস্মাৎ এত সাফল্য পেতে শুরু করেছিল যে তাদের গতিবিধি দেখে মোগলবাহিনী স্তম্ভিত হয়ে পড়ছিল। দীর্ঘদিন ধরে মন্দির ভাঙ্গার রাজনীতিতে হিন্দুরা যে আশঙ্কিত হয়েছিল তা সম্রাটের অজানা ছিল না। ঔরংজেবের অনুসৃত রক্ষণশীল নীতির বিরোধিতা করে হিন্দুরা তাঁকে জিজিয়া কর তুলে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল। সম্রাট তা শোনেননি। সম্রাটের এই

রক্ষণশীল আগ্রাসী ইসলামের বিরোধিতা করেই আকবর মাথা তুলেছিলেন। এইবার আশঙ্কা হল যে দক্ষিণের শিয়া মুসলমানরা বিশেষ করে শিয়া মুসলিম রাজ্যগুলিকে এই সদ্য জেগে ওঠা হিন্দুদের মদত দেয় তাহলে সাম্রাজ্যকে আর টিকিয়ে রাখা যাবে না। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বিপুল পরিমাণ আফগান সৈন্য ছিল। সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিমে আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সম্রাট ভারতবর্ষের আফগানদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন। দক্ষিণে একটা নতুন আফগান প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। বিশেষ করে ভারতবর্ষে আফগানদের মোগল-বিরোধিতা রাজনৈতিক সংস্কৃতির আর ঐতিহ্যের মধ্যেই ছিল।

সবচেয়ে বড় কথা দক্ষিণভারতে লড়াই করতে গিয়ে সম্রাট লড়াই করবেন কাদের নিয়ে? রাজপুত ও আফগানদের তিনি দূরে ঠেলে দিয়েছেন, দক্ষিণাত্যের মোগল শাসকদের ওপর তিনি আস্থা হারিয়েছেন এবং সেখানে মোগলবাহিনীর অকর্মণ্যতা তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। বার্ণিয়ে একজন বহিরাগত পর্যটক হয়েও বুঝতে পেরেছিলেন যে, দক্ষিণে মোগলবাহিনীর কতখানি ঘুণ ধরে গেছে। তিনি লিখেছেন যে, মোগলবাহিনী প্রত্যেকটি সামরিক সঞ্চালনকে (operation) আলস্যের সঙ্গে গ্রহণ করত যাতে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, কারণ দীর্ঘস্থায়ী হলেই যুদ্ধ থেকে তাদের ফায়দা আসত আর যোদ্ধা হিসাবে তাদের মর্যাদা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত। অর্থাৎ ব্যাপারটা ছিল এইরকম যে হিন্দুস্তানের অর্থাৎ উত্তরভারতের সৈনিকদের রুজিরোজগার হত দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ থেকে। ফ্রায়ার (Fryer) লিখেছেন যে, উত্তরভারতের **ওমরাহদের [আমীর** শব্দের বহুবচন] আলস্যের জন্য ঔরংজেবের সমস্ত লড়াই ব্যর্থ হত। প্রত্যেক আমীরের একটাই কথা ছিল—“সৈনিকের রুটি আসবে দাক্ষিণাত্য থেকে” ("they term the Deccan the bread of the military men")।

এইরকম পরিস্থিতিতে ঔরংজেব স্থির করলেন যে, তিনি নিজেই দাক্ষিণাত্য যাবেন। হয়ত সম্রাটের উপস্থিতি অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে। যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ দমন, দক্ষিণী সুলতানৎগুলির বিজয় এবং মারাঠাদের ঔদ্ধত্যের বিনাশ ঘটনো—এই তিন লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হলেন।

২৬.৫.২ বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা বিজয়

১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যাত্রা করে নভেম্বর মাসে ঔরংজেব বুরহানপুরে পৌঁছান। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঔরঙ্গাবাদে যান এবং ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে আহমদনগরে সম্রাটের ছাউনি (pitched camp) বিছানো হয়। এরকম এক-একটা অভিযানে ছাউনি বিছিয়ে এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে বসতি গড়ে তোলা হত সম্রাট, তার পরিবার, পরিষদ ও সেনাবাহিনীর জন্য। আহমদনগরের এইরকম এক ছাউনি থেকে ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শোলাপুর (Sholapur) যাত্রা করেন। সেখানে মারাঠাদের বিরুদ্ধে কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অভিযান চালিয়ে এবং যুবরাজ আকবরকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে সম্রাট নষ্ট করলেন দু বছরের সময়, আর তার সাথে অনেক অর্থ ও মানবসম্পদ। এবার তাঁর অর্থ পূরণের দরকার ছিল,—দরকার ছিল নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধারের। তাছাড়া সম্রাট হওয়ার আগে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা বিজয়ের যে কাজ তিনি অসমাপ্ত রেখেছিলেন তার পরিসমাপ্তির দরকার ছিল। ঔরংজেব খুব সঙ্কল্পবদ্ধ মানুষ ছিলেন। যে লক্ষ্য একবার স্থির করতেন তা যতই দূরে সরে যাক তার পিছনে একাগ্রচিত্ত মানুষের মত তাঁর সমস্ত শক্তি ও অভিলাষকে নিয়োগ করতেন। গোলকোণ্ডা বিজয়ের ভার তিনি দিয়েছিলেন যুবরাজ মুয়াজ্জমের ওপর কিন্তু তিনি শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করলেন। যুবরাজের এই কাজ মোগলরা সরকারিভাবে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সম্রাট তাকে স্বীকার করেননি।

১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ মুয়াজ্জমের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গোলকোণ্ডার কুতুবশাহী শাসনের সঙ্গে

মোকাবিলা করার। সেই বছরই যুবরাজ আজম এবং যুবরাজ শাহ আলমের নেতৃত্বে ৮০,০০০ সৈন্য দিয়ে সম্রাটের নির্দেশে মোগলরা বিজাপুর শহর ও দুর্গ অবরোধ করে। ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে বিজাপুরের তরুণ সুলতান সিকন্দর আদিল শাহ অবরোধের মধ্যে থেকেও দীর্ঘদিন লড়াই করেছিলেন। কিন্তু অবরোধ নীতিতে মোগলবাহিনী ছিল দক্ষ। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা শহরের বাইরে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে বিনষ্ট শস্যক্ষেত্রে প্রায় অনশন ও মহামারীকে সহ্য করেও যখন মোগলবাহিনী অবরোধ তুলল না তখন দেখা গেল আদিল শাহী প্রতিরোধও স্তিমিত হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিকন্দর আদিল শাহ আত্মসমর্পণ করেন। বিজাপুরকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিকন্দর শাহকে কারাগারে বন্দী করা হয়। সেখানে পনের বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। বিজাপুরের আফগান ও ভারতীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মোগল সম্ভ্রান্তদের (nobility) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিজাপুর শহর শ্মশানে পরিণত হয়। সম্রাট সেখানে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা, একজন দেওয়ান, কয়েকজন ফৌজদার ও কিল্লাদার নিয়োগ করলেন। উলেমারা ঔরংজেবকে প্রশ্ন করেছিল যে একজন ধর্মভীরু মাসলমান হয়ে কোন অপরাধে তিনি আরেকজন মুসলমান শাসককে শাস্তি দিলেন। ঔরংজেব উত্তর দিয়েছিলেন যে, কাফেরদের (মারাঠাদের) সাহায্য করার অপরাধে।

ঔরংজেব মনে করতেন যে, এই একই অপরাধ করেছিল গোলকোণ্ডা। আবুল হাসান কুতুবশাহ (১৬৭২-৮৭) আক্কান্না ও মদন্না নামক জনৈক ব্রাহ্মণদ্বয়কে রাষ্ট্র পরিচালনার কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং শম্ভুজীকে অর্থদান করেছিলেন। মদন্না ছিলেন মারাঠাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আবার বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানের সঙ্গে গোলকোণ্ডার কুতুবশাহী শাসকের যথেষ্ট আদান-প্রদান ছিল যা সম্রাট ভাল চোখে দেখেননি। বিজাপুর-গোলকোণ্ডা-মারাঠা সংযোগ দক্ষিণভারতে মোগল স্বার্থের অন্তরায় এটি সম্রাট বুঝতে পেরেছিলেন। তাছাড়া গোলকোণ্ডার ধন প্রজন্ম পরম্পরায় রক্ষিত ছিল। সেই ঐশ্বর্যকে লুঠ করার বাসনাও সম্রাটের মনে দীর্ঘদিন ধরে জেগেছিল।

১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সম্রাট গোলকোণ্ডার সন্নিকটে উপস্থিত হলেন। গোলকোণ্ডা অবরুদ্ধ হল। গোলকোণ্ডার সুলতান এক বিরাট প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। আব্দুর রজ্জাক (Abdur Razzak) নামে এক দুর্ধর্ষ সেনাপতি ছিলেন এই প্রতিরোধের নায়ক। এই প্রতিরোধকে ভাঙ্গার জন্য মোগলবাহিনী সব অস্ত্রই ব্যবহার করেছিল—জমিতে মাইন পুঁতে রাখা, গোলাবর্ষণ করা দেওয়াল টপকে দুর্গে প্রবেশ করা (escalade) সবই। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঔরংজেব চাতুর্যের আশ্রয় নিলেন যা প্রায়ই তিনি নিয়ে থাকতেন। দুর্গের রক্ষীবাহিনীকে ঘুষ আর উপঢৌকন দিয়ে তিনি বশ করলেন। বিশ্বাসঘাতকরা গোলকোণ্ডা দুর্গের দরজা খুলে দিল। আব্দুর রজ্জাক অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে পতিত হলেন। ঔরংজেব তাঁর বীরত্ব বিশ্বস্ততায় এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সযত্নে তাঁর চিকিৎসা করে তাঁকে সারিয়ে তোলেন এবং তাঁকে মোগল শাসনব্যবস্থার উচ্চপদ দান করেন। কাফি খাঁ বলেছেন যে, ঔরংজেব বন্দী সুলতানকে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং দৌলতাবাদ দুর্গে 'প্রয়োজনীয় বৃত্তি' (suitable allowance) দিয়ে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গোলকোণ্ডার পতনের সঙ্গে সঙ্গে কুতুবশাহী শাসনের অবসান হয়।

২৬.৫.৩ দাক্ষিণাত্য-বিজয় কি ভ্রান্ত হয়েছিল?

১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান যখন দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হলেন তখন দক্ষিণের সুলতানৎগুলির ধারণা হয়েছিল যে, তাদের ধ্বংস করে সেখানে সরাসরি মোগল শাসন কায়েম করা হবে। কিন্তু শাহজাহান তা করেননি। তিনি বিজাপুর ও গোলকোণ্ডাকে শুধু করদ রাজ্যে (tributary states) পরিণত করেন এবং তাদের কাছ থেকে বিপুল

অর্থ আদায় করেন। ঔরংজেব সরাসরি এই রাজ্যগুলিকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন যার ফলে দক্ষিণের স্বাধীন মুসলিম সুলতানৎগুলির অবসান হল। এই বিজয়ের জন্য ঔরংজেব ধ্বংস করেছিলেন বিপুল অর্থ, বিশাল মানবসম্পদ আর সৈন্যবাহিনীর পদচারণায় নষ্ট হয়েছিল বিপুল শস্যভাণ্ডার। গোলকোণ্ডা অবরোধের সময়ে বিপুল মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু সম্রাট ঐশ্বর্যও লুঠ করেছিলেন অনেক। শুধু গোলকোণ্ডার থেকে ৭০ কোটি টাকা (70 milion rupees), প্রায় অন্তহীন মণিমুক্ত, সোনা-রূপার বাসন এবং ২ কোটি ৮৭ লক্ষ (2,87,00,000) টাকার পরিমাণ বার্ষিক রাজস্ব তিনি পেয়েছিলেন। আর তিরিশ বছর ধরে দক্ষিণ বিজয়ের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেই স্বপ্নের সার্থকতাও তিনি পেয়েছিলেন।

এই অপর্যাপ্ত লাভ ছিল শেষ পর্যন্ত বড়ই আপাতলাভ। এর অন্তরালে ক্ষত যা হয়েছিল তার নিরাময় সম্ভব ছিল না। দক্ষিণের সুলতানৎগুলি ছিল উত্তরের মারাঠা আর দক্ষিণের প্রসারশীল মোগল শাসনের মধ্যে বাফার অঞ্চল (Buffer region) যা দক্ষিণের সমস্ত অরাজকতাকে শোষণ করে মোগল সীমান্তকে রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত করতে পারত। উত্তরে ক্ষিপ্ত জাঠ, বৈরী রাজপুত ও আগ্রাসী মারাঠারা যখন একটা হিন্দু প্রতিক্রিয়াকে দানা বাঁধানোর চেষ্টা করছে তখন একটি মুসলিম শক্তি হিসাবে অপর দুটি মুসলিম শক্তির বিরোধিতা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গাত হয়নি। দক্ষিণের সুলতানৎগুলি ভেঙ্গো গেলে বিপুল পরিমাণ সৈন্যবাহিনী কর্মহীন হয়ে পড়ে। তারাই গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমান উপদ্রব হিসাবে জীবন ছারখার করতে শুরু করে। বিপুল সংখ্যক পদস্থ মানুষ ও সম্ভ্রান্তরা কর্মহীন হয়ে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রটি হারিয়ে ফেলে। এতে সমাজজীবনে নেমে আসে অসন্তোষ ও মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। আঞ্চলিক সুলতানৎগুলি মারাঠাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত। দূরাগত মোগল শক্তির পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সেকথা সম্রাটের জীবদ্দশাতেই বারবার প্রতিপন্ন হয়েছিল। এ তথ্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সম্রাট বুঝতে পারেননি। মারাঠাদের শক্তি এক আকার ধারণ করেছে তা আত্মমদমত্ত সম্রাটের চোখে ধরা পড়েনি। দক্ষিণের থেকে সম্ভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত করে মনসবদার করা হয়েছিল। এমনিতেই মোগল মনসবদারদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য (homogeneity) ছিল না। এবার বৈষম্য ও বৈসাদৃশ্য গেল বেড়ে। মনসবদের সংখ্যা বাড়ল, অনেক বেশি জাগিরের দাবী উঠল, আর তা নিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের ভেতর দ্বন্দ্ব ও বৈরিতার বিষ ছড়াতে লাগল। বিজাপুর আর গোলকোণ্ডা জয় করে সাম্রাজ্যের সীমানা বেড়েছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের সংহতি ও আভ্যন্তরিক শক্তির ক্ষয় হয়েছিল। এইটিকেই ভিনসেন্ট স্মিথ "impolicy of conquest" বলে চিহ্নিত করেছেন।

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী যুবরাজ আকবরকে শাস্তি দেওয়া। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয়নি। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আকবর ইরাণ যাত্রা করেন। আর তিনি ভারতবর্ষে ফেরেননি। দুর্বিনীত পুত্রকে শাস্তি দিতে না পারলেও ঔরংজেব সাত বছরে দক্ষিণের প্রায় সব শত্রুদের ধ্বংস করেছিলেন—একথা লিখেছেন রিজভি। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়। ঔরংজেব সেই সুযোগে দক্ষিণে গিয়ে মারাঠাদের দমন করতে চেয়েছিলেন। সাত বছরে মারাঠাদের অনেক ক্ষতি করলেও তারা নিশ্চিহ্ন হয়নি। রিজভির মতে সমস্যা ছিল ছোট—জিঞ্জিতে রাজারামের নেতৃত্বে মারাঠারা একজায়গায় আবদ্ধ ('concentrated') হয়েছিল আর বিজাপুর, গোলকোণ্ডার বিজয়কে সংহত করার (consolidation) যে সমস্যা তা এখন প্রায় প্রাদেশিক সমস্যার মতন ছিল। একথা বুঝতে পেরে সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আসাদ খাঁ (Asad Khan) সম্রাটকে উত্তরভারতে ফিরে যেতে পরামর্শ দেন, তাঁর ধারণা ছিল সম্রাট চলে গেলে দক্ষিণভারতের ক্ষতের ওপর প্রলেপ পড়বে। সম্রাট যে পরামর্শকে অগ্রাহ্য করেন। তিনি তখনও মারাঠাদের নির্মুল করার স্বপ্ন দেখছিলেন। মারাঠা গেরিলাদের শক্তি তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন যে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি তাঁর আগ্রাসী নীতি চালিয়ে মারাঠাদের নানাবিধ আক্রমণের মধ্য দিয়ে বিপর্যস্ত করে দিতে পারবেন। আত্মগরিমায় অন্ধ থাখায় যুগশক্তিকে তিনি বুঝতে

পারেননি। উত্তরভারতে ফিরে যাওয়ার শেষ সুযোগ তিনি হারিয়েছিলেন। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার লুঠের সম্পদ তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালানোর বিপুল খরচের জন্য প্রয়োজনীয় রসদের সাময়িক যোগান দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর শেষ পর্বের লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অপরিমেয় ভাণ্ডার তাঁর ছিল না। দাক্ষিণাত্য ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের ক্ষত (Deccan ulcer)। "স্পেনের ক্ষত" (Spanish ulcer) যেমন নেপোলিয়নকে রসাতলে পাঠিয়েছিল সেইরকম দাক্ষিণাত্যের ক্ষত মোগল বিনাশের কারণ হয়েছিল।

অনুশীলনী ২

১। ঔরংজেবকে কেন দক্ষিণভারতে যেতে হয়েছিল? (দশ লাইনে উত্তর দিন)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২। ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিকে কেন দাক্ষিণাত্য ক্ষত বলা হয়? (দশ লাইনে উত্তর দিন)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। উত্তরভারতের সৈনিকদের রুজিরোজগার হতো দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ থেকে।

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪। গোলকোণ্ডার প্রতিরোধের নায়ক ছিলেন আব্দুর রজ্জাক নামে এক দুর্ধর্ষ সেনাপতি।

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৬.৬ মারাঠাদের উত্থান : শিবাজীর নেতৃত্বে নতুন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি : মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্ব

ঔরংজেব সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক নতুন প্রতিরোধ দক্ষিণভারতে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। এই প্রতিরোধ দিয়েছিল মারাঠারা। তাদের নেতা ছিলেন শিবাজী ভোঁসলে (Shivaji Bhonsle) (১৬২৭-১৬৮০)—পৃথিবীর ইতিহাসে তরুণতম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি পিতা শাহজী ভোঁসলে ও মাতা জিজাবাই-এর দ্বিতীয় পুত্র। শাহজী ছিলেন আহমদনগর সুলতানদের (Sultanate) অধীনে একজন মারাঠা সেনানায়ক ও উচ্চরাজকর্মচারী। তাঁর স্ত্রী জিজাবাই ছিলেন একই সুলতানাতের কর্মচারী এক সম্ভ্রান্ত মারাঠা নায়কের কন্যা। আহমদনগর সুলতানৎ মোগলরা গ্রাস করে নেওয়ার পর শাহজী বিজাপুর সুলতানতের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং জাগির লাভ করেন।

শিবাজী বিজাপুরের সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতির অন্তর্লীন পারসিক আদব-কায়দায় মানুষ হননি। তিনি মানুষ হয়েছিলেন পশ্চিমঘাট পর্বতের কোলে পুনার দেশীয় ও একান্তভাবে চিরায়ত ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে—মায়ের নিশ্চিন্ত ও নিবিড় আশ্রয়ে। ফলে দরবারি আদবের দ্বারা তিনি কখনো আড়ষ্ট হননি। ছোটবেলা থেকে স্বাধীন বিচরণের ফলে পর্বতের অলিগলি চিনেছিলেন, স্বায়ত্তশাসনে রাখতে পেরেছিলেন তাঁর স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে, আর মাওয়ালি নামে একদল রুক্ষ, কঠিন, দুর্দান্ত পার্বত্য মানুষদের নিয়ে নিজের দল গড়তে পেরেছিলেন।

এই দল নিয়েই আঠারো বছর বয়সে তাঁর অনুপস্থিত (Absentee) পিতার জাগির নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এর পরেই উনিশ বছর বয়সে তিনি পুনার দক্ষিণ-পশ্চিমে কুড়ি মাইল দূরে তোরণা নামক পার্বত্য দুর্গটি অধিকার করেন। এইবার এই অভূতপূর্ব নেতৃত্বে আকৃষ্ট হলেন মহারাষ্ট্রের দু ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার ক্ষেত্র সংকুচি হয়ে এসেছিল—তারা হল মারাঠা যোদ্ধৃশ্রেণীর মানুষ ও শিক্ষিত মারাঠা ব্রাহ্মণরা। একটি ছোট রাজ্যের ভ্রূণ এইভাবে তৈরি হয়ে গেল দাক্ষিণাত্যে।

২৬.৬.১ শিবাজীর উত্থানের প্রথম পর্যায় : ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

উদীয়মান রাজ্যবিজেতা শিবাজীর কাজ সহজ হয়েছিল তিনটি কারণে। প্রথমত দাক্ষিণাত্যের সুবেদার যুবরাজ ঔরংজেব ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন নিয়ে লড়াই-এর জন্য উত্তরভারতে চলে যান। তিনি এরপর প্রায় পঁচিশ বছর আর দক্ষিণে ফেরেননি। তিনি উত্তরে যাওয়ার সময়ে সমস্ত শক্তিশালী মোগল যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে দাক্ষিণাত্যে পাহারাদার মোগলবাহিনী নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে বিজাপুর রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একটি ক্ষয়িষ্ণু সুলতানতের জীর্ণ কাঠামোকে ভেদ করা শিবাজীর মতো উদ্যোগী, স্বপ্নাবিষ্ট, ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে কঠিন ছিল না। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর প্রায় এক দশক তিনি শক্ত হাতে রাজ্য পরিচালনায় অক্ষম ছিলেন। শিবাজী এই সুযোগ নিয়ে ১৬৫০-এর দশকের শেষের দিকে বিজাপুরের সুলতানের অধীনতাকে অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৃতীয়ত, শিবাজীর অনুচর মাওয়ালি নামে পার্বত্য উপজাতির মানুষরা পাহাড়ের গোপন পথ, ঘাঁটি গাড়ার জঙ্গল, জলাশয়, উৎরাই-চড়াই সব জানত। তারা কাঠ ও বাঁশের কাজে ছিল পরম্পরাগতভাবে দক্ষ। আর স্বভাবে ছিল তারা কষ্টসহিষ্ণু-রুক্ষ। এই জ্ঞান ও দক্ষতাকে শিবাজী একটি সম্মিলিত শক্তি হিসাবে মোগলদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন।

এইরকম প্রায় প্রতিরোধহীন পরিবেশে এক দুর্বার মানবগোষ্ঠী ও দুর্দান্ত আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করে শিবাজী একের পর এক দুর্গ দখল করে নেন। তারপর তাঁর নজর পড়ে কোঙ্কনের দিকে। কোঙ্কন ছিল পশ্চিমঘাট পাহাড়

ও সমুদ্রের মাঝে এক সমতলভূমি। সেইখানে কল্যাণ নামক স্থান তিনি দখল করেন। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে জাওলির (Jaoli) রাজাকে হত্যা করে তার রাজ্য তিনি অধিকার করে নেন। এইবার তিনি বিজাপুরের সুলতানকে অস্বীকার করে সম্রাটকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁকে বিজাপুরি জেলা উত্তর কোঙ্কনের শাসকরূপে স্বীকার করে নেওয়া হোক।

১৬৪৫ খিস্টাব্দের একটি বিজাপুরি **ফরমানে** স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, 'শিবাজীরাজ' সুলতানের আনুগত্য অস্বীকার করেছেন ('Shivaji Raje had turne disloyal to the Shah')। ১৬৬০-এর দশকের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, শিবাজীর নিয়ন্ত্রণে ছিল ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০,০০০ পদাতিক বাহিনী। কি করে এই বিপুল বাহিনী তাঁর অধীনে এল? সেই সময়ে দক্ষিণী সুলতানৎগুলি এবং এমনকি মোগল শাসকরাও অনেক সময়ে সৈন্যদের অর্থ বকেয়া রেখে দিত। ফলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যারা ভাগ্যান্বেষী ভাড়াটে (mercenary) সৈন্য তারা নগদ বেতন যারা দিতে পারত তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করত। এইরকম ভাড়াটে বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল সঙ্কল্পবদ্ধ মারাঠা যোদ্ধৃশ্রেণীর পরাক্রম ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা সাজানো প্রশাসন। শিবাজীর রসদ অর্জনের প্রাথমিক উপায় ছিল লুঠ—সরকারি রাজস্ব, শত্রুশাসিত অঞ্চলের সম্পদ ও পরাজিত শত্রুসৈনিকের ফেলে যাওয়া অস্ত্রসম্ভার। এর পরের উপায় ছিল কর প্রতিষ্ঠা—বিজিত রাজ্যের ওপর কর স্থাপন করে নিয়মিত অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা। উর্বর কোঙ্কন অঞ্চল ছিল তার রাজস্ব ও শস্য ভাণ্ডার। এরপরে যখন তিনি কল্যাণ অধিকার করলেন তখন একটা ঐশ্বর্যশালী বাণিজ্য শহর তাঁর হাতে এল। তিনি বিতাড়িত করলেন তাঁর বিজিত রাজ্যের বিজাপুরি **জাগিরদারদের,** আর তাদের রাজস্ব আর ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করে নিলেন। কোঙ্কন জয় করার পর সমুদ্রে যাওয়ার পথ তাঁর সামনে খুলে গেল। তখন তিনি কিছু জাহাজ জোগাড় করলেন। এই জাহাজ দিয়ে কখনো আরবসাগরে জলদস্যুতা কখনও বা পারস্য উপসাগর বা লোহিত সাগরে বাণিজ্যের কাজে তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের তিনি প্রেরণ করতেন। এইভাবে যে বিপুল ধনভাণ্ডার তিনি আয়ত্ত করেছিলেন তা দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর সৈন্যবাহিনী ও রাজগড় নামক স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজধানী এবং নির্মাণ করেছিলেন প্রতাপগড় নামক এক পার্বত্য অঞ্চলে তাঁর আরাধ্য দেবী ভবানীর মন্দির। ক্ষমতা অর্জনের পর থেকেই তিনি বন্দুক, কামান, গোলাগুলি, নৌ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও কারিগরি সাহায্যের জন্য পর্তুগিজ ও ইংরাজদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলাপ-আলোচনা করতেন।

এই ভাবে ক্ষয়িষ্ণু সুলতানৎগুলির পাশে হঠাৎ করে শিবাজী জাগিয়ে তুললেন এক তরুণ রাজ্য—উদ্যোগী শাসনের নিয়ন্ত্রণে বলশালী, সঙ্কল্পবদ্ধ অনুচরদের তৎপরতায় প্রসারশীল এবং চতুর ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় সংহত। এই রাজ্যকে দমন করার জন্য প্রথম বড় প্রয়াস গ্রহণ করা হয় ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে)। ঔরংজেব তখনও তাঁর সিংহাসনের জন্য লড়াই শেষ করেননি। বিজাপুরের নতুন সুলতান আলি আদিল শাহ তাঁর অতি দক্ষ ও অনুগত সেনাপতি আফজল খাঁকে ১০,০০০ সৈন্য দিয়ে শিবাজীকে দমন করতে প্রেরণ করলেন। এই অভিযান অনেকটাই ঔরংজেবের অভিযানের রূপ নিয়েছিল। পথপার্শ্বের মন্দির ধ্বংস করে, তুলজাপুরের (Tuljapur) ভবানী মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে এ অভিযান অগ্রসর হয়েছিল। অতএব এই অভিযান সম্পর্কে শিবাজী প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন। ফলে আফজল খাঁর অনুরোধে তিনি যখন আলাপ-আলোচনার জন্য বিজাপুরি সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন তখন অতর্কিত আক্রমণের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাই যখন আলিঙ্গন করার ছলে আফজল খাঁ তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার চেষ্টা করলেন তখন এই সতর্ক মারাঠা সাম্রাজ্য বিজেতা তাঁর লুকিয়ে রাখা 'বাঘ নখ' (লোহার তীক্ষ্ণ নখ) দিয়ে আফজলের উদর ছিন্ন করে দেন। আর তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্কেত পেয়ে লুকিয়ে থাকা মারাঠাবাহিনী বিজাপুরি সেনাপতির দেহরক্ষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এইভাবে কৌশলগত উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা শিবাজী বিজাপুরি অভিযানকে পরাস্ত করেন। পরাজিত বিজাপুরিদের কাছ থেকে মারাঠারা ৪,০০০ অশ্ব দখল করে নেয়।

২৬.৬.২ শিবাজীর উত্থানের দ্বিতীয় পর্যায় (১৬৬০-১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ)

বিজাপুরি সৈন্যবাহিনীর এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর মোগলরা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের 'দ্রুতগামী শত্রুকে' ('Swiftly moving foe') সহজে পরাজিত করা যাবে না। তাই আর কালক্ষেপ না করে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ঔরংজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন শিবাজীকে দমন করার জন্য। বর্ষার মুখোমুখি শায়েস্তা খাঁ যখন মারাঠাদের দ্রুত চলাফেরার সঙ্গে তাল রাখতে পারলেন না তখন কিছু প্রাথমিক ছোটখাটো সাফল্যের পর তিনি পুণায় বর্ষাকালটা কাটানোর জন্য মনস্থির করলেন। শিবাজীর ছিল গেরিলা লড়াই। তাই তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পনামাফিক কাজ করা ছিল খুব কঠিন। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক দুঃসাহসী নৈশ অভিযান করে শিবাজী অল্পকিছু বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে শায়েস্তা খাঁর ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। শত্রুকে অপ্রস্তুত মুহূর্তে আটকে ফেলার রণকৌশল প্রথম থেকেই শিবাজী আয়ত্ত করেছিলেন। ভারী সরঞ্জাম ব্যবহার করা মোগলবাহিনী ছিল চলাফেরায় মন্থর। তাই শিবাজীর আক্রমণের মোকাবিলা করা শায়েস্তা খাঁ সম্ভব হয়নি। তিনি কোনক্রমে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। তাঁকে হারাতে হয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সমেত হাতের তিনটি আঙুল। তাঁর পুত্রও নিহত হয়। ঔরংজেব অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে শায়েস্তা খাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন সেখানকার **সুবেদার** করে। কিন্তু তাঁর দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করার আগেই ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসের ১৭ থেকে ২১ তারিখ শিবাজী সুরাট নামক বন্দর নগরটি লুঠ করেন। মাত্র ৪০০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে দুই লক্ষ মানুষের বসতি এই শহরটি আক্রমণ করলে সেখানকার মোগল **সুবেদার** পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। ফলে বাহারজী বোরার মত অত্যন্ত ধনী ইসমেইলি (Ismaili) বণিকের কুঠীও মারাঠারা লুঠ করে। এক কোটি টাকার অধিক নগদ অর্থ ও বিপুল পরিমাণ সোনারূপা ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে মারাঠারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে। এর পরেই মারাঠারা মক্কাযাত্রীদের জাহাজ লুঠ করে এবং দাক্ষিণাত্যের মোগল রাজধানী ঔরঙ্গাবাদের চারপাশের বসতিকে ছারখার করে অপরিমিত ঐশ্বর্য নিয়ে চম্পট দেয়। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের মুখোমুখি মোগল প্রতিরোধ ছত্রখান হয়ে যায়। মারাঠারা এর পর বিজাপুরের একটি আক্রমণও প্রতিহত করে।

শক্তিশালী মোগলবাহিনী নিয়ে কেন শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে পারলেন না তার উত্তর সমকালীন লেখক কাফি খাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি। পরাজিত মোগলদের প্রতি সমবেদনা নিয়ে তাদের শত্রু শিবাজী সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "দুঃসাহসী লুঠেরা শিবাজী তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দিলেন যে যেখানেই আমীর-উল-উমারার মালপত্র দেখবে সেখানেই তা লুঠ করবে। এই সংবাদ পাওয়ার পর আমীর [শায়েস্তা খাঁ] তাঁর দক্ষ সেনাপতিদের অধীনে চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে মারাঠাদের দমন করতে প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রত্যেক দিন, মোগলবাহিনীর প্রত্যেক অগ্রযাত্রায় (march) শিবাজীর দক্ষিণীরা ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের মালপত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। কশাকদের মত [Cossacks—দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়ার একটি উপজাতি] তারা ঘোড়া, উট, মানুষ যাকে ধরতে পারত তা নিয়ে পলায়ন করত।" এই ধরনের গেরিলা যুদ্ধ ঠেকানোর পদ্ধতি মোগলদের জানা ছিল না।

ঔরংজেব অবশ্য মনে করতেন যে, মোগল শিবিরে বিশ্বাসঘাতকতা ঘটেছে তা না হলে অত বিশাল বাহিনী নিয়ে মোগলরা কেন মারাঠাদের ঘিরে ফেলতে পারল না। শায়েস্তা খাঁ পরাজয়কে মোগলদের নিঃসীম অপমান ধরে নিয়ে তিনি শায়েস্তা খাঁর স্থানে যুবরাজ মুয়াজ্জমকে দাক্ষিণাত্যের **সুবেদার** নিযুক্ত করলেন। আর যুবরাজের সঙ্গে দিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি জয়পুরের রাজা মির্জারাজা জয়সিংহ কচ্ছোয়াকে। ঔরংজেব মনে করতেন যে, বিজাপুরের কাছ থেকে শিবাজী মোগল-বিরোধী উস্কানি পেয়েছে এবং মোগল সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ রাঠোরের কাছ থেকে পেয়েছে গোপন প্রশ্রয়। তাই মির্জারাজা জয়সিংহের ওপর হুকুম হল যশোবন্ত সিংহের স্থলাভিষিক্ত হয়ে একদিকে মারাঠাদের দমন করতে এবং অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিজাপুর দখল করে নিতে।

১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে জয়সিংহ—তখন তাঁর ষাট বছর বয়স—বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পুণায় উপস্থিত হলেন এবং যশোবন্ত সিংহ রাঠোরের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিলেন। এরপর শিবাজীকে দমন করার জন্য তিনি চারটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এক, তিনি বিজাপুরের সুলতানকে জানিয়ে দিলেন যে, শিবাজীর সাথে হাত মিলিয়ে মোগল-বিরোধিতা করলে পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর। দুই, পশ্চিমের সমুদ্র-উপকূলের বিদেশি ঘাঁটিগুলিকে সতর্ক করে দিলেন যে, তাদের সহায়তায় শিবাজী নৌবহর যেন কার্যকরী না হতে পারে। তিন, শিবাজীর কাজে যে সব মারাঠা দেশমুখ বিরক্ত হয়েছিলেন তাদের কাছে ব্রাহ্মণদের দূতরূপে প্রেরণ করে বলা হল যে, তারা মোগলদের সহায়তা করলে তাদের নানাবিধ পুরস্কার দেওয়া হবে। পদ, অর্থ, মর্যাদা, জমি, খেতাব ইত্যাদির লোভে অনেক মারাঠা দেশমুখ মোগলদের সাহায্য করেছিল।

এইভাবে শিবাজীকে কূটনৈতিক তৎপরতার দ্বারা ঘিরে ফেলার পরই জয়সিংহ চতুর্থ পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন। তিনি বিরাট সৈন্য নিয়ে পুরন্দর দুর্গটি অবরোধ করেন। মোগল অবরোধের যে রণকৌশল তা এখানেও প্রয়োগ করা হয়। গ্রামাঞ্চল ধ্বংস করা হয়, শস্যক্ষেত্র ছারখার করা হয় এবং অবাধ লুঠের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। দু মাস প্রতিরোধের পর বাধ্য হয়ে শিবাজী আত্মসমর্পণ করেন।

১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে শিবাজীর সঙ্গে মোগলদের চুক্তি সম্পাদিত হয়। একে বলা হয় পুরন্দরের চুক্তি। শিবাজী ২৩টি দুর্গ ও বিস্তীর্ণ রাজ্যাংশ মোগলদের প্রত্যর্পণ করেন, নিজের হাতে রেখে দেন ১২টি দুর্গ এবং তাঁর নিজস্ব রাজ্য ও **ওয়াতান** [পিতৃপুরুষের জমি]। তিনি হলেন মোগলদের **'ভ্যাসাল'**—অধস্তন আঞ্চলিক করদ প্রধান। তবে অন্যান্য **মনসবদারদের** মত সশরীরে মোগল শাসকের সামরিক সেবা করার দায়িত্ব থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। স্থির হল যে শিবাজীর পুত্র শম্ভূজীকে ৫০০০ জাঠ-এর মর্যাদা দেওয়া হবে। শিবাজী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যে মোগলবাহিনী বিজাপুর আক্রমণ করবে শিবাজী সসৈন্যে তাতে অংশগ্রহণ করবেন মোগলদের প্রতি তাঁর সখ্যতার নিদর্শনস্বরূপ। এর বদলে বিজাপুরে যে রাজ্য জয় করা হবে তার থেকে রাজ্যাংশ শিবাজীকে দান করা হবে।

পুরন্দরের চুক্তির দ্বারা সাময়িকভাবে হলেও শিবাজীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল—নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে, মোগল-ব্যবস্থার অধীনস্থ হয়ে অসংখ্য স্থানীয় প্রভুদের মত মোগল কর্তৃত্বকে আইনের কাঠামোর মধ্যে মোগল শাসনকে বিধিসম্মত শাসন বলে মেনে নিতে হয়েছিল। এর ফল হয়েছিল এই যে, রাজা জয়সিংহের পরামর্শকে মেনে নিয়ে মোগল তহবিল থেকে পথ-খরচ হিসাবে নগদ এক লক্ষ টাকার অনুদান গ্রহণ করে তাঁকে আগ্রাতে সম্রাটের দরবারে হাজির হতে হয়েছিল।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে, ঔরংজেবের ৫০ তম চান্দ্র জন্মদিনে শিবাজী মোগল সম্রাটের সভায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে রইলেন জয়সিংহের পুত্র কুমার রামসিংহ যিনি ছিলেন সম্রাটের দরবারে তাঁর পিতার প্রতিনিধি। শিবাজী ভেবেছিলেন তিনি সেখানে মারাঠাদের সার্বভৌম শাসকরূপে হাজির হয়েছেন। সম্রাট মনে করতেন যে, শিবাজী অন্য যে কোনও জমিদারের মত পদস্থ, সম্মানিত কিন্তু অধীন, শাসক-স্বীকৃত স্থানীয় নেতা। শিবাজী স্বীয় মর্যাদার এই অবমূল্যায়নের প্রতিবাদ করলেন। ফলে সম্রাটের দেয় উপহার যা ছিল মর্যাদার অভিজ্ঞান তার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হল। শিবাজী পেলেন না সম্রাটের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, আর তার সঙ্গে হস্তী, মুক্তা ও সম্ভ্রান্তের মূল্যবান পোষাক। কুমার রামসিংহের কুঠীতে বন্দী অবস্থা থেকে শিবাজী একদিন পলায়ন করলেন এবং অনেক কষ্টে মথুরায় এসে সেখান থেকে মারাঠা ব্রাহ্মণের সহায়তায় ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইউসুফজাই বিদ্রোহ চলছিল। তাই ঔরংজেব ঠিক সেই মুহূর্তেই শিবাজীর বিরুদ্ধে কোন অভিযান পাঠাতে পারেননি।

দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করে শিবাজী মোগল সুবেদার যুবরাজ মুয়াজ্জমের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করে চলতে লাগলেন। তাঁর পুত্র শম্ভূজীকে ৫০০০ **মনসব** দান করা হল এবং শিবাজীকে বিজাপুর দখল করার স্বাধীনতা দেওয়া হল।

শিবাজী ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগলদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখলেন। এর মধ্যে মারাঠা রাজ্যে সুশৃঙ্খল প্রশাসনের জন্য আইন প্রণয়ন করে তিনি তাঁর রাজ্যশাসনকে সংহত করেন।

১৬৭০ থেকে শুরু হল শিবাজীর নতুন অভিযান। পুরন্দরের চুক্তির দ্বারা হস্তচ্যুত সমস্ত দুর্গগুলি তিনি পুনরায় দখল করলেন। সেই বছরেই তিনি সুরাট লুণ্ঠন করে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করলেন এবং প্রমাণ করলেন যে মোগল কর্তৃত্ব আর তার রাজ্যরক্ষায় সমর্থ নয়। এরপর থেকে সুরাটের পতন ঘটে। এর পরে খান্দেশের কিছু অঞ্চল তিনি দখল করে নেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই মোগলদের সঙ্গে তাঁর আবার লড়াই হয়। এবার ৫০০০ সৈন্য নিয়ে সম্মুখ সমরে শিবাজী মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি রাজগড়ে ফিরে আসেন। মোগলদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়ে শিবাজীর সেনানায়করা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে সমান-সমান অধিকারে লড়াই করার ক্ষমতা তারা অর্জন করেছে। মোগলদের ছিল ভারী অশ্বারোহী বাহিনী ও ভূমি-নির্ভর গোলন্দাজ বাহিনী (field artillery)। আর মারাঠাদের ছিল দ্রুত সঞ্চালনের ক্ষমতা ও উচ্চ মনোবল। তা নিয়েই পরবর্তী চার বছর মারাঠারা মোগল খান্দেশ ও বিজাপুরি কোঙ্কনে লুঠতরাজ করে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে শিবাজী তাঁর অধিকৃত মোগল রাজ্যাংশে চৌথ দাবি করেন। তার থেকে তাঁর বছরে চার লাখ টাকা রাজস্ব আসতে লাগল। রিজভি বলেছেন যে, এই করকে ব্ল্যাকমেল বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে। তিনি জনসাধারণকে তাদের দেশের নিরাপত্তায় অংশীদার করতে চেয়েছিলেন। মোগল প্রজাদের ব্ল্যাকমেল করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ১৬৭২-এর ডিসেম্বর মাসে শিবাজী পানহ্লা ও সাতারা দুর্গ দুটি অধিকার করেন। এর দু বছর পরে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন রাজগড় দুর্গে তিনি **'ছত্রপতি'** উপাধি নিয়ে নিজেকে সার্বভৌম শাসকরূপে ঘোষণা করেন। কিন্তু এর অনেক আগেই ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট রাজা জয়সিংহ ও যুবরাজ মুয়াজ্জামের অনুরোধে শিবাজীকে রাজা বলে মেনে নেন।

নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা—একটি স্বতন্ত্র জাতির স্বরাট শাসক বলে ঘোষণা করার এই ঘটনা সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক ঘটনাগুলির অন্যতম বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। যখন ঔরংজেবের মতন দোর্দণ্ড-প্রতাপ সম্রাট সমস্ত প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিলেন তখন মোগল শিবিরে বন্দী থাকার পরেও নিজেকে স্বাধীন নরপতিরূপে ঘোষণা করার যে সাহস ও ঔদ্ধত্য, নিজেকে ক্ষমতায় কায়েম রাখার যে কৌশল ও সামর্থ্য শিবাজী দেখিয়েছিলেন তা সমসাময়িক ভারত ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁর অভিষেকের অর্থ রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি গগ্গ ভট্ট (Gagga Bhatta) নামে বারাণসীর এক বেদবিদ্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দিয়ে প্রথমে নিজের বংশগত কৌলিন্য ও বর্ণগত মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে, সম্পূর্ণ বৈদিক হিন্দুমতে দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ও মাসাধিককালে যথোচিত শুদ্ধতার ব্রত পালন করে রাজমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকে তৈমুরবংশীয় শাসকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়নি। এইটিই গুরুত্বপূর্ণ। কোনও স্থানীয় প্রধানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে না পারার ব্যর্থতা মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়ী গ্লানি হয়ে রইল। অন্যদিকে যেখানে সমস্ত উপমহাদেশব্যাপী হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল মুসলিম শাসনের বাতাবরণে সেখানে কোণঠাসা হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুত্বের অপরিম্লান বৈভবকে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাদপীঠে প্রতিষ্ঠা করে এক জঙ্গী হিন্দু রাষ্ট্রসাধনার ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শিবাজী। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রসংগঠনের ঐতিহ্যে হিন্দুদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার (empire building) ধারা খুব কম। এই অসম্পাদিত ধারার বাইরে শিবাজী নতুন ধারা প্রতিষ্ঠা করলেন। শিবাজীর নিজ রাজ্যের সীমানার মধ্যে প্রাচীনতম সম্ভ্রান্ত মারাঠা পরিবারগুলির কাছে নতুন রাজ্য একটি নতুন অঙ্গীকার নিয়ে এল। নিজ রাজ্যের সীমানার বাইরে ভোঁসলা রাজপরিবারের মর্যাদার সম্প্রসারণ হল এবং ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র তাঁর বংশধরেরা বিধিসম্মত রাজবংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার লাভ করল। সাময়িকভাবে মোগল সাম্রাজ্যের ভেতরে হয়েও চিরায়তভাবে তার বাইরে—এইরকম এক বিচিত্র শক্তির আধার তৈরি করলেন শিবাজী। এই শক্তির আধার থেকেই আঠারো শতকে জেগে উঠেছিল মোগল শাসনের বিকল্প মারাঠা-ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদের

জনক হলেন **'ছত্রপতি', 'পাদশাহ'** নয়। তৈরি হল এই মানবিক বিন্দু যাকে ঘিরে মোগল-বিরোধিতার উপকরণগুলি একটি অবয়বে মূর্ত হতে পারে।

১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে শিবাজী তাঁর দক্ষিণভারত অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানকে গ্র্যান্ট ডাফ (Grant Duff) "তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান" ("the most important expedition of his life") বলে ব্যক্ত করেছেন। এই অভিযানে তাঁর লক্ষ্য ছিল বিজাপুর সরকারের অধীনস্থ যে সব **জাগির** তাঁর পিতার দখলে ছিল এবং অধুনা তাঁর ভ্রাতা ভেঙ্কাজীর (Venkajee বা Vyankaji) দখলে আছে তার পুনরুদ্ধার করা। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে তিনি এক বিরাট বাহিনী নিয়ে গোলকোণ্ডা প্রবেশ করেন। সেখানে সুলতান তাঁর সাথে সন্ধি করে মিত্রশক্তিরূপে গ্রহণ করেন এবং আরও দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁকে গোলন্দাজ বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। এইরকম অপ্রতিরোধ্য বাহিনী শীর্ষে থেকে তিনি দক্ষিণ আর্কটের শক্তিশালী দুর্গ জিঞ্জি অধিকার করেন। ভেলোর ও অন্যান্য অঞ্চলও তাঁর অধীনে আসে। তাঁর ভাই-এর কাছ থেকে তাঞ্জোর রাজ্যের অর্ধেক ছিনিয়ে নেন। তারপর দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে অধিকার করেন বেলারি (Bellary) এবং সখ্যতা করলেন তাঁর প্রাচীন শত্রু বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে। ঔরংজেব এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমে আফগানদের সঙ্গে লড়াইতে ব্যস্ত থাকায় দক্ষিণে শিবাজীর রাজ্যজয় সম্ভব হয়েছিল। শিবাজীর দক্ষিণভারত অভিযানের স্বল্পকালের মধ্যেই ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়।

২৬.৬.৩ মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বের উত্তর-শিবাজী পর্যায়

শিবাজী তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ শুরু হয় তাঁর দুই পুত্র শম্ভুজী ও রাজারামের মধ্যে। রাজারামের বয়স তখন মাত্র দশ। তাঁর সমর্থকরা তাঁকে রাজা রূপে ঘোষণা করলেও শেষপর্যন্ত শম্ভুজীই পানহারা ও রাজগড় দুর্গ অধিকার করে, ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি নিজেকে মারাঠা রাজ্যের রাজা ও শাসক বলে ঘোষণা করেন। রাজা হয়েই শম্ভুজী বুরহানপুর আক্রমণ করেন। উত্তর ভারত থেকে পলাতক বিদ্রোহী যুবরাজ আকবরকেও তিনি আশ্রয় প্রদান করেন।

এই দুই ঘটনা মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বের নতুন পর্যায় সৃষ্টি করল। বুরহানপুর লুঠ করে মারাঠারা বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করে। সেখানে ছিল বড় বড় বণিকদের বাস। তাদের কুঠীতে আর দপ্তরে লুকানো ছিল সোনা-রূপা, মণিমুক্তার গোপন ভাণ্ডার। এছাড়া বাহাদুরপুর ইত্যাদি শহরের বণিকদের গোলায় আর গুদামে মজুত ছিল নানারকম বাণিজ্যের সম্ভার। এই সমস্ত ঐশ্বর্য আর সম্ভার মারাঠাদের দখলে চলে যায়। মোগল সেনাপতি খান জাহান বাহাদুর শম্ভুজীকে তাড়া করে সৈন্য নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন বুরহানপুরে, কিন্তু তাঁকে ধরতে পারেননি। জনশ্রুতি আছে যে শম্ভুজীর কাছ থেকে অনেক উপঢৌকন তিনি লাভ করেছিলেন, তাই কৌশলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। শিবাজী সুরাট লুঠ করে যেমন সেই বন্দর-নগরটির ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছিলেন সেই রকম শম্ভুজীর বুরহানপুর লুণ্ঠনের ফলে সড়কপথে দূর বাণিজ্য ও তার সঙ্গে বিপণন, বিনিয়োগ ও বিনিময় ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সব থেকে বড় কথা সেখানকার মুসলমান সমাজ পুরো ব্যাপারটিকে ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে একটি ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির পর্যালোচনা করে সেখানকার **উলেমা** ও মুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঔরংজেবকে লিখলেন যে, জনৈক কাফের মুসলমানদের সম্পত্তি ও সম্মান নষ্ট করেছে এবং জুম্মাবারের (শুক্রবারের) **নমাজ** পড়ার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। একথা বলার অর্থই হল সম্রাটকে বোঝানো যে শম্ভূজীর আক্রমণ কোনও আইন-শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রীক সংগঠন বিনষ্ট হওয়ার ঘটনা নয়—তা বৃহত্তর অর্থে ধর্মের ওপর আঘাত। যদি মুসলমানদের ধর্ম ও সম্পত্তি সম্রাট রক্ষা না করতে পারেন তবে শাসকরূপে তাঁর প্রজার আনুগত্য দাবী করার কোনও অধিকার নেই।

বলাবাহুল্য যে, এ সংবাদ পেয়ে ঔরংজেব যারপরনাই উত্তেজিত হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্যের সামনে দুটো বিপদ—এক, জনৈক বিধর্মীর দ্বারা আক্রান্ত ইসলামের বিপজ্জনক ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ায় সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ধ্বসে যেতে পারে। দুই, বিদ্রোহী যুবরাজ আকবর দাক্ষিণাত্য থেকে যদি একদিকে উদীয়মান মারাঠা শক্তির সঙ্গে হাত মেলায় কিংবা বিক্ষুব্ধ মুসলিম মানবশক্তিকে দলে টেনে আনে তবে সাম্রাজ্যের সর্বনাশ রোধ করা যাবে না। অতএব ঔরংজেব সশরীরে দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হলেন। উত্তর ভারতে সরাসরি তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণে যে প্রধান ও কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী ছিল তাকে দক্ষিণে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর সঙ্গে রইলেন তিনজন যুবরাজ, বিশিষ্ট সেনাপতিরা, বিরাট গোলন্দাজ বাহিনী, অসংখ্য বন্দুকবাজ, পদাতিক বাহিনী, তাঁর হারেম, তাঁর গার্হস্থ্য ব্যবস্থা (household), অন্তহীন করণিক (clerks), সভাসদ, কর্মচারী, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, দাস-বান্দা-বাঁদী, কায়িক শ্রমিক, অশ্ব, হস্তী, পাল্কী, তাঁবু অন্যান্য পণ্যসম্ভার, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি—এককথায় সাম্রাজ্যের চলমান রাজধানীর যাবতীয় উপকরণ।

ঔরংজেব যখন মহাসমারোহে দক্ষিণে যাত্রা করলেন তখন দক্ষিণে বসে যুবরাজ আকবর শম্ভুজীকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে, তাঁর অধীনস্থ দলছুট মোগলবাহিনী, শম্ভুজীর নিয়ন্ত্রণাধীন মারাঠা সৈন্য এবং সম্ভব হলে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সাহায্য নিয়ে দক্ষিণের অরক্ষিত মোগল প্রতিরক্ষা ভেদ করে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ বাহিনীর উত্তরদিকে অভিযান করা দরকার। কিন্তু ভয়, সতর্কতা ও অব্যবস্থিত চিত্ততা এই তিনের মিশ্র প্রভাবের মধ্যে থেকে শম্ভুজী বৃথা কালক্ষেপ করলেন—সুযোগ দিলেন সম্রাটকে এগিয়ে আসার। চার বছর ধরে জাঞ্জিরার সিদ্দিদের বিরুদ্ধে, এবং তার সাথে বম্বের ইংরাজ ও গোয়ার পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বৃথা অর্থ, সময়, মানবশক্তি ও সাজসরঞ্জাম নষ্ট করলেন। বড় মাপের ফল কিছু পেলেন না। বিদ্রোহী যুবরাজ শম্ভুজীর দুর্বলতায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে পারস্যের দিকে যাত্রা করলেন। মোগল সাম্রাজ্যের সামনে থেকে দুটি বিপদের মধ্যে একটি বিপদ অপসারিত হল। বাকী রইল শুধু মারাঠা বিপদ।

যে কথাটি লক্ষণীয় তা হল এই যে, ঔরংজেব শম্ভুজীকে কোনও বড় যুদ্ধে, কোনও ফল-নির্ণয়কারী সম্মুখ সময়ে টেনে আনতে পারেননি—এমন কোনও যুদ্ধ জয়-পরাজয়ের ওপর মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বের সমাপ্তি নির্ভর করবে। শম্ভুজী দুটি কাজ করেছিলেন—একটি ঠিক, আরেকটি ভুল। ঠিক কাজটি হল এই যে, তিনি পিতার রণকৌশল অবলম্বন করে বিকেন্দ্রিকৃত দুর্গব্যবস্থা বহাল (“decentralized network of strong points”) রেখেছিলেন। মোগলদের মুখোমুখি মারাটা জনগণের কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় অংশকে এই সমস্ত ছড়ানো ঘাঁটিগুলিতে রাখা হত। এর মধ্যে যেগুলি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আনা হত। এর ফলে মারাঠা প্রতিরক্ষার খরচ কমত আর মোগলদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে হত। এটি ছিল বিকেন্দ্রায়িত সমরব্যবস্থা যা গেরিলা যুদ্ধের সহায়ক। এটি ছিল ঠিক ব্যবস্থা। কিন্তু এই ঠিক ব্যবস্থা নিয়েও তিনি ভুল কাজ করলেন। রাজা হওয়ার আগেই তিনি এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসক দিলির খাঁর (Dilir Khan) আশ্রয়ে। ঔরংজেবের নির্দেশে তিনি ও তাঁর স্ত্রী জেসুবাই মোগল শিবিরে যথেষ্ট স্বীকৃতি পান। সম্রাট স্বয়ং তাঁকে ‘রাজা’ উপাধি দান করেন এবং তাঁকে সাত হাজার জাট-এর মর্যাদা দেন। কিছুদিন বাদে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন ভোঁসলা দরবারে। তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা ও অস্থিরমতিত্বের খবর মোগলদের জানা ছিল। ঔরংজেব তখন দাক্ষিণাত্যে এলেন তখন শম্ভুজীর বয়স উনিশের একটু বেশি। বয়সের অনভিজ্ঞতার সাথ মিশে ছিল পিতৃগুণ ক্ষিপ্রতার অভাব। যথেষ্ট সতর্কতা আর প্রয়োজনীয় খবরও (intelligence) রাখার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেননি। রত্নগিরির ৩৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সঙ্গামেশ্বর নামক স্থানে তিনি কিছুদিন বিশ্রাম করতে লাগলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে সম্রাট তাঁকে ধরার জন্য কি জাল চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। শম্ভুজীর এই গোপন আস্তানার খবর অচিরেই মোগল শিবিরে পৌঁছে যায় (১৬৮৮ খ্রিঃ)। ২৫,০০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মোগল সেনাপতি মকররাব খান এক দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়েন শম্ভুজীর গোপন আস্তানায়। মারাঠা রাজা ও তাঁর ব্রাহ্মণ প্রধানমন্ত্রীকে বন্দী করা হয়। কিছুদিন বাদে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের দেহ কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো হয়। বিজাপুর, গোলকোণ্ডা আর মারাঠা-রাজ্য সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে চলে এল—অধিকৃত হল ২,২১,২০৭ বর্গমাইল এলাকা। এইটিই হল মোগল সাম্রাজ্যের বৃহত্তম সম্প্রসারণ। মোগল সাম্রাজ্যে চারটি নতুন প্রদেশ তৈরি হল—বিজাপুর, বিজাপুর কর্ণাটক, হায়দ্রাবাদ, কর্ণাটক। ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্তে বিগত কয়েকশত বছরে মুসলিম আধিপত্য যতদূর বিস্তৃত হয়েছিল মোগল সাম্রাজ্য তার সমস্ত কিছুই নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাম্রাজ্য-নির্মাণ প্রক্রিয়া তার চরমে পৌঁছাল।

অনুশীলনী ৩

১। নীচের বক্তব্যগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল? (✓) অথবা (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) শিবাজী পারসিক আদব-কায়দায় মানুষ হয়েছিলেন।

(খ) মাওয়ালিরা ছিল এক অলস জাতি।

(গ) শিবাজী ছিলেন মোগলদের দ্রুতগামী শত্রু।

(ঘ) মারাঠারা ছিল সম্মুখযুদ্ধে পারদর্শী।

(ঙ) শিবাজীর দক্ষিণভারত অভিযানকে গ্রাণ্ট ডাফ তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান বলে ব্যক্ত করেছেন।

২। উদীয়মান রাজ্যবিজেতা শিবাজীর কাজ যে তিনটি কারণে সহজ হয়েছিল সেই কারণ তিনটি লিখুন।

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

৩। শিবাজীকে দমন করার জন্য জয়সিংহ কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন? (দশ লাইনে উত্তর দিন)

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) শিবাজীর পর তাঁর পুত্র—————মারাঠাদের শাসক হন।

(খ) শম্ভুজীর বুরহানপুর লুণ্ঠন একটি—————উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল।

৫। মোগলদের বিরুদ্ধে শম্ভুজী কি ধরনের দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিলেন? (পাঁচ লাইনে উত্তর দিন)

....

....

....

....

....

২৬.৭ রাষ্ট্র ও ধর্ম

ঔরংজেবের সময়ে রাষ্ট্র ও ধর্ম অনেকটাই একাকার হয়ে গেছিল। আকবর থেকে শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত যে সময় তাতে মোগল রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম রাজনীতিকে প্রভাবিত করার উপাদান-রূপে তার ভূমিকাকে অনেকটাই হারিয়েছিল। ঔরংজেবের সময়ে ধর্ম আবার রাজনীতির পরিচালিকা শক্তিরূপে প্রকট হয়ে ওঠে। ঔরংজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান, ইসলামীয় দর্শনের **হানাফি** ধারায় বিশ্বাসী। সম্রাট হওয়ার পর সাত বছর ধরে শ্রমসাধ্য অধ্যয়নের পর তিনি **কোরান** মুখস্থ করেছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও রাষ্ট্রিক অবস্থানের মধ্যে ইসলামীয় নৈতিকতার দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করাই ছিল তাঁর প্রথম লক্ষ্য। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তাঁর প্রতি যে ব্যবহার তিনি করেছিলেন তাতে যেমন মুসলিম **শরিয়ার** (Sharia) নৈতিকতা ব্যাহত হয়েছিল সেইরকম পিতাপুত্রের সম্পর্কের যে ধর্মীয় পবিত্রতা (‘filial piety’) তাও বিনষ্ট হয়েছিল। অতএব সম্রাট হওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজ হল নিজের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরা। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে হিজাজের (Hijaz) পবিত্র শহরগুলোর শাসক শরিফ জায়েদ (Sherif Zaid)-এর কাছে বিরাট মিশন প্রেরণ করেন। অনেক ঐশ্বর্য আর উপঢৌকন দিয়ে তিনি শরিফ জায়েদ-এর মন জয় করতে চেয়েছিলেন। এই মিশন সফল হয়নি। এর পরে অনুরূপভাবে তিনি একটি কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেন। সাফী মুস্তাদ খাঁ তাঁর **মাসির-ই আলমগীরী**-তে বলেছেন যে, এর পর থেকে ঔরংজেব মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার নানা পবিত্র স্থানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি নিজের হাতে **কোরানের** প্রতিলিপি রচনা করে মদিনা শহরে দান করেছিলেন। এইভাবে পবিত্র ধর্মীয় সমাজে ঔরংজেব নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

এর পরে ঔরংজেবের কাজ হল মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে শুদ্ধ ইসলামীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। **শারিয়া** ভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির নতুন উদ্বোধন হল—এর ফলে নিমজ্জিত হল আকবরের উদারনৈতিক সর্বসমন্বয়ের নীতি যা বিবিধের অবয়বে ঐক্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এতদিন ধরে মোগলরাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক দর্শন চালু ছিল তাকে ঐতিহাসিকরা একটি ‘inclusive political culture’—সবাইকে গ্রহণ করে বিকশিত হওয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই রাষ্ট্রদর্শন এবার মার খেল। “স্থির হল ইসলামীয় আদর্শের নতুন লক্ষ্য : মোগল সাম্রাজ্যকে নিশ্চিতভাবে হতে হবে একটি মুসলিম রাষ্ট্র যা শারিয়ার নিয়মে শাসিত হবে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের স্বার্থে।” এইরকম ধর্মরাষ্ট্র কাফের জনগণকে ধর্মান্তরিত করার কাজকে পৃষ্ঠপোষকতা করবে। এটি ছিল কাফের জনগণের ধর্মান্তকরণের (‘conversion of the infidel population’) রাজনীতি। এই নীতির নতুন প্রবর্তন ঘটল মোগল সাম্রাজ্যে। যদি এই নীতির অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর কঠোর শাসন বলবৎ করা হবে। এইটিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আসলে ঔরংজেব চেয়েছিলেন যে, মোগল সাম্রাজ্য হবে রক্ষণশীল সুন্নী ইসলামের রাজ্য যেখানে আদি খলিফাদের প্রদর্শিত নীতি চালু থাকবে। অক্সফোর্ড হিস্টরি অফ ইন্ডিয়ার ঐতিহাসিক বলেছেন যে, সম্রাট বিবেকের দ্বারা তাড়িত হয়ে এ আদর্শকে বেছে

নিয়েছিলেন এবং যে কোনও রাজনৈতিক বিপদের ঝুঁকি বা রাজস্ব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাকে অনায়াসে স্বীকার করে নিয়েও তিনি তাঁর নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃত রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ধর্মবোধকে আড়াল রেখে তিনি নির্বিকারভাবেই এমন নৃশংসতার পরিচয় দিতেন যা মানুষের বোধকে রক্তাক্ত করে তোলে, কিন্তু হিংসার এই অনুষ্ঠান রাষ্ট্রকে সংহত ও স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রযুক্ত হত এবং এর দ্বারা সুন্নীশাসকের ধর্মবোধ বিনষ্ট হত বলে তিনি মনে করতেন না। অন্য যে কোনও স্বৈরাচারী শাসকের মতই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী—নৈতিকতার নিয়মকে তিনি রাষ্ট্রশাসনের বাইরে রেখেছিলেন। তার ফলেই ধর্মীয় শাসন ও রাজনৈতিক শাসনের উপাদানকে পরস্পরের বিনিময়যোগ্য উপাদান হিসাবে তাঁর পক্ষে ধরে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ঔরংজেব নিজেকে মুসলিম রাজ্যবিজেতাদের উত্তরসূরী বলে ভাবতেন, ফলে এ বোধকে কখনোই তিনি প্রশ্রয় দেননি যে তিনি ঐশী প্রেরণায় সমুজ্জ্বল প্রজ্ঞার উত্তরাধিকারী। ফলে আকবর প্রবর্তিত সম্রাটদর্শনের ঐতিহ্যকে অ-ইসলামিক বলে তিনি বন্ধ করে দেন। সূর্যোদয়ের ভোরে সম্রাট এসে প্রাসাদের সু-উচ্চ অলিন্দে দাঁড়াবেন আর দূর থেকে প্রজারা রাজদর্শনের পর আনত হবে। এই প্রথা আকবরের সময় থেকে চালু ছিল। ঔরংজেব তা বন্ধ করেন। ইতিহাস রচনা, রাজবিবরণ প্রস্তুত করা, পুস্তক-চিত্রাঙ্কন (illustration) ইত্যাদিও তিনি বন্ধ করে দেন। তাঁর নিজ রাজত্বের দশম বছরে পর **আলমগীরনামা**-র রচনাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে গোপনে ব্যক্তিগতভাবে রচিত ইতিহাসই তাঁর রাজত্বকালের সাক্ষ্য বহন করে রয়ে গেছে। এতদিন ধরে মোগল-সভায় চিত্রকররা থাকতেন। এবার তাদের বিদায় করে দেওয়া হল। ঔরংজেব তাঁর সময়ে কোনও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে দেননি। জাহাঙ্গীরের সময়ে যে বাগান কিংবা আকবর ও শাহজাহানের সময়ে যে সৌধরাশি নির্মিত হয়েছিল তা আর ঔরংজেবের সময়ে দেখা গেল না। এর ফলে সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে এল এবং মোগল বৈভবের অভিজ্ঞানগুলির আর কোনও নতুন প্রকাশ ঘটল না। এতদিন ধরে যে মোগল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। একদিকে তা ছিল **eclectic** বা মিশ্রিত, অন্যদিকে **inclusive** বা সমাহৃত। ইসলামের দ্বারা সমর্থিত নয় এইরকম প্রথা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে মোগল রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই মিশ্রিত ও সমাহৃত চরিত্র নষ্ট হল। নিজের দ্বিতীয় অভিষেকের পর ইরানীয় নববর্ষ বা **নওরোজ** অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হল। সৌরবর্ষের (solar year) শুরুতে এই অনুষ্ঠান হত। ইসলাম যেহেতু চান্দ্রবর্ষের (lunar year) অনুসারী সেহেতু এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই বছর সম্রাট দরবারের সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদ্যকারদের বরখাস্ত করে দিলেন—সাম্রাজ্যে সঙ্গীত নিষিদ্ধ হল। এইভাবে হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের বিকাশশীল ধারাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হল। মদ ও আফিং সেবনও বন্ধ করার জন্য আইন করা হল। সম্ভ্রান্তদের সঙ্গে সম্ভ্রান্তদের এবং সম্রাটের সঙ্গে অভিজাতদের দেখাসাক্ষাৎ কমিয়ে দেওয়া হল। একমাত্র সম্রাটের ঘনিষ্ঠ পদস্থরাই তাঁর চারপাশে রইলেন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রশাসন-ব্যবস্থায় একটা বড় ব্যাপার ছিল 'সম্রাট-সম্ভ্রান্ত যোগাযোগ' ('emperor-noblelink')। তা এবার বন্ধ হয়ে গেল।

ঔরংজেব ইসলামিক রাষ্ট্রসাধনার সবচেয়ে বড় ফসল হল **ফতাওয়া-ই-আলমগীরী**-র (Fatawa-i-Alamgiri) সংকলন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রথা ছিল এই যে, রাজ্যশাসন ও বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত কোনও গুরুতর প্রশ্নে স্বাধীন আইনবিদ্, প্রশাসক, বিচারবিদ ও বিচারকদের মতামত নেওয়া হত। তাঁরা যে মতামত দিতেন তাকে বলা হত **ফতাওয়া**। এই ফতাওয়াগুলি ছিল নানা ধরনের। তাদের মধ্যে ইসলামীয় আইন সম্বন্ধে অস্পষ্টতা থাকত এবং অনেক সময়ে তা পরস্পরবিরোধী হত। এই সমস্ত **ফতাওয়াগুলির** মধ্যে যেগুলি **হানাফি** মতের সেইগুলিকে একত্রিত করে মুসলিম শাসক ও জনগণ উভয়ের স্বার্থে উলেমাদের দিয়ে প্রত্যেকটি **ফতাওয়া** পর্যালোচনা করিয়ে তাদের সংকলিত করা হয়। এইটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত আইনের সংকলন।

এইভাবে ধ্যানে আর চিন্তায় যিনি সর্বক্ষণের রক্ষণশীল সুন্নী মুসলমান তাঁর পক্ষে মুসলমান-ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের স্বার্থ দেখা সম্ভব নয়। ঔরংজেব দেখেনওনি। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দশম বছরে তিনি টাট্টা, মুলতান ও বারাণসীতে ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্ম প্রচার করছে জেনে তাদের ওপর অত্যাচার করেছিলেন। মথুরার কেশবদেবের ও বারাণসীর বিশ্বনাথের মন্দির ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। **মাসির-ই আলমগীরীতে** কেশবদেবের মন্দির ভাঙ্গার যে বর্ণনা আছে তা এইরকম : "আল্লাহর গৌরব হোক [ঐতিহাসিকের উচ্ছ্বাস]—কারণ তিনি আমাদের ইসলামের ধর্মমত দিয়েছেন, কারণ ঝুটো ঠাকুরের সংহারকের রাজত্বকালে এমন একটি দুঃসাধ্য কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে [কেশবদেবের মন্দির ধ্বংস হয়েছে]। সঠিক ধর্মবিশ্বাসকে [অর্থাৎ ইসলামকে] এইরকম শক্তশালী মদত দেওয়ার ফলে রাজাদের ঔদ্ধত্যকে আঘাত হানা গিয়েছিল এবং মূর্তিগুলির মত তারা দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন বিপন্নভাবে। মূল্যবান মণিমুক্তখচিত মূর্তিগুলি আগ্রায় নিয়ে আসা হয় এবং নবাব বেগম সাহেব মসজিদের সোপানরাজির তলায় তাদের বসানো হয় যাতে সত্যবিশ্বাসীরা [ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা] প্রতিনিয়ত পায়ের তলায় তা দাবাতে পারে। মথুরার নাম বদলে রাখা হয় ইসলামাবাদ এবং এই নামেই নথিপত্রে ও জনগণের কথায় তা উল্লিখিত হয়।"

এই বিপজ্জনক ধ্বংসলীলার ফল কী তা ঔরংজেব জানতেন। হিন্দু রাজা ও হিন্দু জনগণের ওপর এর রাজনৈতিক প্রভাব সম্যকভাবে উপলব্ধি করেও ঔরংজেব যে এই পথ থেকে বিচ্যুত হননি তার কারণ তাঁর ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন সৎ ও সঙ্কল্পবদ্ধ। শুধু তিনি বুঝতে পারেননি যে, যতই থাকুক না কেন বিশ্বাস ও বিশ্বাসের গর্ভ থেকে উঠে আসা আবেগ যদি অন্যের বিশ্বাসকে আঘাত করে তা কখনোই সাধারণ্যে পালনীয় নীতি হওয়া উচিত নয়। ধর্মান্ধ হওয়াতে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ তাঁর ছিল না। তাই হিন্দু ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর তিনি **জিজিয়া কর** স্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। হয়ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যে ধনক্ষয় তিনি ঘটিয়েছিলেন তার জন্য তাঁর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তার জন্য বিধর্মী বলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর স্বতন্ত্র কর বসানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না। হিন্দুরা সহজে এই করকে মেনে নেয়নি। স্টিউয়ার্ট লিখেছেন যে, বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীগুলো এই কর দিতে অস্বীকার করে। হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করে সম্রাটকে চিঠিও দিয়েছিল। এ চিঠিতে তারা সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁর পূর্বপুরুষরা হিন্দুদের প্রতি কি সহৃদয় ব্যবহার করতেন যার ফলে তাঁরা বহু দুর্গ ও জনপদ দখল করতে পেরেছিলেন। আর সম্রাট ঔরংজেবের সময়ে? হিন্দুরা সম্রাটকে লিখল : "আপনার রাজত্বকালে অনেকে সাম্রাজ্যের প্রতি বিরূপ হয়েছে, এর পরে নিশ্চিতভাবে আরও রাজ্যক্ষয় হবে কারণ লুঠতরাজ ও ধ্বংসলীলা সর্বত্র অবাধ ও সর্বজনীন হয়ে পড়েছে।" সম্রাট জানতেন যে, সাম্রাজ্যের অন্তর্সংহতি কিরকমভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। তা সত্ত্বেও ধর্মান্ধ শাসক শোষণের রূঢ় হাত দিয়ে অ-মুসলমানদের কণ্ঠ চেপে ধরেছিলেন। ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তাদের মন্দির—সর্বত্র এবং প্রায় সারাজীবন ধরে। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে যোধপুরে অসংখ্য মন্দির ভাঙ্গার জন্য খান জাহান বাহাদুরকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন সম্রাট। ১৬৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরে ভেঙ্গেছিলেন ১২৩টি মন্দির, চিতোরে ৬৩টি এবং অম্বরে (জয়পুর) ৬৬টি। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন নতুন মন্দির গড়া চলবে না। কিন্তু তিনি যা ভেঙ্গেছিলেন তা শুধু নতুন মন্দির নয়—অসংখ্য পুরনো কাঠামো যার মধ্যে নিদর্শন ছিল বিস্ময়কর হিন্দুশিল্পের।

বিধর্মীদের প্রতি যখন তিনি নির্মম তখন **উলেমাদের** প্রতি তিনি মুক্তহস্ত, উদার। পুরনো মসজিদের সংস্কার ও নতুন মসজিদ নির্মাণ এই দুই কাজের জন্যই তিনি অর্থ ও নিষ্কর জমি দান করতেন। ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিন্দুদের সমস্ত নিষ্কর জমি কেড়ে নেন। হিন্দুদের সম্পত্তিচ্যুত করার এই আইন অবশ্য সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়নি। কিন্তু সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার আইন যে হয়েছিল এইটিই **উলেমাদের** সবচেয়ে বড় জয়, কারণ হিন্দুদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা বহু জমি এই উলেমা ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। এই পৃষ্ঠপোষকতার

ফলে মোগল সাম্রাজ্যের এক বিরাট ধর্মান্ধ **উলেমা** সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এইসব **উলেমা, কাজী, শারিয়া** পণ্ডিতদের অভ্যুদয় রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি। এইসব মানুষরা ছিল সঙ্কীর্ণ, যুদ্ধ আর প্রশাসনে তাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। তদুপরি তারা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ ও লোভী। ষোল বছর ধরে আব্দুল ওয়াহাব (Abdul Wahhab Bohra) ছিলেন প্রধান **কাজী**। তাঁর মতন দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সাম্রাজ্যের অবস্থা কত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। আতহার আলি বলেছেন যে, একজন পারসিক আমীর মীর্জা লহরাসপ্ মহাবাত খান চড়ুই পাখির মত ক্ষুদ্র জীবকে শিকারী ব্যাধে পরিণত করার নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। ঔরংজেব এই প্রতিবাদকে গ্রাহ্য করেননি। প্রথম থেকেই ধর্মান্ধতায় তিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় অভিষেকের পরই তিনি **মুহতাসিব** (Muhtasib) নামে নৈতিকতার নজরদারদের একটি পদ সৃষ্টি করেন। শুধুমাত্র **উলেমাদের** মধ্য থেকেই এই পদে নিয়োগ করা হত। শহরের বাজারগুলিতে যাতে জনগণের ওপর কোনও জুয়াচুরি বা মিথ্যাচার না চলে, সেখানে যাতে কোনও গোলযোগ সৃষ্টি না হয় তা দেখার দায়িত্ব ছিল এই নজরদারদের। কোনও স্থানে ধর্মের বিরোধিতা (blasphemy), মদ্যপান, জুয়াখেলা, পুতুলপূজা ইত্যাদি যাতে না হয় এবং সর্বত্র যাতে শারিয়ার আইন বলবৎ থাকে তা দেখার জন্যে **মুহতাসিবদের** নিয়োগ করা হয়েছিল। এর আগে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনে কোনদিন যা হয়নি এবার তাই হল। **মুহতাসিবরা কোতয়ালের** দায়িত্ব গ্রহণ করল। মোগল সাম্রাজ্যে ঐহিক (Sewlar) প্রশাসন ও ধর্মীয় প্রশাসন এক হয়ে গেল।

২৬.৮ সারাংশ

ওপরে যে আলোচনা আপনারা পড়লেন তার থেকে দুটি ধারণা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হবে। এক, ঔরংজেব ছিলেন শেষ শক্তিশালী মোগল সম্রাট যিনি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ যেমন ঘটিয়েছিলেন সেইরকমভাবে সাম্রাজ্যের সীমানা-সংরক্ষণেও সফল হয়েছিলেন। অর্থাৎ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের যে মোগল ধারা আকবর তৈরি করে গিয়েছিলেন সে ধারা ঔরংজেবের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ঔরংজেব মারা যান ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে। সমস্ত সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে তাই মোগল সাম্রাজ্যের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। দুই, ঔরংজেবের রাজত্বকালেও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহতি ভেঙ্গে যায়। আফগান ও রাজপুত শক্তিকে আঘাত করে ঔরংজেব সাম্রাজ্যের দুটি বড় ও নির্ভরযোগ্য যোদ্ধৃজাতিকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন, যার ফলে রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে আফগানদের আর মারাঠাদের সঙ্গে লড়াইয়ে রাজপুতদের পূর্ণ সহযোগিতা তিনি পাননি। আফগানদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়ে দক্ষিণভারতকে অবহেলা করতে হয়েছিল যার সুযোগ নিয়ে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাজাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আবার যখন তিনি দক্ষিণভারতে গেলেন তখন উত্তরভারত অবহেলার মধ্যে ডুবে গেল। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা দখলের পর তাঁর উত্তরভারতে ফিরে আসার সুযোগ ছিল কিন্তু তিনি ফেরেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টারা তাঁকে ফেরার পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করেননি। এতে সাম্রাজ্যের মঙ্গল হয়নি। বলা হয়ে থাকে যে 'দক্ষিণী ক্ষত' A Deccan ulcer—তাঁর সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। আসলে গোলকোণ্ডা আর বিজাপুর জয় করে বিপুল ঐশ্বর্য এবং বিরাট রাজ্যাংশ মোগলদের দখলে এসেছিল। দক্ষিণে মোগল সাম্রাজ্যের চারটি প্রদেশ নতুন করে যোগ হয়েছিল। কিন্তু হলে কি হবে, অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মোগল সম্ভ্রান্তদের মধ্যে দক্ষিণ অভিজাতদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। এতে **মনসবদারদের** প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছিল। এমনিতেই **মনসবদাররূপে** রাজপুতদের সংখ্যা কম ছিল। তার ওপর এল নতুন করে মারাঠা, দক্ষিণী মুসলমান এবং কিছু কিছু আফগানরাও। রাজপুত **মনসবদাররা** তা পছন্দ করেনি। সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে দক্ষিণ-বিজয়ের পর আত্মসন্তুষ্টির সময় পেয়েছিলেন কারণ শুধু গোলকোণ্ডার বিজয়ের পরই রাজস্ব বেড়েছিল ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। আর এসেছিল বিপুল পরিমাণ সোনা-রূপা-মণি-মাণিক্য। অর্থ আর রাজ্যাংশ লাভ করলেও মোগল সাম্রাজ্যের মানবমিশ্রণ

বদলে গিয়েছিল। ঔরংজেব যখন দক্ষিণে এসেছিলেন তখন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় বাহিনী (central army) এবং সমস্ত বড় বড় দক্ষ-অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য সেনাপতিদের নিয়ে তিনি এসেছিলেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে সৈন্যের সুষম বণ্টন হয়নি। অন্যদিকে রাঠোর ও শিশোদিয়া রাজপুতরা উত্তরে আর শিবাজীর অধীনে মারাঠারা দক্ষিণে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিল। গেরিয়া যুদ্ধ আর পাহাড়ে যুদ্ধ—এই দুই ব্যাপারেই মোগলবাহিনী ছিল অদক্ষ। তাই উত্তর-পশ্চিমে আফগানদের সঙ্গে এবং দক্ষিণে মারাঠাদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী সাফল্য মোগলরা লাভ করতে পারেনি। মোগল সৈন্যবাহিনীর ভিতরে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। সম্রাট যতদিন উত্তরে ছিলেন তখন দাক্ষিণের মোগল সেনাপতিরা আলস্যে নিমগ্ন হয়েছিল এবং অকারণে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করে চালু রাখার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ থাকলেই সৈনিকদের উপার্জন বাড়ে এই ধারণা বহুক্ষেত্রে মোগল সীমান্তে যুদ্ধকে থামতে দেয়নি। সম্রাট নিজেই মনে করতেন যে, মোগলবাহিনীর মধ্যে অসাবধানতা আর বিশ্বাসহীনতা বাড়ছিল। আগ্রা থেকে শিবাজীর পলায়ন এবং শেষপর্যন্ত তাঁর নিজের রাজ্যে তাঁর প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করেছিল যে, মোগল অভ্যন্তরীণ পাহারাদারি ও নজরদারি ব্যবস্থা অনেক কমে গেছে, যেমন কমে গেছে রাষ্ট্র পর্যায়ে তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা। আগ্রা থেকে শিবাজীর পলায়ন করার পর শেষ অবধি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করা মোগলদের সম্ভব হয়নি। নজরদারি ও সংবাদ সরবরাহের ঘাটতি ছিল তা না হলে শায়েস্তা খান মারাঠাদের হাতে পরাজিত হবেন কেন? সম্রাট সন্দেহ করতেন যে, যশোবন্ত সিংহ বা যুবরাজ মুয়াজ্জমের মত উচ্চ পর্যায়ের মানুষরা মারাঠাদের প্রতি দুর্বলতা দেখাচ্ছেন, হয়ত বা মারাঠাদের কাছ থেকে বিপুল উপঢৌকনও তাঁরা লাভ করেছেন। সন্দেহপ্রবণ সম্রাট তাঁর সন্দেহ নিরসনের কোন উপায় খুঁজে পাননি। শিবাজীর দ্বারা দুবার সুরাট লুণ্ঠন, শায়েস্তা খানের পরাজয়, যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরতে না পারা মোগল সাম্রাজ্যে মর্যাদাকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিল। পূর্বদিকে শায়েস্তা খান মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণের কাজ যেমন অব্যাহত রেখেছিলেন সেইরকম পশ্চিম দিকে ঘটছিল তার বিপরীত ঘটনা। সেখানে সুরাট বন্দরের চারপাশে—মোগল প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। পশ্চিমদিকে মোগল স্থিতিশীলতা যখন কমে আসছিল তখন পূর্বদিকে মোগল প্রতাপ বাড়ছিল। একইরকমভাবে দক্ষিণে যখন মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও সংহত হচ্ছিল তখন উত্তরদিকে তার সুস্থিতি কমছিল। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মথুরা জেলায় গোকুলের নেতৃত্বে জাঠরা এবং ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে পাতিয়ালার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সৎনামীরা বিদ্রোহ করে। এর সাথে সাথে হিন্দুদের মধ্যে এক বিরাট বিক্ষোভ দেখা দেয়। মন্দির ভাঙ্গার কলঙ্কজনক রাজনীতির সাথে মিশে ছিল জিজিয়া কর স্থাপনের মধ্যে দিয়ে অ-মুসলমান প্রজাবর্গ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের অর্থনৈতিক শোষণের নীতি। শিখদের নবম গুরু দেগবাহাদুরকে হত্যা করার পর শিখরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। হিন্দুরা সম্রাটের কাছে যে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিল তার সঙ্গে জড়িয়েছিল রাজপুত ও মারাঠারা। সাম্রাজ্যের সর্বাধিক সম্প্রসারণের মুহূর্তেই এইভাবে সাম্রাজ্যের সংহতি ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ধর্মান্ধতা আর পররাজ্যলোলুপতা এই দুই-ই সম্রাটের জীবদ্দশাতেই তাঁকে এক হিংস্র নিয়তির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। দক্ষিণের মুসলিম রাজ্যগুলি আক্রমণ করার জন্য ধর্মপ্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। **উলেমাদের** সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার ফলে প্রগতিশীল উদারনৈতিক মুসলমানরা তাঁর থেকে দূরে সরে গেছিল। অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে শিখ-জাঠ-সৎনামীরা কঠোর হয়েছিল। ধ্বংস আসন্ন জেনে হিন্দুরাও প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আত্মজের বিদ্রোহ সম্রাটের পারিবারিক শান্তিকে বিনষ্ট করেছিল। আর রাজপুত-মারাঠা ও আকবরের নেতৃত্বে বিদ্রোহী মোগলরা অন্তরাল থেকে বিজাপুর সুলতানদের মদত পেয়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছিল। বোঝাই যাচ্ছিল যে, মোগল সাম্রাজ্য তার শান্তি আর সুস্থিতি হারিয়েছে। এটি হল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা। অষ্টাদশ শতাব্দী শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্য বিপর্যয়ের কোলে ঢোলে পড়ল।

২৬.৯ অনুশীলনী

১। নীচের উক্তিগুলি ঠিক (✓) বা ভুল (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) ঔরংজেবের সময়ে ধর্ম-রাজনীতির পরিচালিকা শক্তিরূপে প্রকট হয়ে উঠেছিল।

(খ) ঔরংজেব আকবরের উদারনৈতিক সর্বধর্মসমন্বয়ের নীতিকে বজায় রেখেছিলেন।

(গ) ঔরংজেবের ইসলামিক রাষ্ট্রসাধনার সবচেয়ে বড় ফসল হল আলমগীর-নামা।

(ঘ) হিন্দু ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর ঔরংজেব জিজিয়া কর স্থাপন করেছিলেন।

২। মোগল সাম্রাজ্য কখন ও কিভাবে ঐহিক প্রশাসন ও ধর্মীয় প্রশাসন এক হয়ে গিয়েছিল? (দশ লাইনে উত্তর দিন)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) ————— নেতৃত্বে মারাঠাজাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

(খ) —————————— শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্য বিপর্যয়ের কোলে ঢলে পড়ল।

৪। ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয় কি ভ্রান্ত হয়েছিল?

৫। মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বে উত্তর-শিবাজী পর্যায় আলোচনা করুন।

২৬.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. Tod : Annals and Antiquities of Rajasthan.
2. Smith, V. A. : The Oxford History of India.
3. Sarkar, Jadunath : History of Aurangzib.
4. Sarkar, Jadunath : Sibaji and His trees.
5. Ali, Alhav : Mughal Nobility.
6. S. R. Sarma : Mughal Empire in India.
7. Bhargava, V. S. : Marwas and the Mughal Emperors.
8. Holliseg, Robert e : The Rajput Rebellion against Auranjeb.

একক ১৯ □ মোগল সাম্রাজ্যের পতন

গঠন

১৯.০ উদ্দেশ্য
১৯.১ প্রস্তাবনা
১৯.২ মোগল সাম্রাজ্যের পতন
১৯.৩ মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংকট : অভিজাতদের পতন : ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনতন্ত্রের ধারণা
১৯.৪ মোগল সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক সংকট : সমীক্ষা
১৯.৫ [illegible] উত্তরাধিকারী ও জায়গীরদারি [illegible] সমস্যাগুলির মোগল সাম্রাজ্যের পতন
১৯.৬ সারাংশ
১৯.৭ অনুশীলনী
১৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ
- মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংকট
- মোগল সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক সংকট
- জায়গীরদারি [illegible] সমস্যা প্রভৃতি

১৯.১ প্রস্তাবনা

[illegible] একটি [illegible] [illegible] পরে [illegible] [illegible] মোগল সাম্রাজ্য। আবার অবক্ষয়মূলক সময় তার [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] পরে থেকে মোগল সাম্রাজ্য ভাঙতে শুরু করে। [illegible] অবক্ষয় সময়ের [illegible]-সম্রাটের পরে আসে অবক্ষয়, তার এই অবক্ষয় [illegible] সাথে [illegible] এবং [illegible] সাথে [illegible] ও [illegible] সম্রাটের অবক্ষয় [illegible]। [illegible] [illegible] দেখা দেয় [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] থেকে [illegible] মোগল সাম্রাজ্যের [illegible] পরে এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই অবক্ষয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

কেন্দ্রীয় মোগল সাম্রাজ্য-পতনের [illegible] মোগল সাম্রাজ্যের পতনের [illegible] কারণগুলি [illegible]। [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] ফরাসি-ইংরেজ-[illegible] প্রতিষ্ঠান। মোগল সাম্রাজ্যের পতন এই [illegible]।

১৭.২ মোগল সাম্রাজ্যের পতন

১৫২৬ [পানিপথের প্রথম যুদ্ধ] ও ১৭০৭ [ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু]—এর মধ্যে প্রায় দুই শত বছর ধরে রাজত্ব করেছেন বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত ছয়জন সম্রাট। তাদের Great Mughals বা Greater Mughals বলা হয়। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত সময় বা পঞ্চাশ বছরের কিঞ্চিৎ অধিক কালের মধ্যে ১১ জন শাসক রাজত্ব করেছেন। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগল শাসকদের Later Mughals বা Faineant Emperors বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক

ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগল সম্রাটরা—

1. বাহাদুর শাহ (১৭০৭—১৭১২)
2. জাহান্দার শাহ (১৭১২—১৭১৩)
3. ফাররুখশিয়ার (১৭১৩—১৭১৯)
4. রফি-উদ-দরজাত (১৭১৯)
5. নিকুসিয়ার (১৭১৯)
6. রফি-উদ-দৌলা (১৭১৯) (দ্বিতীয় শাহজাহান)

(৪–৬: ১৮ ফেব্রুয়ারি—২৭ আগস্ট, ১৭১৯)

7. ইব্রাহিম (১ অক্টোবর—৮ নভেম্বর, ১৭২০)
8. মহম্মদ শাহ (১৭১৯—১৭৪৮)
9. আহম্মদ শাহ (১৭৪৮—১৭৫৪)
10. দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪—১৭৫৯)
11. দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯—১৮০৬)
12. দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬—১৮৩৭)
13. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭—১৮৫৭)

জাহান্দার শাহ ও ফাররুখশিয়ারকে হত্যা করা হয়। রফি-উদ-দরজাত ও নিকুসিয়ার কিছু অল্পকাল [illegible]। রফি-উদ-দৌলা মারা যান। [illegible] ও [illegible] মহম্মদ শাহ [illegible] ইব্রাহিম [illegible] কয়েকজনের মধ্যে শাসক [illegible] আহম্মদ শাহকে [illegible] বন্দি করা হয় এবং তাঁকে অন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় আলমগীরকে হত্যা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় শাহ আলম [illegible] [illegible] [illegible] দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়ে বন্দি হন এবং তাঁকে রেঙ্গুনে চালান করে দেওয়া হয়।

ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের শাসনকাল [illegible] মোগল সাম্রাজ্যের 'অপরাহ্ন বেলা' (Post-Meridiem) বলে বর্ণনা করেছেন। বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারীদের আমলকে সাম্রাজ্যের 'সূর্যাস্তকাল' (Sunset of the Empire)। তাদের পরবর্তী শাসকদের উত্তরাধিকারীদের কালকে সাম্রাজ্যের 'নিশাকাল' (Nightfall

of the Empire)। ঐতিহাসিকরা এইরকম দাবিও তোলেন যে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ মোগলদের নৈতিক অবক্ষয়। ঐতিহাসিক মেকলে (T. B. Macaulay) একবার লিখেছিলেন যে, ঔরংজেবের পরবর্তী শাসকদের "ইতিহাস হল একাধারে দুর্বল ও অলস শাসকদের কাহিনি যাঁরা ছিলেন সুরায় মত্ত ও ব্যভিচারে নিমজ্জিত" ("the story of a succession of weak and indolent sovereigns soaked in wine and sunk in debanchery")। শাসকদের অসংযত রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র। নৈতিকতার এই মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকরা সামরিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা থেকেও মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। অবশ্য রাজনৈতিক সংকটকে তাঁরা অস্বীকার করেন না। কেননা একটি আঞ্চলিক ক্ষেত্রের সামগ্রিক আলোচনা এইভাবে শুরু হয়েছে—"শক্তিশালী সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যুর পরেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং তা অবশেষে তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে সেই প্রক্রিয়া আরো দ্রুততর এগিয়ে চলে। তবে রাজনৈতিক সমস্যার অবক্ষয়ই মোগল সাম্রাজ্যের এই সংকটের জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে মনে করা হয়।" একটি মোগল অভিজাতকেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক সংকটে। অথবা তার শাসক ও রাজনৈতিক সংকটকেই থেকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। তার সঙ্গে তৃতীয় ১৭০৭ ...

১৭.৩ মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংকট : সংজ্ঞায়ন সংক্রান্ত : বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা

তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মোগল সম্রাটদের চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটেছিল, যার ফলে দুর্বলতা তাঁদের গ্রাস করে। অভিজাতবর্গকেও হারেমে অসংযমে কালযাপন করা, বিলাসবহুল খাদ্য পানাহার, মোসাহেব ও চাটুকারদের দ্বারা পরিবৃত থাকা ইত্যাদির ফলে অনেক সম্রাটই বিকৃত হয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ আধ্যাত্মিক আফিং সেবন করতেন। ফলে ঔরংজেবের পরে শাসকরা যে কর্মক্ষমতা হারিয়েছিলেন তা তাঁর অযোগ্য শাসকদের হাতে পড়ে দেখা যায়। শাসকের দুর্বলতা তাঁদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। ইরভাইন তাই লিখেছেন যে, "তাঁর ছিল একজন বারাঙ্গনার হৃদয় যিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয় করতেন ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে উঠেছিলেন নিঃসন্দেহভাবে আমোদপ্রমোদে। যেমন জাহান্দার শাহের উপপত্নী ছিল লাল-কুঁয়ার-নামে এক নর্তকী। নিজের শরীরকে সাজসজ্জা সাজিয়ে রাখতে এবং পোশাক ও মূল্যবান গহনাগাঁটি ক্রয় করতে" ("the heart of a courtesan, devoting all his energy to the adornment of his person and the purchase of clothes and high-priced jewels...") তাঁর সম্পর্কে এই উক্তিটি যথার্থ ছিল।

আরাম ও শান্তি মিত্রতা বা ঋণ।

কুই জল-তু-দানা, যমনা বোর্স-সরাক।।

"উজির তখন আদায় ও ফিরিয়ে নয়ে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজের বেপরোয়া সুখভোগ করেন।" তাহলে তাঁর মনে এই উক্তিটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, দরবারের সৌন্দর্য নিঃস্বার্থ দায়িত্বের প্রতি উদাসীন হয়েছিল। আরও মজা—এর মোগল সম্রাট নিজে শাসনকার্যের প্রতি নিঃস্পৃহ হয়ে পড়েছিলেন—তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখেছেন— "আজকাল শাহ একেবারেই সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন—বিলাসিতা, ব্যক্তিগতভাবে সহজ প্রকৃতি তাঁর পরবর্তী দুর্বলতা প্রকাশ করেন।" তাঁর সম্পর্কে তাঁর এক মোগল বংশ বলেছিলেন যে, তাঁর ইনসাফ ছিল সর্বোচ্চের অভাবের পথ, বরং পড়েছে। তাঁর সম্পর্কে তাঁর এক সময় আসল চরিত্র পরিস্ফুট হয়।

ইতিহাসবিদ সরকার, কুরেশি, এম. আর. শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিকরা যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে বলেছেন তা খুব সত্যি, দরবার, শাসকদের সকলেরই বশ্য হয়েছে তা নয়। তাঁদের কথা এই বাক্যের পরিবর্তে, অভিজাত শ্রেণি, সেনাপতি, সর্বোচ্চ আমলাদের অবস্থান নষ্ট হয়। তার এই অবস্থান থেকে অন্যান্য ব্যক্তি শাসকদের অযোগ্যতা প্রকট হয়, অপচয়পূর্ণ অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও আমলাতান্ত্রিক শাসনের ব্যর্থতার ফলে পরে দেখে নিয়েছিল। এ সময়ে সর্বোচ্চ সরকারের যে ভুল এককভাবে সমাধান বংশানুক্রমে করা তা এখন আমলাতন্ত্রের হাতে আবার দেওয়া হল। ছিল ছিলেন : "মোগল প্রশাসনের ত্রুটিপূর্ণ আইনের কারণে আমলাতন্ত্র অভাবের থেকে বিশৃঙ্খলা তার প্রকৃত ছিল না। অভিজাতবর্গ এক অপূর্ণতাকে প্রশ্রয় করতেন। তাঁদের যোগ্য উত্তরাধিকারী তাঁদের ঔরসজাত কোনও সম্ভাবনা দেখে যেতে পারতেন না। আবার ধনী বণিক এবং জমিদার, শাহজাদা এবং পারিষদবর্গ, উপাধিধারী এবং কুসংস্কার নাম দিয়ে যাঁরা—যাঁরা সম্ভাব্য শাসকে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্তৃত্ব বহন করেছেন—তাঁদের মধ্যে তাঁদের যোগ্যতার অনেক প্রভাব তাঁদের কোনও সৎ প্রশিক্ষণের কোনও সুযোগ করেননি।" কার্যক্রমের মধ্যে ঘটে করেন, এর ফলে অযোগ্য শাসকবর্গের সৃষ্টি। তাঁরা মুখে চাটুকারদের দ্বারা পরিবৃত থেকে ষড়যন্ত্রপরায়ণ আমিরদের অধীনস্থ চলতেন। ফলে কখনও সংকল্পবদ্ধ হতে পারেননি। এছাড়া সমস্ত ক্ষমতা ফলে এক আমিরকে দিয়ে দেওয়ার

[illegible]

[illegible] —“the worst ruler imaginable of an empire composed of many creeds and rules, of diverse interests and ways of life and thought.” [illegible]

[illegible] “personality-oriented historians of an earlier generation”— [illegible] ‘সংকট’ (crisis) [illegible] ‘পতন’ (Decline) [illegible]

১৭.৪ মোগল সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক সংকট : ভূমিকা

[illegible] মোগল পতনের [illegible] থেকে সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিকরা [illegible]

তার সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কী ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। ইরফান হাবিব এই প্রশ্নটির কারণ কিভাবে কৃষকদের শোষিত ও অত্যাচারিত হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে হয়েছিল তা দেখিয়েছেন। ঠিক কোন কারণে কিভাবে ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রশ্ন ও সংকট দেখা দিয়েছিল তা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। অন্যান্য কারণ ছাড়াও মুঘল শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এই সংকটের জন্য দায়ী। কিন্তু অর্থাৎ, যেমন থেকে রাষ্ট্র হয় কৃষিজাত সামাজিক উদ্বৃত্ত (social surplus)—যা আগে থেকেই সংকটের কারণ হয়েছিল—এই সংকট ‘সংকট’ (crisis) হিসেবে তাঁরা এই ‘কৃষি সংকটের’ কথা বলেছেন। এই কৃষি-সংকটের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি সংকটকেই (‘Agrarian crisis’) কৃষি সংকট বলা হয়। এই মতে জাগীর ব্যবস্থা ও সংকট—তা সমাজ ও অর্থনীতির সংকট, কৃষক সমাজে জাগীরদারদের শোষণ ও অত্যাচার—সংকট এবং সাম্রাজ্যের পতনের এক অনিবার্য পরিণতি। এই সামাজিক উদ্বৃত্তের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত সম্পর্কে জাগীরদারি ব্যবস্থার কাঠামোগত সংকট ছিল সামাজিক উদ্বৃত্তের অসম বণ্টন। এই সংকট ও জাগীরদারি ব্যবস্থা নিয়ে ঐতিহাসিক ডব্লু. এইচ. মোরল্যান্ড (W. H. Moreland) ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যের শেষ দিকে জাগীরদারি ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয়। মোরল্যান্ড, সতীশ চন্দ্র প্রমুখ ঐতিহাসিক জাগীরদারি ব্যবস্থার সংকটকে অর্থনৈতিক সংকট হিসেবে দেখেছেন। তাঁদের মতে জাগীরদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জাগীর দেওয়ার মতো জমির পরিমাণ বাড়েনি, ফলে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা (imbalance) দেখা দেয়। **মনসবদারি**

ব্যবস্থার মধ্যে স্তরবিন্যাস (hierarchy) বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে এবং জাগীরদারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ে। সাম্রাজ্যের হাতে **পাইবাকি** জমি বা ‘জাগীর হিসেবে দেওয়ার জমি’ (‘land to be assigned’) বা (Paibaqi) কমে আসতে থাকে। ফলে সামাজিক উদ্বৃত্ত বা রাজস্বের জন্য জাগীরদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়। এই সামাজিক উদ্বৃত্তের ভাগ নিয়ে **মনসবদার** ও **জাগীরদার** এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং কৃষক ও জমিদারদের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র, এম. আতাহার আলি প্রমুখ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে অভিজাতদের সংখ্যা বৃদ্ধি, জাগীরের অভাব, দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে এই সংকট তীব্র হয়। তাঁরা দেখিয়েছেন যে **জাগীরদার**, মনসবদার ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ইরানি, তুরানি, আফগান, হিন্দুস্তানি, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ বাড়ে, সংকট আরও গভীর হয়। তিনি **খানা-ই-জাদ** প্রভৃতি অভিজাতদের মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রশ্নও তুলে ধরেছেন।

ঐতিহাসিকদের একাংশ অবশ্য এই ব্যাখ্যা মানেননি, যেমন জে. এফ. রিচার্ডস, মুজাফফর আলম প্রমুখ। তাঁদের মতে এই সংকট-তত্ত্ব একপেশে। তাঁরা আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশ, স্থানীয় শক্তির উত্থান ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছেন—এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সাম্রাজ্যের পতন মানেই সামগ্রিক অবক্ষয় নয়—বরং আঞ্চলিক স্তরে নতুন শক্তির উত্থান। তাঁদের মতে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস “মার্কসবাদ-প্রভাবিত ইতিহাস” (“Marxist-flavoured history”) এবং তাতে ‘একটিমাত্র যুক্তির অস্তিত্ব’ (“existence of single of logic”) লক্ষ করা যায়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় ঐতিহাসিকরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে সংকট-তত্ত্বের বাইরে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে **জাগীর** ব্যবস্থার সংকট কেবল অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক কারণও এর পিছনে ছিল। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সংকট ও পরিবর্তনের ধারণা নিয়ে বিতর্ক আজও চলছে। আঞ্চলিক স্তরে নতুন শক্তির উদ্ভব সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়াকে বুঝতে সাহায্য করে।

(Barha) … (Turani) … (Irani) …

[illegible]

[illegible] (policy of assimilation) [illegible]

[illegible] (Patron-Client Relations) [illegible]

[illegible] (appropriation) [illegible]

[illegible] (Jumma) [illegible] (Net) [illegible]

[illegible] (Lahori) [illegible] (Mohamed Waris) [illegible]

[illegible]

income) করে নেয়। অধ্যাপক সব্যসাচী লিখেছেন যে, অভিজাতদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের হাতে থাকত না। রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় তাদের চাহিদা মেটানোর মত কোনও উপায় থাকত না। সামাজিক উদ্বৃত্ত যা ছিল তা প্রশাসন, যুদ্ধ আর বিলাসী জীবন কোনটারই চাহিদাটুকু মত যোগাতে পারত না—"....the available social surplus was insufficient to defray the cost of administration, pay for wars of one type or another and to give the ruling class a standard of life in keeping with its expectations"। ভারতবর্ষে সামন্তপ্রথা প্রবর্তনের ভিত্তিই ছিল কৃষিকাজে। ভূমিদানের ফলে উৎপাদনও বাড়ে, কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষিসম্পদ থেকে সামাজিক উদ্বৃত্ত (social surplus) গড়ে তোলার সম্ভাবনাও দেখা যায়। এর ফলে রাষ্ট্রীয়রাও 'দানা' বা 'ত্রিবর্গ' বা আনুষঙ্গিক রাজস্বের পরিমাণও কমবেশি করে নেওয়া যেত।

এই অর্থনৈতিক বিবর্তন থেকে দেখা দিল সামাজিক সংকট। **ভূস্বামীশ্রেণি** আরও উৎকৃষ্ট **ভূস্বামীদের** সন্ধান করতে লাগলেন—এখন জমির যার থেকে আরও অনেক বেশি রাজস্ব পাওয়া যায়। অতএব রাজস্ব নির্ধারণ আমার হয় এখন **ভূস্বামীদের** জন্যও কাঠামোটি গড়ে গেল। কিন্তু কল্যাণকামী উৎকৃষ্ট **ভূস্বামী** আর ছিল না। ফলে ভূস্বামীদের মধ্যে দেখা দিল প্রতিযোগিতা আর অসন্তোষ। "...এবং উৎসবে আসে দুর্ভিক্ষ কবল ভূস্বামীদের জমির দখল ও শাসকদের সামন্তদের হাতে সম্পদের জমির দখল।"

ওপরের আলোচনা থেকে যে কথাটি বোঝা গেল তা, হল যে, সমাজের কাঠামো থেকে ভূস্বামী সংকটের সৃষ্টি। সম্প্রতি ডঃ এস. বিশ্বাস দেখিয়েছেন যে, **সামন্ততন্ত্রের** সংজ্ঞা বুঝতে গেলে ভূস্বামীদের যে ক্ষমতা দেখা গিয়েছিল তা, সম্মিলিতভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করত। এই সময় নাগরিকগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটল গ্রামীণদের অধিকারে এসেছিল। বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামগোষ্ঠীর বিকাশ সংস্কৃতিকে যায় দিয়ে শাসকশ্রেণির কাছে আসতেন আগে এর ভূস্বামী সংকটকে আড়াল করা হত। সেখানে গ্রামের নাগরিকত্বকে সংগঠিত করে, আইনত এই অধিকারও সম্মানের কাছে আয়ের দিয়ে সরাসরি সামন্তরাজাদের **ভূস্বামী** দিতে পারতেন। তা, না করে সরাসরি উপর তার উৎকৃষ্ট আইনগুলিকে দিয়ে প্রাপ্তির করে দিয়েছেন। উপরে তাদের **মালিক** ভূমি বলে চিহ্নিত করে দিয়ে সেখানে প্রদত্ত **সামন্ততন্ত্রের** ভূস্বামী দিয়েছে এবং উপরন্তু সেবার বেতনের কাছে রাজস্ব করেছেন। বণ্টন করার জন্য তার দখল দিয়ে **'কিতাবুল্লা'**, ভূমি যা ছিল একান্তভাবেই প্রাপ্য এবং তাদের ভোগ্য অঞ্চলে প্রশাসন। মূলত অঞ্চলে রাজস্ব আদায় ছিল দুর্গত কাজ। যে সকল সামন্তরাজারা সেখানে দিতেন জমি সামন্তদের শাসনকর্তাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পেতেন না। এককভাবে **ভূস্বামী** সমস্যা বাড়তে থাকে। এরপর পরে তাদের নিয়মিত হয়েছিল ১২৭৫ ও ১২৭৮ সালে উৎকীর্ণ **'কিতাবুল্লা'**, ভূমি দিয়ে হস্তান্তরে **মালিক** ভূমির অধিকার বৃদ্ধি করেন এবং **মালিক** ভূমির অধিকার বৃদ্ধি করেন এবং **মালিক** ভূমির রাজস্ব সরাসরিভাবে সংগ্রহের সরকার পেতেন। **ভূস্বামী** হিসাবে যে অধিকারও ভূমি বণ্টন করা গেল তার অধিকার ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। রাষ্ট্র এই টাকা থেকে নিজের উৎপাদন করে নেয়। এই টাকা থেকে কিছু বলেছেন যে, **ভূস্বামী** সমস্যা কৃষিক্ষেত্র—তা উৎপাদনের উন্নত পর্যায়ের হল।

গ্রামের অবস্থা সমাজের রাষ্ট্রের এবং কাজের ছিল রাষ্ট্রীয় গ্রামের। গ্রামগুলি, উৎপাদন কারণ ভূমির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে যে, গ্রামের রাষ্ট্রবাদের ছিল সেনাবাহিনী—রাজস্বের নিঃস্বত্ব গ্রামবাসীর ওপর তা বেড়ে ছিল। রাজার নিয়মিত যে, এত দিন থাকত অত্যন্ত রাজস্বের মাত্র বাড়িয়ে আর উৎপাদন উৎপাদনের রাজস্বের হয়ে কেন্দ্রীয় শাসক। যেহেতু **সামন্তরাজাদের** সেবাবাহিনীর নিয়মিত বেতনের **ভূস্বামীদের** রাজস্ব থেকে বহন করা হত সেকারণেই রাজ্যের মাত্র ছিল উপযুক্ত। উৎপাদনের সকল উৎপাদিত রাজস্ব ছিলেন দিয়ে দেওয়া হত—তাদের হাতে থাকত বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম রসদ। ফলে রাজস্বের হার এত বাড়িয়ে যে, এই ন্যূনতম এবং আদায়ের

অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সমসাময়িকের ওপর চাপ পড়েছিল। এর ফলে কোনও কোনও অঞ্চলে এমন হয় যে, তাদের বেঁচে থাকার সামান্যতম সংস্থানটুকুও আর রইল না (“under these conditions, it must have been inevitable that the actual burden on the peasantry should become so heavy in some areas as to amount to depriving them of their means of survival.”)। প্রতিকারহীন এই শোষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য কৃষকরা তাদের জমিজমা ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। যতই দিন যাচ্ছিল ততই কৃষকের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছিল—“...the flight of peasants was a common phenomenon and that it was apparently growing in momentum with the passage of years”। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মহামারি এসবের জন্য কৃষক মৃত্যু, কৃষকদের পলায়ন ও কৃষিকাজের সংকোচন ছিল সাধারণ ঘটনা। কিন্তু ব্রিটিশদের মতে, এই “মনুষ্য-সৃষ্ট ব্যবস্থা” (‘man-made system’)—মানুষের এই শোষণ যে কোনও প্রাকৃতিক কারণ থেকে অনেক বড় কৃষক-নিধনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে কৃষকরা কখনো কখনো রুখে দাঁড়াতে লাগল। আন্দোলন হত প্রায়শই স্বতঃস্ফূর্ত। অনশন ও ধর্মঘট একদিকে এবং অন্যদিকে সশস্ত্র বিদ্রোহ এই দুই প্রান্তিক অবস্থানের মধ্যে কৃষকদের আর কোনও অবস্থান রইল না—“Beyond a point there was no choice left to the peasant but between starvation or slavery and armed resistance.”

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, **জমিদারি**-সংকট ও কৃষক-বিদ্রোহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ঘটনা, তার দুই-ই একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংকটের ফল। রাষ্ট্রসংকটে মনসবদারদের ওপর নির্ভরশীলতা, যেমন সেনাদের জন্য মনসবদারদের **জায়গিরদান**, **জায়গির** থেকে আহৃত রাজস্বের ক্রমবর্ধমানতা, [illegible] হ্রাস ও [illegible], সম্পদের [illegible] ঘটল, **জায়গিরের** জন্য প্রতিযোগিতা ও কৃষক-পীড়ন এবং সর্বশেষে কৃষকদের পলায়ন এবং তাদের বিদ্রোহ—এই সমস্ত ঘটনাই মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে নিহিত [illegible] ফল। [illegible] মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়কে একটি সংকট (crisis) রূপে দেখেছেন। অনেক কারণে তাদের [illegible] প্রতিক্রিয়াশীলরা—আবার অন্যান্য ঐতিহাসিকরা মোগল অবক্ষয়কে একটি পতন (decline) রূপে [illegible] করেছিলেন। [illegible] তাঁরা এই পতনকে প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়রূপে না দেখে শ্রেণিভিত্তিক [illegible] দেখেছিলেন। আবার অন্যান্য [illegible] মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ [illegible] [illegible]

১৭.৩ সারাংশ

মোগল সাম্রাজ্যের পতন কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। [illegible] প্রাতিষ্ঠানিক সংকট। [illegible] **জায়গিরদারি** [illegible] **জায়গিরদারি** [illegible] কৃষক-বিদ্রোহ [illegible]

[illegible] মোগল সাম্রাজ্যের [illegible] অনিবার্য ছিল না।

করে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এর ফলে [illegible] মোগল সাম্রাজ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। সেই সময় থেকে [illegible] পরবর্তীকালের [illegible] মোগল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] শুরু করেছিলেন তার ফলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible], এই [illegible] [illegible] মোগল সাম্রাজ্য [illegible] [illegible] করেছিল। মোগল সাম্রাজ্য [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেছিল। [illegible] [illegible] সেই [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] যে ঔরংজেবের সময়ে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মোগল সাম্রাজ্য [illegible] এবং [illegible] [illegible] ও [illegible]। [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible]। ১৭০৭ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেছিল। [illegible] [illegible] [illegible] থেকে সাম্রাজ্যকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মোগল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাম্রাজ্য [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] মোগল [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] (Military manpower) [illegible] [illegible] মোগলদের ছিল না। এই [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে [illegible] মোগলসাম্রাজ্যকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মোগল সাম্রাজ্যকে [illegible] করে দিয়েছিল। ঔরংজেবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মোগল সাম্রাজ্যের [illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible]। [illegible] সাম্রাজ্য-[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] ফলে [illegible] [illegible] করে [illegible]। ফলে দেখা [illegible] যে, [illegible] [illegible] [illegible] এই যে, মোগল দরবারে ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে [illegible]। মোগলদের [illegible] করে উঠেছিল। [illegible]—ঔরংজেবের সময় থেকেই—মোগলদের অর্থনীতিও [illegible] [illegible] করেছিল [illegible] [illegible] এবং অযোগ্য [illegible] [illegible] [illegible] তার [illegible] [illegible] মোগল শাসনের [illegible] কাঠামোকে মোগল দরবারে [illegible], [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] সাম্রাজ্যের [illegible] বাড়িয়ে নেওয়ার সঙ্গে [illegible] শক্তিশালী কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। **[illegible]** ও [illegible] সঙ্গে [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] সাম্রাজ্যের [illegible] বিপন্ন করেছিল। সম্ভবত [illegible]

১৫.৮ অনুশীলনী

১। পরবর্তী মোগল শাসকদের [illegible] [illegible] [illegible] করেছিল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২। জায়গিরদারি সংকট বলতে ঐতিহাসিকরা কী বোঝাতে চেয়েছেন? (পাঁচ লাইনে উত্তর দিন)

....

....

....

....

....

৩। নিচের উক্তিগুলির কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল (✓) অথবা (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) ইতিহাসের প্রকৃত পরিবর্তন শুরু হয়েছিল ঔরঙ্গজেবের সময়—এই মত, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের—এটা তাঁর প্রতিপাদ্য।

(খ) মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঔরঙ্গজেবকে দায়ী করেছেন।

(গ) কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুঘল যুগের কৃষি সংকটকেই সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বলেছেন।

(ঘ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতন কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না।

(ঙ) ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসন দখলের জন্য উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় যা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

৪। একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(ক) তুরানি দলের নেতৃত্ব কোন অভিজাত দিয়েছিলেন?

(খ) ইরানি দলের নেতারা কোথা থেকে এসেছিলেন?

(গ) নাদির শাহ ভারতবর্ষ কবে আক্রমণ করেছিলেন?

(ঘ) মনসবদার নিয়োগ ও জাগির প্রদানের একমাত্র কর্তা কে ছিলেন?

(ঙ) জাগির কাকে বলা হত?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) সম্রাট বাহাদুর শাহের ——————সংস্কার নীতি ব্যর্থ হয়েছিল।

(খ) ফারুখশিয়ারের রাজত্বকালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ——————পেয়েছিলেন।

(গ) ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব মনে করেন, কৃষি সংকট——————থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

(ঘ) অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ঐতিহাসিকেরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি——————ও——————সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।

(ঙ) আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি——————ও——————সূত্র দেখিয়েছেন।

২৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. Sharma S. R. : Mughal Empire in India.
2. Keene : The Turks in India.
3. Irvine : The Later Mughals.
4. Qureshi : India under the Mughals.
5. Alam. Muzzafar & Subramanium, Sanjay : (ed) The Mughal State. 1526-1750.
6. Habib, Irfan : Agrarian System of Mughal India.
7. Moreland, W. H. : From Akbar to Aurangzeb—A Study in Indian History.
8. Chandra, Satish : Medieval India—Society, the Jagirdar classes and the village.
9. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর : অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা।

একক ২৮ □ মোগল শাসনে বাংলাদেশ

গঠন

২৮.০ উদ্দেশ্য

২৮.১ প্রস্তাবনা

২৮.২ মোগল শাসনে বাংলাদেশ : প্রারম্ভিক কথা

২৮.৩ মোগল শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা : বারো ভুঁইঞাদের আত্মসমর্পণ : মানসিংহ ও ইসলাম খানের শাসনকাল

২৮.৪ বাংলাদেশে মোগল রাজত্বের প্রকৃতি

২৮.৪.১ মোগল বাংলায় বিদ্রোহ : শোভাসিংহ ও সীতারাম রায়ের অভ্যুত্থান

২৮.৫ মোগল রাজস্বব্যবস্থা : তোডরমলের বন্দোবস্ত : সুলতান সুজা ও মুর্শিদকুলী খানের সংস্কার

২৮.৫.১ মোগলযুগে কৃষক বিদ্রোহ

২৮.৬ মোগল শাসনে বাংলা আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

২৮.৭ সারাংশ

২৮.৮ অনুশীলনী

২৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- বাংলাদেশে মোগল শাসনের প্রকৃতি
- বারো ভুঁইঞাদের আত্মসমর্পণ
- মোগল বাংলায় বিদ্রোহ
- মোগল রাজস্ব ব্যবস্থা
- মোগল শাসনে বাংলার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

২৮.১ প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে মোগল শক্তির আবির্ভাব ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একটি বড় ঘটনা। ষোড়শ শতকে বাংলাদেশ বলতে বোঝাতে ছোট-বড় নানা সামন্তশক্তিদের দ্বারা বিজিত রাজ্য বা রাজ্যাংশের সমাহার—যাকে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে একটি ভৌগোলিক প্রকাশ। (Geographical expression)। মোগল শাসকরা এই বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট ভৌগোলিকভাবে অস্তিত্বশীল রাজনৈতিক এককগুলিকে একটি অখণ্ড সুদৃঢ় রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত এবং একটি অবিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ঐক্যের মধ্যে বিধৃত সাম্রাজ্যের অঙ্গারাজ্যরূপে গড়ে তুললেন। কিভাবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব একটি রাজনৈতিক ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল তা জানার জন্যই আমাদের এই পাঠ্য ঔপনিবেশিক যুগ আরম্ভ হবার আগেই যে বাংলাদেশ একটি সমর্থ রাজনীতি এবং একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা মোগল বাংলার ইতিহাস পড়লে বোঝা যায়। মোগল শাসন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ

থেকে রক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় বণিক ও তার ছদ্মবেশে আসা নতুন সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য শক্তিদের আটকাতে পারেনি। এই ব্যর্থতার কারণ জানাও আমাদের লক্ষ্য। তবে আমরা জোর দেব মোগল যুগের উন্নয়নশীল সমাজ ও অর্থনীতির ওপর। বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ করলে অনেক সময়ে একটা বিকৃত ধারণা হয় যে আমাদের যাবতীয় উন্নতি হয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগে। বাংলাদেশে মোগল শাসনের ইতিহাস পড়লে এ ধারণা যে ভুল তা প্রতিপন্ন হয়। বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য, দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি, বস্ত্রশিল্পের হাত ধরে সাধারণভাবে শিল্পের উন্নয়ন, ব্যবসার ব্যাপ্তি, বহির্বাণিজ্যের সূচনা, সেই বাণিজ্যের রথে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি, তার ফলে প্রচুর সোনা-রূপার (bullion) আমদানি, স্থিতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থা—এ সবই হয়েছিল মোগল যুগে। এই পরিবর্তনের ছবিটি যত ব্যাপক ততই গভীর। আমরা সংক্ষেপে তার ইতিহাস পড়ব। মনে রাখতে হবে যে, এই ইতিহাসি একটা রূপান্তরের ইতিহাস, একটা পরিবর্তনের ইতিহাস। এই পরিবর্তনের অন্তর্পটে যে সৃষ্টিশীলতার দিক তার দিকেই আমাদের দৃষ্টি মূলত নিবন্ধ থাকবে। পরিবর্তনশীলতার প্রসারিত দিগন্তকে তা না হলে আমরা আমাদের পাঠ্যসীমার মধ্যে ধরে রাখতে পারব না। রূপান্তরের ইতিবাচক দিকগুলিই হবে সাধারণভাবে আমাদের পাঠ্য।

২৮.২ মোগল শাসনের বাংলাদেশ : প্রারম্ভিক কথা

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ সম্রাট আকবরের সেনাপতি মুনিম খান তুকারোয়ের যুদ্ধে (Battle of Tukaroi) বাংলার সুলতান দাউদ কররাণীকে (Daud Karrani) পরাজিত করেন। এটি ছিল আইনগতভাবে মোগলদের প্রথম বাংলা বিজয়। এই বিজয়ের ফলে মোগলরা বাংলার সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়েছিল, কিন্তু বাংলায় আফগান শাসনকে নির্মূল করে সেখানে নিজেদের আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররাণী দ্বিতীয়বার মোগলদের হাতে পরাজিত হন। মোগলরা তাঁকে হত্যা করে। বাংলাদেশে মোগল শাসন কায়েম করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা অপসারিত হয়।

বলা হয়ে থাকে যে, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম যুদ্ধ বিজয় থেকে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর মোগল সম্রাট নূর-উদ-দিন জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত যে কিঞ্চিৎ-অধিক অর্ধশতাব্দীকাল তার মধ্যেই বাংলাদেশে মোগল শাসন কায়েম হয়েছিল। তার পর থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ঔরংজেবের নির্দেশে বাংলা নবাব শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মোগলদের বাংলার মূল ভূ-ভাগের মধ্যে রাজ্যজয়ের জন্য বড় লড়াই করতে হয়নি। দু-একটি বড় বিদ্রোহ দমনের কাজকে বাদ দিলে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের পর চল্লিশ বছর ছিল বাংলাদেশে মোগলদের প্রান্তিক যুদ্ধের কাল। কোচবিহার রাজ্য, আহোম রাজ্য, আসাম, চট্টগ্রাম, সন্দীপ, আরাকান রাজ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের মগ-পর্তুগিজ জলদস্যু—ইত্যাদির বিরুদ্ধে মোগলদের নিরন্তর লড়তে হয়েছে। বাংলাদেশের মূল ভূ-ভাগ দখল হয়ে গেছে আকবর-জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের মধ্যেই।

সুলতানি যুগে বাংলার রাজধানী ছিল **তাণ্ডা** (Tanda)। বর্তমান মালদহ শহরের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ছিল এই শহর। সুলতান দাউদ কররাণীর পিতা সুলতান সুলেমান কররাণী গৌড় থেকে রাজধানী সরিয়ে এখানে এনেছিলেন, ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ এবং রাজা টোডরমল তাণ্ডা জয় করেন। স্বয়ং সম্রাট আকবর এক বিরাটি সৈন্যবাহিনী নিয়েপাটনা পর্যন্ত এসেছিলেন। সেখান থেকে মুনিম খাঁ ২০,০০০-এরও বেশি সৈন্য নিয়ে তাণ্ডা জয় করেন। মোগলবাহিনীর চাপে হাজার হাজার আফগান, যারা মোগল বিরোধী ছিল তারা বাংলার অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। মোগলবাহিনী আফগানদের চারটি দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল—উত্তরে ঘোড়াঘাটের, দক্ষিণে সাতগাঁর, পূর্বে সোনারগাঁর এবং দক্ষিণ-পূর্ব ফতেহবাদের (ফরিদপুর শহর) দিকে। ১৫৭৯ থেকে ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই আপগানরা সশস্ত্রভাবে মোগলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ১৫৮০ থেকে

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোগল **মনসবদারদের** মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৫৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে **ভাটি** (Bhati) বা পূর্ববঙ্গের সামন্ত জমিদাররা ইশা খানের (Isa Khan) নেতৃত্বে নিজেদের কর্তৃত্বকে জারি রাখার চেষ্টা করে। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাণ্ডা জয়ের পর থেকে প্রায় বারো বছর বাংলাদেশে অরাজকতা চলেছিল। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত সুবাগুলির জন্য একই প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেন (introduction of uniform *Subah* administration)। একজন **নাজিম** (Viceroy) বা নবাব, একজন **দেওয়ান** এবং একজন **বক্সিকে** নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রেরণ করা হল।

বাংলাদেশে মোগল বিজয়ের প্রথম কুড়ি বছর—১৫৭৪-১৫৯৪ ছিল অশান্ত পরিবেশকে দমন করার কাল। এই সময় প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশ ছিল অসংখ্য ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যের সমাহার। এইভাবে ছড়ানো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষমতার ঘাঁটিগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়ার কাজ শুরু হয় ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে। সেই বছর রাজা মানসিংহ কাচ্ছোওয়াকে বাংলার শাসক করা হয়। তিনি বাংলায় এলেন সম্রাটের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিরূপে, সর্বোচ্চ আঞ্চলিক শাসনের ক্ষমতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে এসেছিল বিপুল সৈন্যবাহিনী, কারণ এই সময়ে যুবরাজ সেলিমের অধীনে ৫০০০ সৈন্য প্রধানকে বাংলায় জাগির দেওয়া হল। এরপর থেকে আরম্ভ হল বাংলার অভ্যন্তরে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রকৃত প্রচেষ্টা।

২৮.৫ মোগল শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা : বারো ভুঁইঞাদের আত্মসমর্পণ : মানসিংহ ও ইসলাম খাঁর শাসনকাল

মানসিংহ বাংলার শাসক হয়ে প্রথমে **'ভ্যাটি'** অঞ্চল দখল করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজমহলে নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। সেখান থেকে তিনি অভিযান চালিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিকের ছোট ছোট আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের কর্তৃত্ব ভেঙে দিলেন। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যকেও সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত করা হয়। মানসিংহের এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান পরবর্তী শাসক ইসলাম খাঁ (মে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট ১৬১৩)। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম, প্যাচেট ও হিজলির জমিদাররা মোগলদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। এরপর শুরু হয় বারো ভুঁইঞাদের* দমন। ১৬০৯—ভূষণার রাজা সত্রাজিৎ, ১৬১১—বাংলার প্রধান জমিদার ইশা খানের পুত্র মুসা খান, ১৬২২—যশোহর ও বাকলার (বরিশাল) জমিদাররা আত্মসমর্পণ করেন। তারপরেই শ্রীহট্টের বিদ্রোহী আফগানরা মোগল পরাক্রমের কাছে নতজানু হল। তপন

* বারো ভুঁইঞাদের সকলের নাম পাওয়া যায় না। এন. কে. ভট্টশালী যে নামগুলি দিয়েছেন সেগুলি নিম্নরূপ :

১। উৎমন (উসমান) খান—বোকাইনগর (মৈমনসিংহ শহর)
২। মাসুম খান কাবুলি—চাটমোহর (পাবনার অন্তর্গত)
৩। মধু রায়—খলসি (পশ্চিম ঢাকার সন্নিকটে জাফরগঞ্জে)
৪। রাজা রায়—শাহজাদপুর (পূর্ব পাবনায়)
৫। নবুদ (মদন) রায়—চন্দ্রদ্বীপ (ঢাকা সাবডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত মানিকগঞ্জে)
৬। বাহাদুর গাজী, সোনাগাজী ও আনোয়ার গাজী—ভাওয়াল (ঢাকা)
৭। পালোয়ান—মাতঙ্গ (দক্ষিণ-পশ্চিম শ্রীহট্ট)
৮। রামচন্দ্র—বাকলা (দক্ষিণ-পূর্ব বাখরগঞ্জ)
৯। মজলিস কুতুব—ফতেহ্‌বাদ (ফরিদপুর)
১০। ইশা খান—কুমিল্লা, ঢাকার অর্ধাংশ, পশ্চিম মৈমনসিংহ, রংপুর, বোগরাও পাবনার অংশবিশেষ। এর সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি আরো দুটি নাম।
১১। প্রতাপাদিত্য—যশোহর
১২। কেদার রায় (ও তাঁর পুত্র চাঁদ রায়) শ্রীপুর

রায়চৌধুরী বলেছেন, এই প্রথম ভৌগোলিকভাবে বাংলার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত মোগলদের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে গেল। রিচার্ড ইটন বলেছেন যে, ইসলাম খানের রাজত্বকাল থেকে বাংলার ইতিহাসে মোগল যুগ প্রকৃত অর্থে শুরু হল। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা জয় করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম জয় করার দুটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আহোম রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করে সেখানে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও সফল হয়নি। এই তিনটি ব্যর্থ অভিযান বাংলার অর্থনীতি ও স্থিতিশীলতার ওপর তীব্র আঘাত হেনেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও একটি আঘাত। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান বিদ্রোহ করেন এবং সুবে বাংলার ওপর সাময়িকভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন মগ ও পর্তুগিজ দস্যুরা তাঁর সাথে হাত মিলিয়েছিল। বাংলাদেশ পরিণত হয়েছিল একটি গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ফিতাই খান (Fidai Khan) নামক এক সেনাপ্রধানকে বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠালেন। তিনিই প্রথম শাসক যিনি প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে সম্রাটকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা নগদে বা মূল্যবান উপহারে প্রেরণ করার অঙ্গীকার করেন। সম্রাটের প্রিয়তমা নূরজাহানকে সমপরিমাণ উপঢৌকন দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এইভাবে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের করদ আজ্ঞারাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। শুরু হল বাংলা থেকে সম্পদের বহির্নিষ্কাশন (Drain of wealth)। এর পর থেকে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল এই অর্থে যে, সেখান থেকে অরাজকতা নির্বাসিত হল, বাংলায় একটি দৃঢ় প্রশাসন চালু হল এবং দেশময় ছড়ানো আঞ্চলিক ঔদ্ধত্যের ঘাঁটিগুলি বিনষ্ট হল।

শাহজাহান ও ঔরংজেবের রাজত্বকালে নতুন করে বাংলার অভ্যন্তর ভূ-ভাগ দখল করার প্রয়োজন হয়নি। কখনও কখনও বিদ্রোহের ফলে কোনও কোনও অঞ্চলে সাময়িকভাবে শাসন স্থাপিত থাকলেও রাজ্য বিস্তারের জন্য মূল ভূ-ভাগে কোনও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ করতে হয়নি যা করতে হয়েছিল সীমান্ত সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য। শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনটি পর্যায়ে—১৬১৬-১৬৩৬, ১৬৩৬-১৬৩৮, ১৬৩৯-১৬৫৮—উত্তর-পূর্বে আহোম রাজ্যের সঙ্গে মোগলদের বিরোধ হয়েছিল এবং দ্বিতীয় মোগল-আহোন যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে মোগল অর্থনীতির ক্ষতিও হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহজাহানের সময়ে আহোম রাজ্যের ওপর মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তা হয়েছিল ঔরংজেবের সময়ে যখন তাঁর সেনাপতি মীরজুমলা বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে নতুন নৌবহর তৈরি করে আহোম রাজ্যের ওপর মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট শাহজাহানের সময়ে পূর্বদিকে মোগল সীমান্তনীতি আগ্রাসনশীল ছিল না যেমন তা কখনও সম্মুখপ্রসারীও হতে পারেনি। বাংলার অভ্যন্তরভাগে মোগল সাম্রাজ্যের অখণ্ডতাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিল এই সীমান্তনীতির মূল লক্ষ্য। তবুও শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা পূর্ণভাবে প্রশমিত হয়নি। তার প্রভাব ঔরংজেবের রাজত্বকালেও পড়েছিল। কিন্তু বাংলার রাজ্যগত অখণ্ডতা তার দ্বারা বিঘ্নিত হয়নি। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্ত হয়ে বাংলার নদীমাতৃক সমতলভূমি যে নিশ্চিন্ততা পেয়েছিল মোগল শক্তি রাষ্ট্র-শরীরের সমস্ত আলোড়ন সত্ত্বেও তাকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে। এই সুরক্ষিত প্রশান্তি বাংলাদেশে মোগল শাসনের সবচেয়ে বড় দান।

২৮.৪ বাংলাদেশে মোগল রাজত্বের প্রকৃতি

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের সরকারি ঐতিহাসিক আবুল ফজল (Abul-Fazl) মনে করতেন যে, মোগল রাজ্যজয়ের প্রতিটি ঘটনাই হচ্ছে পরাজিত রাজ্য ও বিজিত মানবগোষ্ঠীর ওপর তাঁর প্রভুর স্নেহসিক্ত করুণা বর্ষণ মাত্র। তাই আকবরনামা গ্রন্থে তিনি লিখলেন যে, সম্রাট আকবর বাংলাদেশ জয় করেছেন কারণ সেখানে কৃষকরা অত্যাচারী আফগানদের নিষ্পেষণে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছিল। কথাটি সত্য হলে বলতে হবে যে, বাংলাদেশে মোগল সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কৃষকত্রাণের লক্ষ্য নিয়ে। এটি অবশ্য প্রশস্তিকারের বলা কথা। আকবর একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সুলেমান কররানীর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদের দাবিদারদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল তাতে বাংলাদেশে সাময়িকভাবে একটা শক্তিশূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার শাসকগোষ্ঠীর এই আত্মসংহারক দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে বাংলার সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেওয়াই আকবরের লক্ষ্য ছিল। একজন সাম্রাজ্যবাদীর রাজ্যলিপ্সাকে তাঁর প্রশাসিতিকার একটি মহিমার আবরণে ঢেকে দিয়েছেন—বলেছেন যে সুতলান সুলেমান সম্রাটকে মেনে নিয়ে 'আনুগত্যের যে বাহ্যিক পোশাকটি' ('an outer garment of submission') পরিধান করতেন সেই ভণ্ডামির আবরণটুকুও ('scarf of hypocrecy) তাঁর পুত্র দাউদ পরিহার করেছিলেন। অর্থাৎ দাউদ নামক আফগান শাসকটি আকবর নামে মোগল শাসকটিকে অস্বীকার করে নিজের নামে মুদ্রা ছাপা ও খুতবা পড়া শুরু করে দিয়েছেন। এই অবাধ্যকে শাস্তি দেবার জন্যেই আকবর বাংলাদেশে এসেছিলেন।

কৃষকত্রাণ আর অবাধ্যের শাস্তিবিধান এই দুই লক্ষ্য নিয়ে যে শক্তি বাংলাদেশে এসেছিল তাকে বাংলার রাজারা—বারো ভুঁইএরা প্রতিরোধ জানিয়েছিলেন। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে বারো ভুঁঞাদের প্রতিরোধকে রোমান্টিকৃত করা হয়েছে, ফলে তথ্য ও যুক্তির নির্মোহ প্রেক্ষিতের বাইরে তাদের অবস্থান হয়ে পড়েছে অনৈতিহাসিক। একথা বলেছেন আচার্য যদুনাথ সরকার। তিনি লিখলেন : "একটি ভুয়ে প্রাদেশিক স্বদেশপ্রীতির বশীভূত হয়ে বাঙালী লেখকরা বাংলাদেশের বারো ভুঁইএাদের বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিভূ মনে করে থাকেন। তাঁরা এসবের কিছুই ছিলেন না"—"A false provincial patriotism has led modern bengali writers toglorify the Bara Bhuiyas of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort." এ কথার অর্থই হল যদুনাথ সরকার মোগল সাম্রাজ্যকে বিদেশি সাম্রাজ্য বলতে অস্বীকার করছেন। বারো ভুঁইএাদের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, তাঁরা সবাই ছিলেন 'উঠতি মানুষ' ('upstarts') যাঁরা নিজেদের সময়ে বা এক প্রজন্ম আগে ভেঙ্গেপড়া কররাণী রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকার করে দেশের এখানে সেখানে 'প্রভুহীন রাজা' ('Masterless Rajas') রূপে বিরাজ করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খুলনা ও বাখরগঞ্জের দুর্গম সমুদ্রোপকূলে, কেউবা শক্তিশালী ব্রহ্মপুত্রের আড়ালে ঢাকায়, কেউ বা মৈমনসিংহ এবং শ্রীহট্টে জঙ্গালের কোণে তাঁদের রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের তুলনা করা হয়েছে রাজপুতানার সেইসব শিশোদিয়া ও রাঠোর জাতির পুরুষানুক্রমিক রাজাদের সঙ্গে যাঁরা বহু শতাব্দী ধরে পিতৃপুরুষের রক্তরঞ্জিত সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত নিজেদের আবাসভূমিকে রক্ষা করার জন্য মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এই ভুল দৃষ্টিকোণ শীর্ষে পৌঁছেছিল যখন জনৈক বাঙালী নাট্যকার যশোরের প্রতাপাদিত্যকে মেবারের রাণা প্রতাপের সঙ্গে তুলনা করলেন। বারো ভুঁইএাদের মধ্যে কেউই ত্রিপুরা, কামরূপ এবং কোটবিহারের রাজাদের মতন ঐতিহ্যশালী ছিলেন না। ফলে তাঁদের প্রতিরোধ দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যকে 'বিদেশি' (foreign) বলতে যদুনাথ সরকার রাজি ছিলেন না। তিনি দৃপ্তভাবে বললেন "যদি ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসা মোগলরা বিদেশি আক্রমণকারী হয় তবে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে আসা কররাণীর এবং কররাণীদের দাস লোহর্নিরাও তাই ছিলেন।"

আসলে যে বিরাট শক্তি আর দক্ষতা নিয়ে মোগলরা বাংলাদেশের নৈরাজ্য দূর করেছিলেন তাকে অস্বীকার করা যায় না। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী আর রাজস্বের দলিল দস্তাবেজ থেকে এ কথা এখন প্রমাণিত যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ভাগীরথী-পদ্মার জলবিধৌত ব-দ্বীপ বাংলায় (Bengal Delta) মোগল সাম্রাজ্য একটি প্রতিষ্ঠিত শাসন হিসাবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল। দুটি কারণে তা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, মোগলদের সঙ্গে হিন্দু ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একটি সহযোগিতা বা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক—একটি Collaboration—তৈরি হয়েছিল। মোগলরা ক্ষত্রিদের দিয়েছিল নিরাপত্তা যার ছত্রতলে খত্রিরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারবে। এর পরিবর্তে ক্ষত্রিরা দিয়েছিল অর্থ, যে অর্থ নিয়ে মোগলরা আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। এ কথা বলেছেন রিচার্ড ইটন।

সারা দেশে ক্ষত্রিদের স্ব-জাতির ('fellow caste-members') মানুষ ছড়িয়ে ছিল। তারাই মোগলদের যোগ্যতা প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ। রিচার্ড ইটনের এই তথ্য প্রমাণ করে যে, প্রথম থেকেই মোগল রাষ্ট্র ছিল একটি সহযোগিতার রাষ্ট্র। হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের সহযোগিতার ওপর তা দাঁড়িয়েছিল।

বাংলাদেশে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বড় কারণ ছিল তার প্রায় অপরাজেয় সামরিক যন্ত্র। মোগলরা বারুদ-শস্ত্র—'Gunpower weaponry'—যেভাবে ব্যবহার করেছে সেভাবে এর আগেতা ব্যবহৃত হয়নি। এজন্য অনেকেই মনে করেন যে, মোগল সাম্রাজ্যকে ‘বারুদ-সাম্রাজ্য’—'Gunpowders Empire'—বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, অশ্বারোহী তীরন্দাজ বাহিনী (mounted archers) এবং পরবর্তীকালে গড়ে তোলা নৌবহর মোগল গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিল বলে মোগল শক্তি এক অপরাজেয় সামরিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। অনেকাংশে মোগল রাষ্ট্র যে একটি সামরিক রাষ্ট্র ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাকে সামরিক রাষ্ট্র বললে ভুল বলা হবে। মোগল সাম্রাজ্যের আগে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত যে কোনও রাজ্য থেকে মোগলরাজ্য ভিন্ন ছিল। রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে মোগলরা ভিন্নতর একটা কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছিল। যেহেতু উত্তর ভারত থেকে আসা মোগল সৈন্যরা রণক্লান্ত ছিল, যেহেতু নদীমাতৃক দেশের গতিবিধির বিজ্ঞান তাদের জানা ছিল না এবং যেহেতু বাংলার অস্বাস্থ্যকর জল-হওয়ায় তাদের আয়ুক্ষয় হত সেহেতু তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল ছিল। মোগলরা তাই উৎকোচ, উপঢৌকন, স্তুতি, তর্জন-গর্জন, বন্ধুত্ব, সংযম ইত্যাদির সাথে মিলিয়েছিল সন্ত্রাস, শাসন, অত্যাচার, নির্মমতা, নৃশ্যসতার নীতি। এমন প্রলোভন আর ত্রাসের নীতি এর পূর্বে এত ব্যাপকভাবেঅনুসৃত হয়নি। মোগলরা বাংলার স্থানীয় সামন্তদের সামনে দুটি বিকল্পকে হাজির করেছিল—হয় মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে মোগল-আনুগত্য-কাঠামোর মধ্যে পুরস্কার আর স্বস্তি নিয়ে রাজ্যসুখ উপভোগ করা, না হয় মোগল-বিরোধিতা করে ধ্বংস হওয়া। বাংলার জমিদার আর রাজারাও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলেন যে, মোগল শাসনের আবির্ভাব কোনও শীর্ষদেশের একজন শাসকের পরিবর্ত নয়, শাসনের ওপরতলে ব্যক্তির বাইরে এক শাসক-শ্রেণীর বদলে আরেক শাসক-শ্রেণীর অভ্যুদয় নয়, এমনকি শুধু গৌড় বা তাণ্ডার স্থানে রাজমহল বা ঢাকায় রাজধানী পরিবর্তন নয়। প্রথম পর্বে বাংলার বারো ভুঁইঞাদের লড়াই এবং তাদের বাইরে কারও কারও সংগ্রাম দেখে কোনও কোনও মানুষ হয়ত মনে করে থাকবেন যে, স্থান থেকে স্থানান্তরে মোগল বিজয় ছিল হয়ত সামরিক দখলদারি যার মাত্রা ছিল ভিন্ন—বড় কামান, জৌলুসময় দরবার, বৃহত্তম অট্টালিকা আর স্মৃতিসৌধ এইসব নিয়ে চলমান মুসলিম শাসনের রূপান্তরিত আবির্ভাবযার মধ্যে মাত্রার বিবর্তন ছিল (change of scales) কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তন ছিল না। আমরা পরে দেখব ঘটনা তা নয়। যদুনাথ সরকার, জগদীশ নারায়ণ সরকার, তপন রায়চৌধুরী, রিচার্ড ইটন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে মোগল শাসনের আগমন ও ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল যার তুলনা বাংলাদেশের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক যুগের সূচনার পূর্বে বিরল। রাজদরবার থেকে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের কুটির পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই পরিবর্তন একমাত্র একটি দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় রাষ্ট্রেই সম্ভব। বাংলাদেশে মোগলরা এই ইতিবাচক পরিবর্তনের অভিজ্ঞানকে বহন করে একটি স্বীকৃত দেশজ রাষ্ট্রে (indigenus state) পরিণত হয়েছিল।

২৮.৪.১ মোগল বাংলায় বিদ্রোহ : শোভাসিংহ ও সীতারাম রায়ের অভ্যুত্থান

যদুনাথ সরকার ও তাঁর প্রজন্মের ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করতেন যে, বাংলাদেশে মোগল শাসনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল শান্তি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই আপাত শান্তির অন্তরালে যে বিদ্রোহ মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করত সে কথা কেউই অস্বীকার করেননি। আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোগল বাংলায় বিদ্রোহ ছিল প্রাসঙ্গিক ঘটনা। তপন রায়চৌধুরী লিখেছেন যে, বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রায় প্রথম কুড়ি বছর—১৫৭৫-১৫৯৪—ছিল

বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহে জর্জরিত একটি সময়। তার পরেও যখন মোগল শাসন কায়েক হয়ে গিয়েছিল তখনও বিদ্রোহ ছিল একটি পৌনঃপুনিক ঘটনা। এই বিদ্রোহের অনেক কারণ ছিল। বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হওয়ার পরও অনেকদিন পর্যন্ত বিদেশি বিজয়ের ('foreign conquest') রূপ নিয়েছিল। কোনও দক্ষ, শক্তিশালী এবং মোগল ক্ষমতা-শিবিরে প্রাধান্য আছে এরকম উচ্চপর্যায়ের মানুষ অস্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ার ভয়ে এখানে থাকতেন না। কাউকে শাস্তি দিতে হলে মোগলরা তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতেন। ফলে ক্রমাগত উচ্চপর্যায়ের মোগল কর্মচারী, সেনানায়ক ইত্যাদিরা বাংলাদেশে আসতেন এবং এখানে কিছুদিন থেকে নানা পথে প্রচুর অর্থ রোজগার করে উত্তর ভারতে চলে যেতেন। এর ফলে বাংলার সম্পদের বহির্নিষ্কাষণ ঘটত, বাংলায় মোগল প্রশাসন দানা বাঁধত না এবং সাময়িক অবস্থানকারী কর্তাব্যক্তিদের ধনলিপ্সার চাপে পড়ে কৃষক ও জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। তাতে ঘনীভূত হত বিদ্রোহের পরিবেশ।

বাংলাদেশে যে বিদ্রোহের পরিবেশ কখনও মুছে যায়নি তারকারণ বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ আফগানদের অবস্থান। শেরশাহর রাজত্বকালে বাংলাদেশ মোগল শাসনের বাইরে চলে গিয়েছিল; পরে মোগলরা বাংলাদেশকে পুনরধিকার করলেও কররাণী ও শূর বংশের (শেরশাহর বংশ) মদতপুষ্ট আফগানরা মনে করত যে, তারাই হচ্ছে শাসকজাতি। আকবরের রাজত্বকালে বিদ্রোহী মনসবদারদের ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তা বাংলাদেশে মোগল শান্তিকে বিনষ্ট করেছিল। একটি প্রান্তিক ও অনিশ্চিত অঞ্চলে সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের ঘনীভূত হতে দেওয়ার ফলে স্বাভাবিক নিয়মে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উপাদানগুলি পুঞ্জিভূত হয়েছিল।

নদীমাতৃক ও জঙ্গলে আকীর্ণ হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গে যাতায়াত ছিল খুব দুর্গম। দক্ষিণবঙ্গ সমুদ্রসন্নিধানে থাকার ফলে সেখানে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের প্রাধান্য ছিল। প্রথমপর্বে মোগলদের যথেষ্ট নৌবহর না থাকায় তারা মগ ও পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারেনি। অনেক পূর্ববঙ্গের জমিদার যেমন, প্রতাপাদিত্য পর্তুগিজদের নিজেদের নৌ ও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলার উপকুলভাগকে দখল করার জন্য তখন মোগল, আরাকান ও পর্তুগিজদের একটা ত্রিমুখী লড়াই চলছিল। ফলে অনেকদিন পর্যন্ত বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মোগল শাসন দৃঢ় হতে পারেনি।

এইরকম পরিস্থিতিতে বাংলায় মোগল বিরোধী বিদ্রোহ একটা প্রাসঙ্গিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কেন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক ঔদ্ধত্যের প্রথম পর্বের নায়ক ছিলেন বারো ভুঁইঞারা। একজন বাঙ্গালী মুসলমান জমিদার ইশা খাঁর নেতৃত্বে এই সময়ে মোগল ও কেন্দ্রীয় শাসন বিরোধী আঞ্চলিক প্রতিরোধ দানা বেঁধে ওঠে। প্রাচীন নগর সোনার গাঁ-র কাছে কত্রাবো (Katrabo) নামক শহরে ইশা খাঁর রাজধানী ছিল। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে একটি জলযুদ্ধে তিনি মোগল বাহিনীকে পরাজিত করেন। পরে তিনি আইনগতভাবে মোগল প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে প্রায় স্বাধীন 'ক্ষুদ্র রাজ্য' ('Little King') রূপে নিজের রাজত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। মোগলদের বিরুদ্ধে তিনজন জমিদার তথা আঞ্চলিক রাজার বিদ্রোহকে ঐতিহাসিকরা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁরা হলেন পূর্ববাংলার দুই জমিদার-প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম রায় এবং পশ্চিমবঙ্গের জমিদার রহিম খান ও শোভা সিংহ। রাজা প্রতাপাদিত্যর বিদ্রোহ হয়েছিল সম্রাট আকবরের সময়ে এবং অন্য দুটি বিদ্রোহ হয়েছিল সম্রাট ঔরংজেবের রাজত্বকালে। পূর্ববঙ্গের যশোর-খুলনা ও ভূষণার—দুটি বিদ্রোহ ছিল একান্তভাবে মোগল-চাপে অধিকার আর সুযোগসুবিধা-হারাবার বিরুদ্ধে জমিদারি প্রতিক্রিয়া। সেখানে মোগল শাসনকে উচ্ছেদ করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না যা শোভা সিংহের বিদ্রোহে (১৬৯৫-৯৬) ছিল। শোভা সিংহ ছিলেন মেদিনীপুর জেলার ছিটুয়া বরদা (Chitua Barda) জেলার জমিদার। তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন রহিম খান নামে উড়িষ্যার এক জমিদার। শোভা সিংহ বিপুল পরিমাণ আফগান অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে—একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাত থেকে আট হাজার অশ্বারোহী এবং কয়েক হাজার পদাতিক বাহিনী—নিজের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করেন। তারপরেই তিনি মেদিনীপুর ও বর্ধমান সমেত বহু জেলা দখল করে

নেন। তিনি রাজা উপাধি নিয়েছিলেন এবং যদুনাথ সরকারের মতে গঙ্গার তীরে হুগলীকে মাঝখানে রেখে তিনি প্রায় ১৮০ মাইল দীর্ঘ একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল তাঁর নিজের রাজ্য—'a state of his own'। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শোভা সিংহের বিদ্রোহ স্তব্ধ হয়ে যায়। এর ঠিক পনের বছর পরে, ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে খুলনার সন্নিকটে ভূষণার জমিদার সীতারাম রায় বিদ্রোহ করেন। তাঁর উত্থানকে আধুনিক ঐতিহাসিকরা সাধারণ জমিদারি উত্থান বললেও যুদনাথ সরকার বাঙ্গালী চৈতন্যে প্রাপ্ত মর্যাদার দিক থেকে তাঁকে রাজা প্রতাপাদিত্যর সমকক্ষ বলে মনে করেন। তিনি ভূষণার ১০ মাইল দক্ষিণে বাগজানি নামক স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং রাজা উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের অর্ধাংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া স্বাধীনতাকে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সহ্য করতে পারেননি। ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে সীতারাম রায় যখন হুগলির ফৌজদার সৈয়দ আবু তুরবকে হত্যা করেন তখন মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ১৭১৪ খিস্টাব্দে তাঁর বিদ্রোহ দমন করা হয়। তাঁর পতনে আচার্য যদুনাথ সরকারের মন্তব্য—"এইভাবে বাংলাদেশে শেষ হিন্দু রাজত্বের পতন হল"— "Thus fell the last Hindu kindgom in Bengal.."

২৮.৫ মোগল রাজস্ব ব্যবস্থা : তোডরমলের বন্দোবস্ত : সুলতান সুজা ও মুর্শিদকুলি খানের সংস্কার

আকবরের রাজস্ব সচিব তোডরমল বাংলাদেশে মোগল রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে এই বন্দোবস্তের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এইরকম : "প্রতি বছরের (সরকারের) দাবিকে আটটি মাসিক কিস্তিতে প্রদান করা হত। তারা (রায়তরা) রাজস্ব (revenue) প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে মোহর এবং টাকা নিয়ে আসত, কারণ সরকার ও কৃষকের মধ্যে ফসলের ভাগাভাগি এখানে (বাংলাদেশে) চালু হয়নি। ফসল ছিল প্রচুর, মাপজোপের (measurement) চাহিদা ছিল না। ফসলের পরিমাপ (estimate) করেই রাজস্বের দাবি নির্ণিত হত। সম্রাট তাঁর উদারতা দিয়ে এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।"

এই ছোট কিন্তু অসাধারণ বর্ণনার মধ্যে মোগল রাজস্বব্যবস্থার—যা অন্তত বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল তার—একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমরা দেখতে পাই। বছরে আটটি কিস্তিতে রাজস্ব প্রদানের কথা ঠিক হলে বলতে হবে যে কৃষকদের—কিংবা তাদের মাথার ওপরে অবস্থিত রাজস্ব আদায়কারী জমিদারদের—একসঙ্গে সমস্ত সরকারি দাবি মেটানোর দায়ভাগ বহন করতে হত না। **বাহারিস্তান-ই-গায়বী**-র লেখক মির্জা নাথন অবশ্য বলেছেন যে, বছরে দুবার রাজস্ব আদায় করা হত যখন দুবার ফসল কাটা হত—শরতে ও বসন্তে।

আবুল ফজলের দ্বিতীয় কথাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকরা রাজস্ব দিত নগদ অর্থে, যদিও ফসলের প্রাচুর্য ছিল লক্ষণীয়। এই নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদান করা হত সরাসরি সরকারের কাছে, কোনও মধ্যব্যক্তি বা মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে নয়। ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, বাংলাদেশ ছিল জমিদার-প্রধান। এখানে রাজস্ব আদায় করা এবং সেই আদায়কৃত রাজস্বের এক-দশমাংশ নিজেদের পারিশ্রমিকরূপে রেখে বাকি রাজস্বের পুরোটাই সরকারের ঘরে পৌঁছে দিত জমিদাররা। অতএব কৃষকদের সরাসরি রাজস্ব প্রদানের ঘটনা হয়ত ঘটত শুধুমাত্র **খালসা বা খালিসা** জমিতে যে জমিতে জমিদাররা থাকত না, যে জমি ছিল প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আর যে জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল সরকারের কর্মচারীদের। এইসব কর্মচারীরা **করোরি (ক্রোরি), আমিল, আমিন, শিকদার** ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হতেন। তাদের কাজও ভিন্ন হত। যেমন **করোরি** বা **ক্রোরিরা** সরাসরি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকতেন। একই কাজ করতেন **আমিলরা।** কখনও কখনও তারা নজরদারির কাজেও

নিযুক্ত হত। **আমিন** আর শিকদারদের কাজ ছিল জমির জরিপ ইত্যাদি কাজ করা। তবে কাজের নিপুণ ভাগ অবশ্য অনেক সময়েই থাকত না।

যে কথাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে, বাংলাদেশে ফসলের পরিমাপ করে রাজস্ব আদায় করা হত জমির পরিমাপ করে না। তা বলে জমির পরিমাপ করে রাজস্ব আদায় করা যে একেবারে দেখা যেত না তা নয়। মির্জা নাথন লিখেছিলেন যে, তাঁর কর্মচারীরা তাজপুর পূর্ণিয়ার গ্রামে জরিপ করতে ও গ্রামে রাজস্বের অনুসন্ধান করতে ("to survey and inspect the villages") গিয়েছিলেন। কবি মুকুন্দরামও দুঃখ করে লিখেছিলেন যে, অত্যাচারী শিকদাররা ১৫ কাঠাকে এক বিঘা [বাংলাদেশে ২০ কাঠায় এক বিঘা] ধরে রাজস্ব নির্ধারণ করত।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে মোগল শাসনাধীন অঞ্চলে যে রাজস্ব ব্যবস্থা চালু ছিল বাংলাদেশে তা ছিল না। অন্য স্থানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাকে বলা হত জবত্‌ব্যবস্থা (Zabt System)। **জবত্‌** ব্যবস্থায় দুটি জিনিস ছিল—স্থিরীকৃত নগদ রাজস্ব এবং জমির মাপজোপ। ধ্রুপদী **জবত্‌** ব্যবস্থায় প্রতিবছর জমির জরিপ করা হত। আকবরের রাত্বকালেই সিন্ধুপ্রদেশ থেকে ঘর্ঘরা (Ghaghra) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে **জবত্‌** ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। পরে শাহজাহানের সময়ে দক্ষিণাত্যেও এ ব্যবস্থা প্রচলিত হল। একথা মনে রাখা দরকার যে, যে সব অঞ্চলে **জবত্‌** ব্যবস্থা কায়েম ছিল সে সমস্ত অঞ্চলেও কোনও কোনও গ্রামে রাজস্ব নির্ধারণের অন্য ব্যবস্থাও বহাল ছিল—তাকে উচ্ছেদ করা যায়নি। এরকম ব্যবস্থা হল **ভাওলি** (Bhaoli) গবা **বাটাই** (Batai) ব্যবস্থা [ফার্সি ভাষায় যাকে বলা হত **ঘাল্লা-বক্‌সি** (ghalla-bakhshi)] এবং **কানকুট** (kankut) ব্যবস্থা। ভাওলি ব্যবস্থায় জমিতে উৎপন্ন ফসলকে সাধারণভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হত—একটি ভাগ ছিল কৃষকের, অন্য ভাগটি রাষ্ট্রের। **কানকুট [কান = শস্য,** কূট = পরিমাপ বা estimate] ব্যবস্থায় জমির এক একটি একক ধরে মাপজোপ করা হত। তারপর চলতি বছরের উৎপাদিতব্য ফসলের একটা [যাকে বলা হত **রাই** (rai)] সম্ভাব্য হিসাব করা হত। তার ওপর নির্ণয় করা হত সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ।

বাংলাদেশের এরকম কোনও ব্যবস্থা চালু ছিল না। এখানে যে ব্যবস্থা চালু ছিল তা অন্যত্র কোথাও কোথাও কমবেশি মাত্রায় বহাল ছিল। সে সব স্থানে তাকে বলা হত **মুক্তাই** (Muqtai)। এর অর্থ হল স্থির দাবি (fixed demand)। বাংলাদেশে মোগলরা যে ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তার তিনটি দিক ছিল—এক, রাজস্ব নির্ধারিত হত নগদ অর্থে; দুই, তা নির্ধারত হত জমির এক-একটি একক ধরে—অর্থাৎ কখনও একখণ্ড জমির ওপর, কখনও বা সমস্ত গ্রামের ওপর, কখনও বা দু-তিনটি গ্রাম মিলিয়ে এক-একটি **মৌজার** ওপর, কিন্তু কখনও ফসলের ওপর নয়; তিন, একবার রাজস্ব স্থির হয়ে গেলে তা চলত বছরের পর বছর—অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত যতদিন না রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কোনও নতুন রাজস্ব সংস্কার চালু হচ্ছে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্র তার রাজস্বদাবি স্থাপন করত কৃষকদের ওপর নয়, জমিদারদের ওপর। জমিদাররা তাদের দাবি স্থাপন করত কৃষকদের ওপর। এইভাবে রাষ্ট্রের দাবির সাথে জমিদারদের দাবি যুক্ত হয়ে কৃষকদের মাথায় রাজস্বের বোঝা নেমে আসত। কৃষকদের কাছ থেকে এইভাবে আহৃত সরকারি রাজস্বকে বলা হত **মাল**। কখনও কখনও সরকার চাপ দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করত। তাকে বলা হত **আবওয়াব** (Abwab)। **আবওয়াব** ছিল দুরকমের—সরকার প্রতিষ্ঠিত **আবওয়াব** যাকে বলা হত বাদাশহী আবওয়াব বাসুবাদারি আবওয়াব। যেমন, সরকারের হাতিশালের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করা হত মাথুত ফিলখানা বলে একটা আবওয়াবের মাধ্যমে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে দেখা যায় মানুষকে বিবাহের সময়ে একটা কর দিতে হত। তাকে বলা হত হালদারি। সুবাদারী আবওয়াব ছাড়াও জমিদাররা আবওয়াব নিতেন। তাকে বলা হত জমিদারি আবওয়াব। জমিদারের কন্যার বিবাহ, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদির জন্য অনেক সময়ে এই ধরনের আবওয়াব নেওয়া হত। বাংলাদেশে মোগল শাসনের ফলে যে শান্তি

স্থাপিত হয়েছিল তাতে কৃষিকাজ বেড়েছিল। এছাড়া বিদেশিদের বাণিজ্যের জন্য দেশে সোনারূপাও (Bullion) যথেষ্ট আসছিল। দেশে নতুন সম্পদ সৃষ্টির যে পরিমণ্ডল হয়েছিল তাতে রাষ্ট্রের পক্ষে এই সম্পদের উদ্বৃত্তকে আত্মসাৎ করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল। আবওয়াব হয়ে উঠেছিল এই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ-র হাতিয়ার।

মাল নামক রাজস্ব ছাড়া সরকারের প্রতিনিধি রূপে জমিদাররা কৃষক-কারিগর সমতে সমস্ত মানুষদের কাছ থেকে আরেক রকম অর্থ আদায় করতেন। তাকে বলা হত **সেয়র** (Sair or Sayer)। গ্রামাঞ্চলে চৌকিদারি ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য এবং কৃষক-কারিগরদের সম্পত্তি ও জীবনকে নিরাপত্তাদানের জন্য যে খরচ হত সেই খরচের দায়ভাগ জনগণকে বহন করতে হত। **সেয়র** ছিল নিরাপত্তা কর (security tax)। দেশে চুরি-ডাকাতি হলে জমিদারদের দায়িত্ব ছিল সেই চোর-ডাকাতকে ধরে দেওয়া এবং তাদের শাস্তিবিধান করা। অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকতেন। মোগল যুগে জমিদারদের সচরাচর উচ্ছেদ করা হত না। কিন্তু কোনও জমিদার যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করতেন, কিংবা চোর-ডাকাতকে প্রশ্রয় দিতেন কিংবা নিজে সরাসরি সদ্যুবৃত্তি করে, সরকারি কর্মচারীদের হত্যা করে (যেমন করেছিলেন ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে যশোরের সীতারাম রায়) বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরতেন তবে তাঁকে পদ ও ক্ষমতাচ্যুত করে তার জমিদারি কেড়ে নেওয়া হত। অন্যথায় বাংলাদেশে জমিদার পোষণ ছিল সরকারের পালিত নীতি। জমিদারদের দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করার জন্য নিষ্কর জমি দেওয়া হত। একে বলা হত **লাখিরাজ** (ফার্সি ভাষায় লা = না; খিরাজ বা খরাজ = রাজস্ব) জমি। এইভাবে জমিদাররা যে নিষ্কর জমি পেতেন তাকে বলা হত **নানকর** (নান = রুটি বা অন্ন); যে জলাশয় পেতেন তাকে বলা হত **জলকর,** যে বনভূমি ব্যবহারের অধিকার পেতেন তাকে বলা হত **বনকর**। জমিদারদের এই আবওয়াব ও লাখিরাজ ছিল বলে তারা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে নিষ্কর জমি অন্যদেরও দিতে পারতেন। মন্দির, মসজিত ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং বিদ্বান, গুণী, পণ্ডিত ও দরিদ্র ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও নিষ্কর জমি দেওয়া হত। এইসব দান করা জমিকে সরকার প্রদত্ত হলে বলা হত **বাদশাহী** এবং জমিদার প্রদত্ত হলে বলা হত হুকুমি জমি। রকমফেরে এদের **মিল্ক** (Milk), আমলক (Amlok), সায়ুরঘল (Suyurghal) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হত। কিন্তু এই সমস্ত জমির সার্বিকভাবে একটি সাধারণ নাম ছিল **মদদ-ই-মাশ** (Madad-i-Mash)। এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল "বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য" ["aid for subsistance"—মদদ (সাহায্য) মাস (জীবন, বেঁচে থাকা)]। ধর্মীয় কারণে যখন জমি দেওয়া হত তখন তাকে বলা হত আয়েমা। (ইমাম শব্দের বহুবচন হল আয়েমা। ইমাম হলেন ধর্মীয় নেতা। অর্থের বিকৃতি ঘটে এই শব্দ জমির বর্ণনায় প্রযুক্ত হয়েছে)। মনে রাখতে হবে মদদ-ই-মাশ জমির মালিকানা কাউকে প্রদান করা হত না। ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যেমন এক বা দুই জীবৎকাল এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ের জন্য রাজস্ব উপভোগের অধিকার দেওয়া হত।

বলাবাহুল্য যে এরকম একটি রাজস্ব ব্যবস্থা একটি সক্ষম কৃষিভিত্তিক উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী সমর্থ সমাজের ওপরই দাঁড়াতে পারে। তাই মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষক কল্যাণের কথা ভাবা হত। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, মড়ক, খরা, মাঢ়ী ইত্যাদির সময়ে কৃষকদের জমিদাররা ছাড় দিতেন আর সেই ছাড়ের সমপরিমাণ ছাড় সরকার তাদের দিত তাদের রাজস্ব প্রদানের সময়। কৃষকদের চাষের শুরুতে অর্থের প্রয়োজন হলে তাদের **তকাভি** (taqavi) ঋণ দান করা হত। এই ঋণ ও ছাড় কৃষি ব্যবস্থাকে সচল রাখার দিকে দুটি বড় পদক্ষেপ।

১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাণ্ডাতে প্রবেশ করার পর থেকেই টোডরমল তাঁর রাজস্ব বন্দোবস্ত স্থির করার কাজ শুরু করেছিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, ১৫৮২ থেকে ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়েছিল। মোট কত টাকার রাজস্ব এখানে নির্ধারিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। রায় এম. এন. গুপ্ত বাহাদুরের মতে তা ছিল ৬৩.৪ লাখ টাকা, নরেন্দ্রকৃষ্ম সিংহর মতে ১,০৬,৯৩,১৫২ টাকা। বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে নতুন রাজ্যজয় হচ্ছিল এবং তার সঙ্গে বিরাট কৃষিযোগ্য জমি এবং নতুন রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছিল। এদিকে

মোগলদের ক্রমাগত যুদ্ধের জন্য এবং মোগল প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য ব্যয়ও বাড়ছিল। অতএব মোগল শাসকদের প্রয়োজন হল আরও বেশে রাজস্বের। এই প্রয়োজনের তাগিদে তোডরমলের বন্দোবস্তের প্রায় সাত-আট দশক পরে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের সুলতান সুজার রাজত্বকালে আরেকবার ভূমিরাজস্বের সংস্কার হয়। এর পরে ভূমিরাজস্ব সংস্কার হয়েছিল আঠারো শতাব্দীর শুরুতে মুর্শিদকুলি খানের রাজত্বকালে—সম্ভবত ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে। একটি হিসাব অনুযায়ী সুলতানসুজার সময়ে রাজস্ব বেড়েছিল ১৫ শতাংশ, মুর্শিদকুলি খানের সময়ে ১৪ শতাংশ। উভয় সংস্কারের ফলে মূলত জমিদারি মহলগুলিতেই রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছিল। সুলতান সুজার থেকে মুর্শিদকুলি খানের সংস্কার ছিল অনেক বৈপ্লবিক। তিনি সমস্ত জাগিরগুলিকে রাষ্ট্রের দখলে ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের ওপর রাজস্বধার্য করেন। এতদিন যে জমির রাজস্ব **জাগিরদাররা** ভোগ করতেন এখন তা রাষ্ট্রের তহবিলে জমা পড়তে লাগল। উচ্ছেদ হওয়া **জাগিরদারদের** নতুন **জাগির** দিটে পাঠিয়ে দেওয়া হল উড়িষ্যার অশান্ত অঞ্চলে এইভাবে যে নতুন রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র তৈরি হল সেখানে তিনি **আর্মিল** নামে ঠিকাদার—যদুনাথ সরকারের ভাষায় "Contractor collector"-শ্রেণীর লোকদের নিয়োগ করলেন। তারা রাষ্ট্রকে আগে থেকেই রাজস্বের জামিল (মালজাসিন) দিয়ে গ্রামাঞ্চলে রাজস্ব আদায় করতে গেল। মুর্শিদকুলি খানের এই ব্যবস্থাকে **মালজামিনি** (Malzamini) ব্যবস্থা বলা হয়। এই আমিলরা জমিদারদের ওপর একনজরদার (Supervisor) শ্রেণী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার সনাতন ভূস্বামীরা অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল বলে মুর্শিদকুলি খান এই ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে এই রাজস্বের ঠিকাদারদের অনেকেই জমিদারি আয়ত্ত করে নতুন এক জমিদার শ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

অনুশীলনী ১

১। নীচের উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল? (✓) অথবা (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) সুলতানি যুগে বাংলার রাজধানী ছিল তাণ্ডা।

(খ) সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলা মোগলদের দখলে এসেছিল।

(গ) ঔরংজেবের সেনাপতি মীরজুমলা আহোম রাজ্যের ওপর মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

(ঘ) প্রথম থেকেই মোগল রাষ্ট্রে হিন্দু ও মুসলিমের কোনও সহযোগিতা ছিল না।

২। মোগল আমলে বাংলার সম্পদের কি বহির্নিষ্কাশন ঘটেছিল? (পাঁচ লাইনে উত্তর লিখুন)

....

....

....

....

....

৩। বাংলাদেশে শেষ হিন্দু রাজত্বের পতন কিভাবে হয়েছিল? (পাঁচ লাইনে উত্তর দিন)

....

....

....

....

....

৪। মোগল শাসনাধীন বাংলাদেশে কি ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থা চালু ছিল? (দশ লাইনে উত্তর দিন)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৫। একটি বাক্যে উত্তর লিখুন :

(ক) কৃষকদের কাছ থেকে আহৃত সরকারি রাজস্বকে কি বলা হয়?

(খ) হালদাবি কাকে বলা হত?

(গ) নানকর ও জলকর কি?

(ঘ) তকাভি ঋণ কাদের এবং কখন দেওয়া হত?

(ঙ) মালজামিনি ব্যবস্থা কে চালু করেছিলেন?

২৮.৫.১ মোগল যুগে কৃষক বিদ্রোহ

মোগল যুগে বাংলাদেশের এমন কোনও বড় মাপের কৃষক বিদ্রোহ হয়নি যার প্রভাবে—অন্তত আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে মোগল শাসন নড়ে উঠতে পারে, যেমন উঠেছিল শোভা সিংহ বা সীতারাম রায়ের বিদ্রোহে। গৌতম ভদ্র মোগল যুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কোচবিহার ও আসাম সীমান্ত জুড়ে পাইক বিদ্রোহের কথা বলেছেন। ১৫১৫-১৫১৬ খিস্টাব্দে এই অঞ্চলের পাইকরা তাদের নেতা পাইক সর্দার সনাতনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। তখন সবে মোগল শাসন এইসব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই অস্থির পরিবেশে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে ও বর্তমান গোগায়পাড়ার অন্তর্গত "খন্তাঘাট পরগনার ক্রোরি জামান তব্রিজি কৃষকদের ওপর অত্যাচার করতে লাগলেন এবং তাদের সুন্দরী স্ত্রীদের নিজের হারেমে পুরতে লাগলেন।" ফলে কৃষকরা রুখে দাঁড়াল। পাইকরা ছিল আসলে কৃষক। সশস্ত্র ছিল বলে তারা কৃষকদের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই বিদ্রোহকে দমন করা হলেও কৃষক পাইকদের মোগল বিরোধিতা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে মীরজুমলা যখন কোচবিহার—যা মোগল অধিকারের বাইরে চলে গিয়েছিল—তাকে পুনরায় অধিকার করার জন্য অভিযান করেন তখন তার সৈন্যবাহিনীর পেছনে কোচ রায়তরা আবার বিদ্রোহ করেছিল। এই বিদ্রোহগুলো ছিল বাংলার প্রান্তভাগের বিদ্রোহ। বাংলার মূল ভূ-ভাগ ব্যাপক হারে যেমন জমিদার বিদ্রোহও হয়নি তেমন কৃষক বিদ্রোহ হয়নি। গৌতম ভদ্র স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, "...সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে অন্যান্য অঞ্চলের মতো ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন দেখা যায়নি।" মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে যখন ঔপনিবেশিক শাসনের সময় আরম্ভ হল তখনই কৃষক বিদ্রোহের সংখ্যা বেড়ে গেল। মোগল যুগে যে বড়মাপের কৃষকবিদ্রোহ হয়নি তার কারণ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে **জরত্** ব্যবস্থার আওয়ায় অবস্থিত জমিদারদের চেয়ে বাংলার জমিদারদের ওপর রাষ্ট্রিক জুলুম কম ছিল। ফলে তাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল হওয়ায় তারা কৃষকদের প্রয়োজনে ছাড় দিতে পারত। তাছাড়া কৃষকদের তকাভি (taqavi) ঋণ দেওয়া, তাদের জমিতে আল বেঁধে দেওয়া, জমিতে তাদের দখলি স্বত্বকে মেনে নেওয়া, গ্রামাঞ্চলে দস্যু-তস্করের উপদ্রবকে যতখানি সম্ভব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, কিছু কিছু জমিকে খাজনা-মুক্ত (rent-free) বলে স্বীকার করে নেওয়া ইত্যাদি ছিল জমিতারদের কাজের স্বীকৃত অংশ। এইসব কাজের প্রতিপালনে বা তার অভাবে জমিদাররা সরকারের কাছ থেকে পুরষ্কৃত বা তিরষ্কৃত দুই-ই হত। মনে রাখা দরকার যে, আকবর থেকে ঔরংজেবের

রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে গড়পড়তা বার্ষিক রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল ০.২%। এর ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষি অর্থনীতিতে শোষণের মাত্রা ঔপনিবেশিক যুগের তুলনায় কম ছিল। অতএব স্বাভাবিক নিয়মেই জমিদার বা কৃষক কেউই সঙ্ঘবদ্ধ বড়মাপের বিদ্রোহের ঝুঁকি নেয়নি।

২৮.৬ মোগল শাসনে বাংলার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

মোগল শাসন বাংলাদেশে শান্তি ও প্রগতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের সংযোগ নতুন করে স্থাপিত হয়েছিল এই সময়ে। উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে স্থলপথে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গেও বাংলাদেশের সংযোগ পুনঃস্থাপিত হল। বৌদ্ধধর্ম যখন তার জন্মস্থান ভারতবর্ষে আর সক্রিয় শক্তিরূপে রইল না এবং যখন বাংলাদেশের শাসকরা—মুসলিম প্রাদেশিক শাসনকর্তারা—দিল্লিশ্বরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করল তখন থেকেই বাংলাদেশ বৃহত্তর উত্তরাঞ্চল ওর পরপারে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়েছিল। এই যোগাযোগ আবার ফিরে এল মোগল যুগে। এইভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝির সময় থেকে বাংলাদেশ যে "সংকীর্ণ একাকীত্বের" ("narrow isolation") মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল তার থেকে সে মুক্ত হল। কখনও মালয় থেকে কখনও বা সুদূর জাঞ্জিবার (Zanzibar) থেকে, আবার কখনও কখনও বহির্বিশ্বের অন্য কোনও মুসলিম দেশ থেকে বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে বিদেশি বণিকের জাহাজ বাংলার কূলে ভিড়তে লাগল। বাংলার নিঃসঙ্গতা ঘুচল, বহির্বাণিজ্যের দ্বারও তার সাথে সাথে খুলে গেল।

জলপথের বিকাশ, সামুদ্রিক বাণিজ্যের নতুন সূচনা, এই সবের সাথে বাংলাদেশে এসেছিল পাশ্চাত্যের বণিক ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্য। বণিক ও বাণিজ্যের আড়ালে এসেছিল পাশ্চাত্যের জলদস্যুতা (piracy)। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ভারত ও বাংলার সমুদ্রাঞ্চলে এই দস্যুতার প্রথম আবির্ভাব। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে গোয়ায় এবং গোয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের মাটিতে পর্তুগিজ বণিক ও ইউরোপীয় সামুদ্রিক শক্তির ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অচিরেই পর্তুগিজ নৌবহর ভারত মহাসাগরে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করল। ভারতবর্ষ, আরব, আফ্রিকা, মালয় প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যপোত এই পর্তুগিজ আধিপত্যের ছায়ায় তলিয়ে গেল। গোয়ায় পর্তুগিজ ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একশত বছরের মধ্যে দেখা গেল সেখানকার নাবিক ও বণিকরা কেউই লিসবনের (Lisbon) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য ও নির্দেশ না মেনে নিজেদের লাভের জন্য জলদস্যুতা শুরু করে দিয়েছে। একসময়ে এমন হল যে, মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণে দক্ষিণবঙ্গ উজাড় হয়ে যাওয়ার অবস্থা হল। ঠিক এইরকম এক দুর্ভাগ্যের সন্ধিমুহূর্তে বাংলাদেশে এসে পড়েছিল মোগলশক্তি। দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের আধিপত্য নিয়ে মোগল শক্তি, আরাকানরাজ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হয়েছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে যখন মোগলরা চট্টগ্রাম দখল করল তখন এই জলদস্যুদের ঘাঁটি ভেঙে গেল। এর আগেই ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে পর্তুগিজ শক্তিকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম দখলের পর দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে মোগল কর্তৃক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

এইভাবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের দুটি অক্ষরেখা তৈরি হল। প্রথমটি হল উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে স্থলপথে। এই পথ দিয়ে এসেছিল পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক, বণিক, কারিগর, সৈন্য এবং প্রশাসক। দীর্ঘদিন উত্তর ভারতের সম্ভ্রান্ত প্রশাসকরা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি। তারা এসে এদেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে নিজেদের দেশে ফিরে গেছে। তার ফলে বাংলাদেশ থেকে অনেক দিন পর্যন্ত বিপুল ধননিষ্কাশন ঘটেছিল। যোগাযোগের দ্বিতীয় অক্ষরেখা তৈরি হয়েছিল জলপথে। এ পথ দিয়ে এসেছিল বণিক, ভবঘুরে ভাগ্যান্বেষী, হার্মাদ জলদস্যু এবং বাণিজ্যের হাত ধরে পণ্য আর সোনারূপা. যেহেতু শক্তিশালী নৌবহরের অভাবে সমুদ্রশাসন মোগলরা করতে পারেনি সেহেতু পরবর্তীকালে এই পথ দিয়েই এসেছে বণিকের ছদ্মবেশে পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য শক্তির দল।

এইভাবে মোগল সাম্রাজ্য বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একশত বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি নিজেদের নিঃসঙ্গতা এবং অন্তর্বদ্ধতা কাটিয়ে ভুবনায়িত হয়েছিল। যদুনাথ সরকার বলেছেন যে, এইভাবে যখন বিশ্ব বাংলার দরজায় এসে দাঁড়াল বাংলাদেশ তখন নিজেকে মিলিয়ে দিল বিশ্বের সঙ্গে। এইভাবে দুই মানবশক্তির মহামিলনে যে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ঘটল তার থেকেই বিবর্তিত হয়েছিল আধুনিক বাংলা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আধুনিকীকরণের আগে এর থেকে বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আর বাংলাদেশে হয়নি।

বলা হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশে মোগলি শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে দুটি বড় শক্তির সূচনা হয়েছিল—এক, বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিকাশ এবং দুই, বাংলার বৈষ্ণব আন্দোলনের নবতর সংগঠন। মনে রাখতে হবে যে, এই সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে যুদ্ধের নতুন কৌশল আত্মপ্রকাশ করছিল। গোলা-বারুদের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছিল, ফলে সোরার (Salt-petre) চাহিদাও বাড়ছিল, কারণ সোরা ছিল বারুদের (gun-powder) সবচেয়ে প্রধান উপাদান। উত্তর বিহারের লালগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর সোরা পাওয়া যেত। সে সোরা জলপথে বাংলাদেশ হয়ে সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ ধরে পশ্চিমে চলে যেত। ইতিমধ্যে বাংলার রেশম ও সুতিবস্ত্র এবং নীল রপ্তানিযোগ্য পণ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ সমস্ত পণ্য ক্রয় করার জন্য বিদেশি, বিশেষ করে ইউরোপীয় বণিকরা সোনা-রূপা নিয়ে আসত। ১৬৮০-১৬৮৩ খিস্টাব্দের মধ্যে শুধু ইংরেজ বণিকরাই বাংলাদেশে এনেছিল দুই লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং-এর পরিমাণ রূপা। ইংরেজদের বাংলার পণ্যসম্ভার কেনার জন্য বাৎসরিক গড় বিনিয়োগ ছিল চার লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে এদেশে টাকার যে মূল্য ছিল তার থেকে মোগল যুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে এবং প্রায় সমস্ত মোগল যুগ ধরেই টাকার মূল্য ছিল অন্তত কুড়ি গুণ বেশি। অর্থাৎ, কম করেও শুধু আশি লক্ষ টাকা শুধু একটি বিদেশি কোম্পানির বণিকরা বাংলার অর্থনীতিতে বার্ষিকভাবে যোগান দিত। এত পরিমাণ সোনারূপা বাংলাদেশে আসলেও এখানে গ্রামাঞ্চলে ও সর্বত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যম (medium of exchange) ছিল কড়ি। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, যথেষ্ট সোনারূপা থাকলেও কি তার দ্বারা মুদ্রা ছাপা হত না? অথচ আবুল ফজল লিখেছেন যে, কৃষকরা নগদ অর্থে রাজস্ব দিত। আসলে যথেষ্ট সোনারূপা দিয়ে মুদ্রা ছাপা হলেও শেষপর্যন্ত অনেক সোনা-রূপাই মুদ্রার আকারে রাজস্বের রূপ ধরে হয়তো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতি কিংবা ক্ষণস্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রশাসকদের সাথে বাইরে চলে যেত। বাংলাদেশে সোনা-রূপার আমদানির ফলে নগদ অর্থের প্রাচুর্য নিশ্চয় বেড়েছিল। যার ফলে মোগল যুগে বাংলার মানুষ ও বণিকরা অন্য প্রদেশের পণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশে অর্থভিত্তিক দাম, অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য (money prices) এবং মজুরির অর্থমূল্য (money wages) বেড়েছিল। এর দ্বারা যে শ্রমের প্রকৃত মজুরি (real wages) বেড়েছিল এমন কথা বলা যাবে না। আমাদের দেশের ওপরের শ্রেণীর মানুষের ঐশ্বর্য বেড়েছিল যা দিয়ে তারা আগের থেকে অনেক বেশি বিলাসদ্রব্য ক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছিল। এর সঙ্গে যাদের ভাগ্যের উন্নতি হয়েছিল তারা হল সরকারি কর্মচারী, রাজস্ব-আদায়কারী মধ্যব্যক্তি এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা। সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যর অপনোদনের চিহ্ন আমরা বড় দেখি না।

বাণিজ্যের সঙ্গে যোগ রেখে মোগল বাংলায় নগরায়ণ ঘটেছিল। হুগলি, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, চুঁচুড়া, চট্টগ্রাম, চন্দননগর এবং পরে কলকাতা—ইত্যাদি শহরগুলি গড়ে ওঠে। বাণিজ্যের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক একাকীত্বে (economic isolation) মুছে গিয়েছিল। নগরায়ণের ধারা বাংলার সামাজিক উজ্জীবনকে আরও প্রসারিত করেছিল।

সামাজিক পরিবর্তন বিশেষভাবে এসেছিল বৈষ্ণব ধর্মের সংগঠনের মধ্য দিয়ে। এই ধর্মের মূল বোধ ছিল ভক্তি যার সাথে জড়িয়ে ছিল সহিষ্ণুতা আর নম্রতা বা দিনতার ভাব। তৃণের থেকেও দীন ও তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে যিনি ভক্তিভরে কৃষ্ণনাম করতে পারেন তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব। গুরু নিত্যানন্দ এবং অন্য সাতজন গুরু [সপ্ত গোস্বামী] এই ধর্মের ও সম্প্রদায়ের আচার-বিচার, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সাধনার পথকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। 'শক্তি' এই অভিধার

মধ্য দিয়ে ঔশী সৃজনী বলভাবকে ('Divine Creative Energy') নারীরূপে বাঙ্গালীরা দীর্ঘদিন ধরে আরাধনা করে আসছে। নারীর প্রকৃত শক্তিকে 'প্রকৃতি' রূপে পুরুষের বিপরীত বোধে উপস্থাপিত করে অনেকদিন ধরে এক জটিল সাধনাতান্ত্রিক মতবাদরূপে গড়ে উঠেছিল। বৈষ্মববাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার বিপরীত শক্তি। যদুনাথ সরকারের মতে, বাংলাদেশে বৈষ্মব ভাবধারার প্রভাবে তান্ত্রিক মতবাদ ও তন্ত্রসাধনা যেমন কমেছিল তার সঙ্গে তাল রেখে শক্তি উপাসনা, পশুবলি ও ঝাঁঝাল উত্তেজক মদ (কারণ-বারি) ইত্যাদি পানের প্রবণতাও কমেছিল। সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষের মনে রক্ত আর মদের উন্মাদনা কমানোর সাথে সাথে বৈষ্ণবধর্ম সাধারণ ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নতুন উজ্জীবন এনেছিল। ঘরে নাম সংকীর্তন এবং শোভাযাত্রা সহকারে সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে কলহ ও আত্মভাব ভুলে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বন্ধন ও সৌভ্রাত্র এনেছিল বৈষ্ণবধর্ম। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, নিরামিষ আহার আর উত্তেজনা পরিহারের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবধর্ম বাঙ্গালী মনকে এমন এক নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল যার ফলে তাদের সামরিক শৌর্য বিনষ্ট হয়েছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে হিন্দুশাসকদের পতন হওয়ার ফলে এখানে সংস্কৃত ভাষার ললিত চর্চা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিরস ন্যায় (logic) এবং বন্ধ্যা দার্শনিক দ্বন্দ্ব সংস্কৃত ভাষার বিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্মবধর্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র জনগণের চেষ্টায় আবার সংস্কৃতচর্চা দেশে বাড়তে থাকে।

বাংলাদেশে টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থা কর্মক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তন এনেছিল। এর পর থেকে সমস্ত রাজস্ব দলিল ফার্সিভাষায় লেখা হত। ফলে হিন্দু ও মসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীরা ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করে। মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় একসময়ে হিন্দুদের একচেটিয়াত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবও আগ্রা থেকে ক্ষত্রিরা (ক্ষত্রিয়রা) এবং রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের লালারাও রাজস্ব ব্যবস্থায় একটা বিরাট অংশ দখল করে নিতে থাকে। মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকালে কেবলমাত্র বাঙ্গালীরাই প্রশাসনে প্রাধান্য পেতে থাকে। সেটি আঠারো শতকের ঘটনা।

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মতো কোনও মোগল প্রাদেশিক শাসনকর্তা নবাব বা সুবাদার ও তাদের সম্ভ্রান্ত উত্তরভারতীয় মোগল সভাসদরা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি। ফলে তারা কোনওতিন বাংলাভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। বাধ্য হয়েই তাদের সভায় সবাইকেই ফার্সিভাষা শিখতে হত। দেশের জমিদারদের প্রতিনিধি **ভকিলরাও** (Vakil) ফার্সি ভাষা জানতেন। অনেক জমিদারকেও তা শিখতে হত। যার ফলে বাংলাদেশের হিন্দু জমিদারদের সভায় বা অন্তঃপুরে অনেক আদব-কায়দা, খানাপিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ চালু হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সংস্কৃতির এক বিরাট সমন্বয় ঘটেছিল মোগল যুগে। এইরকম সমন্বিত সংস্কৃতির একজন বড় প্রতিভু হলেন নদিয়ার সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

২৮.৭ সারাংশ

১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর পর কুড়ি বছর নিরন্তর অস্থিরতার মধ্য দিয়ে মোগল বিজয়ের ধারা চলতে থাকে। ১৬০৮ থেকে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইসলাম খানের শাসনকালে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম দখল করার পর মোগল রাজ্য বিজয়ের অব্যাহত ধারার সমাপ্তি ঘটে। এর পরের কাজ হল সীমানার প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকৃতপক্ষে বারো ভুঁইএঞাদের পরাজয়ের পর বাংলার অভ্যন্তরে বড় করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি। কোচবিহার, আসাম ও আহোম রাজ্যের সঙ্গে লড়াই ছিল বাংলার মূল ভূখণ্ডের প্রান্তিক অংশের সীমানা সংকোচন ও প্রসারণ সংক্রান্ত বিরোধ। বাংলা বিজয়কে নিশ্চিতি দানের জন্য মোগল শক্তিকে লড়তে হয়েছে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিরুদ্ধে।

১৬৩২ খিস্টাব্দে হুগলি থেকে পর্তুগিজ বিতাড়ণ ও ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম দখলের পর বাংলায় মগ ও পর্তুগিজ উপদ্রব বন্ধ হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের আধিপত্য নিয়ে আরাকানরাজ, পর্তুগিজ দস্যুশক্তি ও মোগলদের মধ্যে লড়াই চলে।

মোগলরা বাংলাদেশকে দিয়েছিল শান্তি আর স্থিরতা; আর দিয়েছিল ঐক্য। এর আগেও বারো ভুঁইঞা আর সামন্ত শাসকদের মধ্যে বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মোগলরাই বাংলাদেশকে একটা নিশ্চিত শাসনতান্ত্রিক ঐক্য দান করে। এর ফলে উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হল। উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এবং জলপথে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের যোগাযোগ স্থাপিত হল। বাংলাদেশের একাকীত্ব কাটল। এরপর শুরু হল নতুন বাণিজ্য, নতুন মানুষদের আনাগোনা। জলপথের বাণিজ্য দিয়ে আসতে লাগল সোনা-রূপা। বাংলার রেশম ও তাঁত বস্ত্র, নীল এবং বিহারের সোরা (salt-petre) বাংলার মধ্য দিয়ে বিদেশে যেতে লাগল। বাংলায় সমাজের ওপর দিকে যারা থাকত তাদের হাতে সম্পদের সঞ্চয় হ'তে লাগল। তারা বিলাসদ্রব্যে আসক্ত হলেন। জিনিসপত্রের অর্থভিত্তিক দাম ও শ্রমের অর্থভিত্তিক মজুরি বাড়লেও জনগণের প্রকৃত আয় বাড়েনি। কিন্তু মোটের ওপর রাষ্ট্রের চাহিদা অত্যধিক কিছু না হওয়ায় কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব কম ছিল। সার্বিকভাবে দেশে শান্তি স্থাপিত হয়। এই শান্তির পরিমণ্ডলে বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও বিকাশ বাড়তে থাকে। জনগণের মধ্যে ফার্সিভাষা শিখবার প্রবণতা দেখা দেয়। ফার্সিভাষায় দক্ষতা অর্জন করে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানরা সরকারী কর্মের একটা বিরাট অংশ দখল করে নেয়। ফার্সি ভাষা ও মোগল সংস্কৃতি জমিদারদের দরবার ও গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির এক নতুন সমন্বয় এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

২৮.৮ অনুশীলনী

১। সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে অন্যান্য অঞ্চলের মতো ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন কেন দেখা যায়নি? (আট লাইনের মধ্যে উত্তর লিখুন)

....
....
....
....
....
....
....
....

২। মোগল শাসনে বাংলায় কি কি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয়েছিল? (পাঁচ লাইনে উত্তর দিন)

....
....
....
....
....

৩। নীচের উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল? (✓) অথবা (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) পাশ্চাত্য বণিক ও পাশ্চাত্য বাণিজ্যের আড়ালে এসেছিল পাশ্চাত্যের জলদস্যুতা।

(খ) মোগলরা ছিল এক শক্তিশালী নৌবহরের অধিকারী।

(গ) মোগল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য অপনোদন করেছিল।

(ঘ) বৈষ্ণবধর্মের সংগঠন এক সামাজিক পরিবর্তন এনেছিল।

(ঙ) মোগল আমলে রাজস্ব-দলিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা হওয়াতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালীরা সংস্কৃত শিখতে শুরু করেছিল।

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) মোগল আমলে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের একজন বড় প্রতিভূ হলেন ———।

(খ) বাংলা বিজয়কে নিশ্চিতি দানের জন্য মোগল শক্তিকে লড়তে হয়েছে ——— ও ———জলদস্যুদের বিরুদ্ধে।

(গ) মোগলরাই বাংলাদেশকে একটা নিশ্চিত———ঐক্য দান করে।

(খ) মোগল আমলে বাংলায় সার্বিকভাবে ———স্থাপিত হয়।

২৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. Raychoudhuri, Tapan : Bengal under Akbar and Jahangir.
2. Eaton, Richard M : The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760.
3. Karim, Khondakar Mahababul : The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan
4. Chatterjee, Anjali : Bengal in the Reign of Auranjeb, 1658-1707
5. Sarkar, Jadunath : (ed) History of Bengal, Vol-II, Muslim Period, 1200-1757
6. Roy, Aniruddha : Aniruddha Adventures Landowners & Revls.
7. Habib, Irfan : The Agrarian System of Mughal.
8. Sen, Ranjit : Economics of Revenue Realisation in Bengal, 1757-1793.
9. Sinha, N. K. : Economic History of Bengal, Volume-II.
10. ভদ্র, গৌতম : মুঘল যুগের কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ।

একক ২৯ □ মনসবদারি ব্যবস্থা—মুঘল রাজস্বনীতি ও কৃষি

গঠন

২৯.০ উদ্দেশ্য

২৯.১ প্রস্তাবনা

২৯.২ মনসব : মুঘল শাসকশ্রেণীর সংগঠন

২৯.২.১ আকবরের আমলে মনসবদারি ব্যবস্থা

২৯.২.২ মনসবদার : জাট ও সওয়ার

২৯.২.৩ মনসবদারি ব্যবস্থার জটিলতা

২৯.৩ মনসবদারি ও জাগির ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক

২৯.৩.১ মনসবদারদের নিয়োগ ব্যবস্থা

২৯.৩.২ মনসবদারি ব্যবস্থা : দাগ ও চেহারার অর্থ

২৯.৩.৩ মনসবদারি অর্থ : উত্তরাধিকারের প্রশ্ন

২৯.৪ রাজস্বব্যবস্থা ও কৃষি

২৯.৪.১ মুঘল রাষ্ট্র ও উদ্বৃত্ত আদায়ের ব্যবস্থা

২৯.৪.২ বিভিন্ন শাসকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক

২৯.৪.৩ মুঘল রাষ্ট্রে কৃষক বিদ্রোহের কারণ ও বিদ্রোহের চরিত্র

২৯.৫ মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্কট নিয়ে বিতর্ক

২৯.৬ সারাংশ

২৯.৭ অনুশীলনী

২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২৯.০ উদ্দেশ্য

মুঘল শাসনাধীন ভারতকে জানতে হলে কেবল সাম্রাজ্য বিস্তার, ধর্মনীতি বা রাজপুত নীতির আধারে তাকে সম্যকভাবে চেনা যাবে না। মুঘলরা ভারতবর্ষের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে এক শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে এই রাজবংশের একটা বড় কৃতিত্ব। সেইজন্য সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক দিকটি সম্পর্কেও আপনাদের জানতে হবে। দেখতে হবে কিভাবে অভিজাত আমির-ওমরাহরা মুঘল শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে মনসব এবং জাগির ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাহলে আপনারা দেখবেন কিভাবে মনসব এবং জাগির যুগপৎ মুঘল শাসনের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল, আবার পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ সাম্রাজ্যের পতনের পথও প্রস্তুত করেছিল। সেই সঙ্গে এই ব্যবস্থার সাথে কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্কের কথাও আপনাদের জেনে রাখতে হবে। কারণ কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে এই সকল ব্যবস্থার যোগাযোগ ছিল গভীর।

২৯.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন মনসবদারি ব্যবস্থাটি কি ও কেমনভাবে তা মূলত সম্রাট আকবরের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। মনসবদারি ব্যবস্থার কি সম্পর্ক ছিল। আকবরের ও তাঁর পরবর্তী সময়ে মনসবদার ব্যবস্থার চরিত্র জটিল হয়ে পড়ে। মনসবদারি ব্যবস্থায় দুর্নীতি আটকানোর জন্য সম্রাটগণ চেহরা ও দাগের মতো কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা জানা যাবে। জানতে পারবেন জাট ও সওয়ার বলতে কি বোঝায় ইত্যাদি। আগেই বলা হয়েছে মনসবদারি ব্যবস্থার সঙ্গে জায়গিরদারি ব্যবস্থা ছিল গভীরভাবে সংযুক্ত। মুঘল কৃষি-ব্যবস্থার সঙ্গে আবার জায়গিরদারি ব্যবস্থা ছিল তেমনিভাবে যুক্ত।

জায়গিরদানের মাধ্যমে মনসবদারদের বেতন দেওয়া হত। এই জায়গিরদানের মাধ্যমে কৃষি-উদ্বৃত্ত আদায় করা হত। কৃষি-উদ্বৃত্ত কৃষিকার্য পদ্ধতির মাধ্যমে পরিমাপ করা হত ভাগচাষ, কানকুত, জবৎ ইত্যাদি। রাজস্ব অত্যন্ত কড়াভাবে আদায় হত, না দেওয়া ছিল বিদ্রোহের সমান। রাজস্ব আদায় নিয়ে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষকদের শোষক-শোষিতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যদিও মুঘল রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল কৃষকদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। ঔরঙ্গজেব কেমন করে শেষ জীবনে কৃষকদের ধ্বংসের পথে না ঠেলে দেবার জন্য হাহাকার করেছিলেন তাও জানতে পারা যাবে। আবার কেন মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছিল, তাও এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে।

২৯.২ মনসব : মুঘল শাসকশ্রেণীর সংগঠন

ঐতিহাসিকদের মতে, মনসবদারি ব্যবস্থা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণীর সংগঠন। আবুল ফজলের সাক্ষ্য অনুযায়ী (আইন-ই-আকবরী) আকবর এই ব্যবস্থার সাংগঠনিক-রাজনৈতিক চরিত্র নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। মনসবদারি ব্যবস্থার কিছু কিছু অস্তিত্ব তুর্কিদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। দশ এককের সংখ্যায় ঘোড়সওয়ারের হিসেব রাখা হত। একজন 'খাস' ১০,০০০ ঘোড়সওয়ারের কর্তৃত্ব করত, একজন মালিক ১০০০ জন ঘোড়সওয়ারের ও একজন আমীর ১০০ জন ঘোড়সওয়ারের কর্তৃত্ব করত। এই ব্যবস্থায় যুগপৎ দশ এককের হিসেব ও ধাপ (rank) যুক্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। এই ব্যবস্থা তৈমুরলঙের আমলে সঠিকবাবে কার্যকরী ছিল কিন্তু ১৪০৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থা অনেকটাই ভেঙ্গে পড়ে। দারিদ্র্যের জন্য সঠিক সংখ্যার ঘোড়সওয়ার রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে, যদিও ধাপের সঙ্গে যুক্ত সম্মান আগের মতনই থাকে। এর ফলে উঁচু সম্মানযুক্ত অফিসাররা কমসংখ্যক ঘোড়সওয়ার রাখতে পারত। দিল্লির সুলতানদের আমল এই একই ব্যবস্থার রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক বরনীর মতে, এক বিরাট সৈন্যসংখ্যার যে অস্তিত্ব সুলতানি আমলে দেখা যায় তার প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল না।

২৯.২.১ আকবরের আমলে মনসবদারি ব্যবস্থা

আকবর এই সমস্ত উপাদান নিয়েই তাঁর ধাপযুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সুলতানি যুগের ব্যবস্থা থেকে তিনি বিভিন্ন সংখ্যার ধাপের অনুকৃতি (model)-টি গ্রহণ করেন। এর সঙ্গে যুক্ত করেন বিভিন্ন ধাপের সংখ্যা ও নির্দিষ্ট সংখ্যার সৈন্য হাজির করার দাসত্ব ও মনসবদারদের সম্পূর্ণভাবে খরচ চালাবার জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা। আকবর প্রবর্তিত ব্যবস্থায় একজন পাঁচ হাজারি মনসবদার অথবা অন্য যে কোনও সংখ্যার মনসবদার নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য হাজির করার দায়িত্ব বহন করত। সৈন্যসংখ্যার, সময় বিশেষে পর্যবেক্ষণ হত, ঘোড়াগুলির গায়ে সরকারি ছাপ মারা হত। নির্দিষ্ট সংখ্যার সৈন্য ও ঘোড়া ঠিক সময় হাজির করতে না পারলে

শাস্তি হত। আকবরের প্রবর্তিত ব্যবস্থার আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারি ব্যবস্থার ওপর মনসবদারদের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা। আকবর কিছুকাল অর্থে বেতন দান করেন। এর জন্য সরকারি প্রশাসক বা কারোরিরা সরকারি ভূমি-রাজস্ব আদায় করেছিল। আকবরের পরবর্তীকালের সম্রাটগণ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন ও অর্থের পরিবর্তে ভূমির মাধ্যমে বেতনদান করার প্রথা চালু করেন। একজন মনসবদারের বেতন ঠিক হত তার ধাপ ও সামরিক দায়িত্বের হিসেব-নিকেশের মাধ্যমে। বেতন একবার ঠিক হলে একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভূমি-রাজস্বের বরাত (assignment) দেওয়া হত। তাত্ত্বিক ও বাস্তবিকভাবে এই বরাত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা জমিদারি ছিল না; অর্থে বেতনের পরিবতে ভূমি-রাজস্ব ভোগ করার অধিকার ছিল। একজন মনসবদারের বরখাস্ত অথবা মৃত্যু হলে বরাত সম্রাটের খাস জমিতে পরিণত হত। সম্রাটের তোষাখানা থেকে কোনও ধার নেওয়া থাকলে তার কড়া হিসেবনিকেশ হত। মনসবদারের মৃত্যুর পর তার পরিবারবর্গ ভরণপোষণের বাবদ অল্প পরিমাণে রাজস্বমুক্ত জমি পেত। মনসবদাররা তত্ত্বগত দিক থেকে এবং বাস্তবে সরকারি কার্যকালে একই জমির বরাত পেত না। বরাত নিয়মিত বদল করা হত। এর ফলে কোনও বিশেষ এলাকায় মনসবদারের ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারত না। জমির সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মনসবদারের সম্পর্ক ছিল অর্থভিত্তিক (cash mexus), জমিদার-প্রজাভিত্তিক নয়।

মনসবদাররা নিঃসন্দেহে ছিল রাজকীয় প্রশাসক (Imperial official)। আবুল ফজলের মতে, সম্রাট আকবর ধাপের সংখ্যা নির্ণয় করেছিলেন। দশ সংখ্যার কমাণ্ডার থেকে দশ হাজার সংখ্যার কমাণ্ডার ছিল। একমাত্র রাজপরিবারের সদস্যরা পাঁচ হাজারের বেশি সংখ্যার ধাপের অধিকারী হতে পারত। সাধারণ প্রজা সংখ্যা এবং ধাপের ব্যাপারে পাঁচ হাজার মনসবের বেশি উঁচুতে যেতে পারত না। একথা মনে রাখতে হবে যে, মনসবের সঙ্গে যুক্ত সংখ্যা অনুযায়ী মনসবদারকে সৈন্যসংখ্যা রাখতে হত এবং তাকে সেই পরিমাণে অর্থ দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটি ছিল ধাপের ও সম্মানের ইঙ্গিতবাচক।

২৯.২.২ মনসবদার : জাট ও সওয়ার

একজন মনসবদার যে ব্যক্তিগত ধাপের অধিকারী হত তা জাট বলে পরিগণিত হত। এছাড়া মনসবদার আর একটি সংখ্যার অধিকারী হত তাকে বলা হত সওয়ার অথবা ঘোড়সওয়ার। সওয়ার সংখ্যা কখনই জাটের বেশি হত না বরং কম হত। খুব কম ক্ষেত্রে সওয়ার সংখ্যার অস্তিত্ব থাকত না। সওয়ার ধাপ অনুযায়ী একজন অফিসারকে ঘোড়সওয়ার রাখতে হত, যদিও এটিতে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যার ইঙ্গিত থাকত না। সওয়ার ছিল একটি ধাপের মধ্যে আর একটি ধাপ। সাধারণত সওয়ার ধাপের সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ ঘোড়সওয়ার রাখতে হত। সম্রাট শাহজাহান পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। শাহজাহান এই ব্যবস্থার বদল করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী একজন হাজার সওয়ার ধাপের মনসবদারকে দুইশত (২০০) ঘোড়সওয়ার রাখতে হত ও এইভাবে বলা যায় একজন মনসবদার যে চার হাজার (৪০০০) জাটের অধিকারী ও তিন হাজার (৩০০০) সওয়ার ধাপের অধিকারী তাকে প্রকৃতপক্ষে ছয়শত (৬০০) ঘোড়সওয়ার রাখতে হত।

২৯.২.৩ মনসবদারি ব্যবস্থার জটিলতা

মনসবদারি ব্যবস্থার আর একটি জটিল দিক হল একজন মনসবদারের ব্যবস্থা অনুযায়ী বারো মাসের মাইনে পাবার কথা, কিন্তু সবসময় তা হত না। অনেকসময় বেতন মাত্র পাঁচ মাসের দেওয়া হত। বেতনের কম-বেশি অনুযায়ী

সওয়ার ধাপও কম-বেশি হত। যেমন একজন মনসবদারের সওয়ার ধাপ অনুযায়ী ১০০০ ঘোড়সওয়ার রাখার কথা, সে মাত্র নয় মাসের বেতন পেত। সেক্ষেত্রে ৭৫০ জন ঘোড়সওয়ার রাখলেই চলত, এবং ১৬৫০টি ঘোড়া রাখার দায়িত্ব বর্তাত। সুতরাং সওয়ার ধাপের মধ্যে দায়িত্বের নানারকম পরিবর্তন হত বেতনের পরিবর্তনের ফলে। অনুরূপভাবে, জাট ধাপের ক্ষেত্রে সওয়ার ধাপের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। এই সমস্ত পরিবর্তন ধাপ ও সম্মানের (status) পরিবর্তন ঘটাত। এসব নানা পরিবর্তন মনসবদারি ব্যবস্থার জটিলতার ইঙ্গিতবাহক। সমস্ত ব্যবস্থাটি ছিল আভ্যন্তরীণ বিরোধগুলিকে একটি মাননীয় উপাধির ঘেরাটোপে ঢেকে রাখা। জাতিগত, সংস্কৃতি, ধর্মীয় প্রভৃতি সত্তার বিরোধে ব্যাপৃত অশান্ত শাসকশ্রেণীকে সাম্রাজ্যের স্বার্থে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই বাবস্থার মাধ্যমে, মোরল্যান্ড দেখিয়েছেন, আকবর থেকে শাহজাহানের আমলে কিভাবে জাট এবং সওয়ার সংখ্যার ধাপের জন্য প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। এবিষয়ে বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ যা মোরল্যান্ড ব্যবহার করতে পারেননি তার মতের পক্ষে যায়।

২৯.৩ মনসবদারি ও জাগির ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক

শাহজাহানের আমলে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রথম লক্ষ করা যায় তা হল মাসিক হারের অথবা অনুপাতের প্রথাটি। এই প্রথাটির উদ্ভব ঘটে জাগিরের জমার সরকারি হিসেব ও প্রকৃত রাজস্ব আদায় বা হাসিলের পার্থক্যের জন্য। যখন কেউ জাগির পেত যার সরকারি হিসেব অনুযায়ী জমা ছিল তার বাৎসরিক আয়ের সমান। মনে রাখতে হবে, এসব ক্ষেত্রে জাগিরের প্রকৃত আয় ছিল অর্ধেক বা একের চার অংশ। এসব ক্ষেত্রে জাগির শাসমাহা (ছয় মাসের) বা সিহ্ মাহা (তিন মাসের) নামে পরিগণিত হতে থাকে। শাহজাহানের রাজত্বের শেষের দিকে দক্ষিণ-ভারতের হাসিলের পরিমাণ হয় জমার একের চার অংশ (অর্থাৎ সিহ্-মাহা)। তুলনায় উত্তরভারতের অবস্থা ভাল ছিল। অনুরূপ অবস্থা অর্থে প্রদেয় বেতনের ক্ষেত্রেও চালু ছিল। যে জাগিরের হাসিল ছিল পাঁচ মাসের তার মাসিক যখন নগদি (নগদে প্রাপ্ত বেত) হত তখন সে পুরো বারো মাসের মাইনে পেতে পারত না। শাহজাহান তাঁর এক ফারমানে (রাজত্বের সাতাশ বৎসরে) আদেশ দেন যে, অর্থে দেয় বেতন কখনও সর্বোচ্চ আট মাসের ওপরে অথবা চার মাসের নীচে ঠিক করা হবে না। এই আদেশ একমাত্র সাম্রাজ্যের দুইজন উঁচু পদের অভিজাত ও রক্তের সম্পর্কে রাজপরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে কার্যকরী না হবার ঘোষণা করা হয়। জমা ও হাসিলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্য মনসবদারি তথা জাগির ব্যবস্থায় সঙ্কট ডেকে আনে।

২৯.৩.১ মনসবদারদের নিয়োগ ব্যবস্থা

মনসবদারদের নিয়োগ ব্যবস্থাও ক্রমশ এক ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। তত্ত্বগত দিক থেকে মনসবদারদের নিয়োগ করতেন স্বয়ং সম্রাট। তিনি কাউকে মনসব দিতে বা নিতে পারতেন, মনসবের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারতেন। আবুল ফজলের মতে মনসব প্রার্থীরা অনেক সময় স্বয়ং সম্রাট দ্বারা পরীক্ষিত হতেন। মীর বক্শী সম্রাটের সামনে ইরানী, তুরানী, রুমী, ফেরাঙ্গী, হিন্দী, কাশ্মীরিদের ঔগচ্ছিত করতেন। দ্বিতীয় প্রথাটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কোনও বড় অভিজাত, প্রদেশের প্রশাসক অথবা অভিযানের নেতা সম্রাটের কাছে নাম সুপারিশ করে পাঠাতেন এবং সাধারণত তাদের নাম গৃহীত হত। রাজ-পরিবারের কেউ নাম সুপারিশ করলেও তা গৃহীত হত। পদোন্নতির পথও ছিল প্রধানত সুপারিশ। মনসব দেবার সময় যা সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেত তা হল উত্তরাধিকার। খামামজাদ বা মনসবদারদের উত্তরাধিকারীদের দাবি ছিল সবথেকে বেশি। এদের পর যারা মনসব পেত তারা ছিল সাম্রাজ্যভুক্ত

জমিদার অথবা প্রধানরা (chiefs)। আকবর এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের মনসব দেওয়ার ওপর জোর দেন এবং বিশাল সংখ্যক জমিদার ও তাদের উত্তরাধিকারীদের মনসব দেন। এইসব জমিদাররা তাদের ব্যক্তিগত জমিদারী ‘ওয়াতন’ জাগির হিসাবে ভোগ করতেন, আবার সরকারি প্রশাসক হিসাবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সাধারণ জাগিরের মালিক হতেন।

মুঘল রাষ্ট্রে অন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অভিজাতরা ক্রমশ ঢুকে পড়ে। এই ব্যবস্থা ছিল কিছুটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফল, কিছুটা বাদশাহী নীতি। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত করে প্রশাসনে নিয়োগ করা। আকবর তাঁর ‘সুলেহ-কুল’ এই উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করেন যে বিভিন্ন জাতির লোক তাদের ক্ষমতাকে কার্যকরী রূপ দিতে পারবে ও সম্রাটের প্রতি তাদের আনুগত্য অক্ষুণ্ণ থাকবে।

২৯.৩.২ মনসবদারি ব্যবস্থা : দাগ ও চেহারার অর্থ

মুঘল সাম্রাজ্যের মূল শক্তি ছিল ঘোড়সওয়ার বাহিনী। ভালো জাতের ঘোড়া দিয়ে ঘোড়সওয়ার বাহিনী তৈরি রাখা ছিল মনসবদারদের প্রধান দায়িত্ব। এইজন্যই মনসবদারদের সওয়ার সংখ্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তারা সম্রাটের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের ঘোড়সওয়ার নিয়ে প্রয়োজনীয় স্থানে পৌঁছতে বাধ্য থাকত। সওয়ারের সংখ্যা সেইজন্য মুঘল মনসবদারের কাছে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু আকবরের আমল থেকেই ঘোড়া রাখার ব্যাপারে অভিজাতদের মধ্যে দুর্নীতি বেড়ে যায় এবং তার ফলে সম্রাট ঘোড়ার ক্ষেত্রে দাগ (ছাপ মারা) ও ঘোড়সওয়ারের ক্ষেত্রে “চেহরা” (পরিচয় পত্র) প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। এই নিয়ম অনুযায়ী একজন মনসবদারকে সওয়ার সংখ্যা অনুযায়ী ঘোড়সওয়ার হাজির করতে হত এবং তা না করতে পারলে শাস্তি পেতে হত। মনসবদারদের নির্দিষ্ট সংখ্যা ঘোড়সওয়ার শুধু নয় নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়াও হাজির রাখতে হত।

জাহাঙ্গীরের সময় এই নিয়ম দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শাহজাহান পুরো ব্যবস্থা ঢেলে সাজান। লাহোরীর পাদশাহনামা থেকে জানা যায়, যে সব মনসবদার নিজের জায়গায় জাগির ভোগ করত তারা সওয়ার সংখ্যার একের-তিন অংশ ঘোড়া উপস্থিত করতে বাধ্য ছিল। জাগির ও নিয়োগের জায়গা আলাদা হলে একের-চার অংশ ও নিয়োগ যদি বলা বা দেখানোর মতো জায়গায় হত তাহলে একের-পাঁচ অংশ ঘোড়া হাজির করতে বাধ্য ছিল।

২৯.৩.৩ মনসবদারি অর্থ : উত্তরাধিকারের প্রশ্ন

মনসবদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও আলোচনাই সম্পূর্ণ হয় না যদি না অভিজাতদের সংগৃহীত বিপুল অর্থ তাদের উত্তরাধিকারীরা কি ভাবে পেত তা না আলোচনা করা হয়। বিশেষ কোনও অন্যায় করলে শাস্তি হওয়া ছাড়া অভিজাতরা তাদের সঞ্চিত সম্পদ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকত, কিন্তু যে বিষয়ে মতবিরোধ আছে তা হল এই সম্পত্তি আইনত উত্তরাধিকারী পেত কি না। এবিষয়ে কিছু প্রমাণ আছে যা ইঙ্গিত করে সম্রাট মৃত অভিজাতদের সম্পত্তি দাবি করেছেন।

মুসলমান রাজতন্ত্রে রাজা তার অফিসারদের সঞ্চিত অর্থ দাবি করছেন এমন উদাহরণ বহু প্রাচীনকাল থেকে পাওয়া যায়। ভৃত্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে আব্বাসিড খলিফার দোহাই দিয়ে তাদের প্রশাসকদের সম্পত্তি অধিকার করতে আরম্ভ করে। বিধি অনুযায়ী একজন ভৃত্যের অর্থ সবসময় তার প্রভুর আয়ত্তাধীন। দিল্লির সুলতানদের বহু ভৃত্য ছিল এবং ফিরোজ তুঘলক তার এক (অফিসার) ভৃত্যের সম্পত্তি নিয়ে ফিরেছিলেন। ভারতীয় মুঘলরা দিল্লির সুলতানদের মতন প্রকৃত অর্থে অফিসারদের ভৃত্যের পরিবর্তে স্বাধীন বলে স্বীকৃতি দিলেও মুসলমান আইনে ভৃত্যদের প্রতি যে

ব্যবহার করা যায় তাই করতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে যে দাবি মুঘলরা করতেন তা নিয়ে আইন-ই-আকবরীতে বিশেষ কিছু বলা না হলেও আকবরের সময় থেকে ইউরোপীয় পর্যটকরা এ বিষয়ে নীরব থাকেননি। এদের সাক্ষ্য অনুযায়ী সম্রাট একজন অভিজাতের সম্পত্তি নিয়ে আবার নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বন্টন করতেন। সাধারণত কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে সম্রাট বাকি অংশ অভিজাতের উত্তরাধিকারীকে তা দিতেন। আকবর ও শাহজাহানের আমলে এরকম দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যায়। তবে একথা বলা যায় যে, অভিজাতরা এ নিয়ে নিঃসন্দেহ ছিল যে সম্রাট তাঁর অংশ রেখে (মুতালিক) বাকি অংশ তার উত্তরাধিকারদের পুনর্বন্টন করবেন এই কারণে অভিজাতরা তাদের জীবদ্দশায় প্রচুর পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ করতে দ্বিধাবোধ করত না।

২৯.৪ রাজস্বব্যবস্থা ও কৃষি

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, মনসবদারদের বেতন দেওয়া হত হয় নগদে নয় জাগিরের মাধ্যমে; যে জমি সম্রাটের নিজের ব্যবহারের জন্য রাখা হত তাকে বলা হত খালিফা-ই-শরিফা বা খালিসা। যে জমি বণ্টনের জন্য হলেও সাময়িকভাবে সম্রাটের তত্ত্বাবধানে রাখা হত তাকে বলা হত **'পাইকাবাবী'।**

সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশ জাগির হিসাবে বণ্টনের জন্য রাখা হত। জাগিরের প্রাপককে বলা হত জাগিরদার। জাগির ছিল মুঘল রাজস্বব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ। মনসবদাররা হত জাগিরদার। জাগিরদাররা রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিল। কৃষকরা যা উৎপাদন করত তার উদ্বৃত্ত অংশ (কৃষকদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অংশের বাকি অংশ) আদায় করে রাষ্ট্রের হাতে জমা করা ছিল জাগিরদারের কাজ। রাজস্ব ছিল প্রধানত ভূমিরাজস্ব, তবুও এছাড়া নানারকম উপকর ও খুচরো করও থাকত, যা দূরতম গ্রামাঞ্চল থেকেও আদায় করা হত। বড় বড় নগর ও বন্দরের বাজার নিয়ে হত আলাদা মহাল এবং এগুলিও অন্যান্য এলাকার মতোই প্রায়ই জাগির হিসেবে বিলি করা হত।

কয়েক বছর পর পর জাগিরের হাতবদল হত; এ ছিল আকবরের সৃষ্ট নিয়ম। জাগির বেতনের বদলে দেওয়া হত বলে প্রত্যেক জাগিরের একটি স্থায়ী জমা বা আয় নির্ধারণ করা হত, যাতে মনসবদারদের বেতনের পরিমাণ ও জাগিরের জমার পরিমাণ সমান হয়। আবার জমার পরিমাণ হাসিল (প্রকৃত আদায়) যাতে মোটামুটি এক হয় তার দিকেও নজর রাখা হত। আবুল ফজলের মতে, এই ধরনের জমা বার করাই ছিল আকবরের রাজস্বনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

১৭ শতক থেকে জমা 'জমাদামী' হিসাবে পরিচিত হয়। এই সময় থেকে জমা পরিসংখ্যানে লেখা হতে থাকে। এই জাতীয় পরিসংখ্যান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। এই পরিসংখ্যানের হেরফের হত, স্থায়ী জমাও কিছু ছিল না। জমাদামী কি হবে তাই নিয়ে জাগিরদার প্রশাসনের সঙ্গে দর-কষাকষি করত। পরবর্তীকালে মাসের হিসাবে জমাদমী ঠিক করা হতে থাকে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রশাসন জমাদামীর হিসেবের ঝুঁকি জাগিরদারের ওপর চাপাত, হাসিল কম হলে জায়গিরদারকে তার দায়িত্ব নিতে হত, হাসিল বেশি হলে প্রশাসন তা আদায় করে নিতে চাইত। এই নিয়ে অত্যধিক টানাপোড়েন চলায় টোডরমল ঠিক করে দিয়েছিলেন যে, সমস্তরকম রাজস্ব আদায় হবে সরকারের ঠিক করে দেওয়া হারে, তার বেশি আদায় করলে জরিমানা সমেত বাড়তি অংশ কেড়ে নেওয়া হবে। প্রশাসন জাগিরগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ের বিল বা 'হাল-এ-হাসিল' চেয়ে পাঠাত। স্থায়ী জমা ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য এলাকার ও রাজস্বের দশ বছরের হিসাবের নথিপত্র দরবারে রাখা থাকত।

শাহজাহানের আমল থেকে হাসিল ও জমাদামীকে এক করার চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া হয় কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জমাদামী ও হাসিল এক হত না, হাসিল কম হত। ঔরঙ্গজেবের আমলে শেষের দিকে জাগির ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা দেয়। ঔরঙ্গজেব দক্ষিণে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ করলে এক বিরাট সংখ্যক দক্ষিণী বা দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রশাসকরা মনসবদার রূপে মুঘলরাষ্ট্রে জায়গা করে নেয়। মারাঠারাও এসময়ে প্রচুর মনসব পায় কারণ মুঘল-রাষ্ট্রের জয়ের জন্য তাদের কিনে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। এই উভয় কারণে মনসবদারদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে এদের মাইনে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় জাগির আর ছিল না, (বে-জাগির) যাদের একের পর এক মনসবদার করা হচ্ছিল তারা বছরের পর বছর জাগিরহীন অবস্থায় কাটাচ্ছিল, আর কারোর জাগির একবার হস্তান্তরিত হলে আর একটি জাগির সে নাও পেতে পারত।

অন্যদিকে মনসবদাররা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি হবার ফলে কৃষকদের কাছ থেকে চড়া হারে রাজস্ব আদায় করতে চাইত। তারা তাদের জাগিরগুলির অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের কথা ভাবত না। সমকালীন পর্যবেক্ষকেরা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে অন্যায়-অত্যাচার চলত সে বিষয়ে অনেক তথ্য রেখে গেছেন। মনসবদাররা আবার অনেক সময় রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিয়োগ করত, যারা আরও অনেক বেশি অত্যাচার করে রাজস্ব আদায় করত। এদের অস্থায়ী চরিত্রের ফলে কৃষকদের অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে।

তুলনামূলকভাবে হিন্দু-রাজারা তাদের ওয়াতন জাগিরে অনেক কম অত্যাচার করত কারণ সেখানে জমিনদারের সঙ্গে কৃষকদের অনেক বেশি স্থায়ী সম্পর্ক ছিল। জমিনদারি ছিল কৃষককে বাদ দিয়ে তার ওপরতলার এক গ্রামীণ শ্রেণীর। জমির উৎপন্নের ওপর অধিকার জমিনদারি গ্রাম ও রাইয়তি গ্রাম ছিল আলাদা। সাম্রাজ্যের সর্বত্র এই দুই ধরনের গ্রামের পার্থক্য 'সুনির্দিষ্ট না হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল' কোথাও কোথাও গ্রামের জমিকে 'খুদকাস্তা-এ-জমিনদারান' বলা হয়েছে। জমিদারদের নিজের কর্ষিত জমি ও রাইয়তি এইভাবে ভাগ করা হয়েছে আবার কোথাও তাল্লুক হিসাবে ভাগ হয়েছে। তালুকদার সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজস্ব সংক্রান্ত পরিচয় আমরা পাই, যা সমস্ত জায়গায় ব্যবহার করা হত। যেমন তালুক ও তালুকদার জমিদার ও জমিদারি কথাটির বদলে ব্যবহৃত হতে থাকে। তাল্লুক কথাটির অর্থ ছিল যোগাযোগ। আকবরের আমলে প্রথম জমিনদার কথাটি ব্যবহার হয় যদিও 'আইন' অথবা রসিকাদাসের প্রতি ঔরঙ্গজেবের ফরমানে কোথাও জমিদার কথাটি ব্যবহার করা হয়নি। তবে শেরশাহ যখন তাঁর বাবার আমলে বিহারের শাসনকাজ চালাচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন নিয়ন্ত্রণে না থাকলে জমিদাররা রাজস্ব হিসাবে যা রাজকোষে জমা দেবার কথা তার থেকে অনেক বেশি অর্থ দুর্বল প্রজাদের থেকে আদায় করবে। সুতরাং মনে করতে হবে, জমিদার অথবা তালুকদার উভয় পরিভাষাই ক্রমবিবর্তনশীল রাজস্ব সংক্রান্ত পরিভাষা মাত্র। কৃষকদের জমি দেওয়া বা ফিরিয়ে নেবার অধিকার জমিদারদের ছিল বলে মনে হয়। জমিনদাররা চাইত কৃষকদের ধরে রাখতে। তবে আইনত জোর করে কৃষকদের ধরে রাখতে পারত কিনা তা বলা যায় না। কিন্তু বাদশাহী কর্তৃপক্ষ—যার মধ্যে জমিনদার ও তার কর্মচারীরা পড়ত—এ কাজ করতে পারত। জমিনদাররা গ্রামের রাজস্ব বাদশাহী কর্তৃপক্ষকে দিত একটা বাঁধা অঙ্কে, তারপর 'প্রথামত বা নিজস্ব নির্দিষ্ট হারে কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত'। এই প্রথা বাংলায় চালু ছিল। গুজরাটে জমিনদারদের জমি দু ভাগে ভাগ হত। এর তিনের চারভাগকে 'তলপদ' বলা হত আর একের চার ভাগকে বলা হত 'জাট'। প্রথমটি থেকে রাজস্ব নিত কর্তৃপক্ষ আর বাকিটা ছেড়ে দেওয়া হত জমিনদারদের হাতে। জমিনদাররা তাদের প্রধান আর্থিক দাবি ছাড়াও ছোটখাট উপরি কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করত। তারা বেগার খাটাত তবে কৃষিকাজের সময় এই বেগার খাটান হত না।

জমিদারি সৃষ্টি হয়েছিল ঐতিহাসিক কারণে। একটি বা কয়েকটি গোষ্ঠী (কওম) বিভিন্ন এলাকায় জোতজমি একচেটিয়াভাবে দখলে রেখেছিল। জমিনদার শ্রেণী এই গোষ্ঠীগুলি নিয়ে গঠিত। চার্লস এলিয়ট বলেছেন, যখন কোনও গোষ্ঠী অন্য কোনও গোষ্ঠীর অঞ্চল জয় করত কিন্তু আগের গোষ্ঠীর সবাইকে তাড়িয়ে দিতে পারত না আগের পুরোন গোষ্ঠীর কেউ কেউ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখত, তারাই জমিদারি স্বত্বের অধিকারী হয়ে উঠত।

২৯.৪.১ মুঘল রাষ্ট্র ও উদ্বৃত্ত আদায়ের ব্যবস্থা

যাই হোক, জাগিরদার ও ওয়াতন জাগিরদারদের মাধ্যমে উৎপাদনের উদ্বৃত্ত (surplus) মুঘল রাষ্ট্র আদায় করে নিত।* একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, রাজস্ব দাবি এতটাই চড়া হারে বাঁধা ছিল যে তা আর বাড়ানোর উপায় থাকত না। কৃষকদের ওপর অন্য যে সব কর চাপান হত, কর্মচারী ও অন্যান্যরা নিয়ম-বেনিয়মে আরও যে অর্থ আদায় করত তার বোঝা কৃষকদের ওপর এতটাই ছিল যে, কৃষকরা প্রায়শই তাদের বেঁচে থাকার অপরিহার্য অংশটুকুও ছেড়ে দিতে বাধ্য হত।

মুঘল আমলে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ হত বিভিন্ন পদ্ধতিতে, যেমন 'হস্ত-এ-বুদ', 'কানকূত' বা 'দানাবন্দি', 'জাবত' (Zabt) প্রভৃতি। এই বিভিন্ন পদ্ধতির কারণ ছিল উৎপাদনের হার সব জায়গায় একরকম ছিল না। সাধারণত উদ্বৃত্ত বেশি হত না বলে মনে করা যেতে পারে। সুতরাং, উদ্বৃত্ত ঠিক করে তার অংশবিশেষ নেবার পদ্ধতিই ছিল ভূমি-রাজস্ব ঠিক করারও পদ্ধতি।

আবুল ফজল মন্তব্য করেছিল যে, শেরশাহ তিন রকমের শস্যহার বেঁধে দিয়েছিলেন। তার নীতি ছিল আদায়ের পরিমাণ বেঁধে দেওয়া। এই সমস্ত শস্যহারগুলির গড়ে এক-তৃতীয়াংশ আদায় করার নিয়ম প্রত্যেকটি শস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এই ব্যবস্থা জাবত ব্যবস্থারই অঙ্গ ছিল। লাহোর থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল। আকবরের রাজত্বকালের প্রথম দিকে জোর করে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়; পরবর্তীকালে অঞ্চল অনুযায়ী এই ব্যবস্থা চালু করার ফলে তা অনেক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি অঞ্চলের উৎপাদনের গড় অনুযায়ী আদায় স্থির করা হয়। ভূমি-রাজস্ব অবশ্য শস্যের বদলে অর্থে নেওয়া হতে থাকে।

জুবাৎ ব্যবস্থায় রাজস্ব দাবির ভিত্তি ছিল প্রথমে অপরিবর্তিত শস্যহার ও সবশেষে অপরিবর্তিত নগদ হার। হিন্দস্তানে এই ব্যবস্থায় গড়ে এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদিত শস্য ছিল রাজস্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে সরকার অর্ধাংশ দাবি করত। ফসল তোলার সময় অর্থাৎ শস্যের দাম যখন কম সেই হারে ফসল বিক্রি করে কৃষক যে অর্থ রাজস্ব হিসাবে দিত তা ছিল তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে অনেক বেশি এছাড়া ফসলের অনিশ্চয়তার ঝুঁকিও কৃষককে নিতে হত।

দ্বিতীয় যে ব্যবস্থায় ভূমি-রাজস্ব নেওয়া হত তা ছিল 'কানকূত'। যে পদ্ধতিটি থেকে কানকূতের জন্ম তা হল ভাগচাষ, ফার্সিতে 'গল্লা-বখ্শী', হিন্দিতে 'বটাঙ্গা' এবং 'ভাণ্ডলি'। তিন ধরনের ভাগচাষ হত। প্রথমটি অনুযায়ী কৃষক ও প্রশাসনের উপস্থিতিতে চুক্তি অনুযায়ী ফসল ভাগ করা; দ্বিতীয়টি অনুযায়ী ক্ষেত কটাঈ বা ক্ষেত ভাগ করার আগে মাঠের ফসল ভাগ; তৃতীয়টি অনুযায়ী ফসল কাটার পর তা স্তূপাকারে রেখে ফসল

* উদ্বৃত্ত বলতে বোঝায় কৃষক ও তার পরিবারের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উৎপাদন।

ভাগ। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এটি ছিল রাজস্ব আদায়ের সবথেকে ভাল পদ্ধতি। কৃষকরা এটি পছন্দ করত কারণ এখানে চাষের ঝুঁকির সবটা কৃষককে বহন করতে হত না। সরকারকে অবশ্য শস্য পাহারা দেবার জন্য বিরাট খরচের মধ্যে পড়তে হত।

'হস্ত-এ-বুদ' পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রাম পরিদর্শন করে ভালমন্দ দু'ধরনের জমি দেখা হত। এর ভিত্তিতে মোট উৎপাদনের একটা মোট হিসেব করা হত ও তার ওপর রাজস্ব বেঁধে দেওয়া হত।

এই দুটি রীতির ত্রুটিগুলি বাদ দিয়ে একটি পদ্ধতি চালু করা হয়, তাই হল 'কানকূত'। আইন-এ-আকবরীতে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। সম্ভবত এই ব্যবস্থার দু'টি দপ্তর ছিল। প্রথমে জমি মাপা হত ও সেই জমির বিভিন্ন ধরনের শস্যের ফলনের হিসেব নিয়ে শস্যহার ঠিক করা হত। যে জায়গায় যে শস্য উৎপাদিত হত সেই জায়গায় গড় শস্যহার প্রয়োগ করা হত। আবুল ফজলের মতে, কানকূত পদ্ধতিতে রাজস্ব ঠিক হত শস্যে, নগদে নয়। প্রথমে পুরো শস্যের ওপর শস্যহারের ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্য করা হত। তারপর কৃষকের ভাগের অংশ সেখান থেকে বাদ দিয়ে যা থাকত তা ছিল রাজস্বের সূচক। শস্যের দামের তালিকা অনুযায়ী রাজস্ব নগদে পরিণত করা হত। কানকূত ব্যবস্থা ছিল একদিকে কম ব্যয়সাপেক্ষ অন্যদিকে এর কার্যকারিতা ছিল অনেক বেশি

জাবত-এর কতকগুলি অসুবিধা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবুল ফজল লিখেছেন যে, সাম্রাজ্যের সীমানা এতদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে দরবারে স্থানীয় দামের তালিকা পৌঁছতে দেরি হয়ে যেত। প্রত্যেক বছর তা মঞ্জুর করতে আরও দেরি হয়ে যেত। কৃষকরা অভিযোগ করত মজুরের চেয়ে বেশি আদায় করা হত বলে। অন্যদিকে জাগিরদার অভিযোগ করত অনুমোদিত হার হাতে পেতে দেরি হয়ে যাওয়ায় রাজস্ব অনাদায়ী থেকে গেছে বলে। এরপর যারা দামের খবর দরবারে পাঠাত তারা অনেকেই অসাধু হয়ে উঠেছিল। এইসব অবস্থাকে ঠিক করার জন্য এক নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যা জমা-এ-দহশালা নামে পরিচিত। মোরল্যান্ডের মতে, আগের দশ বৎসরে কৃষকদের ওপর ধার্য মোট রাজস্ব দাবির গড় হিসেব করে জমা-এ-দহশালা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন, ফসলের শ্রেণী ও দামের স্তর অনুযায়ী প্রতি পরগণার দশ বছরের অবস্থা বিচার করে বার্ষিক রাজস্বের এক-দশমাংশ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সতেরশ শতকে মূলত একই ধারায় জাবৎ ব্যবস্থার কাজ চলেছিল। প্রশাসনিক দিক থেকে দেখলে জাবৎ ব্যবস্থার কিছু সুবিধা ছিল। পরিমাপগুলি আবার পরীক্ষা করে দেখা যেত। তবে এ ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এ ব্যবস্থা খরচাসাপেক্ষ বলে ও নীচের দিকে জমি নথিভুক্ত করার ব্যাপারে অসাধুতা চলত।

রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায় সহজ করা ও সর্বাধিক করা। কৃষিভূমির বিস্তার ঘটানোও ছিল আর একটি অন্যতম লক্ষ্য। অজন্মার বৎসরে রাজস্ব শস্যে দেওয়া হত। জাবত ব্যবস্থায় রাজস্ব ঠিক করার সময় যেখানে শস্য হয়নি সেসব অঞ্চল হিসাব বহির্ভূত রাখা হত। শস্য না হওয়া অঞ্চলকে না-বুদ বলা হত এবং এই না-বুদ ১২$^{১}/_{২}$ শতাংশের বেশি হতে পারত না। এসব এলাকার কৃষকদের তাকাভি বা ধার দেওয়া হত। এই দিয়ে কৃষকরা বীজধান কেনা এবং চাষ-আবাদ ইত্যাদি করতে পারত। ফসল তোলবার সময় এই ধার শোধ দিতে হত। কৃষককে চাষের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য বিশেষত পতিত জমি উদ্ধারের জন্য কম হারে রাজস্ব দেবার বন্দোবস্ত দেওয়া হত। পাঁচ বছরের হিসাবে প্রতি বছর কিছু কিছু রাজস্ব বাড়িয়ে পাঁচ বছরে পুরো রাজস্ব নেওয়া হত।

২৯.৪.২ বিভিন্ন শাসকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক

মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় যে সমস্যাটি সমাধানের বাইরে ছিল তা হল ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের ওপর রাজস্ব চাপানোর প্রচেষ্টা। অন্যদিকে ছিল কিছু মধ্যবর্তীদের মাধ্যমে (জামিনদার, তালুকদার, মুকদ্দম/প্যাটেল প্রভৃতি) রাজস্ব আদায় করা। প্রথম ব্যবস্থাটি ছিল কাম্য কারণ এর মাধ্যমে প্রশাসন প্রত্যেকের বিষয়ে সঠিকভাবে হিসাব রাখতে পারত, একসঙ্গে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে রাজস্বের হিসাব ঠিক রাখা কঠিন ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে দুঃস্থ কৃষকের ওপর চাপ বেশি পড়ত না। একসঙ্গে রাজস্ব দিলে মধ্যবর্তীরা নিজেদের গা বাঁচিয়ে রাজস্বের ভার গরিব কৃষকের ওপর চাপিয়ে দিত। প্রাপ্ত তথ্য অবশ্য ইঙ্গিত করে যে, রাজস্ব আদায় হত গ্রামকে একটি একক ধরে। মধ্যবর্তীদের রাজস্ববিহীন জমি দেওয়া হত অথবা যে হারে রাজস্ব দিতে হত তার পরিমাণ ছিল নগণ্য।

রাজস্ব অত্যন্ত কড়াভাবে আদায় করা হত। রাজস্ব না দেওয়া ছিল বিদ্রোহের সামিল। জমি থেকে বিতাড়ন ছিল স্বাভাবিক শাস্তি। তাছাড়া গ্রামীণ প্রধানকে বন্দি বা হত্যা করা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

মুঘল আমলে ভূমি-রাজস্ব ঠিক করা ও আদায়ের ব্যাপারে দু'টি দিক ছিল। প্রথাগত জাগিরের রাজস্ব থেকে যেহেতু মনসবদারে সামরিক বাহিনীর ভরণপোষণ করতে হত সেহেতু তাদের উদ্দেশ্য হ'ত যথাসম্ভব চড়া হারে রাজস্ব দাবি করার দিকে। এর ফলে সাম্রাজ্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা অর্জন সম্ভব হত। কিন্তু অন্যদিকে আর একটি বিষয় তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে, রাজস্বের হার অত্যন্ত বেশি হলে কৃষকদের জীবনযাপনের পক্ষে অবশিষ্ট কিছু থাকবে না তাহলে মোট রাজস্ব আদায় শেষ হিসেবে কম হবে। এই কারণেই কৃষকের ন্যূনতম প্রয়োজন বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ও বাদশাহী প্রশাসনের নির্ধারিত রাজস্ব দাবি এক হত।

এতদ্ সত্ত্বেও বলা যায়, রাজস্বের পরিমাণ বেড়েই চলেছিল। জাগির ব্যবস্থার মধ্যেই এই ঝোঁক ছিল। যদিও এর ক্ষতিকর দিকটি সম্পর্কে প্রশাসন অবহিত ছিল এবং রাজস্ব-দাবি বেঁধে দেবার চেষ্টা করত। বাদশাহী প্রশাসনের সঙ্গে জাগিরদারের স্বার্থের কিছু কিছু বিরোধ ছিল। সেহেতু যে কোনও সময়ে জাগিরের হাতবদল হত ও তিন/চার বছরের মাথায় এই হাতবদল হয়ে থাকত; জাগিরদার যথাসম্ভব অত্যাচার করে তার ক্ষতি পুষিয়ে নিত। এর ফলে জাগিরের এলাকায় কৃষকদের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা লোপ পেলেও জাগিরদারের কিছু এসে যেত না। সমকালীন পর্যবেক্ষকরা এবিষয়ে নানা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। এদের মতে, জাগিরদার যখন নিজে কর্মচারী না রেখে ইজারা দিত তখন অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠত। বাদশাহী প্রশাসন এবিষয়ে সজাগ ছিল কিন্তু কিছু করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বাদশাহী নিয়ম-কানুনই জাগিরদারদের ইচ্ছেমতো চলার রাস্তা করে দিত। অজন্মার বছরে কর মুকুব, আগাম ঋণ দেওয়া তারা করতে পারত, নাও করতে পারত। নিয়ম-কানুন একেবারেই মানা হয়নি এমন প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। কর চাপান মানা করে ঔরঙ্গজেবের আদেশনামা মানা হয়নি এমনও উদাহরণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, গ্রাম-সমাজের বিভাজীকরণ ছিল এবং ওপর-তলার লোকেরা তাদের ওপর চাপ নীচের তলায় চাপিয়ে দিত। চাপ বাড়ার ফলে কৃষির প্রসার বন্ধ হয় এর ফল শেষকালে মুঘল শাসকশ্রেণীকে আঘাত করেছিল; শুধু তাই নয় কৃষির সঙ্গে যুক্ত অপর দুই শ্রেণী, জমিদার ও কৃষকশ্রেণীকেও এই চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল। অনেক আধা-স্বাধীন জমিদার মনসবদার হিসাবে মুঘল শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল (মনসবহীন জমিদারও অবশ্য ছিল)। এই ধরনের জমিদাররা অনেক সময় কৃষকদের সঙ্গে একত্রে বিদ্রোহ করেছিল।

কৃষকদের সঙ্গো জমিদারদের সম্পর্ক ছিল বিচিত্র। জমিদাররা কৃষকদের ওপর অত্যাচার করলে কৃষকরা 'জোর তলব' জমিদারদের দলে যোগ দিত। এইসব জমিদাররা কম শক্তিশালী জমিদার ও দুঃস্থ মনসবদারদের পয়সায় ফুলে-ফেঁপে উঠত। জোর তলব জমিদার ও তাদের কৃষকরা উৎপাদনের সবটাই রাজস্ব হিসেবে দিয়ে দিত এমন বলা যায় না।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ভূমি-রাজস্ব এমনভাবেই ঠিক করা হত যার ফলে যাদের কিছু ছিল না তাদের ওপরই চাপ সবচেয়ে বেশি পড়ত। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, কৃষকেরা জমি ছেড়ে চলে যাবার বদলে মোটা সাধারণ মানের ধান (খাদ্যশস্য) উৎপাদন করত, যারা ছিল স্বচ্ছল তারা বাণিজ্যিক ফসল ফলাত। নগদ অর্থে রাজস্ব দেওয়া বাধ্যতামূলক হবার ফলে গরিব কৃষকের পক্ষে চাপের পথ এড়ান ছিল কঠিন। মহাজনের কাছ থেকে ধার করে রাজস্ব মিটিয়ে দুঃস্থ কৃষকের পক্ষে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কোনও ব্যয় করা সম্ভব হত না। অথচ, জমিচাষ করা বাধ্যতামূলক ছিল বলে চাষ করতে তারা বাধ্য হত। এসকল সত্ত্বেও একথা ভাবলে ভুল হবে না, মুঘল রাষ্ট্র কৃষকদের জীবনের রক্ত শোষণ করে নিত। কৃষকদের ভাগ করা ছিল রাষ্ট্রের আদর্শ যদিও এই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া ছিল শাসকশ্রেণীর জন্মগত অধিকার। বৃদ্ধবয়সে ঔরঙ্গজেব হতাশা প্রকাশ করেছিলেন কৃষকদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবার জন্য। তিনি বারংবার অভিজাত শ্রেণীকে সাবধান করেছিলেন অগণিত কৃষক সম্প্রদায়কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেবার জন্য। এসব নির্দেশ ছিল দিল্লির আশপাশের অভিজাতদের উদ্দেশ্যে। জমিদারদের ওপর কড়া আইন জারি করা হয় কৃষকের জমি ভাড়া করা কৃষক-শ্রমিককে দিয়ে চাষ না করানোর জন্য। একথা সত্য যে, মুঘল আমলে বার্ণিয়ে কথিত সর্বহারা কৃষক যেমন ছিল তেমনি লাভের ভাগিদার বিভিন্ন শ্রেণীও গ্রামীণ সমাজে ছিল। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের কিছুটা অংশ জমিদার, মহাজন, গ্রামীণ প্রধানরা এবং কিছু ক্ষমতাসর্বস্ব কৃষকদের (agricultural castes with superior right in land) হাতে থেকে যেত।

২৯.৪.৩ মুঘল রাষ্ট্রে কৃষক বিদ্রোহের কারণ ও বিদ্রোহের চরিত্র

মুঘল রাজত্বের শেষে জাট ও শিখ বিদ্রোহের নেতা ছিল গ্রামীণ সমাজের এই শ্রেণী। ক্রমবর্ধমান রাজস্বের চাপ গ্রামীণ সমাজের সবল এবং দুর্বল উভয়ের ওপরেই পড়েছিল। জমিদারদের প্রথাগত অধিকারে হাত পড়েছিল ফলে এরাও বিদ্রোহের সামিল হয়। তবে একথাও স্বীকার করে নেওয়া ভাল এইসব বিদ্রোহ শুধু কৃষক সঙ্কটেরই কারণ ছিল না। আকবরের সময়ে কৃষির যে অবস্থা ছিল আঠারশ শতকে কৃষির অবস্থা এর চেয়ে বেশি খারাপ ছিল বলে মনে হয় না। কারোর কারোর মতে, জাগির সঙ্কটও প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রশাসনিক ব্যর্থতা। ইরফান হাবিব কৃষিসঙ্কটকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান সঙ্কট হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। গৌতম ভদ্র আবার হাবিব কৃত কৃষিসঙ্কটের চরিত্র বিচার করতে গিয়ে বলেছেন, এ ব্যাখ্যা একমাত্রিক। কোথাও কৃষক জমিদারদের সঙ্গো মুঘল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আবার কোথাও নতুন জমিদাররা পুরোন জমিদারদের এলাকা জবরদখল করেছে; সেখানে কৃষকরা উদাসীন থেকেছে। কৃষক আন্দোলন এলাকা অনুযায়ী বিভিন্ন চরিত্র নিয়েছে যা ইরফান হাবিবের লেখায় অনুপস্থিত। শোষণ, অত্যাচার, বিদ্রোহ এইভাবে হাবিব এক সরলীকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। কৃষকরা কিভাবে বিদ্রোহের সময় একত্রিত হত, তাদের চৈতন্য, বিদ্রোহে গুজবের ভূমিকা এসব কিছুই হাবিব দেখাননি বলে শ্রীভদ্র অভিযোগ করেছেন।

২৯.৫ মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্কট নিয়ে বিতর্ক

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আর অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ে ভিন্ন একধরনের আলোচনা করেছেন মুজাফ্‌ফর আলম, বেইলি, আন্দ্রে উইক প্রভৃতিরা। মুজাফ্‌ফর আলম ও বেইলির ধারণা অষ্টাদশ শতকের অর্থনৈতিক অবক্ষয় সার্বিক ছিল না, চরিত্র অনুযায়ী স্থানীয় বলে বলাই ভাল। অষ্টাদশ শতকে একদিকে দেখা যায় অযোধ্যা বা পাঞ্জাবে উৎপাদন ও হাসিল দুই-ই বেড়েছিল। জমার সঙ্গে হাসিল তাল মিলিয়ে বেড়েছিল। পূর্বভারত, রোহিলখণ্ডের মতো জায়গায় নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার ঘটেছিল। অন্যদিকে দিল্লির সন্নিহিত অঞ্চল অথবা গুজরাটে পতন ঘটেছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্কটকে মুজাফ্‌ফর আলম কেন্দ্র ও সুবার মধ্যে বিরোধের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। দিল্লির দরবারে পুরনো ও নতুন আমিরদের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ ঘনীভূত হবার ফলে বহু আমির দরবার ছেড়ে স্থানীয় সুবার রাজনীতিতে জায়গা করে নেয়। এইসব নতুন গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মুর্শিদকুলি খানের মতো ব্যক্তিরা সম্পর্ক স্থাপন করে ও বিভিন্ন সুবায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজ্যের নীতি আর নবাবি নীতির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের নীতি অনুযায়ী ইজারা ছিল খারাপ অথচ এই ইজারার মাধ্যমেই নবাবরা স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে একধরনের সমঝোতায় আসে ও নিয়মিত রাজস্ব পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির মাধ্যমে নবাবরা এইভাবে নিজেদের রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলেন, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাজনীতি ক্রমশ আলাদা হয়ে যায়। আঞ্চলিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শক্তি হারিয়ে ফেলে।

২৯.৬ সারাংশ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘলরা সাম্রাজ্যের একটি বিশেষ কাঠামো গড়ে তোলে। শাসনের বনিয়াদ ছিল মনসবদারি ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে জাগির ব্যবস্থা। মনসবদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয়। অভিজাতদের মনসব দেবার মাধ্যমে একদিকে প্রশাসনিক সংগঠন তৈরি করা হয় অন্যদিকে বিভিন্ন জাতির অভিজাতদের কার্যক্ষমতাকে সাম্রাজ্যের স্বার্থে কাজে লাগান হয়। জাগির ব্যবস্থা ছিল ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের একটি কার্যকরী মাধ্যম। জাগির ব্যবস্থা ত্রুটিশূন্য ছিল না এবং এর ফলে একসময় এর মধ্যে সঙ্কট তৈরি হয়। কৃষিব্যবস্থার মধ্যেও সঙ্কট তৈরি হয়, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়, মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

২৯.৭ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। মনসবদারি ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? মনসবদারি প্রথার সঙ্গে জাগির প্রথা কিভাবে যুক্ত ছিল?

২। মুঘল রাজস্বব্যবস্থা কেমন ছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। জাগির সঙ্কট কি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল?

৪। **ছোট প্রশ্ন :**

(ক) বে-জাগির কি?

(খ) 'কানকূত' মানে কি?

(গ) কারা এবং কিভাবে মনসবদার হত?

(ঘ) 'ওয়াতন জাগির' বলতে কি বোঝায়?

(ঙ) আবুল ফজলের লিখিত একটি বইয়ের নাম করুন।

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) মনসবদারি ব্যবস্থা——————প্রচলন করেন।

(খ) জাট মানে, সওয়ার মানে——————।

২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। ইরফান হাবিব : *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, ১৫৫৬-১৭০৭*

২। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ : *মধ্যযুগের ভারত*

৩। এম. আতাহার আলি : *The Mughal Nobility under Aurangzeb, 1970*

৪। Tapan Roychoudhury & Irfan Habib : *The Cambridge Economic History of India,* Vol. I, 1200-1750

একক ৩০ □ নগরায়ণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য

গঠন

৩০.০ উদ্দেশ্য
৩০.১ প্রস্তাবনা
৩০.২ মুঘল যুগে বাণিজ্যিক উৎপাদন ও অর্থনীতি
৩০.২.১ বাজারের বিভিন্নতা
৩০.২.২ বাজারদামের ওঠানামার কারণ বিষয়ে বিভিন্ন মত
৩০.৩ নগরায়ণের প্রারম্ভিক অবস্থা
৩০.৩.১ শহরের চারিত্রিক বিভিন্নতা
৩০.৩.২ মুঘল আমলের অস্থায়ী শহর
৩০.৪ মুঘল যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল চরিত্র
৩০.৪.১ বৃহৎ বাণিজ্য ও উৎপাদনের যোগাযোগের অভাব
৩০.৪.২ রপ্তানি বাণিজ্য
৩০.৫ সারাংশ
৩০.৬ অনুশীলনী
৩০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- মুঘল যুগে ভারতীয় বাজারের সমৃদ্ধি কতটা সম্ভব হয়েছিল।
- মুঘল যুগে নগরায়ণ ও বাণিজ্যের প্রক্রিয়া কেমন ছিল।
- মুঘল আমলে উৎপাদন ব্যবস্থায় গ্রামের কাঠামো কেমন ছিল।
- কাঠামোগত কোনও উত্তরণ ঘটেছিল কিনা।

৩০.১ প্রস্তাবনা

মুঘল যুগে ভারতীয় বাজারের সমৃদ্ধি ঘটে ও তার সঙ্গো নগরায়ণ ঘটে। গ্রামগুলি ছিল উৎপাদনের এক-একটি বৃত্ত। রাস্তাঘাটের অভাব ও দুর্গমতা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য বা কাপড়ের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল বিপুল। উৎপাদনের সঙ্গো বাজার বৃদ্ধি পেলেও বিভিন্ন বস্তুর আমদানি-রপ্তানি সত্ত্বেও কেন কাঠামোগত কোনও পরিবর্তন এ সময়ে গড়ে ওঠেনি তা জানার জন্যই এই এককের অবতারণা।

৩০.২ মুঘল যুগে বাণিজ্যিক উৎপাদন ও অর্থনীতি

মুঘল যুগে উৎপাদন ও বন্টনের একটি বাণিজ্যিক কাঠামো গড়ে ওঠে যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুলতানি যুগেই এই কাঠামোটির সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা ক্রমশ বিস্তারলাভ করে।

জনগণের বৃহত্তর অংশ যেহেতু গ্রামে বাস করত এবং তাদের চাহিদা মেটানোর মতো উৎপাদন হত সেহেতু বাণিজ্যিক উৎপাদন ছিল অর্থনীতির খুব সামান্য অংশ। তবুও একথা বলা যায়, যে হারে এবং যে বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্য বিনিময় চলত তার পরিমাণও জটিলতার দিক থেকে কম ছিল না।

৩০.২.১ বাজারের বিভিন্নতা

মধ্যযুগে গ্রামীণ বাজার ছিল স্থানীয় চরিত্রের। বড় ধরনের বাজারগুলি সাধারণত কোনও মুসলমান প্রশাসকের কর্তৃত্বে পরিচালিত হত। তবে একান্তভাবে হিন্দু-বাজারও ছিল। বাংলাদেশ অঞ্চলে ভাল রাজা বা জমিদারদের কর্তব্যই ছিল স্থানীয় বাজার তৈরি করা। বাজার ও মান্ডির মধ্যে পার্থক্য ছিল। খুচরো জিনিস বাজারে বিক্রি হত আর মান্ডি ছিল স্থায়ী বড় বাজার। বড় রাস্তার দু'পাশে বাজার গড়ে উঠত যা ইউরোপে দেখা যায় না। দোকানগুলি হত পাইকারি এবং সেগুলি বহুজনের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করত। রেভারেন্ড কোপল্যান্ড সুরাট বাজার সম্পর্কে বলেছেন, 'এটাকে মিশরের বাজারের সঙ্গে তুলনা করা যায় অথবা বলা যায় জাগতিক স্বর্গ যেখানে সমস্ত কিছুই বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়'।

স্থানীয় বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী দ্রব্যের পরিমাণ। এক-একটি গ্রাম ছিল কেনাবেচার বৃত্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ, মাঝখানে থাকত হাট ও মান্ডিগুলি। অষ্টাদশ শতকের আগে অবশ্য এই চরিত্রের বাজারের উদাহরণ খুবই কম। এর সঙ্গে একথাও বলা যায়, এই ধরনের বাজার ভারতেই ছিল, এশিয়ার বাজার সম্পর্কে তা বলা যায় না।

শহরের ও গ্রামের বাজারগুলির সম্পর্ক ছিল খুবই শক্ত ধাঁচের। গ্রামের তৈরি উৎপাদিত জিনিসেরও বাজার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। খাদ্যের চাহিদা ও যোগানের বাজারের এই সম্পর্ক বর্ধিত বাণিজ্যের পরিচায়ক। কাঁচামালের এক বৃহৎ বাজার তৈরি হয় যা শহরে আসত চারপাশের গ্রামগুলি থেকে। গুজরাটের ব্রোচ ও মাহমুদাবাদ এক বিরাট সুতোর বাজারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। শহরের আসবাব তৈরির কাঠ আসত গ্রামাঞ্চল থেকে। কাশিমবাজারের রেশমের গাঁটগুলি বাঁধার দড়ি আমদানি হত শেরপুরের শহর থেকে। এককথায় বলা যায়, বিভিন্ন উৎপাদিত জিনিসের বিশেষীকরণ ঘটেছিল ও প্রশাসনের দিক থেকে বিশেষ বাণিজ্যকে উৎসাহ দেওয়া হত শুল্ক ছাড় দেবার মাধ্যমে।

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য ও বাজারের বৃদ্ধির ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র উঁচু দামের জিনিসপত্র কেনাবেচা হত তা নয়, রাস্তার দুর্গমতা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়ের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ছিল বিপুল। জলপথের বাণিজ্য—আভ্যন্তরীণ ও উপকূল বাণিজ্য—বণিকদের কাছে ছিল লোভনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল বেশি। কিন্তু আগ্রা ও বুরহানপুরের মধ্যে অন্তর্বর্তী বাণিজ্যের বিপুলতা উভয় ধরনের বাণিজ্যকেই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল।

আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক পার্থক্য ছিল। বাংলা থেকে খাদ্যদ্রব্য ও উৎপাদিত বস্তুর রপ্তানি, আমদানি অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। দামি কাপড়, বিশেষত সিল্কের ব্যবসা ছিল মুঘল রাজসভাকে কেন্দ্র করে। আবার বলা যায়, গুজরাটে আমদানিকৃত বহু দামি বস্তু ও তুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হত, পরিবর্তে খাদ্যশস্য আমদানি হত। উত্তরভারতের কেন্দ্রস্থান আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল, পরিবর্তে সেখান থেকে খাদ্যশস্য ও নীল রপ্তানি হত। খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি থেকে মনে হয়, অঞ্চল বিশেষে খাদ্যের প্রাচুর্য ও অভাব ছিল এবং সামগ্রিকভাবে দেখলে গোটা উপমহাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।

খাদ্য উৎপাদনের প্রাচুর্য বাংলাকে খাদ্য রপ্তানির এক বিশেষ কেন্দ্র করে তুলেছিল। এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষকদের কোনও দ্বিমত নেই। বাংলা থেকে চাল রপ্তানি হত পাটনা হয়ে আগ্রাতে, করমণ্ডলের কেরালাতে এবং পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে। বাংলা ও উড়িষ্যায় চালের দাম সস্তা থাকাই ছিল এই বিপুল পরিমাণ রপ্তানির প্রধান কারণ। সমুদ্রপথে ও নদীপথে বাংলার চিনিও ভারতের সর্বত্র রপ্তানি হত। অন্যদিকে রাজপুতানা থেকে নুনের আমদানি হত। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে এই আমদানি-রপ্তানির হিসাব করা কঠিন, কিন্তু সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য এ ব্যাপারে ধারণ করতে অনেকটাই সাহায্য করে। মানরিক মন্তব্য করেছেন যে, বছরে শতাধিক জাহাজ বাংলার বন্দরগুলি থেকে ঘি, চিনি, মাখন, তেল, মোম ইত্যাদি নিয়ে যাত্রা করত। এছাড়া বানজারা বা যারা হাঁটাপথে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মোষের পিঠে চাপিয়ে মাল নিয়ে যেত তাদের এক-একটি ক্যাম্পে (তাণ্ডা) ১২,০০০ থেকে ২০,০০০ সংখ্যার জন্তুর পিঠে চাপিয়ে ১৬,০০০ থেকে ১৭,০০০ টনের খাদ্যবস্তু নিয়ে যাবার ক্ষমতা ছিল। নিয়মিতভাবে বাজারে মালের যোগান দেওয়া ছাড়াও যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর খাদ্য যোগান দিত।

ইউরোপীয় বণিকরা, যারা কাপড়ের ব্যবসা করত, তারা একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, তাদের কেনাবেচা সামগ্রিক কেনাবেচার অতি ক্ষুদ্র অংশ ছিল। সিংহভাগ ভারতীয় ও এশিয়ার অন্যান্য বণিকরা কিনত মূলত উপমহাদেশ, পশ্চিম ও মধ্যএশিয়ার বাজারের জন্য।

৩০.২.২ বাজারদামের ওঠানামার কারণ বিষয়ে বিভিন্ন মত

বাজারের দামের ওঠানামা ঠিক কি কারণে ঘটল এবং তার ফলে বাণিজ্য কতখানি প্রভাবিত হত সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। মুঘল যুগে মুদ্রা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাতুর চালান ভারতবর্ষে বেড়ে গিয়েছিল—এটিকে উৎপাদন বাড়া বা দাম বাড়ার কারণ বলে অনেকে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে বলা চলে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণই ছিল দামের ওঠানামার প্রকৃত কারণ। মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থা ও সরকারি অন্যান্য ব্যবস্থা, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য উৎপাদনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল বলে অনেকে মতামত দিয়েছেন। নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভবত বাণিজ্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঠিক বৃদ্ধির কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। বাজারের একীকরণের ক্ষেত্রে খুব একটা অগ্রগতি হয়েছিল বলে মনে হয় না, কারণ তা না হলে খাদ্যশস্যের রপ্তানি বাড়ার ফলে উদ্বৃত্ত অঞ্চলে মূল্য বৃদ্ধি হবার কথা। মোরল্যান্ড এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইউরোপীয় বণিকরা যে সব বাজার থেকে তাদের ব্যবসার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করত সেইসব বাজারের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল খুবই কম, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত এলাকায় উৎপাদন খরচ কমিয়ে তারা মূল্য

আওতার মধ্যে রাখতে পেরেছিল। ফলে উৎপাদনে বিনিয়োগ ছিল একই রকম, কিন্তু যেখানে নিয়ন্ত্রণ ছিল না যেমন সোরার (saltpetre) বাজারে বিনিয়োগ বা সংগ্রহ মূল্য বেড়েছিল। মূল্যস্তরের এ ধরনের বৃদ্ধি বা বৃদ্ধির অভাবের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কিভাবে নীচে রাখা হত, বিশেষত খাদ্যবস্তুর দাম যেখানে বাড়ছিল এবং বিনিয়োগের প্রধান উপাদান ছিল শ্রম, তা গবেষণার বিষয়।

মুঘল যুগের বাণিজ্য ও বাজারকে ওলন্দাজ ঐতিহাসিক ভ্যানলুয়ার এশীয় ব্যবসার ক্ষেত্রে নির্ধারণ প্রসঙ্গে 'ফেরিওয়ালা' চরিত্রের বলে চিহ্নিত করেছেন। এই মত কতখানি গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ফেরিওয়ালা চরিত্র সম্ভবত বিচ্ছিন্ন স্থানীয় গ্রামীণ বাজার ও প্রকৃত ফেরিওয়ালার ক্ষেত্রে খাটে কিন্তু ওই যুগে যে বিশাল বাজার ব্যবস্থা ছিল ফেরিওয়ালা চরিত্র তার একটি দিককে শুধু তুলে ধরতে সক্ষম। সামগ্রিক বাজার ছিল অনেক বেশি সংগঠিত, চাহিদা যোগানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বৃহৎ বাজার অনেক দূর-দূরান্তরের পরিবর্তনের দ্বারাও প্রভাবিত ছিল।

মুঘল যুগের ক্রমবর্ধমান বাজার ও বাণিজ্য নির্ভর করত জটিল এবং বহুবিস্তৃত আগাম অর্থ-ব্যবস্থার ওপর। আগাম অর্থ বা মূলধন কোথা থেকে আসত তা একটি বড় প্রশ্ন। ক্রমবর্ধমান বাজারদাম ওঠানামা নির্ভর করত জটিল ব্যবস্থার ওপর। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, একাধিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যবস্থায় জমে ওঠা উদ্বৃত্তকে বাণিজ্যিক বিনিয়োগে অথবা ফাটকায় বিনিয়োগ করত। যারা এ কাজ করত যেমন সবক্-রা খুব প্রাথমিক স্তরের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কাজ করত। সম্রাটের রাজকোষ ও অভিজাতরা অর্থ আগাম দেবার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে বণিকদের ধার দেবার প্রচুর উদাহরণ আছে। এই ধরনের একটি উদাহরণ হল নীলের ব্যবসা, যা সম্রাটের একচেটিয়া বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং একচেটিয়া অধিকার-সহ ৫০,০০০ টাকা এক ব্যবসায়ীকে ধার দেওয়া হয়েছিল লাভ ভাগাভাগির শর্তে। রাজকোষ থেকে অর্থ পাওয়ার সূত্রে জবাৎ শেঠদের উত্থান হয়। নিম্নস্তরের বণিকরা নিয়মিত সাহুকারদের থেকে টাকা ধার করত; বস্তুতপক্ষে ছোট ব্যবসায়ী থেকে ছোট ছোট শিল্প-উৎপাদনকারীরা সবাই টাকা ধার করত।

মুঘল যুগে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে বহু স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জনসংখ্যার অধিকাংশ যা উৎপাদন করত তার বেশিরভাগটাই নিজেরা হজম করত; আবার একথাও সমানভাবে সত্য যে, এরা একাধিক যুগপৎ উৎপাদনকারী ও উৎপাদন হজমকারী ছিল। আবার অন্যদিকে ৫০ শতাংশ উৎপাদিত (প্রধানত কৃষিজ) দ্রব্য অর্থে রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত হত। এই বিপুল পরিমাণে রাজস্ব—ধরে নেওয়া যেতে পারে কারিগরদের কাছ থেকেও আদায় হত। স্ববিরোধিতার প্রমাণ এইখানেই যে, মূলত একটি জীবনধারণ উপযোগীকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে বিপুল পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্য আদান-প্রদানের জন্য নিয়োজিত ছিল এবং এক বিশাল পরিমাণ অর্থ রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত হত। মুঘলরাই সর্বপ্রথম এই কাজটি সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পেরেছিল। গ্রাম থেকে সংগৃহীত দ্রব্য সরকারি ব্যবস্থায় বিদেশের ও স্বদেশের বিরাট বাজারে পৌঁছে যেত। বাজার হয়ে উঠেছিল সুসংগঠিত, গ্রামের স্থানীয় পাইকারের পাশাপাশি ছিল ধনকুবের শ্রেষ্ঠী ও রাজপুরুষেরা। এক জটিল বাজার-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। চাহিদা, বাজার, বর্ধিত মূল্য ইত্যাদি স্থানু চরিত্রের বদলে একটি সক্রিয় বাণিজ্যের ইঙ্গিত করে এবং মুঘল আমলে এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন ঘটেনি।

৩০.৩ নগরায়ণের প্রারম্ভিক অবস্থা

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনযাপন করত। খুব কমসংখ্যক লোক শহরাঞ্চলে বসবাস করত। শহরাঞ্চল কথাটির ব্যবহারও মনে রাখতে হবে খুবই সাধারণ অর্থে করা যেতে পারে। শহরের মাপকাঠি, যেমন নির্দিষ্ট জনসংখ্যা, বিস্তৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে পরিসংখ্যান আমাদের হাতে খুবই কম। পরিসংখ্যানের বদলে শহরের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল আমলে বা তার পরবর্তী সময়েও উপমহাদেশের বড় শহর এবং মফঃস্বলের শহরগুলি ব্যাপকতায় এবং পারস্পরিক ভূমিকার ক্ষেত্রে একাধিক বৈশিষ্ট্যের মাত্রা পেয়েছিল। বড় শহরগুলি ছিল বাজার ও উৎপাদনের, ব্যাঙ্ক ও উদ্যোগকারীদের ব্যবসার কেন্দ্রস্বরূপ। এছাড়াও জলপথ ও স্থলপথের যে বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল, শহরগুলি তার সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করত। ছোট শহরগুলি স্থানীয় বাণিজ্যের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ও সম্পদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইউরোপীয় পর্যটকরা এইসব অসংখ্য স্থানীয় বাণিজ্যের, বিশেষ করে বস্ত্র উৎপাদনের যে কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তা লক্ষ্য করেছিল।

বাণিজ্য ও উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠাই অবশ্য শহরগুলির গুরুত্বের একমাত্র কারণ ছিল না। অনেক শহরই শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র হবার জন্য গুরুত্ব অর্জন করেছিল। অনেক শহর আবার ধর্মীয় চরিত্রের জন্য গুরুত্ব লাভ করেছিল। দিল্লি অথবা আগ্রার গুরুত্ব যেমন ছিল গোটা সাম্রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তেমনি পাটনার গুরুত্ব গড়ে ওঠে বিহারের রাজধানী হিসাবে। বারাণসী, নাসিক বা আজমীরের মতন শহরগুলি ছিল ধর্মীয় চরিত্রের এবং সেই কারণেই এই শহরগুলি স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারাবহনকারী শহরগুলি সামগ্রিক সংস্কৃতির পরিমণ্ডল রক্ষাকারীর ভূমিকার কথা বুঝতে পারলে তবেই নগরায়ণের প্রকৃত চরিত্রটি বোঝা সম্ভব।

ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কিছু সময় নগরায়ণের স্বর্ণযুগ বলে মনে করা যেতে পারে। উত্তর-ভারতের পূর্বাঞ্চল ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের পুরনো ছোটবড় শহরগুলির আয়তন একদিকে যেমন বেড়ে ওঠে তেমনি সংখ্যার দিক থেকে দেখলেও শহরগুলির বৃদ্ধি ঘটে। মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিক বিকাশ শহরগুলির উত্থান ও বৃদ্ধির মূল কারণ। তবে এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শহরগুলির সামগ্রিক বৃদ্ধি ও সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যেও অনেক অংশে এই ছবি অনুপস্থিত ছিল। হুগলি অথবা পরবর্তীকালে কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়ার মতো শহরগুলি দ্রুত বিকাশলাভ করে, কারণ নদীপথে বন্দরগুলির যোগাযোগ। ইউরোপের বাজারে ভারতীয় দ্রব্যের বিরাট চাহিদার ফলে বন্দর, শহর ও নদীতীরবর্তী শহরগুলি প্রাচুর্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। অন্যদিকে একদা প্রাচুর্যশালী শহর, যেমন জৌনপুর, তার গুরুত্ব হারায়। বিহার অঞ্চলের নগরায়ণ ক্রমশ পূর্বে সরে আসে তার কারণ মুঘল যুগে সামগ্রিকভাবে উত্তরাঞ্চলে পরিবর্তন ঘটেছিল।

৩০.৩.১ শহরের চারিত্রিক বিভিন্নতা

মুঘল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলের বেশিরভাগ সময় শহরভিত্তিক অর্থনীতির প্রভুত বিকাশলাভ ঘটে, তার কারণ রাজনৈতিক স্থিতি যা ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক অস্থিরতা উত্তরভারতে ছড়িয়ে পড়লে এক বিশাল শহর এলাকার প্রাচুর্য

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে সব জায়গায় এই অস্থিরতাকে ঠেকানো গিয়েছিল, যেমন অযোধ্যা, পুনা, নাগপুর, বরোদা প্রভৃতি, মারাঠা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রগুলির অর্থনীতি বাধাহীনভাবে বিকাশলাভ করে। লক্ষণীয়ভাবে বন্দর-শহরগুলি, যেমন কলকাতা, মাদ্রাজ, পন্ডিচেরী বা বম্বে—যেগুলি ছিল ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণে এবং মুঘল রাজনৈতিক অস্থিরতার বাইরে সেগুলি সবথেকে বেশি প্রসারলাভ করেছিল।

শহর অর্থনীতির ও সংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্যের কথা মনে রাখলে ভারতীয় উপমহাদেশের নগরায়ণের কোনও 'টাইপ' উদাহরণ দেওয়া কঠিন। বারাণসী কিংবা উজ্জয়িনীর মতন ধর্মীয় চরিত্রের শহরগুলি অথবা আগ্রা বা লাহোরের মতন শাসনকেন্দ্রভিত্তিক শহরগুলি আপাতদৃষ্টিতে আলাদা চরিত্রের। একথাও এ প্রসঙ্গে বলা যায়, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় কেন্দ্র ও শহরগুলির মধ্যে পার্থক্য ছিল। কিন্তু কোনও শহরকেই হিন্দুশহর অথবা হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলিত শহরের মডেল হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা চলে যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে কোনও কোনও শহর মুসলমান সংস্কৃতি ও রাজনীতির পরিপোষক ছিল। লাহোর, দিল্লি, আগ্রা, এলাহাবাদ ও পাটনা, লক্ষণাবতী ও সোনার গাঁ, আহমেদাবাদ, কাম্বে, ব্রোচ ও সুরাট ছিল এজাতীয় শহরের উদাহরণ। যদিও মনে রাখতে হবে, মুঘলদের আসার অনেক আগে থেকেই এই শহরগুলি গড়ে উঠেছিল। এইসব ইসলামীয় চরিত্রের শহরগুলির স্থাপত্য, বসবাসের বহির্ভূত জমির ব্যবহার থেকে এই বৈশিষ্ট্য ধরা যায়। বাংলা অথবা গুজরাটের শহরগুলি ছিল অবশ্য অনেক বেশি দেশীয় সংস্কৃতিবিশিষ্ট। এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে, সামরিক প্রয়োজন সত্ত্বেও অধিকাংশ ভারতীয় শহরগুলি দুর্গ-প্রাকারের বাইরে ছড়িয়ে পড়ত। প্রাকারের বাইরে বিলাস উদ্যানও তৈরি হত। মুঘল শহরগুলির এই জাতীয় প্রাচুর্য সত্ত্বেও বিদেশি পর্যটকরা তার দ্বারা খুব একটা প্রভাবিত হননি। শহরের বড়লোক ও গরিবদের মধ্যে জীবনযাত্রায় ব্যাপক পার্থক্য, বসবাসের বাড়ি সম্পর্কে তাঁরা বিরূপ মন্তব্যই করেছেন। স্যার টমাস রো'র মন্তব্য এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে। সুরাট থেকে বুরহানপুরের রাস্তা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—শহর ও গ্রামগুলি কাদামাটির তৈরি। টাভার্নিয়ের বলেছেন, বড়লোকদের ঘরবাড়ি সুন্দর ও পোক্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত বাড়িগুলির এসব কিছুই নেই, ভারতের অন্যান্য শহরের মতোই। ভারতীয় শহরগুলি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও বলা হয় মুঘল যুগে উত্তরভারতে নগরায়ণের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল। রাজনৈতিক ঐক্য এক বিশাল এলাকায় যোগাযোগের উন্নতি ঘটিয়েছিল এবং তার ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে শহরগুলিতে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। বার্নিয়ের মন্তব্য করেছেন, 'কৃষকদের বৃহৎ অংশ অত্যাচারের ফলে গ্রামগুলি ছেড়ে শহরে অথবা অস্থায়ী বাসস্থানে আশ্রয় নিয়েছে।' এর সঙ্গে একথাও সত্য যে, বড় বড় গ্রামগুলি ষোড়শ শতক থেকেই ক্রমশ বৃহদাকার রূপ নিয়েছিল। করদান বাধ্যতামূলক হওয়ার ফলে এই গ্রামগুলি বৃহৎ বৃহৎ গোলায় পরিণত হয়েছিল। বানজারা নামক বিশেষ জাতটি যারা শুধুমাত্র শস্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার ব্যবসা করত তারা এইসব গ্রাম-শহরগুলি থেকে শস্য সংগ্রহ করত। মুদ্রায় করদানের নীতি চালু হলে কৃষকরা এইসব গ্রামেই শস্য বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে। তার ফলে এইজাতীয় গ্রামগুলি স্থানীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সুদের ব্যবসায়ীরা সরাফরা এইসব কেন্দ্রে বসবাস শুরু করে। অল্প আয়ের জমির মালিকরা, জায়গিরদারদের প্রতিভূরা, ওয়াকফের মালিকরা, উলেমারা, ক্রমশ এসব কেন্দ্রে ভীড় জমাতে শুরু করে। ধর্মীয় সূত্রে আগত লোকদের বসবাসের ফলে নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলির জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থিতিশীল হয়ে উঠেছিল। নগরায়ণের এই ব্যাখ্যা যদি

গ্রহণীয় হয় তাহলে বলা চলে ষোড়শ শতকের শেষ কয়েক দশক থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে উত্তরভারতে এই জাতীয় বহু শত শহরের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

মুঘল যুগে নতুন নতুন শহর পত্তন ও ক্ষয়িষ্ণু শহরগুলিকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে এই জাতীয় নীতি অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। স্থানীয় কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাগিরদার যার স্বার্থ থাকত জাগির যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই এলাকার অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলা, সাধারণত তারাই শহর গড়ে তোলায় উৎসাহী হত। মনে হয় এ ধরনের শহর গড়ে তোলার সময় সরকারি হুকুমনামার প্রয়োজন হত যদিও এসব ক্ষেত্রে তা সহজেই পাওয়া যেত। সরকারি হুকুমনামা ছাড়া আর যা প্রয়োজন হত তা হল জনসাধারণের। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। যুদ্ধ অথবা বিদ্রোহের পর পরাজিত এলাকার জনগণকে জোর করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বসতি স্থাপন করানো ছিল একটা পদ্ধতি, যার দ্বারা নতুন শহরগুলির জনবসতি গড়ে তোলা হত। বসতি স্থাপনের প্রথম দিকে ছাড় দেওয়ার ফলেও জনসাধারণের চলাচল হত গ্রাম থেকে শহরের দিকে। প্রাক্-মুঘল ভারতীয় মুসলমান রাজপরিবারগুলি প্রায়শই পুরনো হিন্দু বসতিগুলিকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করত। দিল্লি, মাণ্ডু, বিদর, বিজাপুর শহরগুলি এইভাবেই বেড়ে ওঠে। আহমেদাবাদের মতো সম্পূর্ণ নতুন শহরের পত্তনের উদাহরণ খুবই কম। মুঘলরা এইসব ব্যবস্থাগুলিকে অনুসরণ করেছিল।

পরিকল্পিত নতুন শহর তৈরি করার ক্ষেত্রে শাহজাহান আকবরের পথ অনুসরণ করেন। তিনি এমন শহর বানাতে চেয়েছিলেন যা হবে সাম্রাজ্য ও সম্রাটের বৈভবের প্রতীক।

মুঘল রাষ্ট্র ও শহরের জনগণের সম্পর্ক অনেকাংশে পুরানো ইসলামীয় শহরগুলির মতো কোনও নাগরিক সংস্থার কেন্দ্র ছিল না। সরকারের দিক থেকে দখলে শহর এবং আধা শহরগুলি কতকগুলি গ্রামের জোটবদ্ধ অবস্থার বেশি কিছু ছিল না। শহরগুলি কতকগুলি মহল্লায় বিভক্ত থাকত এবং এই মহল্লাগুলি শহরবাসীদের কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করত। সাধারণভাবে শহরের জনগণ সরকারি কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করত। মুঘল যুগের পূর্ণ আধিপত্যের সময়েও আইন ভঙ্গের উদাহরণ পাওয়া যায়। আবার সরকারের প্রতিভূদের হাতে অপদস্থ ও অত্যাচারিত হওয়ার উদাহরণও আছে। এসব ছাড়াও শহরের সাধারণ জনগণকে জিনিসপত্রের হঠাৎ মূল্য বৃদ্ধি, জিনিসের অভাব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হত; সঙ্গে থাকত মহামারিজনিত মৃত্যু।

৩০.৩.২ মুঘল আমলের অস্থায়ী শহর

মুঘল যুগে রাজধানী নির্মাণের প্রসঙ্গটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক লন্ডন বা প্যারীর যে মর্যাদা ছিল তার তুলনায় মুঘল রাজধানী ছিল নিতান্তই সাধারণ। এর অন্যতম কারণ ছিল সম্রাট যখন যেখানে থাকতেন তখন সেই স্থানই হয়ে উঠত প্রকৃত রাজধানী। একমাত্র আগ্রা, দিল্লি বা লাহোরেই সম্রাট চার দেওয়ালের মধ্যেই থাকতেন। তা না হলে সম্রাট ও সৈন্যবাহিনীর তাঁবুগুলিকে বলা হত চলন্ত শহর। দিল্লির সমগ্র জনসংখ্যা সৈন্যবাহিনী অস্থায়ী তাঁবুগুলিতে বাস করত। যেহেতু এই জনগণ রাজসভা ও সৈন্যবাহিনীর কাজে নিযুক্ত থাকত, তাই তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা সম্ভব ছিল না একথা বলেছেন বার্নিয়েরের। যদি বার্নিয়ের কথা সত্য বলে

মেনে নেওয়া হয় তাহলে সহজেই বোঝা যাবে যে, ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন তখন শাহজাহানাবাদের (দিল্লির) জনগণের কি অবস্থা হয়েছিল। একমাত্র বাহাদুর শাহ প্রথম-এর মৃত্যুর পর (১৭১২) দিল্লির শাসকরা প্রথম একজায়গায় রাজধানী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর আগে পর্যন্ত সম্রাটের পছন্দ অপছন্দের ওপরেই কোনও শহর রাজধানী হিসেবে পরিগণিত হত।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, যতদিন মুঘল রাজত্বের প্রাচুর্য ছিল ততদিন ছোটবড় শহরগুলি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সপ্তাদশ ও অষ্টাদশ শতকে ক্রমবর্ধমান শাসনতান্ত্রিক অবক্ষয়ের ফলে ভারতীয় নগরজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল।

৩০.৪ মুঘল যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল চরিত্র

মুঘল যুগে বৈদেশিক বাণিজ্য হিসাবে প্রধানত সমুদ্র-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীণ স্থল-বাণিজ্য সমুদ্র-বাণিজ্যের সঙ্গে অনেকটাই জড়িয়ে পড়ে। এই উভয় ধরনের বাণিজ্যের পারস্পরিক অস্তিত্ব ও প্রভাব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, স্থলপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশ সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্যকে জায়গা ছেড়ে দেয় ও অষ্টাদশ শতকে সমুদ্র-বাণিজ্য ভারতীয় ইতিহাসে এক গুণগত পরিবর্তন আনে।

মধ্যযুগের অর্থনৈতিক বিষয়ে তথ্য খুবই কম হওয়ার ফলে সুনির্দিষ্ট কোনও অভিমত দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ প্রসঙ্গে একথা বলা চলে যে, ভারতীয় বণিকরা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাণিজ্যে কি পরিমাণ বিনিয়োগ করত এই প্রশ্নটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কমে আসে ও ইউরোপীয় বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান অস্তিত্বকে সহজ করে তোলে।

পঞ্চাদশ শতকের শেষে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য প্রধানত গুজরাটি মুসলমান বণিকদের হাতে ছিল। ক্যাম্বে থেকে মলাক্কা এই বাণিজ্যপথ ছিল তাদের অধিকারে। পশ্চিমে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত তারা জাহাজ পাঠাত। আরব সাগরের বাণিজ্য অবশ্য মূলত আরবদের হাতে ছিল; পূর্বদিকে বাণিজ্য চীনা বণিকরা নিয়ন্ত্রণ করত। উপকূল বাণিজ্যে কিছু হিন্দু বণিকেরও অস্তিত্ব ছিল। এই বাণিজ্যিক কাঠামোটি বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও অক্ষত ছিল, যদিও বাণিজ্যিক লাভ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অনেক সময়ই সরে যেত ও এক বন্দর ফুলে-ফেঁপে উঠত অন্য বন্দরের পতনের ফলে। ভারত মহাসাগরের মূল কাঠামোটি অক্ষত ছিল এবং তার মধ্যেই ইউরোপীয় বণিকরা জায়গা করে নেয়। নৌ-বাণিজ্যে ভারতীয়দের ভূমিকা সম্পর্কে আরও যে কথাটি উল্লেখযোগ্য তা হল ভারতীয় বণিকরা জাহাজ নির্মাণে মূলধন ঢালতে উৎসাহী ছিল না। মালিকানা বেশিরভাগ ছিল ব্যক্তিগত, যৌথ মালিকানা ছিল খুবই কম। জাহাজে টাকা ঢাললে বণিকদের মূলধনের একটা বিরাট অংশ দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে থাকত।

৩০.৪.১ বৃহৎ বাণিজ্য ও উৎপাদনে যোগাযোগের অভাব

বড় বড় বণিকরা উৎপাদনের সঙ্গে কোনও সরাসরি যোগ রাখত না। এদের নির্দেশ অনুযায়ী এক বিশাল মধ্যবর্তী দালালগোষ্ঠী ঘুরে ঘুরে জিনিস সংগ্রহ করত। অথবা অন্যান্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে পাইকাররা

জিনিস কিনত। বদলে অনেক সময় তারা দাদন দিত। চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে মাল সরবরাহ করত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দিকটি তা হ'ল—'বণিকরা উৎপাদন ব্যবস্থায় কখনও হাত দিত না। ব্যবসার জগৎ থেকে উৎপাদনের জগতে এইসব বণিকদের উত্তরণ হয়নি'। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সমুদ্র-বাণিজ্য এইভাবেই চলেছিল।

স্থলপথে অন্তর্দেশীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য একইভাবে চলত। বড় বণিকরা কতকগুলি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। দালালের মাধ্যমে নীচু তলা থেকে মাল সংগ্রহ করা হত, বাজারের একীকরণ তখনও হয়নি। উৎপাদনও ছিল বিচ্ছিন্ন। উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সংহত করে তার পরিবর্তনের কোনও চেষ্টা হয়নি।

৩০.৪.২ রপ্তানি বাণিজ্য

ভারতবর্ষ থেকে যে সব দ্রব্য বিদেশে যেত তার মধ্যে সুতিবস্ত্র ছিল অন্যতম। সুতিবস্ত্রের মধ্যে আবার মোটা কাপড়ের চাহিদা ছিল বেশি। ইন্দোনেশিয়া অথবা লোহিত সাগরের অঞ্চলের সাধারণ লোক এই জাতীয় কাপড় পছন্দ করত বেশি। তুলনায় মসৃণ কাপড়ের চাহিদা ছিল কম। তবে বাংলা ও করমণ্ডলের মসৃণ কাপড়ের চাহিদা অভিজাতদের মধ্যে কম ছিল না।

কাপড় ছাড়া ভারতবর্ষ থেকে সাধারণ মানের খাদ্যসামগ্রী, যেমন চাল, ডাল, গম, তেল রপ্তানি হত। বাংলা, উড়িষ্যা মালাবার ছিল এইসব শস্যজাতীয় খাদ্যের রপ্তানির প্রধান এলাকা। মালাক্কা, হরমুজ, এডেন প্রভৃতি শহরের সাধারণ লোকের খাদ্য হিসাবে ভারত থেকে শস্যের রপ্তানি হত। এই ধরনের রপ্তানি বাণিজ্য খুব লাভজনক না হলেও দুর্ভিক্ষের সময় দাম উঠত এবং লাভের মুখ বণিকরা দেখতে পেত।

রপ্তানি বাণিজ্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বাণিজ্য ছিল স্থিতিশীল। উল্লেখিত দ্রব্যগুলি ছাড়াও বাংলা থেকে যেত চিনি ও মোটা সিল্ক, গুজরাট থেকে কাঁচা তুলো ও মালাবার থেকে গোলমরিচ যেত ভারত মহাসগরের বিভিন্ন বাজারে। বিভিন্ন রপ্তানি সামগ্রীর পরিবর্তে ভারতে আমদানি হত মুদ্রা, মশলা, ঘোড়া, টিন, হাতির দাঁত ইত্যাদি। ষোড়শ, সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাণিজ্য ছিল ভারতীয় বণিকদের হাতে। সপ্তদশ শতক থেকে ইউরোপীয়রা ক্রমশ সমুদ্র-বাণিজ্যে জায়গা করে নিতে থাকে। ভারতীয়দের হাতে দীর্ঘকাল বাণিজ্য থাকার কারণ ছিল ইউরোপীয় জাহাজের উঁচু হারের ভাড়া। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, ইউরোপীয়রা, বিশেষত পর্তুগিজরা, ভারতীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে ব্যবসা করত (হোল্ডিং কারবার)। ইউরোপীয় ও ভারতীয় বণিকদের সম্পর্ক ছিল প্রতিযোগিতার। ইউরোপীয়রা জাহাজ ভাড়া খাটাত। এখানে ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার। কিন্তু এক্ষেত্রে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল যারা জাহাজে মাল পাঠাত তাদের লক্ষ্য ছিল ঠিকমতো মাল পাঠানো; সেখানে জাতিবৈরিতা ছিল না, ব্যবসাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং, ইউরোপীয় বণিক ও ভারতীয় বণিক সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার লাভক্ষতির হিসেবই করত, অন্য কিছুর নয়।

ভারতীয় বণিকদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেছেন, এরা নানা চরিত্রের ছিল—সম্ভ্রান্ত বণিক থেকে ছোট জাহাজের মালিক। কোথাও ভারতীয় বণিকরা বিদেশি বণিকদের বিরোধিতা করেছে; পর্তুগিজদের বিরোধিতা করে নিজেদের স্বাধীন সমুদ্র-বাণিজ্য চালু রেখেছিল। কোথাও আবার রাজনীতির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এই জাহাজী বণিকরা যতদিন ব্যবসা করেছে ততদিন বিদেশি বণিকরা, যেমন ইংরেজরা

সমুদ্র-বাণিজ্যে বিশেষ জায়গা করতে পারেনি। অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় বণিকদের প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যায় ও ইংরেজরা তার জায়গা দখল করে।

অষ্টাদশ শতকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি এই ত্রিশক্তি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। ফরাসিদের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ এতটাই দ্রুত ছিল যে, ইংরেজরা তাদের কিছুটা সমীহ করে চলত।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপীয় দেশগুলির ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সম্ভব হয়েছিল আমেরিকার রূপার খনিগুলির আবিষ্কারের ফলে। প্রচুর পরিমাণে মুদ্রা যোগান দেওয়ার ক্ষমতার ফলে পশ্চিমের দেশগুলি এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করতে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। তিন শতক পরেও এই বাণিজ্য এশিয়ার অনুকূল ছিল। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা যা এতদিন কার্যকরী ছিল না তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে কি প্রভাব পড়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। প্রথাগত যে ধারণাটি এ সম্পর্কে চালু আছে তা হল মুদ্রা আগমনের যে সুফল ফলতে পারত তা বাতিল হয়ে যায় প্রধানত জনসাধারণের সোনা/রূপা সঞ্চয়ের থেকে; কিন্তু এই ধারণা দূর কল্পনাপ্রসূত। ইউরোপেও সোনা/রূপা সঞ্চয় কম হত না। আমেরিকার রূপা মুঘল ভারতে এসে ঠিকই জমা হয়েছিল। কিন্তু তার মানে বাণিজ্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল একথা বলা যায় না। ইউরোপীয় বণিকরা ভারতীয় বণিকদের বাজার দখল করেছিল এই পর্যন্ত বলা যায়। দ্বিতীয়ত, যে কথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায়, তা হল বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা বেড়েছিল।

৩০.৫ সারাংশ

উপরোক্ত এককটি থেকে আপনি বুঝতে পারবেন মুঘল যুগে বাণিজ্যিক উৎপাদন এককভাবে গড়ে ওঠে ও এই উৎপাদন সামগ্রিক অর্থনীতির সঙ্গে কিভাবে ও কতটা সংযুক্ত ছিল। বাজারের বিভিন্নতা ছিল—গ্রাম থেকে উৎপাদন যেমন শহরে আসত তেমনি এক-একটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ বাজার। উৎপাদনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে দামের ওঠানামা ছিল ও তার পিছনে বিভিন্ন কারণ কাজ করত। বাজারের চরিত্র সম্পর্কে বলা যায় যে, উৎপাদনের বেশির ভাগটাই হজম করত উৎপাদকরা নিজে। উৎপাদনের আরও এক বিশাল অংশ সংগৃহীত হত রাজস্ব হিসাবে। যেহেতু অর্থে রাজস্ব আদায় হত সেহেতু উৎপাদিত দ্রব্য অর্থে রূপান্তরিত হবার জন্য বাজারে আসতে বাধ্য ছিল এবং এইভাবে একটি সক্রিয় বাজার গড়ে উঠেছিল। মুঘলরা সর্বপ্রথম এই বাজার ব্যবস্থাটিকে গড়ে তোলে। সরকারি নিয়ন্ত্রণে গ্রামের উৎপাদিত বস্তু স্বদেশ ও বিদেশের বিরাট বাজারগুলিতে পৌঁছে যেত এবং মুঘল আমলে এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন বোধ হয়নি। বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে নগরায়ণ শুরু হয়। নগর ছিল দুই ধরনের—বড় ও ছোট। বড় শহরগুলি ছিল উৎপাদন, ব্যাঙ্ক ও উদ্যোগকারীদের ব্যবসার কেন্দ্র। জলপথ ও স্থলপথে যে বিপুল বাণিজ্য ছিল শহরগুলি ছিল তার সংযোগকারী কেন্দ্র। অন্যদিকে স্থানীয় বাণিজ্যের, বিশেষ করে বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র ছোট এলাকাগুলি ইউরোপীয় বণিকদের নজর বিশেষভাবে কেড়েছিল।

বণিজ্য ছাড়াও শহরগুলির গড়ে ওঠার অন্যান্য কারণ ছিল, যেমন শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র হিসাবে অথবা ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবেও শহর গড়ে ওঠে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কিছুটা সময়কে নগরায়ণের সুবর্ণ

যুগ বলে মনে করা হয়। এই সময়ের মধ্যে আবার শহরের গুরুত্বের ওঠানামা বিশেষ লক্ষণীয়। কোনও কোনও শহর তার ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে। শহরের স্থাপত্যও হয়ে ওঠে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শহরের ঘরবাড়ি ইত্যাদি প্রসঙ্গে ইউপোরীয় পর্যটকেরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও তার ফলাফল প্রসঙ্গে বার্নিয়ের বহু মন্তব্য করেছেন।

মুঘল যুগে নতুন শহরগুলি এবং ক্ষয়িষ্ণু শহরকে বাঁচিয়ে তোলার উভয় চেষ্টাই করা হয়েছিল। মুঘল যুগে রাজধানী নির্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লণ্ডন বা প্যারিসের তুলনায় মুঘল রাজধানী ছিল নিতান্ত সামান্য। এর অন্যতম কারণ হল মুঘল সম্রাট যখন যেখানে থাকতেন তখন সেই স্থানই হয়ে উঠত রাজধানী। ১৭১২ থেকে দিল্লির শাসকরা প্রথম এক জায়গায় রাজধানী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য :

মুঘল যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল চরিত্র ছিল পরিবর্তনশীলতা। স্থলবাণিজ্য ক্রমশ সমুদ্রবাণিজ্যকে জায়গা ছেড়ে দেয় ও সমুদ্রবাণিজ্য ভারতীয় ইতিহাসে এক গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে।

পঞ্চদশ শতকে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য গুজরাটি মুসলমান বণিকদের হাতে ছিল। পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য চীনা বণিকরা নিয়ন্ত্রণ করত। আরব সাগরের বাণিজ্য ছিল আরবদের হাতে। এই কাঠামোটি বহুদিন অক্ষত ছিল। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উৎপাদনের মধ্যে যোগাযোগের অভাব ছিল। রপ্তানি বাণিজ্য ছিল মূলত বস্ত্রের; বিশেষ করে মোটা কাপড়ের।

অষ্টাদশ শতকে ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি ও পোর্তুগিজরা বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। আমেরিকার রূপার খনিগুলি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয়দের পক্ষে রূপা বাণিজ্যে নিয়োগ করা সম্ভব হয় ও বাণিজ্য প্রভূত বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে মতপার্থক্য আছে। ইউরোপীয় বণিকরা ভারতীয় বণিকদের বাজার দখল করেছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা বেড়েছিল যদিও মোট বাণিজ্য যে বেড়েছিল তা বলা যায় না।

৩০.৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। মুঘল যুগে বাজারের চরিত্র কেমন ছিল? সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২। মুঘল যুগে নগরায়ণের কারণ বিশ্লেষণ করুন।

৩। মুঘল যুগে বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতীয় অর্থনীতিকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল?

ছোট প্রশ্ন :

৪। করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের একটি করে সমৃদ্ধ বন্দর-শহরের নাম লিখুন।

৫। বানজারা কাদের বলা হত?

৬। দুটি ধর্মীয় চরিত্রের শহরের নাম উল্লেখ করুন।

৭। ‘ফেরিওয়ালা বাণিজ্য’ বলতে কি বোঝায়।

৮। **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) শহরগুলি কয়েকটি ——— বিভক্ত থাকত।

(খ) বাংলা থেকে ——— রপ্তানি হত।

(গ) ক্যাম্বে থেকে মালাক্কা ——— হাতে ছিল।

(ঘ) সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্যে ——— বেড়েছিল।

৩০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. Tapan Raychaudhuri, Irfan Habib : *The Cambridge Economic History of India, Vol. I C 1200—C 1750*.
2. S. Arasaratham : *Maritime India in the Seventeenth Century*.

একক ৩১ □ মুঘল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিসমূহ

গঠন

৩১.০ উদ্দেশ্য

৩১.১ প্রস্তাবনা

৩১.২ ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজদের আবির্ভাব

৩১.৩ কার্টাজে ব্যবস্থার চরিত্র

৩১.৪ ভারতের মশলা ও বস্ত্রবাণিজ্যের ইংরেজ-ওলন্দাজ বণিক

৩১.৫ সামুদ্রিক বন্দর ও মুঘল প্রতিরক্ষা

৩১.৬ সমুদ্রবাণিজ্যের মুঘল প্রতিপত্তি বজায় রাখার চেষ্টা ও তার ব্যর্থতা

৩০.৭ সারাংশ

৩০.৮ অনুশীলনী

৩০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- মুঘল শাসকদের সঙ্গে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থার কী সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।
- ঐ সময়ে সমুদ্রবাণিজ্যের কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল।
- বন্দরকেন্দ্রিক মুঘল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল।
- কোন্ প্রেক্ষিতে ভারতের বাণিজ্য ক্রমশ মুঘলদের হাত থেকে ইউরোপীয়দের হাতে চলে এসেছিল।

৩১.১ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষ মুঘল শাসনের হাত থেকে কোন্ প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় শক্তির হাতে চলে যায় এই পর্যায়ে তা জানা দরকার। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা ভারত মহাসাগরে আসে এবং ক্রমশ তারা আশু এশিয় সমুদ্রবাণিজ্য দখল করবার চেষ্টা করে। মুঘল শক্তি বিদেশিদের সুবিধা দেয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখে। মুঘলরা যতদিন পেরেছিল এই নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে বিনিয়োগ সঙ্কটের ফলে মুঘলরা সমুদ্রবাণিজ্য থেকে পিছিয়ে আসে, ফলে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে ওঠে।

৩১.২ ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজদের আবির্ভাব

ভারতবর্ষের মধ্যযুগের নৌ-বাণিজ্যকে বুঝতে হলে যে ঘটনাটিকে মনে রাখতে হবে তা হল ১৪৯৭-এ পর্তুগিজ বণিক ভাস্কো-ডা-গামার কালিকটের বন্দরে অবতরণ। ১৪৯৯ সালে ভাস্কো-ডা-গামা যখন লিসবনে ফিরে যান তখন পর্তুগিজ সম্রাট স্যামুয়েল নিজেকে নির্দ্বিধায় ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রবাণিজ্যের অধিপতি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। ভারত মহাসাগরের কর্তৃত্ব নিয়ে পর্তুগিজ ও মুসলমান রাজাদের বিরোধ বাধে। প্রথমে লোহিত সাগর ও ভারতের উপকূলের যে কোনও মুসলমান মালিকানার জাহাজকে ধ্বংস করার নীতি পর্তুগিজরা গ্রহণ করে, পরে আরও সুসংগঠিত নীতি তারা নেয় এবং মশলা বাণিজ্য সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ১৫১০ সালে আলবুকার্ক দ্বারা বিজাপুরের গোয়া অঞ্চল অধিকার করাকে পর্তুগিজ নৌ-সাম্রাজ্যের পত্তন হয় বলা চলে। ক্রমে অন্য স্থানেও, যেমন পারস্য উপসাগরে ওরমুজ (১৫২৫), করমণ্ডল উপকূলে সানথোমে, বাংলায় হুগলি ও চট্টগ্রাম, চীনে ম্যাকাও পর্তুগিজদের অধিকারে আসে। মশলা সংগ্রহই ছিল এই সাম্রাজ্যের প্রধান কাজ। পর্তুগিজ এই সাম্রাজ্য 'এস্টাডা-ডা-ইণ্ডিয়া' নাম গ্রহণ করে।

পর্তুগিজরা নিজেদের শক্তি সংহত করে এস্টাডা-ডা-ইণ্ডিয়ার দ্বারা কতকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠানগত কিছু নিয়ম প্রবর্তন করে। এই নিয়ম এশিয়ার বাণিজ্য কাঠামোর মধ্যেই কাজ করতে থাকে। যেমন, এশিয়া বাণিজ্যে কোনও জিনিসের ওপর রাষ্ট্রীয় একক অধিকার (monopoly) অজানা ছিল না, কিন্তু এটি ছিল খুবই অব্যবহৃত ঘটনা। পর্তুগিজরা যখন মশলা বাণিজ্যে এই অধিকার প্রয়োগ করল তখন তা ব্যর্থ হয় মুলত দমনকারী কার্যকলাপের জন্য।

৩১.৩ কার্টাজে ব্যবস্থার চরিত্র

এশিয় প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বাণিজ্যের সম্পর্ক কি ছিল তা কিছুটা জানা গেলে বোঝা যাবে এশিয় বণিকদের কি ভূমিকা নেওয়া সম্ভব ছিল। এশিয় রাজশক্তি নৌ-বাণিজ্যে উৎসাহ দেখাত প্রধানত বণিকদের ওপর নানাবিধ শুল্ক চাপিয়ে দিয়ে রাজকোষ ভর্তি করার উদ্দেশ্যে। বণিকরা এইসব শুল্ক, রাজস্ব ইত্যাদি দিতে অরাজি ছিল না, কারণ এর বদলে তারা নিরাপত্তা পেত। ভারতীয় রাজশক্তি বহু শতক ধরে এই ধরনের নিরাপত্তা বণিকদের দিয়ে থাকত। পর্তুগিজরা সমুদ্রবাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী বণিকশক্তিকে এই প্রতিরক্ষা দেবার ভারটি নিজেদের হাতে তুলে নেয়। যে বণিকরা পর্তুগিজদের প্রতিরক্ষা চাইত তাদের গোয়ার ভাইসরয়ের কাছ থেকে 'পাস' বা কার্টাজে নিতে হত। ভারতীয় রাজারাও ক্রমশ এই কার্টাজের আশ্রয়ে বাণিজ্য করতে শুরু করে। বিজাপুরের সুলতানরা ধাবল থেকে মোখা পর্যন্ত কার্টাজে ব্যবস্থায় জাহাজ পাঠাতে থাকে। এমনকি মুঘল সম্রাটরা সুরাট থেকে মোখা জাহাজ একইভাবে পাঠাতে শুরু করে।

পর্তুগিজদের নৌ-শক্তির প্রাধান্যের ফলে যোড়শ শতকের শেষে খুব কম ভারতীয় জাহাজ পূর্ব আফ্রিকা, মশলা দ্বীপপুঞ্জ অথবা চীন ও জাপানে যেতে পারত। পর্তুগিজরা এই কার্টাজে ব্যবস্থা চালু করে বিরাট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। পর্তুগিজ শক্তি অবশ্য খুব বেশিদিন নিরাপদে এই ব্যবস্থা চালু রাখতে পারেনি। প্রথমত, পর্তুগিজ নৌ-সাম্রাজ্য জলদস্যুতার ওপর নির্ভর করত। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি ও সরকারের

তরফে দুর্বলতা ছিল অন্যতম আরও একটি বাধা। পর্তুগিজ বাণিজ্য পরগাছা চরিত্রের ছিল এ বক্তব্য অবশ্য প্রশ্নাতীত নয়।

৩১.৪ ভারতের মশলা ও বস্ত্র বাণিজ্যে ইংরেজ-ওলন্দাজ বণিক

সপ্তদশ শতকে মশলা বাণিজ্যে ওলন্দাজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। প্রথম থেকেই তারা তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তবে এবিষয়ে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০০ শতকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তন হয়। অন্যদিকে ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন ওলন্দাজ কোম্পানিগুলি একসঙ্গে হয়ে একটি সংগঠন তৈরি করে। প্রায় একইভাবে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা কাজ শুরু করলেও পরে তা আলাদা ও জটিল হয়ে ওঠে। প্রথমে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা সরাসরি ইন্দানেশিয়ায় জাহাজ পাঠায়, কারণ এখানে পর্তুগিজদের আধিপত্য ছিল সব থেকে কম। পরবর্তীকালে তারা আবিষ্কার করে যে, ভারতীয় মহাসাগরের বাণিজ্য একান্তভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের বাণিজ্যিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত বিভিন্ন দ্বীপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুদ্রাভিত্তিক ছিল না, ছিল ভারতীয় সুতিবস্ত্রের বিনিময়ের ওপর। করমণ্ডল ও গুজরাট উপকূলে বিভিন্ন রকমের সুতিবস্ত্র উৎপাদিত হত, যার এক বিরাট বাজার ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে। ইউরোপীয়রা এই অতি লাভজনক বাণিজ্য দখল করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ওলন্দাজরা পর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণ থেকে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য দখল করে। মাসুলিপট্টম, সুরাট প্রভৃতি বন্দর অঞ্চলে এরা ফ্যাক্টরি স্থাপনে সমর্থ হয়।

সপ্তদশ শতক থেকে সমুদ্রবাণিজ্যের লাভবান ব্যবসা স্থলের রাজনৈতিক অবস্থার ওপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় বণিকরা মুঘল দরবারের নীতির গতিপ্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে।

মুঘল রাষ্ট্র গোটা সপ্তদশ শতক ধরে দুটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র যথা, গুজরাট ও বাংলা নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল এবং এই শতকের শেষের দিকে বিজাপুর ও করমণ্ডল উপকূল নিয়ন্ত্রণে আনে। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা ইসলামীয় নীতি অনুযায়ী বাণিজ্য চালাত, অন্যদিকে সুদূর দক্ষিণে হিন্দুনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাদের বাণিজ্য নীতিও অন্যান্য রাষ্ট্রের মতোই ছিল।

৩১.৫ সামুদ্রিক বন্দর ও মুঘল প্রতিরক্ষা

মুঘল অথবা অন্য রাষ্ট্রগুলির যে সব বন্দরে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি ফ্যাক্টরী বসিয়েছিল সেইসব জায়গার প্রতিরক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। যে সব জায়গায় ব্যবস্থা নিয়েছিল সেগুলি ছিল স্থলে, সামুদ্রিক প্রতিরক্ষার কোন নিদর্শন নেই। মুঘল বন্দর সুরাটে বিশাল স্থায়ী বাহিনী রাখা হয়েছিল কিন্তু অন্য কোনও বন্দরে এরকম কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যোড়শ শতকে পর্তুগিজ বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য মালাবার অঞ্চলের কোনও কোনও বন্দরে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। মূলত যে ধরনের ব্যবস্থা ছিল তা হল শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত ও শুল্ক আদায় সংক্রান্ত। মুঘল রাষ্ট্রের রাজস্বের ১ শতাংশ ভাগ ছিল বাণিজ্য থেকে পাওয়া শুল্ক। ফলে বাণিজ্য থেকে আয়ের ব্যাপারে মুঘলরা অনেকটাই নিস্পৃহ ছিল। বন্দরগুলি তার শাসনব্যবস্থার

ব্যাপারে স্বশাসিত ছিল। মুঘলরা বন্দরগুলির এই স্বাধীনতা রক্ষায় অবশ্য উৎসাহী ছিল। বাংলায় পর্তুগিজ ও আরাকানদের হাত থেকে বন্দরের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য উৎসাহী ছিল এবং তার জন্য এক শক্তির বিরুদ্ধে আর এক শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে কসুর করেনি। আরাকানদের সঙ্গে না পেরে মুঘল প্রশাসন পর্তুগিজদের সাহায্য নেয়, আবার হুগলি বন্দরকে রক্ষা করতে পর্তুগিজদের বিপক্ষে নীতি গ্রহণ করে। বাংলার বাণিজ্য রক্ষার্থে মুঘলরা কতকগুলি দুর্গ বাণিয়ে বাণিজ্য রক্ষা অনেক সময়েই ব্যর্থ হলেও পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুঘলরা তৎপর ছিল। গুজরাট অঞ্চল ও সুরাটের ক্ষেত্রেও মুঘলরা একই পদ্ধতি গ্রহণ করে। আক্রমণাত্মক ইউরোপীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে মুঘলদের অতি সাবধানতার নীতি গ্রহণ করতে হয়। পর্তুগিজ সমস্যা সমাধানের জন্য মুঘলরা অন্য দুই ইউরোপীয় শক্তিকে কাজে লাগাতে পিছপা ছিল না। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মুঘলরা ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানির সাহায্য নেয় আবার এই দুই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাদের দুর্গ বানাতে সবরকম বাধা দেয়।

১৬৪০-এ মুঘলরা স্বাধীনভাবে জাহাজ চলাচলের বিষয়ে এক গভীর সমস্যায় পড়ে। ওলন্দাজরা এই সময় থেকে ভারত মহাসাগরের কর্তৃত্ব দখল করতে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা ভারতীয় জাহাজগুলিকে বাংলা ও গুজরাটের বন্দর ছেড়ে যাবার পথ অবরোধ করে। কিন্তু মুঘলদের হস্তক্ষেপের ফলে (১৬৪৮-১৬৫২) ওলন্দাজদের নীতি ব্যর্থ হয়। ওলন্দাজরা পরিবর্তে সুরাট বন্দর অবরোধ করে এবং জাহাজ দখল করে। মুঘলরা ওলন্দাজদের কেন্দ্র হিসাবে ওলন্দাজ ফ্যাক্টরিগুলি আক্রমণ করে। ওলন্দাজরা বুঝতে পারে যে, ব্যবসা করতে হলে ভারতীয় জাহাজগুলিকে নৌ-বাণিজ্যে অংশ নিতে দিতে হবে। উভয়পক্ষই সমাধানের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা হার মানলে বাণিজ্য আবার শুরু হয়। ভারতীয় জাহাজগুলি ওলন্দাজ 'পাস' ব্যবহার করতে শুরু করে।

১৬৮০ ও ১৬৯০ সালে মুঘলরা নৌ-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আবার অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এ সময়ে বাংলায় বাণিজ্য করা নিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সুরাট পুনরায় অবরুদ্ধ হয়। গাঙ্গেয় উপকূলে মুঘল দুর্গ আক্রান্ত হয়। ১৬৯০ সালের ঘটনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আক্রমণকারী ছিল ইংরেজ কোম্পানি নয়, কিছু জলদস্যু। মুঘলরা এই জলদস্যুদের বিরুদ্ধে প্রায় অসহায় ছিল, কারণ স্থলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ছিল না। মুঘলরা বাধ্য হয়ে ইংরেজ কোম্পানির ওপর জলদস্যুদের নিবারণ করার জন্য চাপ দিতে থাকে। কোম্পানি এই চাপ ঠেকানোর চেষ্টা করে ও অবশেষে এক মেমরেণ্ডাম সই করতে বাধ্য হয়, যার দ্বারা জলদস্যুদের তাড়াবার দায়িত্ব তারা নেয়।

৩১.৬ সমুদ্রবাণিজ্যে মুঘল প্রতিপত্তি বজায় রাখার চেষ্টা ও তার ব্যর্থতা

এরপর মুঘলরা তাদের নিজেদের শর্তে বিদেশি বণিকদের সামনে বাণিজ্যের দরজা পুনরায় খুলে দেয়। এর পরবর্তী সময়ে মুঘলরা বাণিজ্য মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়। মুঘল রাষ্ট্র আর একটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে বাণিজ্যিক প্রাধান্য টিকিয়ে রাখে। মুঘল সম্রাটরা ও তাঁদের পরিবারবর্গ জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অর্থ নিয়োগ করত। পশ্চিম এশিয়ার এই বাণিজ্যপথ ছিল ব্যবসার দিক থেকে খুবই লাভজনক। কিন্তু সপ্তদশ শতকের

মাঝামাঝি থেকে এই অঞ্চলের ব্যবসা প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে—ওলন্দাজ ও ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই প্রতিযোগিতার অংশীদার হয়ে ওঠে। ১৬৫১, ১৬৫২ এবং ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সুরাট বন্দরের প্রশাসন বারবার আদেশ জারী করে যে ওলন্দাজ ও ইংরেজ জাহাজগুলি, রাজকীয় বহরের মাল না তোলা পর্যন্ত, যেন মাল না তোলে। ১৬৬০ সালে মুঘল সম্রাটরা তাদের প্রাধান্য তুলে নেয় ও অবাধ বাণিজ্য শুরু হয়। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি এই সময় থেকে মাল তোলা-নামার ব্যবসায় লাভ করতে থাকে।

মুঘলরা একচেটিয়া ব্যবসা কায়েমের মাধ্যমেও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। ১৬১১ সালে মসুলিপট্টনের প্রশাসক ওলন্দাজদের বাধ্য করে তার সুতিবস্ত্র কিনতে। ওলন্দাজরা অবশ্য এই বাধ্যতামূলক কেনাবেচার ব্যবসা থেকে নিজেদের মুক্ত করে ও স্থলের বণিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মীরজুমলার যখন উত্থান হয় তখন তিনিও ওলন্দাজদের বাধ্য করেন তাঁর কাছ থেকে সুতিবস্ত্র কিনতে। বাংলা ও গুজরাটে মুঘলরা এ ধরনের কোনও চেষ্টা সুতি ও সিল্কের ক্ষেত্রে না করলেও নীলের ব্যবসায় করতে চেষ্টা করেছিল।

ইউরোপীয় সূত্রে পাওয়া মুঘল রাষ্ট্রের শোষণকারী চরিত্র কতখানি সঠিক তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য আছে। বাণিজ্য থেকে অর্থ আদায় কৃষি থেকে আয়ের অনেক কম ছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় রাষ্ট্র ও শাসকগণ সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য করতে আসার পথে তেমন কোনও বাধার সৃষ্টি করেনি। বরং ষোড়শ শতকে পর্তুগিজদের সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের বিরোধ ছিল অনেক বেশি সংঘাতপূর্ণ। মুঘল রাষ্ট্র ও অন্যান্য ছোট ছোট উপকূলের রাষ্ট্রগুলি বিদেশিদের ফ্যাক্টরী খুলতে অনুমতি দিয়েছিল। এছাড়া ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইউরোপীয়দের শুল্ক আদায় ও শুল্ক ছাড় নিয়ে বিরোধের কোনও প্রকৃত কারণ ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা শুল্ক ছাড় ভোগ করত।

ভারতীয় রাষ্ট্র বিশেষ মাত্রায় ইউরোপীয়দের স্বাধীনতাও দিয়েছিল। তারা তাদের স্বাধীনতার অবমাননা না করে সে বিষয়ে কড়া পাহারা রাখা হত। মুঘল রাষ্ট্র ও গোলকোণ্ডার রাষ্ট্রশক্তি এ ব্যাপারে সবথেকে বেশি সমর্থ হয়েছিল।

সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে মুঘল রাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়। এর ফলে বাণিজ্যে মুঘলদের ভূমিকা ও বিনিয়োগ কমতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসা থেকে মুঘলরা সপ্তদশ শতকের শেষ থেকেই নিজেদের গুটিয়ে (যেমন বাংলা) নিচ্ছিল। মুঘল রাষ্ট্র কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, বণিক-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। ফলে বিদেশি বণিকরা (ইংরেজরা) বাণিজ্য প্রতিযোগিতার বদলে ভারতীয় সমাজে শূন্যস্থান পূরণের সুযোগ পেয়েছিল।

৩১.৭ সারাংশ

ওপরের এককটি পড়ে আপনি জানতে পারলেন যে, ১৪৯৯ সালে পর্তুগিজ বণিক ভাস্কো-ডা-গামার ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে পদার্পণ করা কিভাবে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হয়। এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৫১০ সালে আলবুকার্ক দ্বারা বিজাপুরের গোয়া অঞ্চল অধিকার করা, কারণ এর ফলে পর্তুগিজ নৌ-সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছিল বলে বলা যায়। মশলা সংগ্রহই এই সাম্রাজ্যের প্রধান শর্ত। পর্তুগিজরা এই সাম্রাজ্যকে এস্টাডা-ডা-ইণ্ডিয়া নাম দেয়।

এশিয়ার রাজশক্তিগুলি নৌ-বাণিজ্যকে প্রতিরক্ষার নীতি হিসাবে বহুকাল ধরেই গ্রহণ করেছিল। পরিবর্তে বণিকরা শুল্ক ইত্যাদি দিয়ে থাকত। পর্তুগিজদের নৌ-শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কার্টাজে পদ্ধতি ব্যবহার করায় ভারতীয় বণিকরা অসহায় বোধ করতে থাকে। পর্তুগিজরা যে পথগুলিতে বাধা দেয়, জাহাজ চলাচলের সুবিধে দিতে তাকে কার্টাজে বলা হত। পর্তুগিজরা অবশ্য এই ব্যবস্থা বেশিদিন চালু রাখতে পারেনি। সপ্তদশ শতকে মশলা বাণিজ্যে ওলন্দাজদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু এরা সকলেই মুঘল নীতির গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

মুঘলরা গোটা সপ্তদশ শতক বাংলা ও গুজরাট নিজেদের কর্তৃত্বে রাখে। ক্রমে বিজাপুর ও করমণ্ডল উপকূলও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু মুঘল ও অন্যান্য ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির যে সব বন্দরে ইউরোপীয় কোম্পানি ফ্যাক্টরী বসিয়েছিল তার প্রতিরক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। নৌ-বাণিজ্য থেকে অতি অল্প পরিমাণ রাজস্ব পেত বলে মুঘলরা এই ব্যাপারে উদাসীন ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য মুঘলরা এব্যাপারে সজাগ হয় ও নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপনে উৎসাহী হয়। তবে মনে রাখতে হবে, ষোড়শ শতকে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি সংঘাতপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকে মুঘল রাষ্ট্রের অন্য স্তরে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয় ও সমুদ্রবাণিজ্যে মুঘলদের বিনিয়োগ কমতে থাকে। মুঘল রাষ্ট্র, কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, বণিক-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে বিদেশি বণিকরা (ইংরেজরা) ভারতীয় সমাজে শূন্যস্থান পূরণের সুযোগ গ্রহণ করে।

৩১.৮ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। সপ্তদশ শতকে মুঘল রাজশক্তি ইউরোপীয় বণিক শক্তির প্রতি কি ধরনের নীতি নিয়েছিল সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলি কিভাবে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করত তার বিবরণ দিন।

৩। মশলা বাণিজ্যে উৎসাহী ইউরোপীয় বণিকরা কেন ও কিভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যে উৎসাহী হয়ে ওঠে তার আলোচনা করুন।

ছোট প্রশ্ন :

৪। কোন্ শতকে ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট বন্দরে নামেন?

৫। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কবে গঠিত হয়?

৬। পর্তুগিজদের কারা ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত করে?

৭। ওলন্দাজরা কোন্ মুঘল বন্দর অবরোধ করে?

৮। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) মীরজুমলা ছিলেন—————, যাঁর সমুদ্রবাণিজ্যে ব্যবসা ছিল।

(খ) —————ছিল বাংলার অন্যতম বন্দর।

(গ) এস্টাডা-ডা-ইন্ডিয়া ছিল————— নৌ-সাম্রাজ্য।

(ঘ) পর্তুগিজরা যে ‘পাস’ চালু করেছিল তার নাম—————।

৩১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. Tapan Raychaudhuri, Irfan Habib : The Cambridge Economic History of India. Vol. I, C 1200—1750.
2. S. Arasaratham : Maritime India in the Seventeenth Century.
4. অনিরুদ্ধ রায় (সম্পাদিত) : মুঘল ভারত।
5. Ashin Dasgupta : Malabar in Asian Trade.

একক ৩২ □ ধর্মীয় সমন্বয়বাদ—ভক্তিসংস্কৃতি—মুঘল ভারতে শিল্প-স্থাপত্য

গঠন

৩২.০ উদ্দেশ্য

৩২.১ প্রস্তাবনা

৩২.২ রাজদরবার, চিত্রকারখানা ও মুঘল চিত্র

৩২.২.১ সম্রাটের ও অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষণা

৩২.২.২ দরবারি শিল্পী

৩২.২.৩ চিত্রকারখানা

৩২.৩ কাব্য থেকে ইতিহাস

৩২.৪ মুঘল চিত্রকলায় ইউরোপীয় অভিঘাত

৩২.৪.১ মুঘল দরবারি প্রতিকৃতি

৩২.৫ প্রাদেশিক বিস্তার : রাজস্থান

৩২.৫.১ শেষ পর্যায়

৩২.৬ অনুশীলনী

৩২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- মুঘল চিত্রকলার মূলচরিত্র কি ছিল।
- মুঘল বাদশাহরা এবং অভিজাতরা এই চিত্রকলার বিকাশে কি ভূমিকা পালন করেছিলেন।
- মুঘল দরবারে শিল্পীদের স্থান কোথায় ছিল।
- শিল্পীদের সামাজিক অবস্থান কি ছিল।
- চিত্র-কারখানা বলতে কি বোঝায়।
- মুঘল চিত্রকলায় ইউরোপীয় অভিঘাতের চরিত্র কি ছিল।

৩২.১ প্রস্তাবনা

মুঘল চিত্রকলাকে সাধারণত বলা হয় মিনিয়েচর বা অনুচিত্র। এর কারণ মুঘল চিত্রগুলি মূলত পুঁথিচিত্রণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য ভারতবর্ষে মুঘলরা আসার অনেক আগেই পুঁথিচিত্রণ শুরু হয়। একদিকে বৌদ্ধ অন্যদিকে জৈন বিহারগুলিতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন চিত্র আঙ্গিক।

ভারতীয় চিত্রকলায় মধ্যযুগীয় কথাটির ব্যবহার হয় আঙ্গিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। যে সব চিত্ররীতিতে শিল্পীরা ভাস্কর্যের বিন্যাস অনুসরণ করতেন সেগুলিকে বলা হয় বর্তনা রীতি। বিষ্মুধর্মোত্তর পুরাণে চিত্ররচনার সূত্রগুলিতে বিপরীত রীতি হিসাবে তীক্ষ্ণ কোণযুক্ত রেখার স্থলভাগকে আখ্যা দেওয়া হয় বিভক্তক। এইসব প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করে শিল্প-ঐতিহাসিকরা এই দুই রীতির সংজ্ঞাগত ভাগ করেছেন ক্ল্যাসিক্যাল ও মধ্যযুগীয়। পালযুগের চিত্রকলায় অনেক সময় এই দুই রীতিরই অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই সময় বৌদ্ধ বিহারের মধ্যেও গড়ে ওঠে এক শিল্পপরম্পরা।

একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত অধিকাংশ পুঁথি ছিল তালপাতায় রচিত। এই সময়কার অধিকাংশ চিত্রকলাই আখ্যানধর্মী। ত্রয়োদশ শতকে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তার কিছুটা প্রভাব পড়ে। কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বৌদ্ধ শ্রমণরা চলে যান তিব্বতে ও নেপালে। গুজরাট ও রাজস্থানের জৈন ভাণ্ডারগুলিতে অবশ্য এইসব অঞ্চলের বণিক ও রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে পশ্চিমভারতীয় পুঁথিচিত্রণের কাজ চলতে থাকে। পরবর্তীকালে এই ছবিগুলির ওপর পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় ভারতীয় চিত্রকলার আরেক পর্ব। মধ্য এশিয়া থেকে আগত শাসকগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনমতো নিয়ে আসেন পোশাক, অস্ত্র, আতর ও তার সঙ্গে পারসিক শিল্পকলার নান্দনিক আদর্শ। এর মধ্যে স্থাপত্য ও চিত্রকলার বিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকে তালপাতার বদলে কাগজের ব্যবহার পুঁথি রচনার আরেকটি অধ্যায় সূচিত করে। চতুর্দশ শতকের মধ্যে গ্রামীণ শিল্পী ও দরবারি শিল্পী উভয়েই কাগজে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন।

পঞ্চদশ শতকের প্রথম থেকেই সুলতানি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একাধিক প্রায় স্বাধীন সুলতানি রাজ্য গড়ে ওঠে। এদের রাজধানীগুলি হয়ে ওঠে মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র। মাণ্ডু, জৌনপুর ও গৌড়ে এসে ভিড় করেন মধ্য এশিয়ার বহু বিদ্বান ও শিল্পী।

যেহেতু সুলতানি চিত্রোৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু তথ্য পাওয়া যায় না, অনুমান করা যায় যে, পারসিক দরবারি প্রথা অনুযায়ী অভিজাতরা নিজেদের গৃহসংলগ্ন চিত্রকারখানায় ছবি প্রস্তুত করতেন। উত্তরভারত ছাড়াও পারসিক চিত্রকলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলিতে। আহমেদনগর-বিজাপুরে একধরনের চিত্র-আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায় পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, যা মূলত ধ্রুপদী পারসিক চিত্রকলার প্রভাবে সমৃদ্ধ।

এখানে মনে রাখা ভালো যে, এইসব দরবারি চিত্রকলার বাইরে যে সাধারণের শিল্পজগৎ ছিল তার কিছুটা আভাস পেলেও এইসব লোকচিত্র-আঙ্গিক ও তাদের রচয়িতাদের খুব কম পরিচয় আমরা পাই। শুধু যখন এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে দরবারি শিল্প হারিয়ে ফেলে তার প্রতিষ্ঠা, তখনই নজরে পড়ে বিচিত্র সেইসব লোকশিল্পের সূত্র। সেগুলি এতই বিচ্ছিন্ন যে আমরা শুধুমাত্র আমাদের সমসাময়িক লোকশিল্প লক্ষ্য করেই অনুমান করতে পারি প্রাচীন লোকশিল্পের গতি।

৩২.২ রাজদরবার, চিত্রকারখানা ও মুঘল চিত্র

মুঘল চিত্রকলার জন্ম রাজদরবারে। এক হিসাবে এই বিশেষ শৈলীর অন্তর্গত প্রতিটি ছবিই নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের নিদর্শন। কারণ প্রতিটি ছবির রচনার বা উৎপাদনের একদিকে ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি রঙ, তুলি বা কাগজের জন্য অর্থ ব্যয় করছিলেন, যাঁকে বলা হয় পৃষ্ঠপোষক বা পেট্রন; অন্যদিকে ছিলেন শিল্পী যিনি তাঁর শ্রম বিনিয়োগ করে সৃষ্টি করেছেন মূল্যবান ছবি।

মুঘল প্রাসাদের যে নির্দিষ্ট স্থানে শিল্পীর কাজের জায়গা করে দেওয়া হত, তাকে বলা হত কারখানা। অন্যান্য উৎপন্ন বস্তুর মতো স্বাভাবিকভাবে ছবিতেও প্রতিফলিত হত পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পীর যুগ্ম চাহিদা। এই ছবিগুলি তাই দরবারি মুঘল চিত্র বলে পরিচিত। এগুলি ছাড়া সম্রাট ও অন্যান্য অভিজাতদের গৃহে অবস্থিত কারখানাগুলির বাইরে যে সব কারিগরি বস্তু উৎপন্ন হত তা ছিল সাধারণ বাজারের পণ্য। শিল্প-ঐতিহাসিকরা এই ছবিগুলিকে বাজারি মুঘল বা মুঘল লোকচিত্র আখ্যা দিয়েছেন।

৩২.২.১ সম্রাটের ও অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষণা

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবরই প্রথম যিনি চিত্রকারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও বাবর শিল্পকলায় উৎসাহী ছিলেন—তাঁর আমলের কোনও ছবি পাওয়া যায়নি। হুমায়ুনের আমলে দু'জন বিখ্যাত পারসিক শিল্পী আবদুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলি পারস্য থেকে ভারতবর্ষে আসেন। এঁরাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন সম্রাটের নির্দেশে তাঁর চিত্রকারখানা। যে ছবিগুলি সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় দরবারি মুঘল চিত্রকলা।

আকবরের ভারতীয়করণের নীতির ফলে বহু হিন্দু শিল্পী স্থান পান তাঁর চিত্রকারখানায়। যে নান্দনিক মাত্রা এই কারখানায় সৃষ্ট শিল্পকর্মে সৃষ্টি হয় তাতে মুঘল শাসকগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে খুঁজে পান তাঁদের মতাদর্শের প্রতিফলন। রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত অভিজাতরা সম্রাটের প্রতিটি ভঙ্গি অনুকরণ করতেন। ফলে জীবনযাত্রার মানও তাঁর মুঘল দরবার থেকেই গ্রহণ করেন। শিল্পের পৃষ্ঠপোষণ তাই শুধু সম্রাটদের নয় প্রতিটি অভিজাত মুঘলের বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হত।

এই শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেই সামাজিক উদ্বৃত্তের মূল অংশ বণ্টন করা হত। মুঘল রাষ্ট্রে কৃষকদের শ্রমজাত উদ্বৃত্তের কর হিসাবে আত্মসাৎ করতেন এই শাসকরা। আকবরের আমলের মূল জমার ১৮.৫৯ ভাগ গ্রহণ করতেন মাত্র বারোজন মনসবদার এবং করের ৮২ ভাগ ভোগ করতেন ১০৭১ জন ব্যক্তি। এই অল্পসংখ্যক মানুষ অভিজাতদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়াতে এঁরাই ছিলেন দরবারি শিল্পীদের সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষক। মুঘল শাসকগোষ্ঠীর মূল ভূমিকাই ছিল শোষকের। এদের কাছে ছবিও ছিল এই বিলাসিতার দ্রব্যতালিকাভুক্ত।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে কিন্তু পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা শুধুমাত্র শোষক ও সংগ্রহকারীর ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই তা ছিল সমঝদারের। মুঘল পৃষ্ঠপোষকের এই অন্য চেহারা স্পষ্ট হয় তাঁদের নিজস্ব জীবনীকার ও শিল্পীদের রচনায়।

আকবরের আমল থেকে যে নান্দনিক মাত্রা মুঘল শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক উভয়ের কাছে গ্রাহ্য ছিল তার বিধান আসত সম্রাটের কাছ থেকে। আবুল ফজলের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আকবর প্রতি সপ্তাহে তাঁর চিত্রশিল্পীদের কাজ পরিদর্শন করতেন। তাঁর দারোগারা তাঁর সামনে উপস্থিত করতেন চিত্রকারখানার সাপ্তাহিক উৎপাদন।

যেহেতু উৎকৃষ্ট শিল্পোৎপাদন ছিল পৃষ্ঠপোষকের এক বিশেষ দায়িত্ব, তাই রঙ, তুলি ও উচ্চমানের কাগজ সুলভ মূল্যে ক্রয় করে যোগান দেওয়া হত শিল্পীদের। এই চিত্রোৎপাদন ব্যবস্থা শুধুমাত্র সম্রাটের নয় অভিজাতদের গৃহসংলগ্ন কারখানাগুলিতেও চালু ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'মাসির-ই-রহিমি'র মতো অভিজাতদের জীবনীগ্রন্থ থেকে। 'বিয়াজি-ই-খুশবুই' নামক অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থে অভিজাতদের গৃহসংলগ্ন কারখানার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই ব্যবস্থা বর্তমান ছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত।

মুঘল পৃষ্ঠপোষকদের সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল শিল্প সম্পর্কে তাদের উদার মনোভাব। প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন রুচিবান বিদগ্ধ পুরুষ। এঁদের মধ্যে আকবর নিজেই শিল্পশিক্ষা করেছিলেন আবদুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলির কাছ থেকে। গোঁড়া উলেমাপন্থীদের চিত্রকলা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আকবর সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

এর সঙ্গে সঙ্গে আকবরের রুচি পরিবর্তনও জড়িত। আকবরের রাজসভায় গ্রন্থচিত্রণ প্রাধান্য পায়। একাধিক পারসিক কাব্যগ্রন্থের মতো হিন্দু মহাকাব্যগুলি অনুবাদ হয় ও এদের মধ্যে 'রমম্‌নামা' (মহাভারতের পারসিক অনুবাদ), 'হরিবংশ', 'রামায়ণ' প্রভৃতি চিত্রিত হয়। আকবর নিজে এই গ্রন্থচিত্রণের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। 'হামজানামার' মতোই এইসব বীরগাথা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত।

যদিও গ্রন্থচিত্রণ আকবরের কারখানার মূল বিষয়রূপে গণ্য হয়, প্রতিকৃতি চিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা আবুল ফজল বারবার উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতিসদৃশ রূপায়ণ, যার মাধ্যমে ছবিতে বিষয়ের কাব্যগুণ অক্ষুণ্ণ থাকবে অথচ মানুষ, জীবজন্তু, নিসর্গদৃশ্য সবকিছুকে চিহ্নিত করা যাবে—এই পাঠ মুঘল শিল্পীরা গ্রহণ করেন ইয়োরোপীয় চিত্রকলা থেকে এবং এখানেও এঁদের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। শুধুমাত্র গোঁড়া মুসলমান নয়, হিন্দু জাতিভেদ প্রথার যে কট্টর বিধিনিষেধ জীবিকা বদল অসম্ভব করে তুলেছিল, আকবর তাকেও অস্বীকার করেন।

জাহাঙ্গীর, যিনি সমসাময়িক সাক্ষ্যে আকবরের রাজনৈতিক প্রতিভার যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হতেন না, তাঁর প্রধান উল্লেখযোগ্য সামাজিক ভূমিকা ছিল শিল্পের পৃষ্ঠপোষণ। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কালে এলাহাবাদে যে স্বাধীন দরবার জাহাঙ্গীর বসান সেখানে পূর্ণ উদ্যমে গড়ে তোলেন এক চিত্রকারখানা। সেখানে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে শিল্পীরা এসে যোগ দেন।

জাহাঙ্গীরের আমল থেকে শুরু হয় শিল্পীদের ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাশ। জাহাঙ্গীর নিজে পুঁতিচিত্রণে আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও একক ছবি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর আমলে রচিত বিশাল সব এ্যালবাম বা মুরাক্কা পাওয়া গেছে যাতে রয়েছে ইয়োরোপীয় ছবির অনুকরণ, ওস্তাদ মনসুরের করা জীবজন্তুদের ছবি, আবুল হাসানের আঁকা প্রতিকৃতি।

জাহাঙ্গীর যে শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় ছবি পছন্দ করতেন তা নয়, তাঁর আমলে বেহজাদের ছবির অনুকরণ পাওয়া গেছে শিল্পী নানহার করা। এছাড়া তাঁর চিত্রকারখানায় কাজ নিয়ে আসেন আকা রিজা। এঁর কাজের ধরন ছিল সম্পূর্ণভাবে পারসিক। অন্যদিকে জাহাঙ্গীরের আমলেই সবথেকে বেশি ইয়োরোপীয় নিসর্গদৃশ্য, প্রতীক ও প্রতিকৃতির প্রভাব পড়েছে মুঘল শিল্পকলায়। এক হিসাবে জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই গড়ে উঠেছে সেই মিশ্র আঙ্গিক যা মুঘল চিত্রকলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শাহজাহানকে ধরা হয় মূলত স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও ওঁর আমলেই বিশাল কিছু অ্যালবাম এবং 'শাহজাহান-নামার' চিত্রিত সংস্করণ শেষ করা হয়। একদিকে অনুপুঙ্খের ওপর নজর, অন্যদিকে সোনা ও জমকালো চিত্রকলার জন্ম দেয় যা শাহজাহানের রুচিকে চিহ্নিত করে।

মুঘল দরবারি শিল্পের আরো বেশকিছু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যাদের কথা বিশেষ জানা যায় না, যেমন হারেমের মহিলারা। বহুবার উল্লেখ পাওয়া গেছে যে, আকবর বা জাহাঙ্গীর ইয়োরোপীয় ছবি নিয়ে গেছেন অন্দরমহলে। কিছু কিছু মহিলা শিল্পীর নাম পাওয়া যায়, যাঁদেরকে শিল্প-ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন হারেমের বাসিন্দা বলে।

নান্দনিক উপভোগ ছাড়াও চিত্রকলার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল মুঘল শাসকগোষ্ঠীর কাছে। প্রথাগতভাবে তাঁরা শিল্পের মাধ্যমে প্রচার করতে চেয়েছিলেন নিজেদের মতাদর্শ। অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে যে বিশাল অর্থ বণ্টন হত, সেটা যে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য তা শাসকশ্রেণী প্রমাণ করতেন নানা উপায়ে। এই বৈধকরণের একটা উপায় ছিল শিল্প। জীবনযাত্রার যে বিশাল ফারাক কৃষক ও শহরের গরিব কারিগরদের দূরে রাখত অভিজাতদের থেকে, তাঁরা এইসব শিল্পকর্মকে মেনে নিতেন শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে। এক্ষেত্রে চিত্রকলার কাজ ছিল একটু অন্যরকম। দেওয়ালচিত্র যেভাবে স্থাপত্যের অঙ্গ হিসাবে মানুষের কাছে রাজমহিমা প্রচার করতে পারে, দুটো কাগজে আঁকা অনুচিত্র তা পারে না, কারণ তা সীমাবদ্ধ থেকে অল্পসংখ্যক দর্শকের মধ্যে। অবশ্য মুঘল দরবারে এই সীমিত দর্শকমণ্ডলী ছিলেন সম্রাটের অন্তরঙ্গ ও প্রধান সামরিক সহায়। ফলে এদের মধ্যে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়।

মুঘল চিত্রকলার আর একটি কার্যকর দিক ছিল। ফোটোগ্রাফি আবিষ্কার হবার আগে মূলত ছবি এবং বিশেষভাবে প্রতিকৃতিচিত্র দৃশ্যগ্রাহ্য রূপে ধরে রাখত ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিকে। কিন্তু দলিল হিসাবেও মুঘল সম্রাটরা সচেতন ছিলেন এর আঙ্গিক সম্পর্কে। যেভাবে ইতিহাস রচিত হত সভাস্থ পণ্ডিতকে দিয়ে সেভাবেই প্রতিকৃতিও রচিত হত দরবারি শিল্পীদের দিয়ে। এখানে মনে রাখা ভালো যে, মতাদর্শগত বিশেষ কোনও বিরোধ দরবারি শিল্পী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে না থাকার ফলে মুঘল চিত্রকলার মাধ্যমে শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকের যুগ্ম মতাদর্শই দর্শকের সামনে উপস্থিত হত।

৩২.২.২ দরবারি শিল্পী

মুঘল দরবারে শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকের সম্পর্ক ছিল প্রভু ও ভৃত্যের। মুঘল শিল্পীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া গেছে আবুল ফজলের লেখায়। আবুল ফজল লিখেছিলেন যে, শতাধিক শিল্পী সম্রাটের চিত্রকারখানায় কাজ করছিলেন। এঁরা সবাই নাকি পারসিক ধ্রুপদী শিল্পী, সবাই বেহজাদের দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। অবশ্য যে নামের তালিকা তিনি পেশ করেছিলেন তার মধ্যে একশো জনকে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে খালি সতেরো জনের নাম। এদের মধ্যেও আবার উল্লেখযোগ্য মীর সৈয়দ আলি আবদুস সামাদ (শিরিন কলম্), দশবন্ত ও বসাওয়ান। হুমায়ুনের আমলেও দরবারে শিল্পীরা ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর আমলে লেখা 'বিয়াজিৎ বিয়া'-তে।

আকবরের আমলেই বিভিন্ন ধরনের শিল্পীরা চিত্রকারখানায় কাজ নেন। এখানে কাজ হত সম্মিলিত উপায়ে। আকবরের শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন মীর সৈয়দ আলি ও আবদুস সামাদ। মুঘল দরবারি শিল্পীদের অনেকের

ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তাঁরা শুধু চিত্রকর ছিলেন না, অনেকেই দক্ষ লিপিকার, এমনকি রত্ন খোদাইকরও ছিলেন। আবদুস সামাদ এদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য। আকবরের দরবারের অন্যতম খ্যাতনামা শিল্পী যিনি চিত্রকারখানার তত্ত্বাবধানে ছিলেন তিনি হলেন মীর সৈয়দ আলি।

আকবরের আমলে চিত্রকারখানায় বহু হিন্দু শিল্পীর আগমন হয়। এস পি ভার্মার মতে, শিল্পীদের মধ্যে ১৪৫ জন ছিলেন হিন্দু ও ১১৫ জন ছিলেন মুসলমান। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরের আমলে এদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪৩ জন হিন্দু ও ৪১ জন মুসলমান শিল্পীতে। যদিও জাহাঙ্গীরকে সবাই বলেন মুঘল পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে সবচেয়ে সমঝদার, তবু দেখা যায় যে, আকবরই ছিলেন চিত্রকলার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা।

আকবরের হিন্দু শিল্পীরা কিন্তু কেউই জাতিতে পটুয়া ছিলেন না। পেশাগত বিভাজন তখনও হিন্দু সমাজে বিদ্যমান। অর্ধকথনকের সাক্ষ্য অনুযায়ী চিত্রকররা ছিলেন শূদ্র ও জাতিতে নিম্ন বর্ণের। আকবর যে এই নীতি মানেননি তার বিশেষ দৃষ্টান্ত দশবন্ত। যে অল্প কয়েকজন শিল্পীর প্রশংসায় আবুল ফজল পঞ্চমুখ, তাঁদের মধ্যে আর একজন বসাওয়ান।

আকবরের আমলে যে দরবারি চিত্রকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে সমষ্টিগত প্রয়াসে কাজ হলেও, শিল্পীরা যে নিজেদের মৌলিক শিল্পভাষা গড়ে তুলতে পারছিলেন তা ওপরের আলোচিত শিল্পীদের কাজ পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। একদিকে ধ্রুপদী পারসিক রীতি, অন্যদিকে ভারতীয়করণের প্রচেষ্টা, দুই ভাবধারাই মুঘল শিল্পীদের কিছু স্বাধীনতা দেয়। ১৬৮০-র পর যখন ইয়োরোপীয় শিল্প-আঙ্গিক মুঘল শিল্পীদের সামনে আরো নতুন শৈল্পিক পাঠের সন্ধান দেয় তখন তারা তা সাগ্রহে গ্রহণ করেন। এই আগ্রহ জাহাঙ্গীরের আমলে প্রকাশ প্রায় শিল্পীদের বিশেষ বিশেষ পারদর্শিতা লাভের প্রচেষ্টায়। জাহাঙ্গীরের আমলের সবচেয়ে বিখ্যাত দুই শিল্পী হলেন—আবুল হাসান ও ওস্তাদ মনসুর। আবুল হাসানের মতো আর যে সব শিল্পী সম্রাটদের দরবারে ছোটো থেকে শিক্ষানবিসের সুযোগ পেতেন তাঁদের বলা হত খানজাদা। এঁরা অন্যদের চেয়ে আরো সাম্মানিক বলে গণ্য হতেন।

এখানে যে প্রশ্নটা ওঠে তা এই : মুঘল শিল্পীদের কতটা স্বাধীনতা ছিল বৃত্তি বদলের? বা পৃষ্ঠপোষকের আওতা থেকে বেরিয়ে নিজেদের ছবি বিক্রয় করে জীবনধারণ করবার? যেহেতু পঞ্চদশ শতকের ভারতবর্ষে রেনেসাঁস ইয়োরোপের মতো কোনও 'শিল্পের বাজার' গড়ে ওঠেনি, তাই মুঘল শিল্পীরা কখনই সমসাময়িক ইয়োরোপীয় শিল্পীদের মতো শুধুমাত্র দক্ষতার জোরে স্বাধীন জীবিকা অর্জন করতে পারেননি। পৃষ্ঠপোষকের দাক্ষিণ্যের বাইরে যাওয়া মানেই ছিল বাজারে আশ্রয় নেওয়া, ফলে অন্য যে কোনও প্রতিষ্ঠানিক শিল্পীর মতো রাজকীয় কারখানাগুলিই ছিল তাঁদের শৈল্পিক বিকাশের একমাত্র ক্ষেত্র।

যে সব শিল্পীরা শহরের বাজারে সওদা সাজিয়ে বসতেন তাঁদের সম্পর্কে এত অল্প জানা যায় যে, তাঁদের সামাজিক স্থান নির্ণয় করা আরো শক্ত। একমাত্র অভিজাতদের ক্রোধ উদ্রেকের সময় ছাড়া তাদের অস্তিত্বের কোনো সাক্ষ্য মেলে না। ফলে শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া যায় যে, এঁরা ছিলেন গ্রামীণ ও শহরের কারিগর শ্রেণীর সমপর্যায়ভুক্ত এবং এঁদের সামাজিক অবস্থান ছিল দরবারি শিল্পীদের বিপরীত মেরুতে।

৩২.২.৩ চিত্রকারখানা

রাজকীয় কারখানাগুলি ছিল অভিজাত পৃষ্ঠপোষক ও মুঘল শিল্পীদের মিলবার ক্ষেত্র। চিত্রকারখানায় শিল্পী ছাড়াও থাকতেন লিপিকার, যাঁর মর্যাদা অনেকাংশে ছিল চিত্রকরের থেকে বেশি। বহু ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে, চিত্রকররাও লিপি রচনায় দক্ষ ছিলেন।

মুঘল ছবির পদ্ধতি বা মিডিয়াম ছিল তেল ও জল রঙের মিশ্রণ। একে বলা হয় গুয়াশ। এর ফলে জলরঙটা আর স্বচ্ছ থাকে না। মুঘল চিত্রকলার অধিকাংশ রঙ তৈরি হত পাথরচূর্ণ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে। খালি সোনা বা রূপো ধাতু গলিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা হত। অনেক সময় জমকালো পোশাক বা অলংকারকে স্পষ্ট করতে সোনা বা রূপোর ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এর ব্যবহার পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পায়।

রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমদিকে ছবিতে রঙের ব্যবহার ছিল দ্বিমাত্রিক পদ্ধতিতে আবদ্ধ। পরবর্তীকালে যখন উপস্থাপিত বিষয়কে দৃশ্যগ্রাহ্য জগতের আরো কাছাকাছি আনার চেষ্টা হয় তখন ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অনুকরণে শেডিং চালু করা হয় মুঘল চিত্রে। অবশ্য এটাও করা হয় মুঘল শিল্পীদের নিজস্ব মেজাজ অনুসারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবি শেষ হলে তার চারধারে একটি মার্জিন কাটা হয়, তারপর সেই ছবিকেই আর একটি অলংকৃত কাগজের ওপর আটকানো হত। ছবির এই বাইরের অংশকে বলা হয় হাসিয়া। যে কোনও গ্রন্থের শেষ অংশে যে জায়গা ছেড়ে রাখা হয় তাকে বলা হয় 'তিওমা'। এই অংশেই লেখা থাকে শিল্পীদের নাম, পৃষ্ঠপোষক ও কারখানার পরিচয়।

১৫৫৫ থেকে ১৫৫৮ সাল ছিল মুঘল রাজকীয় চিত্রকারখানার সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময়। এই সময়ই শিল্পীরা মুঘল দরবারকে দর্শকের সামনে শুধু একটি সুশাসিত রাষ্ট্রের কেন্দ্র নয়, উপস্থাপিত করে ভবিষ্যতের সব রাজতন্ত্রের আদর্শ হিসাবে।

৩২.৩ কাব্য থেকে ইতিহাস

হুমায়ুনের যথাযথ দৃশ্যগ্রাহ্য দলিলের চাহিদা ও বাবরের প্রচারধর্মী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী শিল্পের ধারণা মুঘল দরবারি চিত্রকলার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। অনেকে মনে করেন, মুঘল চিত্রকারখানার প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন। কিন্তু আঙ্গিকের ঐতিহাসিক বিবর্তন লক্ষ করলে দেখা যায় যে, স্বকীয় একটি শিল্পশৈলী হিসাবে মুঘল চিত্রকলা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে আকবরের রাজসভায়।

আকবরের চিত্রকারখানার প্রথম দিকের কাজে পারসিক কাব্যের রূপকথার জগৎ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু যখন থেকে প্রাক্‌-মুসলমান চিত্রপদ্ধতিতে দক্ষ শিল্পীরা মুঘল দরবারে জায়গা পেতে থাকেন তখন তাঁরা এই পারসিক রীতিকে শিক্ষার বিষয় করলেও তাঁদের পুরনো শিক্ষাকে একেবারে ভুলতে পারলেন না, ফলে পৃথক রীতিতে সংমিশ্রণে এক নতুন শৈলীর জন্ম হল যাকে ঠিক প্রাদেশিক পারসিক চিত্রকলা বলা যায় না। বরং এর প্রভাবে মুঘল ছবির নিজস্ব রূপও ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে।

আকবরের কারখানার সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হল 'হামজানামা'র অলংকরণ। আনুমানিক ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থচিত্রণ আরম্ভ হয় এবং সমসাময়িক সাক্ষ্যে জানা যায় যে, পনেরো বছর লেগেছিল এই কাজ শেষ হতে। অবশ্যই অন্য গ্রন্থচিত্রণ এই সময় থেমে থাকেনি। ১৫৬৭ থেকে ১৫৭০-এর মধ্যে তিনটি গ্রন্থের অলংকরণ করা হয় যাতে পারসিক প্রভাবের পাশে ফুটে ওঠে শিল্পীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ছাপ। প্রথম দৃষ্টান্ত চিত্রিত 'গুলিস্তান'-এর একটি খণ্ড। বিখ্যাত পারসিক সাহিত্যিক সাদি রচিত নীতিমূলক কাহিনীর এই সংকলন গ্রন্থটি অনুলিখিত হয় বুখারায়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল 'দুবল রানী—খিজির খান'—আমীর খসরু রচিত একটি রোম্যানটিক কাব্য। তৃতীয়টি হল 'আনওয়ার-ই-সুহেলি'। হুসেন-ই-ভয়েজ কাপফী রচিত এই কাহিনী মুঘল দরবারে খুব জনপ্রিয় ছিল।

'হামজানামা'র বিষয় হল হজরৎ মহম্মদের আত্মীয় হামজার অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তাঁর এই ক্ষমতার প্রয়োগের বিবরণ। এহেন 'হামজানামা'র চৌদ্দটি খণ্ডের কোনও সম্পূর্ণ খণ্ড এমনকী মলাট বা মুখবন্ধও পাওয়া যায়নি। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা মাত্র শ-দেড়েক ছবির হদিশ পাওয়া গেছে, তাদের কারুর নিচে কোনও শিল্পীর স্বাক্ষর নেই। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। আঙ্গিকগত বিবর্তনের দিক থেকে লক্ষ করলে 'হামজানামা'র চিত্রগুলি মুঘল চিত্রশৈলীতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাথমিক পর্যায়ের পারসিক আলংকারিক রীতি, যা আবদুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলির ছবিতে স্পষ্ট, পরে তা প্রাকৃতিক বস্তুর অনুচিত্রণে রূপান্তরিত হয়। মানুষের মুখ, অবয়ব, গায়ের রঙ বহুলাংশেই শিল্পীর বাস্তবে দেখা জগতের সদৃশ।

'খানদান-ই-তিমুরিয়া'র মারফৎ আকবর তুলে ধরতে চেয়েছিলেন মুঘল রাজবংশের বীরত্বের কাহিনী। একই সঙ্গে বংশমর্যাদা ও ঐতিহ্যের বিবরণ তাঁর ক্ষমতার বৈধকরণ-প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলে। পিতা থেকে পুত্রে ক্ষমতালাভের এই যে চিরাচরিত পথ, তাকে নানাভাবে সমসাময়িক পাঠক ও দর্শকের কাছে বৈধ করে তোলাই ছিল দরবারি কবি ও শিল্পীর কাজ। আকবরের সভাস্থ লেখক ও শিল্পীদের কাছে এটা খুব স্পষ্ট। 'বাবরনামা' ও 'আকবরনামা' উভয় গ্রন্থচিত্রে এই সত্যই শিল্পীদের মূল প্রেরণা জোগায়। এই জীবনীচিত্রণে লক্ষ করা যায় যথাযথ দৃশ্য উপস্থাপনে মুঘল শিল্পীদের প্রচেষ্টা। একই সঙ্গে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের পরিবর্তন ও ছবিতে উপস্থিত করা চিত্রশৈলীর গতি কিভাবে মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় আবুল ফজলের 'আকবরনামা'র চিত্রিত খণ্ডগুলি।

১৫৯০ সালে 'আকবরনামা' লেখা শেষ হলে সম্রাটের হুকুমে তা চিত্রিত করা শুরু হয়। এই সময় থেকেই মুঘল পুঁথি চিত্রণরীতিতে নতুন আঙ্গিকের উন্মেষ লক্ষণীয়। একই সঙ্গে বাস্তব ঘটনার চিত্রণ এবং সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাসে সেই ঘটনাকে স্থান করে দেবার দাবি রাখা হয় শিল্পীদের কাছে। রাজ্যের বিস্তার চিত্রিত করা হয় একাধিক যুদ্ধের দৃশ্যে। সম্রাটের 'চেহারা' অর্থাৎ প্রতিকৃতি আর শুধুমাত্র জমকালো পোশাক পরা একটি 'টাইপ' হিসাবে উপস্থিত থাকে না। ছবিতে যখন আকবরের মুখের আদল স্পষ্ট, তখনই তাঁকে আর যে কোনও রাজপুরুষ নন, সম্রাট আকবর বলেই চিহ্নিত করা যায়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আকবরের পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের প্রতিকৃতিচিত্রে ব্যক্তিদের আলাদা করা যেত না। ফলে ১৫৮০-র পরবর্তী সময় প্রতিকৃতিচিত্রণ মুঘল দরবারে একটি বিশেষ চিত্রধারা হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

রীতিগতভাবে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, মুঘল শিল্পীরা তাঁদের প্রাথমিক যে শিক্ষা অর্থাৎ পারসিক ও প্রাক্-মুঘল ভারতীয় চিত্রণপদ্ধতি—তা থেকে ক্রমশ সরে আসছিলেন ও যথাযথ দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্ররীতির দিকে ঝুঁকছিলেন। এই পাঠ তাঁরা গ্রহণ করেন ইয়োরোপীয় চিত্রকলা থেকে। কিন্তু একই সঙ্গে পারসিক চিত্রকলার উজ্জ্বল রঙের সমাবেশ, গাঢ় ও হালকা রঙের পাশাপাশি অবস্থানে নাটকীয় আমেজ সৃষ্টি ও দ্বিমাত্রিক রেখাবহুল অঙ্কনরীতি মুঘল শিল্পীদের প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও কাহিনীকে বিবৃত করার জন্য ও স্থানভেদের চিহ্নগুলি তাঁরা চিত্রভূমির বিভাজনের পরিচিত ছকেই আবদ্ধ রাখেন।

মুঘল চিত্রশৈলীর প্রাথমিক পর্যায়ে পারসিক রীতির প্রাধান্য ক্রমশ ১৫৮০-র থেকে সীমিত হয়ে পড়ে। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় চিত্রভূমির বিভাজনের ক্ষেত্রে। ইয়োরোপীয় চিত্রকলায় সামনের বস্তুর প্রাধান্য ও দূরের বস্তুর আয়তন হ্রাসকে বলা হয় পার্সপেকটিভ। মুঘল চিত্রকলায় দেখা যায় শিল্পীরা এই পার্সপেকটিভ নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন। একই ছবিতে দর্শক একবার চিত্রিত ঘটনাকে লক্ষ করছেন ওপর থেকে, একবার পাশ থেকে, একবার দেওয়ালের আড়াল উড়িয়ে দিয়ে সামনে থেকে। এই বহু দৃশ্যের ধারণা মুঘল শিল্পীরা কিছুটা ধ্রুপদী পারসিক শিল্পকলা থেকে গ্রহণ করলেও বাকিটা করেছিলেন লোকশিল্প থেকে। সমসাময়িক রাজস্থানী চিত্রকলায় লোককথা, পুরাণ আর গাথাকাব্য বিষয় হিসাবে সমান মর্যাদা পাওয়ায় সেখানে মুঘল দরবারি শিল্পধারণা অনেকটাই লোকশিল্পের প্রভাবে চাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে মুঘল শিল্পীরাও কিছুটা প্রভাবিত হন এই চিত্রপদ্ধতি দ্বারা।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, মুঘল চিত্রকলার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এই সময় থেকে প্রকট হয় বিষয় ও আঙ্গিকের মিলিত অভিব্যক্তির ফলে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুঘল শিল্পীরা রূপকথার কল্পলোক থেকে স্থানান্তরিত হয়ে পৌঁছেছেন ইতিহাস ও জীবনী চিত্রণে।

মুঘল শিল্পীরা আকবরকে তাই দেবতার প্রতিভূ হিসাবে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থিত করতেন তাঁদের দর্শকমণ্ডলীর কাছে। যেমন, সম্রাটের মুখমণ্ডলের চারধারে রচনা করা হয় আলোকময় বৃত্ত। এখানে তাঁরা দুটো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন—প্রথমটি হল, যে নিজস্ব ঐতিহ্য তাঁরা পেয়েছিলেন দেবাজ শিল্প ও পারসিক চিত্ররীতির মিশ্র আঙ্গিকে তাকে রক্ষা করা, একই সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের যথাযথ প্রকাশ চিত্রে রূপায়িত করা। দ্বিতীয়ত, অভিজাতদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে সম্রাটকে সর্বশক্তির আধার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। শাসকশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব যত বেড়েছে শিল্পকলার ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরভেদকে চিহ্নিত করা ততই কঠিন হয়ে উঠেছে।

মুঘল দরবারি চিত্রকলায় তাই গড়ে উঠল আকবরের রাজত্বকালে ইতিহাসকে নির্ভর করে স্ব-মতাদর্শ অনুযায়ী এক চিত্রজগৎ, যেখানে সম্রাটের একক মহিমা ধরে রাখে বিশ্বকে এবং যেখানে শিল্পীর স্বকীয় শিল্পসত্তার প্রকাশ সম্ভব হয় পৃষ্ঠপোষকের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশে।

৩২.৪ মুঘল চিত্রকলায় ইউরোপীয় অভিঘাত

ধর্মপ্রচারের একটি বিশেষ উপায় ছিল ভারতবর্ষে খ্রিস্টানধর্মীয় চিত্র ও মূর্তির আমদানি। প্রথম থেকেই ক্যাথলিক চার্চ এ বিষয়ে সচেতন থাকায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত গির্জাগুলিতে অলংকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

যিশু ও সন্তদের জীবনের ঘটনা ছাড়াও প্রখ্যাত শিল্পীদের আঁকা তৈলচিত্র ইউরোপ থেকে আনানো হয়। সেই সঙ্গে সাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য মজুত করা হয় এনগ্রেভিং—ছাপাই করা অনুচিত্র। এর ফলে ভারতীয় চিত্রকলার কিছু আঙ্গিকগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, শিল্প-ঐতিহাসিকরা যাকে আখ্যা দেন 'ন্যাচারালিস্ট'—যার চেষ্টা মূলত শিল্পে প্রকৃতির প্রতিরূপ রচনা। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এর জের লক্ষ করা যায়।

মুঘল দরবারে ইয়োরোপীয়দের আগমনের সূচনা হয় ফতেপুরসিক্রির ইবাদতখানায়। ১৫৮০-র পরে, আকবরের চিত্রকারখানায় অঙ্কিত কেশব দাসের ছবিতে ইয়োরোপীয় প্রভাব স্পষ্ট। আরো পরে বসাওয়ান, মুশ্‌কিন ও সাওঁলার ছবিতে ধরা পড়ে পাশ্চাত্য আঙ্গিকের ছাপ। এঁদের মধ্যে কেশব দাসই সবচেয়ে বেশি সংখ্যার ইয়োরোপীয় চিত্র অনুকরণ করেন আকবরের আদেশে।

সমসাময়িক তথ্য অনুসারে জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন সমঝদার শিল্পরসিক ব্যক্তি। খ্রিস্টানধর্মীয় শিল্প সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সেই আকর্ষণেই গড়ে ওঠে। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকরা কিন্তু তাঁর মধ্যে লক্ষ করেন এক আধ্যাত্মিক দিক। তাঁরা বারবার লেখেন, যুবরাজ খ্রিস্টিয় চিত্রগুলির একটি সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন। তিনি প্রতিটি এনগ্রেভিং খুঁটিয়ে দেখেন, কিভাবে তাতে রঙ লাগানো যায় তার পরিকল্পনা করেন। সর্বোপরি ছবিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতীকের তাৎপর্য জানতে চান। পরবর্তীকালে ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ বণিকরা মুঘল দরবারে ভিড় জমান ও মূল্যবান সামগ্রীর বদলে নজরানা হিসাবে ছবি দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করার চেষ্টা চালাতেন।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুঘল শিল্পীরা প্রধানত তিনটি উপায় অনুসরণ করেছিলেন। প্রথমত অনুকরণ; দ্বিতীয়ত, ভাবগ্রহণ এবং তৃতীয়ত, বিভিন্ন বিষয়ের ছবিতে ইয়োরোপীয় চিত্র থেকে পুরুষ ও নারীর টাইপের উপস্থাপনা।

১৫৯৮ সালে সেলিমের (পরে জাহাঙ্গীর) নির্দেশে লাহোরের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে কিছু খ্রিস্টান চিত্র রচনা করা হয়। এবং তাঁর সময়ই মুঘল শিল্পীরা ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অনুকরণে পুরোপুরি দক্ষ হয়ে ওঠেন। মুঘল চিত্ররচনার বহুক্ষেত্রে দেখা যায় দু'টি আঙ্গিকের স্বচ্ছন্দ অবস্থান। এটাও মূলত প্রাধান্যলাভ করে ১৫৮০-র পর থেকেই। ইয়োরোপীয় চিত্র থেকে কিছু কিছু অংশ দিয়ে মুঘল শিল্পীরা তার ওপর তাঁদের ইচ্ছামতো নক্‌শা রচনা করেন। যেমন, ইয়োরোপীয় চিত্রের নিসর্গদৃশ্য থেকে পটভূমি রচনা করে তারই প্রেক্ষায় রচিত হয় পারসিক কাহিনীর চিত্ররূপ।

কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় যে, মুঘল আমলে ভারতীয় শিল্প ও সমসাময়িক ইয়োরোপীয় শিল্পের নান্দনিক চাহিদা কোথাও মিলে যাচ্ছিল। অথচ তথ্যসূত্রে যা জানা যায় তাতে স্পষ্ট যে, মুঘল ও পাশ্চাত্য শিল্পীদের চিন্তার আদান-প্রদানের কোনও পথই ছিল না। মুঘল শিল্পীদের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকের রুচিই প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। এর ফলে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার প্রযুক্তিগত বিবর্তন সম্পর্কে তাঁরা যা জানতেন তা আসত পৃষ্ঠপোষকের অনুগ্রহ ও আদেশ হিসাবে। তেলরঙের ব্যবহার যখা পাশ্চাত্য দর্শক ও শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনছে, তখন স্যার টমাস রো তাঁর ডিরেকটরদের জানাচ্ছেন যে, জাহাঙ্গীরকে কিছু বড়ো তেলরঙের ছবি উপহার দিলে তিনি তা ফেরত দিয়ে দেন, কারণ তিনি তেলরঙের আঁকা ছবি পছন্দ করেন না।

মুঘল শিল্পীরা ইয়োরোপীয় চিত্রে অনুশীলনের ফলে দু'টি আঙ্গিকগত পাঠ গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন— প্রথম, পরিপ্রেক্ষিত ও দুই, কিয়ারসকুরো বা আলো-আঁধারের খেলা। মনে রাখা দরকার যেকোনও শিল্পেই আঙ্গিকগত পরিবর্তন অনেকটাই নির্ভর করে ক্রেতা-দর্শকের রুচির ওপর। মুঘল দরবারে একটি দর্শকগোষ্ঠী থাকলেও তাদের সংখ্যা ছিল সীমিত। শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত হওয়ায় তাঁদের মতাদর্শই শিল্প-উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করত। মুঘল চিত্র আঙ্গিকে ইয়োরোপীয় প্রভাবের ফলে যে পরিবর্তন ঘটে তার পিছনে ছিল এঁদের প্রচ্ছন্ন অনুমোদন।

৩২.৪.১ মুঘল দরবারি প্রতিকৃতি

মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রগুলিতে লক্ষ করা যায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও নান্দনিক চাহিদার এক আশ্চর্য সমন্বয়। ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় এখানে প্রতিষ্ঠা পায় তাঁর সামাজিক প্রেক্ষায়। সাহিত্যে প্রচুর উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও প্রাক্-মুঘল চিত্রকলায় প্রতিকৃতির কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি। প্রাচীন ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যে ব্যক্তির যথাযথ প্রতিকৃতি, যার দ্বারা ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়, তার দৃষ্টান্ত বিরল; নেই বললেই চলে। এ থেকে শিল্প-ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে, মুঘলদের প্রতিকৃতি রচনায় আগ্রহের কারণ তাঁদের মোঙ্গল উত্তরাধিকারের মধ্যেই নিহিত।

মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে, একই ব্যক্তির প্রতিকৃতি চিত্র যদি কয়েক বছর পর পর মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে শুধু যে তাঁদের চিনতে পারা যায় তা নয়, তাদের শারীরিক পরিবর্তনও সহজে চোখে পড়ে। 'আকবরনামা' ও 'জাহাঙ্গীরনামার' যে সব রাজপুত্র, সভাসদ ও রাজকর্মচারীদের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে তাদের সবার ক্ষেত্রেই এই পরবির্তনগুলি লক্ষণীয়।

শিকারযাত্রা, সাধু-সন্ত ও পীরদের সঙ্গে সম্রাট ও রাজপুত্রদের সাক্ষাৎকার প্রায় সবই ছিল শিল্পীদের বিষয়। জাহাঙ্গীরের আমল থেকে প্রতিকৃতি চিত্রগুলি হয়ে ওঠে রূপকধর্মী। সম্রাট নিজেই এই প্রতিকৃতিগুলির বিষয় সম্পর্কে শিল্পীদের অবহিত করেন। জাহাঙ্গীরনামার অলঙ্করণে এই ছবিগুলি ব্যবহার হয়। এর ফলে ছবিগুলি শুধুমাত্র নান্দনিক মূল্যে চিহ্নিত না হয়ে বিশেষ একটি মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

মুঘল শিল্পীরা ধর্মীয় প্রতিমা না গড়লেও একই প্রতীক ব্যবহার করে সম্রাটদের যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন তাতে তাঁদের দেখানো হয় একই সঙ্গে জাগতিক ক্ষমতার অধিকারী ও দৈব অনুগ্রহপুষ্ট এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব রূপে। জাহাঙ্গীরের রূপকধর্মী প্রতিকৃতিগুলি লক্ষ করলে বোঝা যায় মুঘল শিল্পীদের মৌলিক প্রয়াসের বিভিন্ন রূপ।

মুঘল শিল্পীরা তেমন কোনও ধর্মীয় কাহিনীকে অবলম্বন করতে পারেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নির্ভর করেছেন নিজেদের দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ওপর। এইভাবে দরবারে আজীবন সম্রাটকে দেখানো হয়েছে দেবমূর্তির মতো নিশ্চয় স্থির। অন্যদিকে সম্রাটের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাতে আরোপ করা হয়েছে নতুন তাৎপর্য। এর ফলে সম্রাটের জীবনী হয়ে দাঁড়িয়েছেন একই সঙ্গে বাস্তব ক্ষমতার প্রকাশ ও নৈতিক মদাদর্শ প্রচারের আশ্চর্য কাহিনী।

সপ্তদশ শতকের শেষ থেকেই মুঘল দরবারি চিত্রের অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন প্রদেশে। এক ধরনের প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলা গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে দরবারি প্রতিকৃতি চিত্রগুলি নতুনভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

৩২.৫ প্রাদেশিক বিস্তার : রাজস্থান

মুঘল সম্রাটদের রাজপুত নীতি গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের তাগিদে। মিত্র সন্ধানে ব্যাপৃত মুঘলরা প্রথমে মুসলমান অভিজাত 'খানদান' ও পরে 'রাজপুত রাণাদের' দলে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এর ফলে মুঘল রাজনৈতিক সার্থকতার মধ্যে পড়ে রাজপুতদের আনুগত্য ও সমর্থন লাভ। উপহার, খেলাৎ ও আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আকবর গড়ে তুলেছিলেন এবং দরবারি সংস্কৃতি যার নিয়ামক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং।

রাজস্থানী চিত্রকলার যে মিশ্র আঙ্গিক গড়ে ওঠে তা মুঘল দরবারি শিল্পের প্রভাবে বিনষ্ট হয়নি; বরং জোরদার হয়েছিল। যে চিত্রকল্প সমস্ত রাজস্থানী চিত্রগুলিতে এক ধরনের সমতা আনে, তা নতুন মাত্রা পেয়েছিল মুঘল চিত্র আঙ্গিকের প্রভাবে। এটা সম্ভব হয়েছিল শুধু পৃষ্ঠপোষকের চাহিদায় নয়, শিল্পী ও সমসাময়িক দর্শকদের নান্দনিক চাহিদাতওে।

রাজস্থানী চিত্র-আঙ্গিকের উৎসস্থলে আছে তিনটি ভিন্ন চিত্ররীতি। একদিকে পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিচিত্রণ রীতি, যা মূলত অলংকৃত জৈনধর্মীয় গ্রন্থগুলির মাধ্যমে জৈনভাণ্ডারগুলিতে রক্ষিত ছিল। অন্যদিকে ছিল রাজস্থানের সমৃদ্ধ লোকশিল্প ঐতিহ্য। উজ্জ্বল রঙের সমাবেশ ও স্পষ্ট রেখার বেষ্টনীর মাধ্যমে চিত্রকল্পকে উপস্থাপিত করা হত দর্শকের সামনে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় মুঘল দরবারি চিত্র-আঙ্গিক যা একদিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে স্থান করে দেয় চিত্রভূমিতে। অন্যদিকে বিবৃত কাহিনীর প্রয়োজনমতো সৃষ্টি করে এক বিশেষ কল্পলোক। এই মিশ্র আঙ্গিকে যখন প্রাচীন মহাকাব্যগুলি চিত্রিত হয়, নায়ক-নায়িকারা রূপান্তরিত হন মুঘল অভিজাত পুরুষ ও নারীতে।

সপ্তদশ শতক থেকেই রাজস্থানী চিত্রকলার কয়েকটি বিশেষ থীম লক্ষ্য করা যায়—নায়ক-নায়িকাভেদ, বারোমাস্যা, রাগমালা ইত্যাদি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ঢোলা মারু, লোর চন্দানির মতো লৌকিক গাথা। এই বিষয়গত সমতা রাজস্থানী চিত্রকলায় সামঞ্জস্য আনে। তবু আঞ্চলিক কিছু বৈশিষ্ট্য থেকেই যায়, যার থেকে রাজস্থানের ভিন্ন প্রাদেশিক আঙ্গিকগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। যদিও রাজস্থানী চিত্রকলায় শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রতিভার ছাপ কমই থাকে, তবু এখানেও পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পীর যুগ্ম চাহিদা থেকেই গড়ে ওঠে নান্দনিক মাত্রা। যে নিরন্তর আঙ্গিকের পরীক্ষা মুঘল দরবারি শিল্পীকে ব্যাপৃত রাখে, প্রাদেশিক চিত্রকলায় তার উদাহরণ কমই লক্ষ করা যায়, এখানেই মুঘল দরবারি শিল্পের সঙ্গে আঞ্চলিক শিল্পের প্রভেদ।

মানুষ ও প্রকৃতির যথাযথ রূপায়ণের যে প্রচেষ্টা সপ্তদশ শতকের মুঘল দরবারি চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য, রাজস্থানী চিত্রকলায় তার প্রায় বিপরীত ঝোঁকই লক্ষ করা যায়। তার কারণ পাওয়া যায় টড সাহেবের লেখা সপ্তদশ শতকে রাজস্থানী রাণাদের জীবনযাত্রার বর্ণনায়—'প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানের বিরাট

বিরাট গাছগুলির ছায়ায় বসে রাণারা চারণের কথা শুনতেন আর সেই বৃহৎ জলাশয়ের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁদের স্নায়ু তৃপ্ত হত। ফুলের গন্ধে তাঁরা দ্বিপ্রহরের নিদ্রা ও সুখস্বপ্নে ডুবে যেতেন। এইভাবে রাজপুত রাণারা যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করে বিলাসিতার অফুরন্ত সুখস্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে থাকলেন।'

এই মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভক্তিবাদের প্রেরণা। বল্লভাচার্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম ষোড়শ শতক থেকেই রাজস্থানে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সুরদাস ও বিহারীলালের মতো কবিরা, কাব্য রচনার মাধ্যমে সৃষ্টি করেন এক চিত্রময় জগৎ, যেখানে দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় কথা ও ভাবের প্রকাশে কয়েকটি বিশেষ রূপকল্পে। এর ফলে রসের যে অফুরন্ত লীলা ধর্মীয় জনতাকে সামাজিক স্তরভেদ ভুলিয়ে এক শিল্পজগতে উত্তরণের সুযোগ করে দিয়েছিল, সেই রসবোধই বহুদিন পর্যন্ত রাজস্থানী শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষককে আবদ্ধ রাখে মোহময় এক কল্পলোকে, যেখানে মুঘল চিত্রের প্রকৃতিসদৃশ দৃশ্যজগৎ শুধুমাত্র পটভূমি রচনা করে। যে কাহিনী বিবৃত হতে থাকে তা ভক্তি, প্রেম ও লীলার বর্ণনা। তার দ্বারা ইতিহাসচিত্রণ অসম্ভব হয়ে ওঠে।

৩২.৫.১ শেষ পর্যায়

মুঘল দরবারে যে শিল্প আঙ্গিকের জন্ম তার শেষ হয় অষ্টাদশ শতকে। মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বুনিয়াদ ভেঙে পড়তে শুরু করে ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেই। শিল্পীরা আশ্রয় খোঁজেন বিভিন্ন রাজ্যে।

এর মধ্যে অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও বাংলায় মুঘল শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামোটি বজায় থাকে। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদে যে শিল্প ঘরানা গড়ে ওঠে তা লক্ষ করলে আমরা মুঘল দরবারি শিল্পের শেষ অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি।

বাংলার নবাবরা ছিলেন শিল্পের বড়ো পৃষ্ঠপোষক। ইন্দো-পারসিক সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য মুর্শিদাবাদের নবাবরা বহন করতেন, সেই হিসাবেই তাঁরা পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তাঁদের ক্ষমতার যে বৈধকরণ হত, সে সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন।

শেষে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর যে নতুন শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়, তাতে পুরনো সামাজিক সম্পর্কগুলি ভেঙে পড়ে, সেই সঙ্গে ভেঙে পড়ে বেশকিছু শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থা। মুঘল দরবারি শিল্পীরা সাহেবদের দরজায় দরজায় ছবি কাঁধে ফিরি করে বেড়ান এবং ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার পর যখন সাম্রাজ্যের সস্তা স্মারকচিহ্ন হিসাবেও প্রাক্তন দরবারি শিল্পীদের কাজের আর কোনও দাম থাকে না, তখন তাঁরা মিলিয়ে যান দেশের আরও বহু শিল্পীর মতো বিস্মৃতির অন্ধকারে।

৩২.৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। মুঘল আমলে সম্রাট ও অভিজাতবর্গ কিভাবে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষণা করতেন?

২। মুঘল দরবারি শিল্পীরা সমাজের কোন্ বর্গ থেকে আসতেন? তাদের সামাজিক অবস্থা কি ছিল ও স্বাধীনতা কতটা ছিল?

৩। মুঘল চিত্রকলায় পারসিক ও ভারতীয় কাব্য এবং মুঘল ইতিহাস কিভাবে বিম্বিত হয়েছে?

৪। মুঘল চিত্রকলায় ইউরোপীয় অভিঘাত কিভাবে অনুভূত হয়?

৫। রাজস্থানে মুঘল চিত্রকলার বিস্তার কতটা ঘটেছিল?

ছোট প্রশ্ন :

৬। মুঘল দরবারি শিল্পের অবক্ষয় কখন শুরু হয়?

৭। মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রে বিভিন্ন চাহিদার সমন্বয় কিভাবে ঘটেছিল?

৮। নান্দনিক উপভোগ ছাড়াও মুঘল চিত্রকলার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি?

বিষয়ানুগ প্রশ্ন :

৯। চিত্র-কারখানা কি? কোন্ কোন্ গ্রন্থে এর বিবরণ পাওয়া যায়?

১০। আকবরের আমলে কতজন হিন্দু ও কতজন মুসলমান শিল্পী কাজ করতেন?

১১। জাহাঙ্গীরের সময়ে প্রধান চিত্রকর কারা ছিলেন?

১২। 'হামজানামা' কি? কখন এর অলংকরণ শুরু হয়?

১৩। 'খানদান-ই-তিমুরিয়া' কি?

১৪। মুঘল চিত্রশিল্পে পারসিক রীতির প্রাধান্য কখন কমতে থাকে?

১৫। মুঘল চিত্রশিল্পীরা কোন্ কোন্ তিনটি প্রধান পদ্ধতি অনুসরণ করতেন?

১৬। মুঘল দরবারি প্রতিকৃতির প্রধান বিষয় কি ছিল?

১৭। রাজস্থানী চিত্রশিল্পের প্রধান উৎসগুলি কি কি?

১৮। রাজস্থানে চিত্রশিল্পে ভক্তিবাদের প্রেরণা কাদের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল?

NOTES